অসমাপ্ত আত্মজীবনী

শেখ মুজিবুর রহমান



অসমাপ্ত আত্মজীবনী

শেখ মুজিবুর রহমান

As a man, what concerns
mankind concerns me.
As a Bangalee, I am
deeply involved in all that
concerns Bangalees. This
abiding involvement is
born of and nourished
by love, enduring love,
which gives meaning to
my politics and to my
very being.

Sheikh Mujibur Rahman
30.5.73

(An excerpt from the Personal Notebook of
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman
Prime Minister of the People's Republic of Bangladesh)

একজন মানুষ হিসাবে সমগ্র মানবজাতি নিয়েই আমি ভাবি। একজন বাঙালি হিসাবে
যা কিছু বাঙালিদের সঙ্গে সম্পর্কিত তাই আমাকে গভীরভাবে ভাবায়।
এই নিরন্তর সম্পৃক্তির উৎস ভালোবাসা, অক্ষয় ভালোবাসা, যে ভালোবাসা
আমার রাজনীতি এবং অস্তিত্বকে অর্থবহ করে তোলে।

সূচিপত্র

ভূমিকা

আমার পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জীবনের সব থেকে মূল্যবান সময়গুলো কারাবন্দি হিসেবেই কাটাতে হয়েছে। জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলন করতে গিয়েই তাঁর জীবনে বার বার এই দুঃসহ নিঃসঙ্গ কারাজীবন নেমে আসে। তবে তিনি কখনও আপোস করেন নাই। ফাঁসির দড়িকেও ভয় করেন নাই। তাঁর জীবনে জনগণই ছিল অন্তঃপ্রাণ। মানুষের দুঃখে তাঁর মন কাঁদত। বাংলার দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটাবেন, সোনার বাংলা গড়বেন—এটাই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য—এই মৌলিক অধিকারগুলো পূরণের মাধ্যমে মানুষ উন্নত জীবন পাবে, দারিদ্র্যের কশাঘাত থেকে মুক্তি পাবে, সেই চিন্তাই ছিল প্রতিনিয়ত তাঁর মনে। যে কারণে তিনি নিজের জীবনের সব সুখ আরাম আয়েশ ত্যাগ করে জনগণের দাবি আদায়ের জন্য এক আদর্শবাদী ও আত্মত্যাগী রাজনৈতিক নেতা হিসেবে আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন, বাঙালি জাতিকে দিয়েছেন স্বাধীনতা। বাঙালি জাতিকে বীর হিসেবে বিশ্বে দিয়েছেন অনন্য মর্যাদা, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ নামে বিশ্বে এক রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছেন। বাঙালির হাজার বছরের স্বপ্ন সফল করেছেন। বাংলার মানুষের মুক্তির এই মহানায়ক স্বাধীনতা সংগ্রাম শেষে যখন জাতীয় পুনর্গঠন ও অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন নিশ্চিত করছিলেন তখনই ঘাতকের নির্মম বুলেট তাঁকে জনগণের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে। স্বাধীন বাংলার সবুজ ঘাস তাঁর রক্তে রঞ্জিত হয়েছে। বাঙালি জাতির ললাটে চিরদিনের জন্য কলঙ্কের টিকা এঁকে দিয়েছে খুনিরা।

এই মহান নেতা নিজের হাতে স্মৃতিকথা লিখে গেছেন যা তার মহাপ্রয়াণের উনত্রিশ বছর পর হাতে পেয়েছি। সে লেখা তাঁর ছোটবেলা থেকে বড় হওয়া, পরিবারের কথা, ছাত্র জীবনের আন্দোলন, সংগ্রামসহ তাঁর জীবনের অনেক অজানা ঘটনা জানার সুযোগ এনে দেবে। তাঁর বিশাল রাজনৈতিক জীবনের এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা এই গ্রন্থে তাঁর লেখনীর ভাষায় আমরা পাই। তিনি যা দেখেছেন, উপলব্ধি করেছেন এবং রাজনৈতিকভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন সবই সরল সহজ ভাষায় প্রকাশ করেছেন। তাঁর এই সংগ্রাম, অধ্যাবসায় ও আত্মত্যাগের মহিমা থেকে যে সত্য জানা যাবে তা আগামী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত

করবে। ইতিহাস বিকৃতির কবলে পড়ে যারা বিভ্রান্ত হয়েছেন তাদের সত্য ইতিহাস জানার সুযোগ করে দেবে গবেষক ও ইতিহাসবিদদের কাছে এ গ্রন্থ মূল্যবান তথ্য ও সত্য তুলে ধরবে।

এই আত্মজীবনী আমার পিতার নিজ হাতে লেখা। খাতাগুলো প্রাপ্তির পিছনে রয়েছে এক লম্বা ইতিহাস। এই বইটা যে শেষ পর্যন্ত ছাপাতে পারব, আপনাদের হাতে তুলে দিতে পারব সে আশা একদম ছেড়েই দিয়েছিলাম।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়ার পরপরই আমাদের ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কের বাড়িতে (পুরাতন), (বর্তমান সড়ক নম্বর ১১, বাড়ি নম্বর ১০) পাকিস্তানী সেনাবাহিনী হানা দেয় এবং আমার পিতাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। তাঁকে গ্রেফতারের পর আমার মা ছোট দুই ভাই রাসেল ও জামালকে নিয়ে পাশের বাড়িতে আশ্রয় নেন। এরপর আবার ২৬শে মার্চ রাতে পুনরায় সেনারা হানা দেয় এবং সমগ্র বাড়ি লুটপাট করে, ভাঙচুর করে। বাড়িটা ওদের দখলেই থাকে। এই বাড়িতে আব্বার শোবার ঘরের সাথে একটা ড্রেসিংরুম রয়েছে, সেখানে একটা আলমারির উপরে এক কোণে খাতাগুলো আমার মা যত্ন করে রেখেছিলেন। যেহেতু পুরনো মলাটের অনেকগুলো খাতা, যার মধ্যে এই আত্মজীবনী ছাড়াও স্মৃতিকথা, ডায়েরি, ভ্রমণ কাহিনী এবং আমার মায়ের হিসাব লেখার খাতাও ছিল, সে কারণে ওদের কাছে আর এগুলো লুটপাট করার মত মূল্যবান মনে হয়নি। তারা সেগুলো ওভাবে ফেলে রেখে যায়, খাতাগুলো আমরা অক্ষত অবস্থায় পাই।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ৩২ নম্বর সড়কের বাড়িতে পরিবারের সকলকে হত্যার পর তৎকালীন সরকার বাড়িটা বন্ধ করে রেখেছিল। ১৯৮১ সালের ১৭ মে আমি প্রবাস থেকে দেশে ফিরে আসি। তখনও বাড়িটা জিয়া সরকার সিল করে রেখেছিল। আমাকে ঐ বাড়িতে প্রবেশ করতে দেয় নাই। এরপর ওই বছরের ১২ জুন সাত্তার সরকার আমাদের কাছে বাড়িটা হস্তান্তর করে। তখন আব্বার লেখা স্মৃতিকথা, ডায়েরি ও চীন ভ্রমণের খাতাগুলো পাই। আত্মজীবনী লেখা খাতাগুলো পাইনি। কিছু টাইপ করা কাগজ পাই যা উইপোকা খেয়ে ফেলেছে। ফুলস্কেপ পেপারের অর্ধেক অংশই নেই শুধু উপরের অংশ আছে। এসব অংশ পড়ে বোঝা যাচ্ছিল যে, এটি আব্বার আত্মজীবনীর পাণ্ডুলিপি, কিন্তু যেহেতু অর্ধেকটা নাই সেহেতু কোন কাজেই আসবে না। এরপর অনেক খোঁজ করেছি। মূল খাতা কোথায় কার কাছে আছে জানার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কোন লাভ হয় নাই। এক পর্যায়ে এগুলোর আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম।

ইতোমধ্যে ২০০০ সাল থেকে আমরা বঙ্গবন্ধুর লেখা স্মৃতিকথা, নয়াচীন ভ্রমণ ও ডায়েরি প্রকাশের প্রস্তুতি গ্রহণ করি। আমেরিকার জর্জ টাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এনায়েতুর রহিম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন বঙ্গবন্ধুর উপর গবেষণা করতে। বিশেষ করে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা—এই বিষয়টা ছিল তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু। তিনি মাহাবুবউল্লাহ-জেবুন্নেছা ট্রাস্ট কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠিত 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর

রহমান চেয়ার'-এ যোগ দেন 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' গবেষণার জন্য। এই গবেষণা কাজ করার সময় বঙ্গবন্ধুর জীবন, স্মৃতিকথা ও ডায়েরি নিয়েও কাজ শুরু করেন। আমি ও সাংবাদিক বেবী মওদুদ তাঁকে সহায়তা করি। ড. এনায়েতুর রহিম বাংলা থেকে ইংরেজি অনুবাদ করতে শুরু করেন। কিন্তু তাঁর অকাল মৃত্যুতে এই কাজে বিরাট ক্ষতি সাধিত হয়। এভাবে হঠাৎ করে তিনি চলে যাবেন তা স্বপ্নেও ভাবতে পারি নাই।

আমি এ অবস্থায় হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। এ সময় ইতিহাসবিদ প্রফেসর এ. এফ. সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্রফেসর শামসুল হুদা হারুন, লোকসাহিত্যবিদ ও গবেষক অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান এ ব্যাপারে আমাদের মূল্যবান পরামর্শ ও সহযোগিতা দিয়েছেন। পরবর্তীকালে প্রফেসর সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ ও শামসুল হুদা হারুন অনুবাদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শামসুজ্জামান খানের সঙ্গে আমি ও বেবী মওদুদ মূল বাংলা পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা, কম্পোজ ও সংশোধনসহ অন্যান্য কাজগুলো সম্পন্ন করি। মূল খাতার সঙ্গে মিলিয়ে পড়ি বারো-চৌদ্দ বার। অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করেই কাজ এগোতে থাকে। ছাপাতে দেবার একটা সময়সীমাও ঠিক করা হয়।

যখন 'স্মৃতিকথা' ও 'ডায়েরি'র কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে সেই সময় আমার হাতে এল নতুন চারখানা খাতা, যা আত্মজীবনী হিসেবে লেখা হয়েছিল। এই খাতাগুলো পাবার পিছনে একটা ঘটনা রয়েছে। আমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে ২০০৪ সালের ২১ আগস্টে বঙ্গবন্ধু এভেনিউতে আওয়ামী লীগের এক সমাবেশে ভয়াবহ গ্রেনেড হামলা হয়। মহিলা আওয়ামী লীগের সভানেত্রী আইভী রহমানসহ চব্বিশজন মৃত্যুবরণ করেন। আমি আশ্চর্যজনকভাবে বেঁচে যাই। এই ঘটনার পর শোক-কষ্ট-বেদনায় যখন জর্জরিত ঠিক তখন আমার কাছে এই খাতাগুলো এসে পৌঁছায়। এ এক আশ্চর্য ঘটনা। এত দুঃখ-কষ্ট-বেদনার মাঝেও যেন একটু আলোর ঝলকানি। আমি ২১ আগস্ট মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে এসেছি। মনে হয় যেন নতুন জন্ম হয়েছে। আর সেই সময় আমার হাতে এল আব্বার হাতের লেখা এই অমূল্য আত্মজীবনীর চারখানা খাতা! শেষ পর্যন্ত এই খাতাগুলো আমার এক ফুফাতো ভাই এনে আমাকে দিল। আমার আরেক ফুফাতো ভাই বাংলার বাণী সম্পাদক শেখ ফজলুল হক মণির অফিসের টেবিলের ড্রয়ার থেকে সে এই খাতাগুলো পেয়েছিল। সম্ভবত আব্বা শেখ মণিকে টাইপ করতে দিয়েছিলেন, আত্মজীবনী ছাপাবেন এই চিন্তা করে। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তিনিও শাহাদাৎবরণ করায় তা করতে পারেন নাই। কাজটা অসমাপ্ত রয়ে যায়।

খাতাগুলো হাতে পেয়ে আমি তো প্রায় বাকরুদ্ধ। এই হাতের লেখা আমার অতি চেনা। ছোট বোন শেখ রেহানাকে ডাকলাম। দুই বোন চোখের পানিতে ভাসলাম। হাত দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে পিতার স্পর্শ অনুভব করার চেষ্টা করলাম। মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছি; তারপরই এই প্রাপ্তি। মনে হল যেন পিতার আশীর্বাদের পরশ পাচ্ছি। আমার যে এখনও দেশের মানুষের জন্য—সেই মানুষ, যারা আমার পিতার ভাষায় বাংলার 'দুঃখী মানুষ',—সেই দুঃখী মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের কাজ বাকি, তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার কাজ

ব্যকি, সেই বার্তাই যেন আমাকে পৌঁছে দিচ্ছেন। যখন খাতাগুলোর পাতা উল্টাচ্ছিলাম আর হাতের লেখাগুলো ছুঁয়ে যাচ্ছিলাম আমার কেবলই মনে হচ্ছিল আব্বা আমাকে যেন বলছেন, ভয় নেই মা, আমি আছি, তুই এগিয়ে যা, সাহস রাখ। আমার মনে হচ্ছিল, আল্লাহর তরফ থেকে ঐশ্বরিক অভয় বাণী এসে পৌঁছাল আমার কাছে। এত দুঃখ-কষ্ট-বেদনার মাঝে যেন আলোর দিশা পেলাম।

আব্বার হাতে লেখা চারখানা খাতা। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে খাতাগুলো নাড়াচাড়া করতে হয়েছে। খাতাগুলোর পাতা হলুদ, জীর্ণ ও খুবই নরম হয়ে গেছে। অনেক জায়গায় লেখাগুলো এত ঝাপসা যে পড়া খুবই কঠিন। একটা খাতার মাঝখানের কয়েকটা পাতা একেবারেই নষ্ট, পাঠোদ্ধার করা অত্যন্ত কঠিন। পরদিন আমি, বেবী মওদুদ ও রেহানা কাজ শুরু করলাম। রেহানা খুব ভেঙে পড়ে যখন খাতাগুলো পড়তে চেষ্টা করে। ওর কান্না বাঁধ মানে না। প্রথম কয়েক মাস আমারও এমন হয়েছিল যখন স্মৃতিকথা ও ডায়েরি নিয়ে কাজ শুরু করেছিলাম। ধীরে ধীরে মনকে শক্ত করেছি। প্রথমে খাতাগুলো ফটোকপি করলাম। আবদুর রহমান (রমা) এই কাজে আমাদের সাহায্য করল। খুবই সাবধানে কপি করতে হয়েছে। একটু বেশি নাড়াচাড়া করলেই পাতা ছিঁড়ে যায়। এরপর মূল খাতা থেকে আমি ও বেবী পালা করে রিডিং পড়েছি আর মনিরুন নেছা নিনু কম্পোজ করেছে। এতে কাজ দ্রুত হয়েছে। হাতের লেখা দেখে কম্পোজ করতে অনেক বেশি সময় লাগে। সময় বাঁচাতে এই ব্যবস্থা। কোথাও কোথাও লেখার পাঠ অস্পষ্ট। ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে উদ্ধারের চেষ্টা করা হয়েছে। তবে চারখানা খাতার সবটুকু লেখাই কম্পিউটারে কম্পোজ করা হয়েছে। খাতাগুলোতে জেলারের স্বাক্ষর দেয়া অনুমোদনের পৃষ্ঠা ঠিকমত আছে। তাতে সময়টা জানা যায়।

এরপর আমি ও বেবী মওদুদ মূল খাতার সঙ্গে মিলিয়ে পড়ে সম্পাদনা ও সংশোধনের কাজটা প্রথমে শেষ করি। তারপর অধ্যাপক শামসুজ্জামান খানের সঙ্গে আমি ও বেবী মওদুদ পাণ্ডুলিপির সম্পাদনা, প্রুফ দেখা, টিকা লেখা, স্ক্যান, ছবি নির্বাচন ইত্যাদি যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করি। শেখ রেহানা আমাদের এসব কাজে অংশ নিয়ে সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করে।

এই লেখাগুলো বারবার পড়লেও যেন শেষ হয় না। আবার পড়তে ইচ্ছা হয়। দেশের জন্য, মানুষের জন্য, একজন মানুষ কিভাবে কতখানি ত্যাগ স্বীকার করতে পারেন, জীবনের ঝুঁকি নিতে পারেন, জেল জুলুম নির্যাতন সহ্য করতে পারেন তা জানা যায়। জীবনের সুখ-স্বস্তি, আরাম, আয়েশ, মোহ, ধনদৌলত, সবকিছু ত্যাগ করার এক মহান ব্যক্তিত্বকে খুঁজে পাওয়া যায়। শুধু সাধারণ গরিব দুঃখী মানুষের কল্যাণ চেয়ে কিভাবে তিনি নিজের সব চাওয়া-পাওয়া বিসর্জন দিয়েছেন তা একটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে অনুধাবন করা যাবে। এই লেখার সূত্র ধরে গবেষণা করলে আরও বহু অজানা তথ্য সংগ্রহ করা যাবে। জানা যাবে অনেক অজানা কাহিনী। তথ্যবহুল লেখায় পাকিস্তান আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন, বাঙালির স্বাধীনতা ও স্বাধিকার আন্দোলন এবং গণতান্ত্রিক সংগ্রামের বিরুদ্ধে পাকিস্তানী

শাসকগোষ্ঠীর নানা চক্রান্ত ইত্যাদি বিভিন্ন ঘটনা ও ইতিহাস জানার সুযোগ হবে। আর সেই সঙ্গে কায়েমী স্বার্থবাদীদের নানা ষড়যন্ত্র এবং শাসনের নামে শোষণের অপচেষ্টাও তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে তুলে ধরেছেন। বাংলার মানুষ এখনও বড় কষ্টে আছে। আগামী প্রজন্ম এই লেখা পড়ে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশসেবায় ব্রতী হবে সে প্রত্যাশা রাখছি।

এ গ্রন্থে বঙ্গবন্ধু ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত তাঁর আত্মজীবনী লিখেছেন। ১৯৬৬-৬৯ সালে কেন্দ্রীয় কারাগারে রাজবন্দি থাকাকালে একান্ত নিরিবিলি সময়ে তিনি লিখেছেন। তিনি যেভাবে লিখেছেন আমাদের খুব বেশি সম্পাদনা করতে হয়নি। তবে কিছু শব্দ ও ভাষার সাবললীতা রক্ষার জন্য সামান্য কিছু সম্পাদনা করা হয়েছে। আত্মজীবনী হিসেবে প্রকাশের ইচ্ছা তাঁর ছিল বলে সে সময়ে টাইপ করতে দেন। তিনি এ গ্রন্থ কাউকে উৎসর্গ করে যাননি।

প্রফেসর এ. এফ. সালাহ্‌উদ্দীন আহ্‌মদ এই আত্মজীবনীর কাজে শুরু থেকে সব সময় প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছেন। এর ইংরেজি অনুবাদের কাজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের প্রফেসর ফকরুল আলম খুবই আন্তরিকতার সঙ্গে দ্রুত শেষ করেছেন। আমি তাঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। তাঁদের এই মূল্যবান পরামর্শ ও সহযোগিতা ছাড়া এই বিরাট দায়িত্ব পালন কখনোই সম্ভব হত না।

এই গ্রন্থ প্রকাশনার কাজে অন্যান্য যাঁরা সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

শেখ হাসিনা
০৭.০৮.২০০৭
সাব জেল
শেরে বাংলানগর, ঢাকা।

পুনশ্চ: এই আত্মজীবনীর ভূমিকা আমি কারাবন্দি অবস্থায় লিখেছিলাম। মুক্তি পেয়ে বইটি প্রকাশনার পদক্ষেপ নিই। এ গ্রন্থটি দেশে-বিদেশে প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়ে ইউপিএলের প্রকাশক মহিউদ্দিন আহমেদ এবং কনসাল্টিং এডিটর বদিউদ্দিন নাজির সহযোগিতা করায় আমি তাঁদের ধন্যবাদ জানাই। কম্পিউটার গ্র্যাফিক্স ও স্ক্যান ইত্যাদি কাজে আমাদের সহায়তা করায় ধনেশ্বর দাস চম্পককে ধন্যবাদ।

শেখ হাসিনা
৩০.০৭.২০১০
গণভবন
শেরে বাংলানগর, ঢাকা।

Certified that this Khata Contains (252)
Two hundred fifty two pages and passed
for Mr. M. Mujibur Rahman on 9/6/67

Dy. Inspector General of Prisons
Dacca Division,
Central Jail,
DACCA.

পাণ্ডুলিপির একটি খাতায় জেল কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর

Certified that this Khata Contains (220)
Two hundred twenty pages and passed
for Mr. M. Mujibur Rahman on 27/9/67

Dy. Inspector General of Prisons
Dacca Division,
Central Jail,
DACCA.

পাণ্ডুলিপির একটি খাতায় জেল কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর

বন্ধুবান্ধবরা বলে, "তোমার জীবনী লেখ"। সহকর্মীরা বলে, "রাজনৈতিক জীবনের ঘটনাগুলি লিখে রাখ, ভবিষ্যতে কাজে লাগবে।" আমার সহধর্মিণী একদিন জেলগেটে বসে বলল, "বসেই তো আছ, লেখ তোমার জীবনের কাহিনী।" বললাম, "লিখতে যে পারি না; আর এমন কি করেছি যা লেখা যায়! আমার জীবনের ঘটনাগুলি জেনে জনসাধারণের কি কোনো কাজে লাগবে? কিছুই তো করতে পারলাম না। শুধু এইটুকু বলতে পারি, নীতি ও আদর্শের জন্য সামান্য একটু ত্যাগ স্বীকার করতে চেষ্টা করেছি।"

একদিন সন্ধ্যায় বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে দিয়ে জমাদার সাহেব চলে গেলেন। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ছোট্ট কোঠায় বসে বসে জানালা দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবছি, সোহরাওয়ার্দী সাহেবের কথা। কেমন করে তাঁর সাথে আমার পরিচয় হল। কেমন করে তাঁর সান্নিধ্য আমি পেয়েছিলাম। কিভাবে তিনি আমাকে কাজ করতে শিখিয়েছিলেন এবং কেমন করে তাঁর স্নেহ আমি পেয়েছিলাম।

হঠাৎ মনে হল লিখতে ভাল না পারলেও ঘটনা যতদূর মনে আছে লিখে রাখতে আপত্তি কি? সময় তো কিছু কাটবে। বই ও কাগজ পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে চোখ দুইটাও ব্যথা হয়ে যায়। তাই খাতাটা নিয়ে লেখা শুরু করলাম। আমার অনেক কিছুই মনে আছে। স্মরণশক্তিও কিছুটা আছে। দিন তারিখ সামান্য এদিক ওদিক হতে পারে, তবে ঘটনাগুলি ঠিক হবে বলে আশা করি। আমার স্ত্রী যার ডাক নাম রেণু—আমাকে কয়েকটা খাতাও কিনে জেলগেটে জমা দিয়ে গিয়েছিল। জেল কর্তৃপক্ষ যথারীতি পরীক্ষা করে খাতা কয়টা আমাকে দিয়েছেন। রেণু আরও একদিন জেলগেটে বসে আমাকে অনুরোধ করেছিল। তাই আজ লিখতে শুরু করলাম।[1]



আমার জন্ম হয় ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার[2] টুঙ্গিপাড়া গ্রামে। আমার ইউনিয়ন হল ফরিদপুর জেলার দক্ষিণ অঞ্চলের সর্বশেষ ইউনিয়ন। এই ইউনিয়নের পাশেই মধুমতী নদী। মধুমতী খুলনা ও ফরিদপুব জেলাকে ভাগ করে রেখেছে।

টুঙ্গিপাড়ার শেখ বংশের নাম কিছুটা এতদঞ্চলে পরিচিত। শেখ পরিবারকে একটা মধ্যবিত্ত পরিবার বলা যেতে পারে। বাড়ির বৃদ্ধ ও দেশের গণ্যমান্য প্রবীণ লোকদের কাছ থেকে এই বংশেব কিছু কিছু ঘটনা জানা যায়।

পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠার চিত্রলিপি

আমার জন্ম হয় এই টুঙ্গিপাড়া শেখ বংশে। শেখ বোরহানউদ্দিন নামে এক ধার্মিক পুরুষ এই বংশের গোড়াপত্তন করেছেন বহুদিন পূর্বে। শেখ বংশের যে একদিন সুদিন ছিল তার প্রমাণস্বরূপ মোগল আমলের ছোট ছোট ইটের দ্বারা তৈরি চকমিলান দালানগুলি আজও আমাদের বাড়ির শ্রীবৃদ্ধি করে আছে। বাড়ির চার ভিটায় চারটা দালান। বাড়ির ভিতরে প্রবেশের একটা মাত্র দরজা, যা আমরাও ছোটসময় দেখেছি বিরাট একটা কাঠের কপাট দিয়ে বন্ধ করা যেত। একটা দালানে আমার এক দাদা থাকতেন। এক দালানে আমার এক মামা আজও কোনোমতে দিন কাটাচ্ছেন। আর একটা দালান ভেঙে পড়েছে, যেখানে বিষাক্ত সর্পকুল দয়া করে আশ্রয় নিয়েছে। এই সকল দালান চুনকাম করার ক্ষমতা আজ তাদের অনেকেরই নাই। এই বংশের অনেকেই এখন এ বাড়ির চারপাশে টিনের ঘরে বাস করেন। আমি এই টিনের ঘরের এক ঘরেই জন্মগ্রহণ করি।

শেখ বংশ কেমন করে বিরাট সম্পদের মালিক থেকে আস্তে আস্তে ধ্বংসের দিকে গিয়েছিল তার কিছু কিছু ঘটনা বাড়ির মুরুব্বিদের কাছ থেকে এবং আমাদের দেশের চারণ কবিদের গান থেকে আমি জেনেছি। এর অধিকাংশ যে সত্য ঘটনা এ সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নাই। শেখ বংশের সব গেছে, শুধু আজও তারা পুরাতন স্মৃতি ও পুরানো ইতিহাস বলে গর্ব করে থাকে।

শেখ বোরহানউদ্দিন কোথা থেকে কিভাবে এই মধুমতীর তীরে এসে বসবাস করেছিলেন কেউই তা বলতে পারে না। আমাদের বাড়ির দালানগুলির বয়স দুইশত বৎসরেরও বেশি হবে। শেখ বোরহানউদ্দিনের পরে তিন চার পুরুষের কোনো ইতিহাস পাওয়া যায় না। তবে শেখ বোরহানউদ্দিনের ছেলের ছেলে অথবা দু'এক পুরুষ পরে দুই ভাইয়ের ইতিহাস পাওয়া যায়। এঁদের সম্বন্ধে অনেক গল্প আজও শোনা যায়। এক ভাইয়ের নাম শেখ কুদরতউল্লাহ, আর এক ভাইয়ের নাম শেখ একরামউল্লাহ। আমরা এখন যারা আছি তারা এই দুই ভাইয়ের বংশধর। এই দুই ভাইয়ের সময়েও শেখ বংশ যথেষ্ট অর্থ ও সম্পদের অধিকারী ছিল। জমিদারির সাথে সাথে তাদের বিরাট ব্যবসাও ছিল।

শেখ কুদরতউল্লাহ ছিলেন সংসারী ও ব্যবসায়ী; আর শেখ একরামউল্লাহ ছিলেন দেশের সরদার, আচার-বিচার তিনিই করতেন।

শেখ কুদরতউল্লাহ ছিলেন বড় ভাই। এই সময় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলাদেশ দখল করে এবং কলকাতা বন্দর গড়ে তোলে। ইংরেজ কুঠিয়াল সাহেবরা এই দেশে এসে নীল চাষ শুরু করে। শেখ কুদরতউল্লাহ সম্বন্ধে একটা গল্প আজও অনেকে বলাবলি করে থাকে এবং গল্পটা সত্য। খুলনা জেলার আলাইপুরে মি. রাইন নামে একজন ইংরেজ কুঠিয়াল সাহেব নীল চাষ শুরু করে এবং একটা কুঠি তৈরি করে। আজও সে কুঠিটা আছে। শেখদের নৌকার বহর ছিল। সেইসব নৌকা মাল নিয়ে কলকাতায় যেত। মি. রাইন নৌকা আটক করে মাঝিদের দিয়ে কাজ করাত এবং অনেক দিন পর্যন্ত আটক রাখত। শুধু শেখদের নৌকাই নয় অনেকের নৌকাই আটক রাখত। কেউ বাধা দিলে অকথ্য অত্যাচার করত। তখনকার দিনের ইংরেজের অত্যাচারের কাহিনী প্রায় সকলেরই জানা আছে। শেখরা

পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠার চিত্রলিপি

তখনও দুর্বল হয়ে পড়ে নাই। রাইনের লোকদের সাথে কয়েক দফা দাঙ্গাহাঙ্গামা হল এবং কোর্টে মামলা দায়ের হল। মামলায় প্রমাণ হল রাইন অন্যায় করেছে। কোর্ট শেখ কুদরতউল্লাহকে বলল, যত টাকা ক্ষতি হয়েছে জরিমানা করুন, রাইন দিতে বাধ্য। ঐ যুগে এইভাবেই বিচার হত। শেখ কুদরতউল্লাহ রাইনকে অপমান করার জন্য 'আধা পয়সা'[৩] জরিমানা করল। রাইন বলেছিল, "যত টাকা চান দিতে রাজি আছি, আমাকে অপমান করবেন না। তাহলে ইংরেজ সমাজ আমাকে গ্রহণ করবে না; কারণ, 'কালা আদমি' আধা পয়সা জরিমানা করেছে।" কুদরতউল্লাহ শেখ উত্তর করেছিল বলে কথিত আছে, "টাকা আমি গুনি না, মেপে রাখি। টাকার আমার দরকার নাই। তুমি আমার লোকের উপর অত্যাচার করেছ; আমি প্রতিশোধ নিলাম।" কুদরতউল্লাহ শেখকে লোকে 'কদু শেখ' বলে ডাকত। আজও খুলনা ও ফরিদপুরের বৃদ্ধ মানুষ বলে থাকে এই গল্পটা মুখে মুখে। 'কুদরতউল্লাহ শেখের আধা পয়সা জরিমানার', দু'একটা গানও আছে। আমি একবার মিটিং করতে যাই বাগেরহাটে, আমার সাথে জিল্লুর রহমান এডভোকেট ছিল। ট্রেনের মধ্যে আমার পরিচয় পেয়ে এক বৃদ্ধ এই গল্পটা আমাকে বলেছিলেন। খুলনা জেলায় গল্পটা বেশি পরিচিত।

শেখ কুদরতউল্লাহ ও একরামউল্লাহ শেখের মৃত্যুর দুই-এক পুরুষ পর থেকেই শেখ বাড়ির পতন শুরু হয়। পর পর কয়েকটা ঘটনার পরেই শেখদের আভিজাত্যটাই থাকল, অর্থ ও সম্পদ শেষ হয়ে গেল।

ইংরেজরা মুসলমানদের ভাল চোখে দেখত না। প্রথম ঘটনা, রাণী রাসমণি হঠাৎ জমিদার হয়ে শেখদের সাথে লড়তে শুরু করলেন, ইংরেজও তাঁকে সাহায্য করল। কলকাতার একটা সম্পত্তি ও উল্টাডাঙ্গার আড়তে শেখদের সম্পত্তি ছিল। এই সম্পত্তি দেখাশোনা করতেন শেখ অছিমুদ্দিন। আবার জমিদারি নিয়েও রাসমণির স্টেটের সাথে দাঙ্গাহাঙ্গামা লেগেই ছিল। শেখ বাড়ি থেকে তিন মাইল দূরে শ্রীরামকান্দি গ্রামে তমিজুদ্দিন নামে এক দুর্ধর্ষ লোক বাস করত। পরে রাসমণি স্টেটের পক্ষ অবলম্বন করেছিল। সে ভাল যোদ্ধা ছিল। একবার দুইপক্ষে খুব মারামারি হয়। এতে রাণী রাসমণির লোক পরাজিত হয়। শেখদের লোকেদের হাতে তমিজুদ্দিন আহত অবস্থায় ধরা পড়ে এবং শোনা যায় যে, পরে মৃত্যুবরণ করে। মামলা শুরু হয়। শেখদের সকলেই গ্রেফতার হয়ে যায়। পরে বহু অর্থ খরচ করে হাইকোর্ট থেকে মুক্তি পায়।

এরপরই আর একটা ঘটনা হয়। টুঙ্গিপাড়া শেখ বাড়ির পাশেই আরেকটা পুরানা বংশ আছে, যারা কাজী বংশ নামে পরিচিত। এদের সাথে শেখদের আত্মীয়তাও আছে। আত্মীয়তা থাকলেও রেষারেষি কোনোদিন যায় নাই। কাজীরা অর্থ-সম্পদ ও শক্তিতে শেখদের সাথে টিকতে পারে নাই, কিন্তু লড়ে গেছে বহুকাল। যে কাজীদের সাথে আমাদের আত্মীয়তা ও ঘনিষ্ঠতা ছিল তারা শেখদের সমর্থন করত। কাজীদের আর একটা দল রাণী রাসমণির সাথে যোগদান করে। তারা কিছুতেই শেখদের আধিপত্য সহ্য করতে পারছিল না। তাই তারা এক জঘন্য কাজের আশ্রয় নিল শেষ পর্যন্ত। অধিকাংশ কাজী শেখদের সাথে মিশে

গিয়েছিল। একটা দল কিছুতেই শেখদের শেষ না করে ছাড়বে না ঠিক করেছিল। বৃদ্ধ এক কাজী, নাম সেরাজতুল্লা কাজী। তার তিন ছেলে ও এক মেয়ে ছিল। ছেলেরা এক ষড়যন্ত্র করে এবং অর্থের লোভে বৃদ্ধ পিতাকে গলা টিপে হত্যা করে শেখ বাড়ির গরুর ঘরের চালের উপরে রেখে যায়। এই ঘটনা শুধু তিন ভাই এবং তাদের বোনটা জানত। বোনকে ভয় দেখিয়ে চুপ করিয়ে রেখেছিল। শেখ বাড়িতে লাশ রেখে রাতারাতিই থানায় যেয়ে খবর দেয় এবং পুলিশ সাথে নিয়ে এসে লাশ বের করে দেয় এবং বাড়ির সকলকে গ্রেফতার করিয়ে দেয়। এতে শেখদের ভীষণ অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়।

আমার দাদার চাচা এবং রেণুর দাদার বাবা কলকাতা থেকে নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করে চলে আসেন বাড়িতে। কলকাতার সম্পত্তি শেষ হয়ে যায়। তারপর যখন সকলে গ্রেফতার হয়ে গেছে, কেউই দেখার নাই—বড় বড় ব্যবসায়ী, মাঝি ও ব্যাপারীরা নৌকা ডুবিয়ে দিয়ে উধাও হতে শুরু করল। এর পূর্বে তমিজুদ্দিনের খুনে যথেষ্ট টাকা খরচ হয়ে গেছে। জমিদারিও নিলাম হয়ে প্রায় সবই চলে যেতে লাগল। বহুদিন পর্যন্ত মামলা চলল। নিচের কোর্টে সকলেরই জেল হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত কলকাতা হাইকোর্টে মামলা শুরু হল। আমাদের এডভোকেট হাইকোর্টে দরখাস্ত করল সিআইডি দ্বারা মামলা আবার ইনকোয়ারি করাতে। কারণ, এ মামলা ষড়যন্ত্রমূলক। হাইকোর্ট মামলা দেখে সন্দেহ হলে আবার ইনকোয়ারি শুরু হল। একজন অফিসার পাগল সেজে আমাদের গ্রামে যায় আর খোঁজ খবর নেয়। একদিন রাতে সেরাজতুল্লাহ কাজীর তিন ছেলের মধ্যে কি নিয়ে ঝগড়া হয় এবং কথায় কথায় এক ভাই অন্য ভাইকে বলে, "বলেছিলাম না শেখদের কিছু হবে না, বাবাকে অমনভাবে মারা উচিত হবে না।" অন্য ভাই বলে, "তুই তো গলা টিপে ধরেছিলি তাই তো বাবা মারা গেল।" বোনটা বলল, "বাবা একটু পানি চেয়েছিল, তুই তো তাও দিতে দিলি না।" সিআইডি এই কথা শুনতে পেল ওদের বাড়ির পিছনে পালিয়ে থেকে। তার কয়েকদিন পরেই তিন ভাই ও বোন গ্রেফতার হল এবং স্বীকার করতে বাধ্য হল তারাই তাদের বাবাকে হত্যা করেছে।

শেখরা মুক্তি পেল আর ওদের যাবজ্জীবন জেল হল। শেখরা মামলা থেকে বাঁচল, কিন্তু সর্বস্বান্ত হয়েই বাঁচল। ব্যবসা নাই, জমিদারি শেষ, সামান্য তালুক ও খাস জমি, শেখ বংশ বেঁচে রইল শুধু খাস জমির জন্য। এদের বেশ কিছু খাস জমি ছিল। আর বাড়ির আশপাশ দিয়ে কিছু জমি নিষ্কর ছিল। খেয়ে পরার কষ্ট ছিল না বলে বাড়িতে বসে আমার দাদার বাবা চাচারা পাশা খেলে দিন কাটাতেন। সকলেই দিনভর দাবা আর পাশা খেলতেন, খাওয়া ও শোয়া এই ছিল কাজ। এরা ফার্সি ভাষা জানতেন এবং বাংলা ভাষার উপরও দখল ছিল। রেণুর দাদা আমার দাদার চাচাতো ভাই, তিনি তাঁর জীবনী লিখে রেখে গিয়েছিলেন সুন্দর বাংলা ভাষায়। রেণুও তার কয়েকটা পাতা পেয়েছিল যখন তার দাদা সমস্ত সম্পত্তি রেণু ও তার বোনকে লিখে দিয়ে যান তখন। রেণুর বাবা মানে আমার শ্বশুর ও চাচা তাঁর বাবার সামনেই মারা যান। মুসলিম আইন অনুযায়ী রেণু তার সম্পত্তি পায় না। রেণুর কোনো চাচা না থাকার জন্য তার দাদা সম্পত্তি লিখে দিয়ে

যান। আমাদের বংশের অনেক ইতিহাস পাওয়া যেত যদি তাঁর জীবনীটা পেতাম। কিন্তু কে বা কারা সেটা গায়েব করেছে বলতে পারব না, কারণ অনেক কথা বের হয়ে যেতে পারে। রেণু অনেক খুঁজেছে, পায় নাই। এ রকম আরও অনেক ছোটখাটো গল্প আছে, কতটা সত্য আর কতটা মিথ্যা বলতে পারি না।

যাহোক, শেখদের দুর্দিন আসলেও তারা ইংরেজদের সহ্য করতে পারত না। ইংরেজকে গ্রহণ করতে না পারায় এবং ইংরেজি না পড়ায় তারা অনেক পেছনে পড়ে গেল। মুসলমানদের সম্পত্তি ভাগ হয় অনেক বেশি। বংশ বাড়তে লাগল, সম্পত্তি ভাগ হতে শুরু করল, দিন দিন আর্থিক অবস্থাও খারাপের দিকে চলল। তবে বংশের মধ্যে দুই একজনের অবস্থা ভালই ছিল।

আমার দাদাদের আমল থেকে শেখ পরিবার ইংরেজি লেখাপড়া শুরু করল। আমার দাদার অবস্থা খুব ভাল ছিল না। কারণ দাদারা তিন ভাই ছিলেন, পরে আলাদা আলাদা হয়ে যান। আমার দাদার বড় ভাই খুব বিচক্ষণ লোক ছিলেন; তিনি দেশের বিচার-আচার করতেন। আমার দাদা হঠাৎ মৃত্যুবরণ করেন। আমার বড় চাচা এন্ট্রান্স পাস করে মারা যান। আমার আব্বা তখন এন্ট্রান্স পড়েন। ছোট্ট ছোট্ট ভাইবোন নিয়ে আমার আব্বা মহাবিপদের সম্মুখীন হন। আমার দাদার বড় ভাইয়ের কোনো ছেলে ছিল না। চার মেয়ে ছিল। আমার বাবার সাথে তাঁর ছোট মেয়ের বিবাহ দেন এবং সমস্ত সম্পত্তি আমার মাকে লিখে দেন।

আমার নানার নাম ছিল শেখ আবদুল মজিদ। আমার দাদার নাম শেখ আবদুল হামিদ। আর ছোট দাদার নাম শেখ আবদুর রশিদ। তিনি পরে ইংরেজের দেয়া 'খান সাহেব' উপাধি পান। জনসাধারণ তাঁকে 'খান সাহেব' বলেই জানতেন। আমার আব্বার অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হলেও দুই চাচার লেখাপড়া, ফুফুদের বিবাহ সমস্ত কিছুই তাঁর মাথার উপর এসে পড়ল। বাধ্য হয়ে তিনি লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে চাকরির অন্বেষণে বের হলেন। মুসলমানদের তখনকার দিনে চাকরি পাওয়া খুবই দুষ্কর ছিল। শেষ পর্যন্ত দেওয়ানি আদালতে একটা চাকরি পান, পরে তিনি সেরেস্তাদার হয়েছিলেন। যেদিন আমি ম্যাট্রিক পাস করে কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজে পড়তে যাই আমার আব্বাও সেইদিন পেনশন নিয়ে বাড়ি চলে যান।

একটা ঘটনা লেখা দরকার, নিশ্চয়ই অনেকে আশ্চর্য হবেন। আমার যখন বিবাহ হয় তখন আমার বয়স বার তের বছর হতে পারে। রেণুর বাবা মারা যাবার পরে ওর দাদা আমার আব্বাকে ডেকে বললেন, "তোমার বড় ছেলের সাথে আমার এক নাতনীর বিবাহ দিতে হবে। কারণ, আমি সমস্ত সম্পত্তি ওদের দুই বোনকে লিখে দিয়ে যাব।" রেণুর দাদা আমার আব্বার চাচা। মুরব্বির হুকুম মানার জন্যই রেণুর সাথে আমার বিবাহ রেজিস্ট্রি করে ফেলা হল। আমি শুনলাম আমার বিবাহ হয়েছে। তখন কিছুই বুঝতাম না, রেণুর বয়স তখন বোধহয় তিন বছর হবে। রেণুর যখন পাঁচ বছর বয়স তখন তার মা মারা যান। একমাত্র রইল তার দাদা। দাদাও রেণুর সাত বছর বয়সে মারা যান।

তারপর, সে আমার মা'র কাছে চলে আসে। আমার ভাইবোনদের সাথেই রেণু বড় হয়। রেণুর বড়বোনেরও আমার আর এক চাচাতো ভাইয়ের সাথে বিবাহ হয়। এরা আমার শ্বশুরবাড়িতে থাকল, কারণ আমার ও রেণুর বাড়ির দরকার নাই। রেণুদের ঘর আমাদের ঘর পাশাপাশি ছিল, মধ্যে মাত্র দুই হাত ব্যবধান। অন্যান্য ঘটনা আমার জীবনের ঘটনার মধ্যেই পাওয়া যাবে।



আমার জন্ম হয় ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ তারিখে। আমার আব্বার নাম শেখ লুৎফর রহমান। আমার ছোট দাদা খান সাহেব শেখ আবদুর রশিদ একটা এম ই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। আমাদের অঞ্চলের মধ্যে সেকালে এই একটা মাত্র ইংরেজি স্কুল ছিল, পরে এটা হাইস্কুল হয়, সেটি আজও আছে। আমি তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত এই স্কুলে লেখাপড়া করে আমার আব্বার কাছে চলে যাই এবং চতুর্থ শ্রেণীতে গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে ভর্তি হই। আমার মায়ের নাম সায়েরা খাতুন। তিনি কোনোদিন আমার আব্বার সাথে শহরে থাকতেন না। তিনি সমস্ত সম্পত্তি দেখাশোনা করতেন আর বলতেন, "আমার বাবা আমাকে সম্পত্তি দিয়ে গেছেন যাতে তাঁর বাড়িতে আমি থাকি। শহরে চলে গেলে ঘরে আলো জ্বলবে না, বাবা অভিশাপ দেবে।"

আমরা আমার নানার ঘরেই থাকতাম, দাদার ও নানার ঘর পাশাপাশি। আব্বার কাছে থেকেই আমি লেখাপড়া করি। আব্বার কাছেই আমি ঘুমাতাম। তাঁর গলা ধরে রাতে না ঘুমালে আমার ঘুম আসত না। আমি বংশের বড় ছেলে, তাই সমস্ত আদর আমারই ছিল। আমার মেজো চাচারও কোনো ছেলেমেয়ে ছিল না। আমার ছোট দাদারও একমাত্র ছেলে আছে। তিনিও 'খান সাহেব' খেতাব পান। এখন আইয়ুব সাহেবের আমলে প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য আছেন। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সভ্যও ছিলেন, নাম শেখ মোশাররফ হোসেন।

১৯৩৪ সালে যখন আমি সপ্তম শ্রেণীতে পড়ি তখন ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ি। ছোট সময়ে আমি খুব দুষ্ট প্রকৃতির ছিলাম। খেলাধুলা করতাম, গান গাইতাম এবং খুব ভাল ব্রতচারী করতে পারতাম। হঠাৎ বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হয়ে আমার হার্ট দুর্বল হয়ে পড়ে। আব্বা আমাকে নিয়ে কলকাতায় চিকিৎসা করাতে যান। কলকাতার বড় বড় ডাক্তার শিবপদ ভট্টাচার্য, এ কে রায় চৌধুরী আরও অনেককেই দেখান এবং চিকিৎসা করাতে থাকেন। প্রায় দুই বছর আমার এইভাবে চলল।

১৯৩৬ সালে আব্বা মাদারীপুর মহকুমায় সেরেস্তাদার হয়ে বদলি হয়ে যান। আমার অসুস্থতার জন্য মাকেও সেখানে নিয়ে আসেন। ১৯৩৬ সালে আবার আমার চক্ষু খারাপ হয়ে পড়ে। গ্লুকোমা নামে একটা রোগ হয়। ডাক্তারদের পরামর্শে আব্বা আমাকে নিয়ে আবার কলকাতায় রওয়ানা হলেন চিকিৎসার জন্য। এই সময় আমি মাদারীপুর হাইস্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিলাম লেখাপড়া করার জন্য। কলকাতা যেয়ে ডাক্তার টি. আহমেদ

সাহেবকে দেখালাম। আমার বোন কলকাতায় থাকত, কারণ ভগ্নিপতি এজিবিতে[৪] চাকরি করতেন। তিনি আমার মেজোবোন শেখ ফজলুল হক মণির মা। মণির বাবা পূর্বে সম্পর্কে আমার দাদা হতেন। তিনিও শেখ বংশের লোক। বোনের কাছেই থাকতাম। কোন অসুবিধা হত না। ডাক্তার সাহেব আমার চক্ষু অপারেশন করতে বললেন। দেরি করলে আমি অন্ধ হয়ে যেতে পারি। আমাকে কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে দিলেন। ভোর ন'টায় অপারেশন হবে। আমি ভয় পেয়ে পালাতে চেষ্টা করতে লাগলাম, কিন্তু পারলাম না। আমাকে অপারেশন ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। দশ দিনের মধ্যে দুইটা চক্ষুই অপারেশন করা হল। আমি ভাল হলাম। তবে কিছুদিন লেখাপড়া বন্ধ রাখতে হবে, চশমা পরতে হবে। তাই ১৯৩৬ সাল থেকেই চশমা পরছি।

চোখের চিকিৎসার পর মাদারীপুরে ফিরে এলাম, কোন কাজ নেই। লেখাপড়া নেই, খেলাধুলা নেই, শুধু একটা মাত্র কাজ, বিকালে সভায় যাওয়া। তখন স্বদেশী আন্দোলনের যুগ।[৫] মাদারীপুরের পূর্ণ দাস তখন ইংরেজের আতঙ্ক। স্বদেশী আন্দোলন তখন মাদারীপুর ও গোপালগঞ্জের ঘরে ঘরে। আমার মনে হত, মাদারীপুরে সুভাষ বোসের দলই শক্তিশালী ছিল। পনের-ষোল বছরের ছেলেদের স্বদেশীরা দলে ভেড়াত। আমাকে রোজ সভায় বসে থাকতে দেখে আমার উপর কিছু যুবকের নজর পড়ল। ইংরেজদের বিরুদ্ধেও আমার মনে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি হল। ইংরেজদের এদেশে থাকার অধিকার নাই। স্বাধীনতা আনতে হবে। আমিও সুভাষ বাবুর ভক্ত হতে শুরু করলাম। এই সভায় যোগদান করতে মাঝে মাঝে গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর যাওয়া-আসা করতাম। আর স্বদেশী আন্দোলনের লোকদের সাথেই মেলামেশা করতাম। গোপালগঞ্জের সেই সময়ের এসডিও, আমার দাদা খান সাহেবকে একদিন হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন, এ গল্প আমি পরে শুনেছি।

১৯৩৭ সালে আবার আমি লেখাপড়া শুরু করলাম। এবার আর পুরানো স্কুলে পড়ব না, কারণ আমার সহপাঠীরা আমাকে পিছনে ফেলে গেছে। আমার আব্বা আমাকে গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলেন। আমার আব্বাও আবার গোপালগঞ্জ ফিরে এলেন। এই সময় আব্বা কাজী আবদুল হামিদ এমএসসি মাস্টার সাহেবকে আমাকে পড়াবার জন্য বাসায় রাখলেন। তাঁর জন্য একটা আলাদা ঘরও করে দিলেন। গোপালগঞ্জের বাড়িটা আমার আব্বাই করেছিলেন। মাস্টার সাহেব গোপালগঞ্জে একটা 'মুসলিম সেবা সমিতি' গঠন করেন, যার দ্বারা গরিব ছেলেদের সাহায্য করতেন। মুষ্টি ভিক্ষার চাল উঠাতেন সকল মুসলমান বাড়ি থেকে। প্রত্যেক রবিবার আমরা থলি নিয়ে বাড়ি বাড়ি থেকে চাউল উঠিয়ে আনতাম এবং এই চাল বিক্রি করে তিনি গরিব ছেলেদের বই এবং পরীক্ষার ও অন্যান্য খরচ দিতেন। ঘুরে ঘুরে জায়গিরও ঠিক করে দিতেন। আমাকেই অনেক কাজ করতে হত তাঁর সাথে। হঠাৎ যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান। তখন আমি এই সেবা সমিতির ভার নেই এবং অনেক দিন পরিচালনা করি। আর একজন মুসলমান মাস্টার সাহেবের কাছেই টাকা পয়সা জমা রাখা হত। তিনি সভাপতি ছিলেন আর আমি ছিলাম সম্পাদক। যদি কোন মুসলমান চাউল না দিত আমার দলবল নিয়ে তার উপর জোর

করতাম। দরকার হলে তার বাড়িতে রাতে ইট মারা হত। এজন্য আমার আব্বার কাছে অনেক সময় শাস্তি পেতে হত। আমার আব্বা আমাকে বাধা দিতেন না।

আমি খেলাধুলাও করতাম। ফুটবল, ভলিবল ও হকি খেলতাম। খুব ভাল খেলোয়াড় ছিলাম না, তবুও স্কুলের টিমের মধ্যে ভাল অবস্থান ছিল। এই সময় আমার রাজনীতির খেয়াল তত ছিল না।

আমার আব্বা খবরের কাগজ রাখতেন। *আনন্দবাজার*, *বসুমতী*, *আজাদ*, মাসিক *মোহাম্মদী* ও *সওগাত*। ছোটকাল থেকে আমি সকল কাগজই পড়তাম। স্কুলে ছেলেদের মধ্যে আমার বয়স একটু বেশি হয়েছে, কারণ প্রায় চার বৎসর আমি লেখাপড়া করতে পারি নাই। আমি ভীষণ একগুঁয়ে ছিলাম। আমার একটা দল ছিল। কেউ কিছু বললে আর রক্ষা ছিল না। মারপিট করতাম। আমার দলের ছেলেদের কেউ কিছু বললে একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়তাম। আমার আব্বা মাঝে মাঝে অতিষ্ঠ হয়ে উঠতেন। কারণ ছোট শহর, নালিশ হত; আমার আব্বাকে আমি খুব ভয় করতাম। আর একজন ভদ্রলোককে ভয় করতাম, তিনি আবদুল হাকিম মিয়া। তিনি আমার আব্বার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। একসঙ্গে চাকরি করতেন, আমাকে কোথাও দেখলেই আব্বাকে বলে দিতেন, অথবা নিজেই ধমকিয়ে দিতেন। যদিও আব্বাকে ফাঁকি দিতে পারতাম, তাঁকে ফাঁকি দিতে পারতাম না। আব্বা থাকতেন শহরের একদিকে, আর তিনি থাকতেন অন্যদিকে। হাকিম সাহেব বেঁচে নাই, তাঁর ছেলেরা লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়েছে। একজন কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে বড় চাকরি করেন, আর একজন সিএসপি[৬] হয়েছে। তখন গোপালগঞ্জে এমএলএ[৭] ছিলেন খন্দকার শামসুদ্দীন আহমেদ সাহেব। তিনি নামকরা উকিলও ছিলেন। তাঁর বড় ছেলে খন্দকার মাহবুব উদ্দিন ওরফে ফিরোজ আমার বন্ধু ছিল। দুইজনের মধ্যে ভীষণ ভাব ছিল। ফিরোজ এখন হাইকোর্টের এডভোকেট। দুই বন্ধুর মধ্যে এত মিল ছিল, কেউ কাউকে না দেখলে ভাল লাগত না। খন্দকার শামসুদ্দীন সাহেবের সঙ্গে আমার আব্বার বন্ধুত্ব ছিল। অমায়িক ব্যবহার তাঁর। জনসাধারণ তাঁকে শ্রদ্ধা করত ও ভালবাসত। তিনি মরহুম শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক সাহেবের কৃষক শ্রমিক পার্টির[৮] সদস্য ছিলেন। যখন হক সাহেব বাংলার প্রধানমন্ত্রী হলেন এবং মুসলিম লীগে[৯] যোগদান করলেন, খন্দকার সাহেবও তখন মুসলিম লীগে যোগদান করেন। যদিও কোনো দলেরই কোনো সংগঠন ছিল না। ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তার উপরই সবাই নির্ভর করত। মুসলিম লীগ তো তখন শুধু কাগজে-পত্রে ছিল।



১৯৩৮ সালের ঘটনা। শেরে বাংলা তখন বাংলার প্রধানমন্ত্রী এবং সোহরাওয়ার্দী শ্রমমন্ত্রী। তাঁরা গোপালগঞ্জে আসবেন। বিরাট সভার আয়োজন করা হয়েছে। এগজিবিশন হবে ঠিক হয়েছে। বাংলার এই দুই নেতা একসাথে গোপালগঞ্জে আসবেন। মুসলমানদের মধ্যে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হল। স্কুলের ছাত্র আমরা তখন। আগেই বলেছি আমার

বয়স একটু বেশি, তাই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী করার ভার পড়ল আমার উপর। আমি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী করলাম দলমত নির্বিশেষে সবাইকে নিয়ে। পরে দেখা গেল, হিন্দু ছাত্ররা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী থেকে সরে পড়তে লাগল। ব্যাপার কি বুঝতে পারছি না। এক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলাম, সেও ছাত্র, সে আমাকে বলল, কংগ্রেস[১০] থেকে নিষেধ করেছে আমাদের যোগদান করতে। যাতে বিরূপ সম্বর্ধনা হয় তারও চেষ্টা করা হবে। এগজিবিশনে যাতে দোকানপাট না বসে তাও বলে দেওয়া হয়েছে। তখনকার দিনে শতকরা আশিটি দোকান হিন্দুদের ছিল। আমি এ খবর শুনে আশ্চর্য হলাম। কারণ, আমার কাছে তখন হিন্দু মুসলমান বলে কোন জিনিস ছিল না। হিন্দু ছেলেদের সাথে আমার খুব বন্ধুত্ব ছিল। একসাথে গান বাজনা, খেলাধুলা, বেড়ান—সবই চলত।

আমাদের নেতারা বললেন, হক সাহেব মুসলিম লীগের সাথে মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন বলে হিন্দুরা ক্ষেপে গিয়েছে। এতে আমার মনে বেশ একটা রেখাপাত করল। হক সাহেব ও শহীদ সাহেবকে সম্বর্ধনা দেয়া হবে। তার জন্য যা কিছু প্রয়োজন আমাদের করতে হবে। আমি মুসলমান ছেলেদের নিয়েই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী করলাম, তবে কিছু সংখ্যক নমশূদ্র শ্রেণীর হিন্দু যোগদান করল। কারণ, মুকুন্দবিহারী মল্লিক তখন মন্ত্রী ছিলেন এবং তিনিও হক সাহেবের সাথে আসবেন। শহরে হিন্দুরা সংখ্যায় খুবই বেশি, গ্রাম থেকে যথেষ্ট লোক এল, বিশেষ করে নানা রকম অস্ত্র নিয়ে, যদি কেউ বাধা দেয়! যা কিছু হয়, হবে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও হতে পারত।

হক সাহেব ও শহীদ সাহেব এলেন, সভা হল। এগজিবিশন উদ্বোধন করলেন। শান্তিপূর্ণভাবে সকল কিছু হয়ে গেল। হক সাহেব পাবলিক হল দেখতে গেলেন। আর শহীদ সাহেব গেলেন মিশন স্কুল দেখতে। আমি মিশন স্কুলের ছাত্র। তাই তাঁকে সম্বর্ধনা দিলাম। তিনি স্কুল পরিদর্শন করে হাঁটতে হাঁটতে লঞ্চের দিকে চললেন, আমিও সাথে সাথে চললাম। তিনি ভাঙা ভাঙা বাংলায় আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করছিলেন, আর আমি উত্তর দিচ্ছিলাম। আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার নাম এবং বাড়ি কোথায়। একজন সরকারি কর্মচারী আমার বংশের কথা বলে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনি আমাকে ডেকে নিলেন খুব কাছে, আদর করলেন এবং বললেন, "তোমাদের এখানে মুসলিম লীগ করা হয় নাই?" বললাম, "কোনো প্রতিষ্ঠান নাই। মুসলিম ছাত্রলীগও[১১] নাই।" তিনি আর কিছুই বললেন না, শুধু নোটবুক বের করে আমার নাম ও ঠিকানা লিখে নিলেন। কিছুদিন পরে আমি একটা চিঠি পেলাম, তাতে তিনি আমাকে ধন্যবাদ দিয়েছেন এবং লিখেছেন কলকাতা গেলে যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করি। আমিও তাঁর চিঠির উত্তর দিলাম। এইভাবে মাঝে মাঝে চিঠিও দিতাম।

এই সময় একটা ঘটনা হয়ে গেল। হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে একটু আড়াআড়ি চলছিল। গোপালগঞ্জ শহরের আশপাশেও হিন্দু গ্রাম ছিল। দু'একজন মুসলমানের উপর অত্যাচারও হল। আবদুল মালেক নামে আমার এক সহপাঠী ছিল। সে খন্দকার শামসুদ্দীন সাহেবের আত্মীয় হত। একদিন সন্ধ্যায়, আমার মনে হয় মার্চ বা এপ্রিল মাস হবে, আমি ফুটবল

মাঠ থেকে খেলে বাড়িতে এসেছি; আমাকে খন্দকার শামসুল হক ওরফে বাসু মিয়া মোক্তার সাহেব (পরে মহকুমা আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন) ডেকে বললেন, "মালেককে হিন্দু মহাসভা[১২] সভাপতি সুরেন ব্যানার্জির বাড়িতে ধরে নিয়ে মারপিট করছে। যদি পার একবার যাও। তোমার সাথে ওদের বন্ধুত্ব আছে বলে তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে আস।" আমি আর দেরি না করে কয়েকজন ছাত্র ডেকে নিয়ে ওদের ওখানে যাই এবং অনুরোধ করি ওকে ছেড়ে দিতে। রমাপদ দত্ত নামে এক ভদ্রলোক আমাকে দেখেই গাল দিয়ে বসল। আমিও তার কথার প্রতিবাদ করলাম এবং আমার দলের ছেলেদের খবর দিতে বললাম। এর মধ্যে রমাপদরা থানায় খবর দিয়েছে। তিনজন পুলিশ এসে হাজির হয়ে গিয়েছে। আমি বললাম, "ওকে ছেড়ে দিতে হবে, নাহলে কেড়ে নেব।" আমার মামা শেখ সিরাজুল হক (একই বংশের) তখন হোস্টেলে থেকে লেখাপড়া করতেন। তিনি আমার মা ও বাবার চাচাতো ভাই। নারায়ণগঞ্জে আমার এক মামা ব্যবসা করেন, তার নাম শেখ জাফর সাদেক। তার বড় ভাই ম্যাট্রিক পাস করেই মারা যান। আমি খবর দিয়েছি শুনে দলবল নিয়ে ছুটে এসেছেন। এর মধ্যেই আমাদের সাথে মারপিট শুরু হয়ে গেছে। দুই পক্ষে ভীষণ মারপিট হয়। আমরা দরজা ভেঙে মালেককে কেড়ে নিয়ে চলে আসি।

শহরে খুব উত্তেজনা। আমাকে কেউ কিছু বলতে সাহস পায় না। সেদিন রবিবার। আব্বা বাড়ি গিয়েছিলেন। পরদিন ভোরবেলায় আব্বা আসবেন। বাড়ি গোপালগঞ্জ থেকে চৌদ্দ মাইল দূরে। আব্বা শনিবার বাড়ি যেতেন আর সোমবার ফিরে আসতেন, নিজেরই নৌকা ছিল। হিন্দু নেতারা রাতে বসে হিন্দু অফিসারদের সাথে পরামর্শ করে একটা মামলা দায়ের করল। হিন্দু নেতারা থানায় বসে এজাহার ঠিক করে দিলেন। তাতে খন্দকার শামসুল হক মোক্তার সাহেব হুকুমের আসামি। আমি খুন করার চেষ্টা করেছি, লুটপাট দাঙ্গাহাঙ্গামা লাগিয়ে দিয়েছি। ভোরবেলায় আমার মামা, মোক্তার সাহেব, খন্দকার শামসুদ্দীন আহমেদ এমএলএ সাহেবের মুহুরি জহুর শেখ, আমার বাড়ির কাছের বিশেষ বন্ধু শেখ নুরুল হক ওরফে মানিক মিয়া, সৈয়দ আলী খন্দকার, আমার সহপাঠী আবদুল মালেক এবং অনেক ছাত্রের নাম এজাহারে দেয়া হয়েছিল। কোনো গণ্যমান্য লোকের ছেলেদের বাকি রাখে নাই। সকাল ন'টায় খবর পেলাম আমার মামা ও আরও অনেককে গ্রেফতার করে ফেলেছে। আমাদের বাড়িতে কি করে আসবে—থানার দারোগা সাহেবদের একটু লজ্জা করছিল! প্রায় দশটার সময় টাউন হল মাঠের ভিতর দাঁড়িয়ে দারোগা আলাপ করছে, তার উদ্দেশ্য হল আমি যেন সরে যাই। টাউন হলের মাঠের পাশেই আমার বাড়ি। আমার ফুফাতো ভাই, মাদারীপুর বাড়ি। আব্বার কাছে থেকেই লেখাপড়া করত, সে আমাকে বলে, "মিয়াভাই, পাশের বাসায় একটু সরে যাও না।" বললাম, "যাব না, আমি পালাব না। লোকে বলবে, আমি ভয় পেয়েছি।"

এই সময় আব্বা বাড়ি থেকে ফিরে এসেছেন। দারোগা সাহেবও তাঁর পিছে পিছে বাড়িতে ঢুকে পড়েছেন। আব্বার কাছে বসে আস্তে আস্তে সকল কথা বললেন। আমার গ্রেফতারি পরোয়ানা দেখালেন। আব্বা বললেন, "নিয়ে যান।" দারোগা বাবু বললেন,

"ও খেয়েদেয়ে আসুক, আমি একজন সিপাহি রেখে যেতেছি, এগারটার মধ্যে যেন থানায় পৌঁছে যায়। কারণ, দেরি হলে জামিন পেতে অসুবিধা হবে।" আব্বা জিজ্ঞাসা করলেন, "মারামারি করেছ?" আমি চুপ করে থাকলাম, যার অর্থ "করেছি"।

আমি খাওয়া-দাওয়া করে থানায় চলে এলাম। দেখি আমার মামা, মানিক, সৈয়দ আরও সাত-আটজন হবে, তাদেরকে পূর্বেই গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে এসেছে। আমার পৌঁছার সাথে সাথে কোর্টে পাঠিয়ে দিল। হাতকড়া দেয় নাই, তবে সামনেও পুলিশ পিছনেও পুলিশ। কোর্ট দারোগা হিন্দু ছিলেন, কোর্টে পৌঁছার সাথে সাথে আমাদের কোর্ট হাজতের ছোট কামরার মধ্যে বন্ধ করে রাখলেন। কোর্ট দারোগার রুমের পাশেই কোর্ট হাজত। আমাকে দেখে বলেন, "মজিবর খুব ভয়ানক ছেলে। ছোরা মেরেছিল রমাপদকে। কিছুতেই জামিন দেওয়া যেতে পারে না।" আমি বললাম, "বাজে কথা বলবেন না, ভাল হবে না।" যারা দারোগা সাহেবের সামনে বসেছিলেন, তাদের বললেন, "দেখ ছেলের সাহস!" আমাকে অন্য সকলে কথা বলতে নিষেধ করল। পরে শুনলাম, আমার মামা এজাহার দিয়েছে এই কথা বলে যে, আমি ছোরা দিয়ে রমাপদকে হত্যা করার জন্য আঘাত করেছি। তার অবস্থা ভয়ানক খারাপ, হাসপাতালে ভর্তি হয়ে আছে। প্রকৃতপক্ষে রমাপদের সাথে আমার মারামারি হয় একটা লাঠি দিয়ে, ও আমাকে লাঠি দিয়ে আঘাত করতে চেষ্টা করলে আমিও লাঠি দিয়ে প্রত্যাঘাত করি। যার জন্য ওর মাথা কেটে যায়। মুসলমান উকিল মোক্তার সাহেবরা কোর্টে আমাদের জামিনের আবেদন পেশ করল। একমাত্র মোক্তার সাহেবকে টাউন জামিন দেয়া হল। আমাদের জেল হাজতে পাঠানোর হুকুম হল। এসডিও হিন্দু ছিল, জামিন দিল না। কোর্ট দারোগা আমাদের হাতকড়া পরাতে হুকুম দিল। আমি রুখে দাঁড়ালাম, সকলে আমাকে বাধা দিল, জেলে এলাম। সাবজেল, একটা মাত্র ঘর। একপাশে মেয়েদের থাকার জায়গা, কোনো মেয়ে আসামি না থাকার জন্য মেয়েদের ওয়ার্ডে রাখল। বাড়ি থেকে বিছানা, কাপড় এবং খাবার দেবার অনুমতি দেয়া হল। শেষ পর্যন্ত সাত দিন পরে আমি প্রথম জামিন পেলাম। দশ দিনের মধ্যে আর সকলেই জামিন পেয়ে গেল।

হক সাহেব ও সোহরাওয়ার্দী সাহেবের কাছে টেলিগ্রাম করা হল। লোকও চলে গেল কলকাতায়। গোপালগঞ্জে ভীষণ উত্তেজনা চলছিল। হিন্দু উকিলদের সাথে আব্বার বন্ধুত্ব ছিল। সকলেই আমার আব্বাকে সম্মান করতেন। দুই পক্ষের মধ্যে অনেক আলোচনা হয়ে ঠিক হল মামলা তারা চালাবে না। আমাদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে পনের শত টাকা। সকলে মিলে সেই টাকা দিয়ে দেওয়া হল। আমার আব্বাকেই বেশি দিতে হয়েছিল। এই আমার জীবনে প্রথম জেল।



১৯৩৯ সালে কলকাতা যাই বেড়াতে। শহীদ সাহেবের সাথে দেখা করি। আবদুল ওয়াসেক সাহেব আমাদের ছাত্রদের নেতা ছিলেন। তাঁর সাথেও আলাপ করে তাঁকে

গোপালগঞ্জে আসতে অনুরোধ করি। শহীদ সাহেবকে বললাম, গোপালগঞ্জে মুসলিম ছাত্রলীগ গঠন করব এবং মুসলিম লীগও গঠন করব। খন্দকার শামসুদ্দীন সাহেব এমএলএ তখন মুসলিম লীগে যোগদান করেছেন। তিনি সভাপতি হলেন ছাত্রলীগের। আমি হলাম সম্পাদক। মুসলিম লীগ গঠন হল। একজন মোক্তার সাহেব সেক্রেটারি হলেন, অবশ্য আমিই কাজ করতাম। মুসলিম লীগ ডিফেন্স কমিটি একটা গঠন করা হল। আমাকে তার সেক্রেটারি করা হল। আমি আস্তে আস্তে রাজনীতির মধ্যে প্রবেশ করলাম। আব্বা আমাকে বাধা দিতেন না, শুধু বলতেন, লেখাপড়ার দিকে নজর দেবে। লেখাপড়ায় আমার একটু আগ্রহও তখন হয়েছে। কারণ, কয়েক বৎসর অসুস্থতার জন্য নষ্ট করেছি। স্কুলেও আমি ক্যাপ্টেন ছিলাম। খেলাধুলার দিকে আমার খুব ঝোঁক ছিল। আব্বা আমাকে বেশি খেলতে দিতে চাইতেন না। কারণ আমার হার্টের ব্যারাম হয়েছিল। আমার আব্বাও ভাল খেলোয়াড় ছিলেন। তিনি অফিসার্স ক্লাবের সেক্রেটারি ছিলেন। আর আমি মিশন স্কুলের ক্যাপ্টেন ছিলাম। আব্বার টিম ও আমার টিমে যখন খেলা হত তখন জনসাধারণ খুব উপভোগ করত। আমাদের স্কুল টিম খুব ভাল ছিল। মহকুমায় যারা ভাল খেলোয়াড় ছিল, তাদের এনে ভর্তি করতাম এবং বেতন ফ্রি করে দিতাম।

১৯৪০ সালে আব্বার টিমকে আমার স্কুল টিম প্রায় সকল খেলায় পরাজিত করল। অফিসার্স ক্লাবের টাকার অভাব ছিল না। খেলোয়াড়দের বাইরে থেকে আনত। সবই নামকরা খেলোয়াড়। বৎসরের শেষ খেলায় আব্বার টিমের সাথে আমার টিমের পাঁচ দিন ড্র হয়। আমরা তো ছাত্র; এগারজনই রোজ খেলতাম, আর অফিসার্স ক্লাব নতুন নতুন প্লেয়ার আনত। আমরা খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। আব্বা বললেন, "কাল সকালেই খেলতে হবে। বাইরের খেলোয়াড়দের আর রাখা যাবে না, অনেক খরচ।" আমি বললাম, "আগামীকাল সকালে আমরা খেলতে পারব না, আমাদের পরীক্ষা।" গোপালগঞ্জ ফুটবল ক্লাবের সেক্রেটারি একবার আমার আব্বার কাছে আর একবার আমার কাছে কয়েকবার হাঁটাহাঁটি করে বললেন, "তোমাদের বাপ ব্যাটার ব্যাপার, আমি বাবা আর হাঁটতে পারি না।" আমাদের হেডমাস্টার তখন ছিলেন বাবু রসরঞ্জন সেনগুপ্ত। আমাকে তিনি প্রাইভেটেও পড়াতেন। আব্বা হেডমাস্টার বাবুকে খবর দিয়ে আনলেন। আমি আমার দলবল নিয়ে এক গোলপোস্টে আর আব্বা তার দলবল নিয়ে অন্য গোলপোস্টে। হেডমাস্টার বাবু বললেন, "মুজিব, তোমার বাবার কাছে হার মান। আগামীকাল সকালে খেল, তাদের অসুবিধা হবে।" আমি বললাম "স্যার, আমাদের সকলেই ক্লান্ত, এগারজনই সারা বছর খেলেছি। সকলের পায়ে ব্যথা, দুই-চার দিন বিশ্রাম দরকার। নতুবা হেরে যাব।" এবছর তো একটা খেলায়ও আমরা হারি নাই, আর 'এ জেড খান শিল্ডের' এই শেষ ফাইনাল খেলা। এ. জেড. খান এসডিও ছিলেন, গোপালগঞ্জেই মারা যান। তাঁর ছেলেদের মধ্যে আমির ও আহমদ আমার বাল্যবন্ধু ও সাথী। আমির ও আমি খুব বন্ধু ছিলাম। আমিরুজ্জামান খান এখন রেডিও পাকিস্তানে চাকরি করেন। ওর বাবা মারা যাবার পরে যখন গোপালগঞ্জ থেকে চলে আসে তখন ওর জন্য আমি খুব আঘাত পেয়েছিলাম। হেডমাস্টার বাবুর কথা

মানতে হল। পরের দিন সকালে খেলা হল। আমার টিম আব্বার টিমের কাছে এক গোলে পরাজিত হল।

১৯৪১ সালে আমি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেব। পরীক্ষায় পাস আমি নিশ্চয়ই করব, সন্দেহ ছিল না। রসরঞ্জন বাবু ইংরেজির শিক্ষক, আমাকে ইংরেজি পড়াতেন। আর মনোরঞ্জন বাবু অঙ্কের শিক্ষক, আমাকে অঙ্ক করাতেন। অঙ্ককে আমার ভয় ছিল। কারণ ভুল করে ফেলতাম। অঙ্কের জন্যই বোধহয় প্রথম বিভাগ পাব না। পরীক্ষার একদিন পূর্বে আমার ভীষণ জ্বর হল এবং মামস হয়ে গলা ফুলে গেল। একশ' চার ডিগ্রি জ্বর উঠেছে। আব্বা রাতভর আমার কাছে বসে রইলেন। গোপালগঞ্জ টাউনের সকল ডাক্তারই আনালেন। জ্বর পড়ছে না। আব্বা আমাকে পরীক্ষা দিতে নিষেধ করলেন। আমি বললাম, যা পারি শুয়ে শুয়ে দেব। আমার জন্য বিছানা দিতে বলেন। প্রথম দিনে বাংলা পরীক্ষা। সকালের পরীক্ষায় মাথাই তুলতে পারলাম না, তবুও কিছু কিছু লিখলাম। বিকালে জ্বর কম হল। অন্য পরীক্ষা ভালই হল। কিন্তু দেখা গেল বাংলায় আমি কম মার্কস পেয়েছি। অন্যান্য বিষয়ে দ্বিতীয় বিভাগের মার্কস পেয়েছি। মন ভেঙে গেল।

তখন রাজনীতি শুরু করেছি ভীষণভাবে। সভা করি, বক্তৃতা করি। খেলার দিকে আর নজর নাই। শুধু মুসলিম লীগ, আর ছাত্রলীগ। পাকিস্তান আনতেই হবে, নতুবা মুসলমানদের বাঁচার উপায় নাই। খবরের কাগজ 'আজাদ', যা লেখে তাই সত্য বলে মনে হয়।

পরীক্ষা দিয়ে কলকাতায় যাই। সভা-সম্মেলনে যোগদান করি। মাদারীপুর যেয়ে মুসলিম ছাত্রলীগ গঠন করি। আবার পড়তে শুরু করলাম। পাস তো আমার করতে হবে। শহীদ সাহেবের কাছে এখন প্রায়ই যাই। তিনিও আমাকে স্নেহ করেন। মুসলিম লীগ বললেই গোপালগঞ্জে আমাকে বোঝাত। যুদ্ধের সময় দেশের অবস্থা ভয়াবহ। এই সময় ফজলুল হক সাহেবের সাথে জিন্নাহ সাহেবের মনোমালিন্য হয়। হক সাহেব জিন্নাহ সাহেবের হুকুম মানতে রাজি না হওয়ায় তিনি মুসলিম লীগ ত্যাগ করে নয়া মন্ত্রিসভা গঠন করলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির সাথে। মুসলিম লীগ ও ছাত্রকর্মীরা তাঁর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করল। আমিও ঝাঁপিয়ে পড়লাম। এই বৎসর আমি দ্বিতীয় বিভাগে পাস করে কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হয়ে বেকার হোস্টেলে থাকতাম। নাটোর ও বালুরঘাটে হক সাহেবের দলের সাথে মুসলিম লীগের মনোনীত প্রার্থীদের দুইটা উপনির্বাচন হয়। আমিও দলবল নিয়ে সেখানে হাজির হলাম এবং অক্লান্ত পরিশ্রম করলাম, শহীদ সাহেবের হুকুম মত।



একটা ঘটনার দিন-তারিখ আমার মনে নাই, ১৯৪১ সালের মধ্যেই হবে, ফরিদপুর ছাত্রলীগের জেলা কনফারেন্স, শিক্ষাবিদদের আমন্ত্রণ জানান হয়েছে। তাঁরা হলেন কবি

কাজী নজরুল ইসলাম, হুমায়ুন কবির, ইব্রাহিম খাঁ সাহেব। সে সভা আমাদের করতে দিল না, ১৪৪ ধারা জারি করল। কনফারেন্স করলাম হুমায়ুন কবির সাহেবের বাড়িতে। কাজী নজরুল ইসলাম সাহেব গান শোনালেন। আমরা বললাম, এই কনফারেন্সে রাজনীতি আলোচনা হবে না। শিক্ষা ও ছাত্রদের কর্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা হবে। ছাত্রদের মধ্যেও দুইটা দল হয়ে গেল। ১৯৪২ সালে আমি ফরিদপুর যেয়ে ছাত্রদের দলাদলি শেষ করে ফেলতে সক্ষম হলাম এবং পাকিস্তানের জন্যই যে আমাদের সংগ্রাম করা দরকার একথা তাঁরা স্বীকার করলেন। তখন মোহন মিয়া সাহেব ও সালাম খান সাহেব জেলা মুসলিম লীগের সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন।

১৯৪২ সালে মিস্টার জিন্নাহ আসবেন বাংলাদেশে, প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সম্মেলনে যোগদান করার জন্য। সম্মেলন হবে পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমায়। আমরা ফরিদপুর থেকে বিরাট এক কর্মী বাহিনী নিয়ে রওয়ানা করলাম। ছাত্রলীগ কর্মীই বেশি ছিল। সৈয়দ আকবর আলী সাহেবের বাড়িতে অভ্যর্থনা কমিটির অফিস করা হয়েছিল। আমি প্রায় সকল সময় শহীদ সাহেবের কাছে কাছে থাকতে চেষ্টা করতাম। আনোয়ার হোসেন তখন ছাত্রদের অন্যতম নেতা ছিলেন। তাঁর সাথে কলকাতায় আমার পরিচয় হয়। শহীদ সাহেব আনোয়ার সাহেবকে খুব ভালবাসতেন। ছাত্রদের মধ্যে দুইটা দল ছিল। চট্টগ্রামের ফজলুল কাদের চৌধুরীও তখন ছাত্র আন্দোলনের একজন নেতা ছিলেন। ওয়াসেক সাহেব ও ফজলুল কাদের চৌধুরীর সাথে গোলমাল লেগেই ছিল। ওয়াসেক সাহেব ছাত্রদের রাজনৈতিক পিতা ছিলেন বললে অন্যায় হবে না। বহুদিন তিনি 'অল বেঙ্গল মুসলিম ছাত্রলীগে'র সভাপতি ছিলেন, ছাত্রজীবন শেষ করেছেন বোধহয় পনের বছর পূর্বে। তবুও তিনি পদ ছাড়বেন না। কেউ তাঁর মতের বিরুদ্ধে কথা বললেই তিনি বলতেন, "কে হে তুমি? তুমি তো ছাত্রলীগের সদস্য বা কাউন্সিলার নও; বের হয়ে যাও সভা থেকে।" প্রথমে কেউই কিছু বলত না তাঁকে সম্মান করে। প্রথম গোলমাল হয় বোধহয় ১৯৪১ বা ১৯৪২ সালে চুঁচুড়া সম্মেলনে। ফজলুল কাদের চৌধুরী ও আমরা ভীষণভাবে প্রতিবাদ করলাম, শেষ পর্যন্ত শহীদ সাহেবের হস্তক্ষেপে গোলমাল হল না। আমি ও আমার সহকর্মীরা ফজলুল কাদের চৌধুরীর দলকে সমর্থন করে বের হয়ে এলাম। তখন সাদেকুর রহমান (এখন সরকারের বড় চাকরি করেন) প্রাদেশিক ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন, পরে আনোয়ার হোসেন সম্পাদক হন। বগুড়া সম্মেলনে আমরা উপস্থিত হয়েও সভায় যোগদান করি না, কারণ অল ইন্ডিয়া মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি মাহমুদাবাদের রাজা সাহেব ওয়াদা করলেন শীঘ্রই তিনি এডহক কমিটি করে নির্বাচন দেবেন। এডহক কমিটি করলেন সত্য, তবে তা কাগজপত্রেই রইল।

এই সময় ইসলামিয়া কলেজে আমি খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছি। অফিসিয়াল ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে প্রার্থী দাঁড় করিয়ে তাদের পরাজিত করালাম। ইসলামিয়া কলেজই ছিল বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র। পরের বছরও ১৯৪৩ সালে ইলেকশনে আনোয়ার সাহেবের অফিসিয়াল ছাত্রলীগ পরাজিত হল। তারপর আর তিন বৎসর কেউই

আমার মনোনীত প্রার্থীর বিরুদ্ধে ইলেকশন করে নাই। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের ইলেকশন হত। আমি ছাত্রনেতাদের নিয়ে আলোচনা করে যাদের ঠিক করে দিতাম তারাই নমিনেশন দাখিল করত, আর কেউ করত না। কারণ জানত, আমার মতের বিরুদ্ধে কারও জিতবার সম্ভাবনা ছিল না। জহিরুদ্দিন আমাকে সাহায্য করত। সে কলকাতার বাসিন্দা, ছাত্রদের উপর তার যথেষ্ট প্রভাব ছিল। নিঃস্বার্থ কর্মী বলে সকলে তাকে শ্রদ্ধাও করত। চমৎকার ইংরেজি, বাংলা ও উর্দুতে বক্তৃতা করতে পারত। জহির পরে ইসলামিয়া কলেজ ছেড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে, তবুও আমার সাথে বন্ধুত্ব ছিল। কিছুদিনের জন্য সে কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় রেডিওতে চাকরি নিয়ে চলে আসায় আমার খুবই অসুবিধা হয়েছিল।

১৯৪৩ সালে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হয়েছে। লক্ষ লক্ষ লোক মারা যাচ্ছে। এই সময় আমি প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সদস্য হই। জনাব আবুল হাশিম সাহেব মুসলিম লীগের সম্পাদক হন। তিনি সোহরাওয়ার্দী সাহেবের মনোনীত ছিলেন। আর খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেবের মনোনীত প্রার্থী ছিলেন খুলনার আবুল কাশেম সাহেব। হাশিম সাহেব তাঁকে পরাজিত করে সাধারণ সম্পাদক হন। এর পূর্বে সোহরাওয়ার্দী সাহেবই সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। এই সময় থেকে মুসলিম লীগের মধ্যে দুইটা দল মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। একটা প্রগতিবাদী দল, আর একটা প্রতিক্রিয়াশীল। শহীদ সাহেবের নেতৃত্বে আমরা বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা মুসলিম লীগকে জনগণের লীগে পরিণত করতে চাই, জনগণের প্রতিষ্ঠান করতে চাই। মুসলিম লীগ তখন পর্যন্ত জনগণের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় নাই। জমিদার, জোতদার ও খান বাহাদুর নবাবদের প্রতিষ্ঠান ছিল। কাউকেও লীগে আসতে দিত না। জেলায় জেলায় খান বাহাদুরের দলেরাই লীগকে পকেটে করে রেখেছিল।

খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেবের নেতৃত্বে ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে ঢাকার এক খাজা বংশের থেকেই এগারজন এমএলএ হয়েছিল। ১৯৪৩ সালে, খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেব যখন প্রধানমন্ত্রী হলেন তিনি তাঁর ছোট ভাই খাজা শাহাবুদ্দীন সাহেবকে শিল্পমন্ত্রী করলেন। আমরা বাধা দিলাম, তিনি শুনলেন না। শহীদ সাহেবের কাছে আমরা যেয়ে প্রতিবাদ করলাম, তিনিও কিছু বললেন না। সোহরাওয়ার্দী সাহেব সিভিল সাপ্লাই মন্ত্রী হলেন। দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছে। গ্রাম থেকে লাখ লাখ লোক শহরের দিকে ছুটেছে স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে। খাবার নাই, কাপড় নাই। ইংরেজ যুদ্ধের জন্য সমস্ত নৌকা বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছে। ধান, চাল সৈন্যদের খাওয়াবার জন্য গুদাম জব্দ করেছে। যা কিছু ছিল ব্যবসায়ীরা গুদামজাত করেছে। ফলে এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ব্যবসায়ীরা দশ টাকা মণের চাউল চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকায় বিক্রি করছে। এমন দিন নাই রাস্তায় লোকে মরে পড়ে থাকতে দেখা যায় না। আমরা কয়েকজন ছাত্র শহীদ সাহেবের কাছে যেয়ে বললাম, "কিছুতেই জনসাধারণকে বাঁচাতে পারবেন না, মিছামিছি বদনাম নেবেন।" তিনি বললেন, "দেখি চেষ্টা করে কিছু করা যায় কি না, কিছু লোক তো বাঁচাতে চেষ্টা করব।"

তিনি রাতারাতি বিরাট সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট গড়ে তুললেন। 'কন্ট্রোল' দোকান খোলার বন্দোবস্ত করলেন। গ্রামে গ্রামে লঙ্গরখানা করার হুকুম দিলেন। দিল্লিতে যেয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে ভয়াবহ অবস্থার কথা জানালেন এবং সাহায্য দিতে বললেন। চাল, আটা ও গম বজরায় করে আনাতে শুরু করলেন। ইংরেজের কথা হল, বাংলার মানুষ যদি মরে তো মরুক, যুদ্ধের সাহায্য আগে। যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রথম স্থান পাবে। ট্রেনে অস্ত্র যাবে, তারপর যদি জায়গা থাকে তবে রিলিফের খাবার যাবে। যুদ্ধ করে ইংরেজ, আর না খেয়ে মরে বাঙালি; যে বাঙালির কোনো কিছুরই অভাব ছিল না। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন বাংলাদেশ দখল করে মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতায়, তখন বাংলার এত সম্পদ ছিল যে, একজন মুর্শিদাবাদের ব্যবসায়ী গোটা বিলাত শহর কিনতে পারত। সেই বাংলাদেশের এই দুরবস্থা চোখে দেখেছি যে, মা মরে পড়ে আছে, ছোট বাচ্চা সেই মরা মার দুধ চাটছে। কুকুর ও মানুষ একসাথে ডাস্টবিন থেকে কিছু খাবার জন্য কাড়াকাড়ি করছে। ছেলেমেয়েদের রাস্তায় ফেলে দিয়ে মা কোথায় পালিয়ে গেছে। পেটের দায়ে নিজের ছেলেমেয়েকে বিক্রি করতে চেষ্টা করছে। কেউ কিনতেও রাজি হয় নাই। বাড়ির দুয়ারে এসে চিৎকার করছে, 'মা বাঁচাও, কিছু খেতে দাও, মরে তো গেলাম, আর পারি না, একটু ফেন দাও।' এই কথা বলতে বলতে ঐ বাড়ির দুয়ারের কাছেই পড়ে মরে গেছে। আমরা কি করব? হোস্টেলে যা বাঁচে দুপুরে ও রাতে বুভুক্ষুদের বসিয়ে ভাগ করে দেই, কিন্তু কি হবে এতে?

এই সময় শহীদ সাহেব লঙ্গরখানা খোলার হুকুম দিলেন। আমিও লেখাপড়া ছেড়ে দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়লাম। অনেকগুলি লঙ্গরখানা খুললাম। দিনে একবার করে খাবার দিতাম। মুসলিম লীগ অফিসে, কলকাতা মাদ্রাসায় এবং আরও অনেক জায়গায় লঙ্গরখানা খুললাম। দিনভর কাজ করতাম, আর রাতে কোনোদিন বেকার হোস্টেলে ফিরে আসতাম, কোনোদিন লীগ অফিসের টেবিলে শুয়ে থাকতাম। আমার আরও কয়েকজন সহকর্মী ছিলেন। যেমন পিরোজপুরের নূরুদ্দিন আহমেদ—যিনি পরে পূর্ব বাংলার এমএলএ হন। নিঃস্বার্থ কর্মী ছিলেন—যদিও তিনি আনোয়ার হোসেন সাহেবের দলে ছিলেন, আমার সাথে এদের গোলমাল ছিল, তবুও আমার ওকে ভাল লাগত। বেকার হোস্টেলের সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন প্রফেসর সাইদুর রহমান সাহেব (বহু পরে ঢাকার জগন্নাথ কলেজের প্রিন্সিপাল হন) আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। হোস্টেল রাজনীতি বা ইলেকশনে আমার যোগদান করার সময় ছিল না। তবে তিনি আমার সাথে পরামর্শ করতেন। প্রিন্সিপাল ছিলেন ড. আই. এইচ. জুবেরী। তিনিও আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। যে কোনো ব্যাপারে তাঁদের সঙ্গে সোজাসুজি আলাপ করতাম এবং সত্য কথা বলতাম। শিক্ষকরা আমাকে সকলেই স্নেহ করতেন। আমি দরকার হলে কলেজের এ্যাসেম্বলি হলের দরজা খুলে সভা শুরু করতাম। প্রিন্সিপাল সাহেব দেখেও দেখতেন না। মুসলমান প্রফেসররা পাকিস্তান আন্দোলনকে সমর্থন করতেন। হিন্দু ও ইউরোপিয়ান টিচাররা চুপ করে থাকতেন, কারণ সমস্ত ছাত্রই মুসলমান। সামান্য কিছু সংখ্যক ছাত্র পাকিস্তানবিরোধী ছিল, কিন্তু সাহস করে কথা বলত না।



এই সময় রিলিফের কাজ করার জন্য গোপালগঞ্জ ফিরে আসি। গোপালগঞ্জ মহকুমার একদিকে যশোর জেলা, একদিকে খুলনা জেলা, আর একদিকে বরিশাল জেলা। বাড়িতে এসে দেখি ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। মানুষ সবই প্রায় না খেতে পেয়ে কঙ্কাল হতে চলেছে। গোপালগঞ্জের মুসলমানরা ব্যবসায়ী এবং যথেষ্ট ধান হয় এখানে। খেয়ে পরে মানুষ কোনোমতে চলতে পারত। অনেকেই আমাকে পরামর্শ দিল, যদি একটা কনফারেন্স করা যায় আর সোহরাওয়ার্দী সাহেব ও মুসলিম লীগ নেতাদের আনা যায় তবে চোখে দেখলে এই তিন জেলার লোকে কিছু বেশি সাহায্য পেতে পারে এবং লোকদের বাঁচাবার চেষ্টা করা যেতে পারে। আমাদের সহকর্মীদের নিয়ে বসলাম। আলোচনা হল, সকলে বলল, এই অঞ্চলে কোনোদিন পাকিস্তানের দাবির জন্য কোনো বড় কনফারেন্স হয় নাই। তাই কনফারেন্স হলে তিন জেলার মানুষের মধ্যে জাগরণের সৃষ্টি হবে। এতে দুইটা কাজ হবে, মুসলিম লীগের শক্তিও বাড়বে, আর জনগণও সাহায্য পাবে। সকল এলাকা থেকে কিছু সংখ্যক কর্মীকে আমন্ত্রণ করা হল। আলোচনা করে ঠিক হল, সম্মেলনের 'দক্ষিণ বাংলা পাকিস্তান কনফারেন্স' নাম দেয়া হবে এবং তিন জেলার লোকদের দাওয়াত করা হবে। সভা আহ্বান করা হল অভ্যর্থনা কমিটি করার জন্য। বয়স্ক নেতাদের থেকে একজনকে চেয়ারম্যান ও একজনকে সেক্রেটারি করা হবে। প্রধান যারা ছিলেন তাদের মধ্যে কেউ রাজি হন না, কারণ খরচ অনেক হবে, দেশে দুর্ভিক্ষ, টাকা পয়সা তুলতে পারা যাবে না। শেষ পর্যন্ত সকলে মিলে আমাকেই অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান এবং যশোর জেলার মৌলভী আফসারউদ্দিন মোল্লা নামে একজন বড় ব্যবসায়ী, তাঁকে সম্পাদক করা হল।

আমি কলকাতায় রওয়ানা হয়ে গেলাম, নেতৃবৃন্দকে নিমন্ত্রণ করার জন্য। যখন সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে দাওয়াত করতে গেলাম, দেখি খাজা শাহাবুদ্দীন সেখানে উপস্থিত আছেন। শহীদ সাহেব বললেন, "আমি খুবই ব্যস্ত, তুমি বুঝতেই পারো, নিশ্চয়ই চেষ্টা করব যেতে। শাহাবুদ্দীন সাহেবকে নিমন্ত্রণ কর উনিও যাবেন।" অনিচ্ছা সত্ত্বেও শাহাবুদ্দীন সাহেবকে বলতে হল, তিনিও রাজি হলেন। তমিজুদ্দিন খান তখন শিক্ষামন্ত্রী, ফরিদপুর বাড়ি, তাঁকেও অনুরোধ করলাম, তিনিও রাজি হলেন। মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ এবং হবীবুল্লাহ বাহার চৌধুরী সাহেবকেও দাওয়াত দিলাম। জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী (লাল মিয়া), তখন কংগ্রেস ত্যাগ করে মুসলিম লীগে যোগদান করেছেন এবং প্রাদেশিক মুসলিম লীগ রিলিফ কমিটির সম্পাদক। আমি তাঁর সাথেই রিলিফের কাজ করতাম, আমাকে খুবই বিশ্বাস করতেন। তিনি যথেষ্ট টাকা, ঔষধ ও কাপড় জোগাড় করেছিলেন। তাঁর সাথে সাথেই আমাকে থাকতে হত। আর প্রত্যেক মহকুমায় কাপড় পাঠাতে হত। যুদ্ধের সময় মালপত্র বুক করা কঠিন ছিল, দশ দিন ঘোরাঘুরি করলে কিছু কিছু কাপড় পাঠাবার মত জায়গা পাওয়া যেত। অনেক সময় হিসাব-নিকাশও দেখতে হত। নিজের হাতে কাপড়ের গাঁটও বাঁধতে হত। আমি কোন কাজেই 'না' বলতাম না। যাহোক, তাঁকেও

গোপালগঞ্জ যেতে অনুরোধ করলাম, তিনিও রাজি হলেন। দিন তারিখ ঠিক করে আমি বাড়ি রওয়ানা হয়ে এলাম। সামান্য কিছু টাকা তুললাম শহর থেকে। আমি গ্রামে বের হয়ে পড়লাম, কিছু কিছু অবস্থাশালী লোক ছিল মহকুমায়, তাদের বাড়িতে যেয়ে কিছু কিছু টাকা তুলে আনলাম। কাজ শুরু হয়ে গেছে। লোকজন চারিদিকে নামিয়ে দিয়েছি। অতিথিদের খাবারের ভার আব্বাই নিলেন। তবে পাক হবে এক সরকারি কর্মচারীর বাড়িতে। পরে দুই পক্ষ হয়ে গেল। গোলমাল শুরু হলে শেষ পর্যন্ত গোপালগঞ্জে আমাদের বাড়িতেই বন্দোবস্ত হল। প্যান্ডেল করলাম নৌকার বাদাম দিয়ে। যাদের বড় বড় নৌকা ছিল তাদের বাড়ি থেকে দুই দিনের জন্য বাদামগুলি ধার করে আনলাম। পাঁচ হাজার লোক বসতে পারে এত বড় প্যান্ডেল করলাম, খরচ খুব বেশি হল না।

এদিকে এই কনফারেন্স বন্ধ করার জন্য অনেকেই চেষ্টা করতে আরম্ভ করল। টেলিগ্রাম করল সকল আমন্ত্রিত নেতাদের কাছে। কনফারেন্সের মাত্র তিন দিন সময় আছে, আমার কাছে তমিজুদ্দিন সাহেব ও শাহাবুদ্দীন সাহেব টেলিগ্রাম করেছেন, কনফারেন্স বন্ধ করা যায় কি না? আমি টেলিগ্রাম করলাম, বন্ধ করা অসম্ভব। সোহরাওয়ার্দী সাহেব আসতে পারবেন না বলে টেলিগ্রাম করেছেন। তিনি বোধহয় ঐ কনফারেন্সে দিল্লি বা অন্য কোথাও যাবেন। সকলে আমাকে বলল, কলকাতায় রওয়ানা হতে, কারণ যদি কেউ না আসে তবে ভীষণ ক্ষতি হয়ে যাবে। বহু দূর দূর থেকে লোক আসবে। কনফারেন্স দুই দিন চলার কথা ছিল, তা দুর্ভিক্ষের জন্য সম্ভব হবে না। সকালে কর্মী সম্মেলন, বিকালে জনসভা হবে বলে ঠিক হল। আমি আমার সহকর্মীদের ওপর ভার দিয়ে কলকাতা রওয়ানা করলাম। তমিজুদ্দিন সাহেব পূর্বেই খুলনায় রওয়ানা হয়ে গেছেন। শাহাবুদ্দীন সাহেব, মওলানা তর্কবাগীশ ও লাল মিয়া সাহেবকে নিয়ে খুলনায় এলাম। খুলনায় তমিজুদ্দিন সাহেব সরকারি লঞ্চে আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছেন। আমরা লঞ্চে উঠলাম এবং জানতে চাইলাম, কেন তিন দিন পূর্বে কনফারেন্স বন্ধ করতে বললেন? জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম, জনাব ওয়াহিদুজ্জামান কিছুদিন পূর্বেও হক সাহেবের সাথে ছিলেন, সদ্য মুসলিম লীগে যোগদান করেছেন, তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না যে আমি চেয়ারম্যান হয়েছি আর গোপালগঞ্জে কনফারেন্স হবে। তাঁর কিছু করার নাই আর বলারও নাই। যদিও ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত তাঁরা আমাকে ও মুসলিম লীগকে বাধা দিয়েছেন। আবার সালাম খান সাহেব, জেলা লীগের সম্পাদক, বাড়ি গোপালগঞ্জ, তাঁরও আপত্তি রয়েছে এত বড় কনফারেন্স হবে তাঁকে বলা হয় নাই বা তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করা হয় নাই। তিনিও খবর দিয়েছেন, যাতে নেতারা না আসেন।

আমাকে সকল নেতাই জানতেন ভাল কর্মী হিসাবে, আমাকে সকলে স্নেহও করতেন। শহীদ সাহেবও বলে দিয়েছেন সকলকে কনফারেন্সে যোগদান করতে। আমাকে অপমান করলে, আবার একবার মত দিয়ে না গেলে কলকাতায় ছাত্রদের নিয়ে যে গোলমাল করব সে ভয়ও অনেকের ছিল। সকলকে নিয়ে আমি গোপালগঞ্জ উপস্থিত হলাম। নেতারা বিরাট সম্বর্ধনা পেলেন। 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে গোপালগঞ্জ শহর মুখরিত হয়ে

উঠল। নেতারা জনসমাগম দেখে খুবই আনন্দিত হলেন। সভা হবে, কিন্তু প্যান্ডেল গত রাতে ঝড়ে ভেঙে গিয়েছে। নৌকার বাদামগুলি ছিঁড়ে টুকরা টুকরা হয়ে গেছে। সেই ভাঙা প্যান্ডেলে সভা হল। রাতেই সকলে বিদায় নিলেন। আমার অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে গেল। এত টাকা আমি কোথায় পাব? বাদামগুলি ছিঁড়ে গেছে, এখন তো কেউই এক টাকাও দিবে না। নেতারাও কেউ জিজ্ঞাসা করলেন না। যাদের বাদাম এনেছিলাম, তারা অনেকেই আমাকে স্নেহ করত। তারা অনেকেই অর্থশালী, আর তাদের ছেলেরা প্রায়ই আমার দলে। অনেকে ছেঁড়া বাদাম নিয়ে চলে গেল, আর কিছু লোক উসকানি পেয়ে বাদাম নিতে আপত্তি করল। তারা টাকা চায়, ছেঁড়া বাদাম নেবে না, আমি কি করব? মুখ কালো করে বসে আছি। অতিথিদের খাবার বন্দোবস্ত করার জন্য আমার মা ও স্ত্রী গ্রামের বাড়ি থেকে গোপালগঞ্জের বাড়িতে এসেছে তিন দিন হল। আমার শরীরও খারাপ হয়ে পড়েছে অত্যধিক পরিশ্রমে। বিকালে ভয়ানক জ্বর হল। আব্বা আমাকে বললেন, "তুমি ঘাবড়িয়ে গিয়েছ কেন?" আব্বা পূর্বেও বহু টাকা খরচ করেছেন এই কনফারেন্স উপলক্ষে। বড়লোক তো নই কি করে আব্বাকে বলি। আব্বা নিজেই সমাধান করে দিলেন। যাদের ব্যবসা ভাল না, তাদের কিছু কিছু টাকা দিয়ে বিদায় দিলেন। একজন ব্যবসায়ী যার আট, দশটা বাদাম নষ্ট হয়েছে তিনি পুরা টাকা দাবি করলেন, না দিলে মামলা করবেন। আব্বা বললেন, "কিছু টাকা আপনি নিয়ে এগুলি মেরামত করায়ে নেন। মামলার ভয় দেখিয়ে লাভ নাই। যারা পরামর্শ আপনাকে দিয়েছে, তারা জানে না আপনার বাদাম যে এনেছি তা প্রমাণ করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হবে।" আমার জ্বর ভয়ানকভাবে বেড়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত ভদ্রলোক উকিলের নোটিশ দিয়েছিলেন। কিন্তু সাহস করে আর মামলা করেন নাই।

রেণু কয়েকদিন আমাকে খুব সেবা করল। যদিও আমাদের বিবাহ হয়েছে ছোটবেলায়। ১৯৪২ সালে আমাদের ফুলশয্যা হয়। জ্বর একটু ভাল হল। কলকাতা যাব, পরীক্ষাও নিকটবর্তী। লেখাপড়া তো মোটেই করি না। দিনরাত রিলিফের কাজ করে কূল পাই না। আব্বা আমাকে এ সময় একটা কথা বলেছিলেন, "বাবা রাজনীতি কর আপত্তি করব না, পাকিস্তানের জন্য সংগ্রাম করছ এ তো সুখের কথা, তবে লেখাপড়া করতে ভুলিও না। লেখাপড়া না শিখলে মানুষ হতে পারবে না। আর একটা কথা মনে রেখ, 'sincerity of purpose and honesty of purpose' থাকলে জীবনে পরাজিত হবা না।" একথা কোনোদিন আমি ভুলি নাই।

আর একদিনের কথা, গোপালগঞ্জ শহরের কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি আমার আব্বাকে বলেছিলেন, আপনার ছেলে যা আরম্ভ করেছে তাতে তার জেল খাটতে হবে। তার জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবে, তাকে এখনই বাধা দেন। আমার আব্বা যে উত্তর করেছিলেন তা আমি নিজে শুনেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, "দেশের কাজ করছে, অন্যায় তো করছে না; যদি জেল খাটতে হয়, খাটবে; তাতে আমি দুঃখ পাব না। জীবনটা নষ্ট নাও তো হতে পারে, আমি ওর কাজে বাধা দিব না। আমার মনে হয়, পাকিস্তান না আনতে পারলে মুসলমানদের

অস্তিত্ব থাকবে না।" অনেক সময় আব্বা আমার সাথে রাজনৈতিক আলোচনা করতেন। আমাকে প্রশ্ন করতেন, কেন পাকিস্তান চাই? আমি আব্বার কথার উত্তর দিতাম।

একদিনের কথা মনে আছে, আব্বা ও আমি রাত দুইটা পর্যন্ত রাজনীতির আলোচনা করি। আব্বা আমার আলোচনা শুনে খুশি হলেন। শুধু বললেন, শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক সাহেবের বিরুদ্ধে কোনো ব্যক্তিগত আক্রমণ না করতে। একদিন আমার মা'ও আমাকে বলছিলেন, "বাবা যাহাই কর, হক সাহেবের বিরুদ্ধে কিছুই বলিও না।" শেরে বাংলা মিছামিছিই 'শেরে বাংলা' হন নাই। বাংলার মাটিও তাঁকে ভালবেসে ফেলেছিল। যখনই হক সাহেবের বিরুদ্ধে কিছু বলতে গেছি, তখনই বাধা পেয়েছি। একদিন আমার মনে আছে একটা সভা করছিলাম আমার নিজের ইউনিয়নে, হক সাহেব কেন লীগ ত্যাগ করলেন, কেন পাকিস্তান চান না এখন? কেন তিনি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির সাথে মিলে মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন? এই সমস্ত আলোচনা করছিলাম, হঠাৎ একজন বৃদ্ধ লোক যিনি আমার দাদার খুব ভক্ত, আমাদের বাড়িতে সকল সময়ই আসতেন, আমাদের বংশের সকলকে খুব শ্রদ্ধা করতেন—দাঁড়িয়ে বললেন, "যাহা কিছু বলার বলেন, হক সাহেবের বিরুদ্ধে কিছুই বলবেন না। তিনি যদি পাকিস্তান না চান, আমরাও চাই না। জিন্নাহ কে? তার নামও তো শুনি নাই। আমাদের গরিবের বন্ধু হক সাহেব।" এ কথার পর আমি অন্যভাবে বক্তৃতা দিতে শুরু করলাম। সোজাসুজিভাবে আর হক সাহেবকে দোষ দিতে চেষ্টা করলাম না। কেন পাকিস্তান আমাদের প্রতিষ্ঠা করতে হবে তাই বুঝালাম। শুধু এইটুকু না, যখনই হক সাহেবের বিরুদ্ধে কালো পতাকা দেখাতে গিয়েছি, তখনই জনসাধারণ আমাদের মারপিট করেছে। অনেক সময় ছাত্রদের নিয়ে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছি, মার খেয়ে। কয়েকবার মার খাওয়ার পরে আমাদের বক্তৃতার মোড় ঘুরিয়ে দিলাম। পূর্বে আমার দোষ ছিল, সোজাসুজি আক্রমণ করে বক্তৃতা করতাম। তার ফল বেশি ভাল হত না। উপকার করার চেয়ে অপকারই বেশি হত। জনসাধারণ দুঃখ পেতে পারে ভেবে দাবিটা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করতাম।

পাকিস্তান দুইটা হবে, লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে। একটা বাংলা ও আসাম নিয়ে 'পূর্ব পাকিস্তান' স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র; আর একটা 'পশ্চিম পাকিস্তান' স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হবে—পাঞ্জাব, বেলুচিস্তান, সীমান্ত ও সিন্ধু প্রদেশ নিয়ে। অন্যটা হবে হিন্দুস্তান। ওখানেও হিন্দুরাই সংখ্যাগুরু থাকবে তবে সমান নাগরিক অধিকার পাবে হিন্দুস্তানের মুসলমানরাও। আমার কাছে ভারতবর্ষের একটা ম্যাপ থাকত। আর হবীবুল্লাহ বাহার সাহেবের 'পাকিস্তান' বইটা এবং মুজিবুর রহমান খাঁ সাহেবও 'পাকিস্তান' নামে একটা বিস্তৃত বই লিখেছিলেন সেটা; এই দুইটা বই আমার প্রায় মুখস্তের মত ছিল। *আজাদের* কাটিংও আমার ব্যাগে থাকত।

সিপাহি বিদ্রোহ এবং ওহাবি আন্দোলনের ইতিহাসও আমার জানা ছিল। কেমন করে ব্রিটিশরাজ মুসলমানদের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিল, কি করে রাতারাতি মুসলমানদের সর্বস্বান্ত করে হিন্দুদের সাহায্য করেছিল, মুসলমানরা ব্যবসা-বাণিজ্য,

জমিদারি, সিপাহির চাকরি থেকে কিভাবে বিতাড়িত হল—মুসলমানদের স্থান হিন্দুদের দ্বারা পূরণ করতে শুরু করেছিল ইংরেজরা কেন? মুসলমানরা কিছুদিন পূর্বেও দেশ শাসন করেছে তাই ইংরেজকে গ্রহণ করতে পারে নাই। সুযোগ পেলেই বিদ্রোহ করত। ওহাবি আন্দোলন কি করে শুরু করেছিল হাজার হাজার বাঙালি মুজাহিদরা? বাংলাদেশ থেকে সমস্ত ভারতবর্ষ পায়ে হেঁটে সীমান্ত প্রদেশে যেয়ে জেহাদে শরিক হয়েছিল। তিতুমীরের জেহাদ, হাজী শরীয়তুল্লাহর ফারায়জি আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনা করেই আমি পাকিস্তান আন্দোলনের ইতিহাস বলতাম। ভীষণভাবে হিন্দু বেনিয়া ও জমিদারদের আক্রমণ করতাম। এর কারণও যথেষ্ট ছিল। একসাথে লেখাপড়া করতাম, একসাথে বল খেলতাম, একসাথে বেড়াতাম, বন্ধুত্ব ছিল হিন্দুদের অনেকের সাথে। আমার বংশও খুব সম্মান পেত হিন্দু মুসলমানদের কাছ থেকে। কিন্তু আমি যখন কোনো হিন্দু বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে যেতাম, আমাকে অনেক সময় তাদের ঘরের মধ্যে নিতে সাহস করত না আমার সহপাঠীরা।

একদিনের একটা ঘটনা আমার মনে দাগ কেটে দিয়েছিল, আজও সেটা ভুলি নাই। আমার এক বন্ধু ছিল ননীকুমার দাস। একসাথে পড়তাম, কাছাকাছি বাসা ছিল, দিনভরই আমাদের বাসায় কাটাত এবং গোপনে আমার সাথে খেত। ও ওর কাকার বাড়িতে থাকত। একদিন ওদের বাড়িতে যাই। ও আমাকে ওদের থাকার ঘরে নিয়ে বসায়। ওর কাকীমাও আমাকে খুব ভালবাসত। আমি চলে আসার কিছু সময় পরে ননী কাঁদো কাঁদো অবস্থায় আমার বাসায় এসে হাজির। আমি বললাম, "ননী কি হয়েছে?" ননী আমাকে বলল, "তুই আর আমাদের বাসায় যাস না। কারণ, তুই চলে আসার পরে কাকীমা আমাকে খুব বকেছে তোকে ঘরে আনার জন্য এবং সমস্ত ঘর আবার পরিষ্কার করেছে পানি দিয়ে ও আমাকেও ঘর ধুতে বাধ্য করেছে।" বললাম, "যাব না, তুই আসিস।" আরও অনেক হিন্দু ছেলেদের বাড়িতে গিয়েছি, কিন্তু আমার সহপাঠীরা আমাকে কোনোদিন একথা বলে নাই। অনেকের মা ও বাবা আমাকে আদরও করেছেন। এই ধরনের ব্যবহারের জন্য জাতক্রোধ সৃষ্টি হয়েছে বাঙালি মুসলমান যুবকদের ও ছাত্রদের মধ্যে। শহরে এসেই এই ব্যবহার দেখেছি। কারণ আমাদের বাড়িতে হিন্দুরা যারা আসত প্রায় সকলেই আমাদের শ্রদ্ধা করত। হিন্দুদের কয়েকটা গ্রামও ছিল, যেগুলির বাসিন্দারা আমাদের বংশের কোনো না কোনো শরিকের প্রজা ছিল।

হিন্দু মহাজন ও জমিদারদের অত্যাচারেও বাংলার মুসলমানরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। তাই মুসলমানরা ইংরেজদের সাথে অসহযোগ করেছিল। তাদের ভাষা শিখবে না, তাদের চাকরি নেবে না, এই সকল করেই মুসলমানরা পিছিয়ে পড়েছিল। আর হিন্দুরা ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করে ইংরেজকে তোষামোদ করে অনেকটা উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়েছিল। যখন আবার হিন্দুরা ইংরেজের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল তখন অনেকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলে মরতে দ্বিধা করে নাই। জীবনভর কারাজীবন ভোগ করেছে, ইংরেজকে তাড়াবার জন্য। এই সময় যদি এই সকল নিঃস্বার্থ স্বাধীনতা সংগ্রামী ও ত্যাগী পুরুষরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সাথে সাথে হিন্দু ও মুসলমানদের মিলনের চেষ্টা করতেন এবং মুসলমানদের

উপর যে অত্যাচার ও জুলুম হিন্দু জমিদার ও বেনিয়ারা করেছিল, তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেন, তাহলে তিক্ততা এত বাড়ত না। হিন্দু নেতাদের মধ্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এবং নেতাজী সুভাষ বসু এ ব্যাপারটা বুঝেছিলেন, তাই তাঁরা অনেক সময় হিন্দুদের হুঁশিয়ার করেছিলেন। কবিগুরুও তাঁর লেখার ভেতর দিয়ে হিন্দুদের সাবধান করেছেন। একথাও সত্য, মুসলমান জমিদার ও তালুকদাররা হিন্দু প্রজাদের সঙ্গে একই রকম খারাপ ব্যবহার করত হিন্দু হিসাবে নয়, প্রজা হিসাবে। এই সময় যখনই কোনো মুসলমান নেতা মুসলমানদের জন্য ন্যায্য অধিকার দাবি করত তখনই দেখা যেত হিন্দুদের মধ্যে অনেক শিক্ষিত, এমনকি গুণী সম্প্রদায়ও চিৎকার করে বাধা দিতেন। মুসলমান নেতারাও 'পাকিস্তান' সম্বন্ধে আলোচনা ও বক্তৃতা শুরু করার পূর্বে হিন্দুদের বিরুদ্ধে গালি দিয়ে শুরু করতেন।

এই সময় আবুল হাশিম সাহেব মুসলিম লীগ কর্মীদের মধ্যে একটা নতুন প্রেরণা সৃষ্টি করেন এবং নতুনভাবে যুক্তিতর্ক দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করতেন যে পাকিস্তান দাবি হিন্দুদের বিরুদ্ধে নয়, হিন্দু মুসলমানদের মিলানোর জন্য এবং দুই ভাই যাতে শান্তিপূর্ণভাবে সুখে বাস করতে পারে তারই জন্য। তিনি আমাদের কিছু সংখ্যক কর্মীকে বেছে নিয়েছিলেন, তাদের নিয়ে রাতে আলোচনা সভা করতেন মুসলিম লীগ অফিসে। হাশিম সাহেব পূর্বে বর্ধমানে থাকতেন, সেখান থেকে মুসলিম লীগ অফিসে একটা রুমে এসে থাকতেন, কলকাতায় আসলে। মুসলিম লীগ অফিসটা শহীদ সাহেব ভাড়া নিয়েছিলেন। তাঁকেই ভাড়া দিতে হয়েছে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত। হাশিম সাহেব আমাদের বললেন, একটা লাইব্রেরি করতে হবে, তোমাদের লেখাপড়া করতে হবে। শুধু হিন্দুদের গালাগালি করলে পাকিস্তান আসবে না। আমি ছিলাম শহীদ সাহেবের ভক্ত। হাশিম সাহেব শহীদ সাহেবের ভক্ত ছিলেন বলে আমিও তাঁকে শ্রদ্ধা করতাম, তাঁর হুকুম মানতাম। হাশিম সাহেবও শহীদ সাহেবের হুকুম ছাড়া কিছু করতেন না। মুসলিম লীগের ফান্ড ও অর্থ মানে শহীদ সাহেবের পকেট। টাকা পয়সা তাঁকেই জোগাড় করতে হত। সে সম্বন্ধে পরে আলোচনা করব। হাশিম সাহেব বলতেন, মুসলিম লীগকে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির হাত থেকে উদ্ধার করতে হবে। গ্রাম থেকে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। উপরের তলার প্রতিষ্ঠান করলে চলবে না। জমিদারদের পকেট থেকে প্রতিষ্ঠানকে বের করতে হবে। তিনি শহীদ সাহেবের সাথে পরামর্শ করে সমস্ত বাংলাদেশ ঘুরতে আরম্ভ করলেন। চমৎকার বক্তৃতা করতেন। তাষার উপর দখল ছিল। ইংরেজি বাংলা দুই ভাষায় বক্তৃতা করতে পারতেন সুন্দরভাবে।



এই সময় ছাত্রদের মধ্যে বেশ শক্তিশালী দুইটা দল সৃষ্টি হল। আমি কলকাতায় এসেই খবর পেলাম, আমাদের দিল্লি যেতে হবে 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ সম্মেলনে' যোগদান করতে। তোড়জোড় পড়ে গেল। যাঁরা যাবেন নিজের টাকায়ই যেতে হবে। আনোয়ার হোসেন সাহেব তাঁর দলবল থেকে কয়েকজনকে নিলেন। টাকাও বোধহয় জোগাড় করলেন।

আমি ও ইসলামিয়া কলেজ ইউনিয়নের সেক্রেটারি মীর আশরাফউদ্দিন ঠিক করলাম, আমরাও যাব আমাদের নিজেদের টাকায়। আমাদের পূর্বেই ডেলিগেট করা হয়েছিল। মীর আশরাফউদ্দিন ওরফে মাখন, বাড়ি ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জ মহকুমার কাজী কসবা গ্রামে। আমার খালাতো বোনের ছেলে, ওর বাবা-মা ছোটবেলায় মারা গেছেন। যথেষ্ট টাকা রেখে গেছেন। ওর বাবা তখনকার দিনে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। শহীদ সাহেবকে বললাম, "আমরা দিল্লি কনফারেন্সে যোগদান করব।" তিনি বললেন, "খুব ভাল, দেখতে পারবে সমস্ত ভারতবর্ষের মুসলমান নেতাদের।" আমরা দুইজন ও আনোয়ার সাহেবের দলের কয়েকজন একই ট্রেনে ভিন্ন ভিন্ন গাড়িতে রওয়ানা করলাম। তাদের সাথে আমাদের মিল নাই। দুই মামু-ভাগ্নের যা খরচ লাগবে দিল্লিতে তা কোনোমতে বন্দোবস্ত করে নিলাম। টাকার বেশি প্রয়োজন হলে আমি আমার বোনের কাছ থেকে আনতাম। বোন আব্বার কাছ থেকে নিত। আব্বা বলে দিয়েছিলেন তাকে, আমার দরকার হলে টাকা দিতে। আব্বা ছাড়াও মায়ের কাছ থেকেও আমি টাকা নিতে পারতাম। আর সময় সময় রেণুও আমাকে কিছু টাকা দিতে পারত। রেণু যা কিছু জোগাড় করত বাড়ি গেলে এবং দরকার হলে আমাকেই দিত। কোনোদিন আপত্তি করে নাই, নিজে মোটেই খরচ করত না। গ্রামের বাড়িতে থাকত, আমার জন্যই রাখত।

হাওড়া থেকে আমরা দিল্লিতে রওয়ানা করলাম। এই প্রথমবার আমি বাংলাদেশের বাইরে রওয়ানা করলাম। দিল্লি দেখার একটা প্রবল আগ্রহ আমার ছিল। ইতিহাসে পড়েছি, বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে শুনেছি, তাই দিল্লির লালকেল্লা, জামে মসজিদ, কুতুব মিনার ও অন্যান্য ঐতিহাসিক জায়গাগুলি দেখতে হবে। নিজামুদ্দিন আউলিয়ার দরগায় যাব। আমরা দিল্লি পৌঁছালে মুসলিম লীগ স্বেচ্ছাসেবক দল আমাদের পৌঁছে দিল এ্যাংলো এ্যারাবিয়ান কলেজ প্রাঙ্গণে। সেখানে আমাদের জন্য তাঁবু করা হয়েছে। তাঁবুতে আমরা দুইজন ছাড়াও আলীগড়ের একজন ছাত্র এবং আরেকজন বোধহয় এলাহাবাদ বা অন্য কোথাকার হবে। আনোয়ার সাহেবের দলবল অন্য একটা তাঁবুতে রইলেন। বিরাট প্যান্ডেল করা হয়েছে। আমরা ডেলিগেট কার্ড নিয়ে সভায় উপস্থিত হলাম। বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের জন্য আলাদা জায়গা রাখা হয়েছে। প্রথম দিন কনফারেন্স হয়ে যাওয়ার পরে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে হাতির পিঠে নিয়ে এক বিরাট শোভাযাত্রা বের হল। আমরাও সাথে সাথে রইলাম। লোকে লোকারণ্য, রাস্তায় রাস্তায় পানি খাওয়ার বন্দোবস্ত রেখেছে। বোধহয় এই সময় পানি না রাখলে বহু লোক মারা যেত। দিল্লির পুরানা শহর আমরা ঘুরে বিকালে ফিরে এলাম। রাতে আবার কনফারেন্স শুরু হল। এই সময়কার একজনের কথা আজও আমি ভুলতে পারি না। উর্দুতে তিন ঘণ্টা বক্তৃতা করলেন। যেমন গলা, তেমনই বলার ভঙ্গি। উর্দু ভাল বুঝতাম না, কলকাতার উর্দু একটু বুঝলেও এ উর্দু বোঝা আমার পক্ষে বেশ কষ্টকর। বক্তৃতা করেছিলেন নবাব ইয়ার জং বাহাদুর। তিনি হায়দ্রাবাদের লোক ছিলেন। স্টেট মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন। তাঁর বক্তৃতা না বুঝলেও সভা ছেড়ে উঠে আসা কষ্টকর ছিল।

শরীর আমার খারাপ হয়ে পড়ে। দিনেরবেলায় ভীষণ গরম, রাতে ঠাণ্ডা। সকালে আর বিছানা থেকে উঠতে পারি না ; বুকে, পেটে, আর সমস্ত শরীরে বেদনা। দুই তিন দিন পায়খানা হয় নাই। অসহ্য যন্ত্রণা আমার শরীরে। দুপুর পর্যন্ত না খেয়ে শুয়েই রইলাম। মাখন আমার কাছেই বসে আছে। ডাক্তার ডাকতে হবে, কাউকেই চিনি জানি না। একজন স্বেচ্ছাসেবককে বলা হল, তিনি বললেন, "আভি নেহি, থোড়া বাদ"। তাকে আর দেখা গেল না, 'থোড়া বাদই রয়ে গেল।' বিকালের দিকে মাখন খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমারও ভয় হল। এই বিদেশে কি হবে? টাকা পয়সাও বেশি নাই। মাখন বলল, "মামা, আমি যাই ডাক্তার যেখানে পাই, নিয়ে আসতে চেষ্টা করি। এভাবে থাকলে তো বিপদ হবে।" শহীদ সাহেব কোথায় থাকেন জানি না, অন্যান্য নেতাদের বলেও কোন ফল হয় নাই। কে কার খবর রাখে? মাখন যখন বাইরে যাচ্ছিল ঠিক এই সময় দেখি হেকিম খলিলুর রহমান আমাকে দেখতে এসেছেন। তিনি জানেন না, আমি অসুস্থ। খলিলুর রহমানকে আমরা 'খলিল ভাই' বলতাম। ছাত্রলীগের বিখ্যাত কর্মী ছিলেন। আলীয়া মাদ্রাসায় পড়তেন এবং ইলিয়ট হোস্টেলে থাকতেন।

ইলিয়ট হোস্টেল আর বেকার হোস্টেল পাশাপাশি, আমরা ঠাট্টা করে বলতাম 'ইডিয়ট হোস্টেল'। খলিল ভাই আলীয়া মাদ্রাসা থেকে পাস করে দিল্লিতে এসেছেন এক বৎসর পূর্বে, হাকিম আজমল খাঁ সাহেবের হেকিমি বিদ্যালয়ে হেকিমি শিখবার জন্য। আমার অবস্থা দেখে তিনি বললেন, কি সর্বনাশ কাউকে খবরও দাও নাই! তিনি মাখনকে বললেন, আপনার ডাক্তার ডাকতে হবে না, আমি ডাক্তার নিয়ে আসছি। আধ ঘণ্টার মধ্যে খলিল ভাই একজন হেকিম নিয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি আমাকে ভালভাবে পরীক্ষা করে কিছু ওষুধ দিলেন। তাঁকে খলিল ভাই পূর্বেই আমার রোগের কথা বলেছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, ভয় নাই। ওষুধ খাওয়ার পরে তিন বার আপনার পায়খানা হবে, রাতে আর কিছুই খাবেন না। ভোরে এই ওষুধটা খাবেন। বিকালে আপনি ভাল হয়ে যাবেন। তিনি যা বললেন, তাই হল।

পরের দিন সুস্থ বোধ করতে লাগলাম। কনফারেন্সও শেষ হয়ে যাবে। খলিল ভাই আমাদের সাথেই দুই দিন থাকবেন। আমাদের দিল্লির সকল কিছু ঘুরে ঘুরে দেখাবেন। এই সময় আর একটা ঘটনা ঘটল। বরিশালের নূরুদ্দিন আহমেদের সাথে আনোয়ার সাহেবের ঝগড়া হয়েছে। নূরুদ্দিন রাগ করে আমাদের কাছে চলে এসেছে। তার টাকা পয়সাও আনোয়ার সাহেবের কাছে। তাকে কিছুই দেয় নাই, একদম খালি হাতে আমার ও মাখনের কাছে এসে হাজির। বলল, "না খেয়ে মরে যাব, দরকার হয় হেঁটে কলকাতা যাব, তবু ওর কাছে আর যাব না।" এই নূরুদ্দিন সাহেবকেই মাখন ইসলামিয়া কলেজ ইউনিয়নের ইলেকশনে জেনারেল সেক্রেটারি পদে পরাজিত করেছিল। নূরুদ্দিনকে ছাত্ররা ভালবাসত কিন্তু সে আনোয়ার সাহেবের দলে ছিল বলে তাকে পরাজিত হতে হয়েছিল। আইএ পড়লেও দলের নেতা আমিই ছিলাম। আমরা একই হোস্টেলে থাকতাম। বললাম, "ঠিক আছে তোমার ওর কাছে যাওয়া লাগবে না, যেভাবে হয় চলে যাবে।" যদিও ওর

জন্য টিকিট করার টাকা আমাদের কাছে নাই। তিন দিন থাকব ঠিক হল। খাবার খরচ বেশি, হোটেলে খেতে হয়। দুই দিনের মধ্যেই খলিল ভাইকে নিয়ে দিল্লির লালকেল্লা, দেওয়ানি আম, দেওয়ানি খাস, কুতুব মিনার, নিজামুদ্দিন আউলিয়ার দরগাহ, নতুন দিল্লি দেখে ফেললাম। কিছু টাকা খরচ হয়ে গেল। হিসাব করে দেখলাম, তিনজনের টিকিট করার টাকা আমাদের নাই। দুইখানা টিকিট করা যায়, কিন্তু না খেয়ে থাকতে হবে। খলিল ভাই একমাত্র বন্ধু, তবে তিনি তখনও ছাত্র তার কাছেও টাকা পয়সা নাই। যাহোক, আর দেরি না করে স্টেশনে এসে হাজির হলাম। তিনজনে পরামর্শ করে ঠিক করলাম, একখানা টিকিট করব এবং কোনো 'সার্ভেন্ট' ক্লাসে উঠে পড়ব। ধরা যদি পড়ি, হাওড়ায় একটা বন্দোবস্ত করা যাবে।

প্রথম শ্রেণীর প্যাসেঞ্জারদের গাড়ির সাথেই চাকরদের জন্য একটা করে ছোট্ট গাড়ি থাকে। সাহেবদের কাজকর্ম করে এখানেই এসে থাকে চাকররা। দিল্লি যাওয়ার সময় আমরা ইন্টারক্লাসে যাই। এখন টাকা ফুরিয়ে গেছে, কি করি? একখানা তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনলাম হাওড়া পর্যন্ত। আর দুইখানা প্লাটফর্ম টিকিট কিনে স্টেশনের ভিতরে আসলাম। মাখনের চেহারা খুব সুন্দর। দেখলে কেউই বিশ্বাস করবে না 'চাকর' হতে পারে। আমরা শুনলাম, খান বাহাদুর আবদুল মোমেন সাহেব এই বগিতে যাবেন। নূরুদ্দিন খোঁজ এনেছে। ভাবলাম, বিপদে পড়লে একটা কিছু করা যাবে। নূরুদ্দিনকে খান বাহাদুর সাহেব চিনতেন। তিনি রেলওয়ে বোর্ডের মেম্বারও ছিলেন। আমরা তাঁর গাড়ির পাশের সার্ভেন্ট ক্লাসে উঠে পড়লাম। মাখনকে বললাম, তুমি উপরে উঠে শুয়ে থাক। তোমাকে দেখলে ধরা পড়ব। এই সকল গাড়িতে বোধহয় কোনো রেলওয়ে কর্মচারী আসবে না। নূরুদ্দিনকে সামনে দিব যদি কেউ আসে। একবার এক চেকার সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কোন সাহেবের লোক"? নূরুদ্দিন ঝট করে উত্তর দিল, "মোমেন সাহেব কা"। ভদ্রলোক চলে গেলেন। কিছু কিছু ফলফলাদি নূরুদ্দিন কিনত, আমরা তিনজন খেতাম। ভাত বা রুটি খাবার পয়সা নাই। তিনজনে ভাত খেতে হলে তো এক পয়সাও থাকবে না।

কোনোমতে হাওড়া পৌঁছালাম, এখন উপায় কি? পরামর্শ করে ঠিক হল, মাখন টিকিট নিয়ে সকলের মালপত্র নিয়ে বের হয়ে যাবে। মালপত্র কোথাও রেখে তিনখানা প্লাটফর্ম টিকিট নিয়ে আবার ঢুকবে। আমরা একসাথে বের হয়ে যাব।

গাড়ি থামার সাথে সাথে মাখন নেমে গেল, আমরা দুইজন ময়লা জামা কাপড় পরে আছি। দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না যে আমরা দিল্লি থেকে আসতে পারি। চশমা খুলে লুকিয়ে রেখেছি। মাখন তিনখানা প্লাটফর্ম টিকিট নিয়ে ফিরে এসেছে। তখন প্যাসেঞ্জার প্রায়ই চলে গেছে। দুই চারজন আছে যাদের মালপত্র বেশি। তাদের পাশ দিয়ে আমরা দুইজন ঘুরছি। মাখন আমাদের প্লাটফর্ম টিকিট দিল, তিনজন একসঙ্গে বেরিয়ে গেলাম। তখন হিসাব করে দেখি, আমাদের কাছে এক টাকার মত আছে। আমরা বাসে উঠে হাওড়া থেকে বেকার হোস্টেলে ফিরে এলাম। না খেয়ে আমাদের অবস্থা কাহিল হয়ে গেছে।



সেই সময় হতে নূরুদ্দিনের সাথে আমাদের বন্ধুত্ব হয়। পরে আমাদের বন্ধুত্বের 'খেসারত' তাকে দিতে হয়েছে। ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে মার্শাল ল' জারি হওয়ার পরে কর্মীদের তাদের দুঃখ কষ্টের কথা অন্য কোনো নেতাদের কাছে বললে কানও দিত না। একমাত্র শহীদ সাহেবই দুঃখ কষ্ট সহানুভূতির সাথে শুনতেন এবং দরকার হলে সাহায্যও করতেন। নূরুদ্দিন পরে 'অল বেঙ্গল মুসলিম ছাত্রলীগে'র অস্থায়ী সাধারণ সম্পাদক হয়। আনোয়ার সাহেব যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়ে যাদবপুর হাসপাতালে ভর্তি হন। তাঁর যাবতীয় খরচ শহীদ সাহেব বহন করতেন।

১৯৪৪ সালে ছাত্রলীগের এক বাৎসরিক সম্মেলন হবে ঠিক হল। বহুদিন সম্মেলন হয় না। কলকাতায় আমার ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা কিছুটা ছিল—বিশেষ করে ইসলামিয়া কলেজে কেউ আমার বিরুদ্ধে কিছুই করতে সাহস পেত না। আমি সমানভাবে মুসলিম লীগ ও ছাত্রলীগে কাজ করতাম। কলকাতায় সম্মেলন হলে কেউ আমাদের দলের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারবে না। যাহোক, শহীদ সাহেব আনোয়ার সাহেবকেও ভালবাসতেন। আনোয়ার সাহেব অনেকটা সুস্থ হয়েছেন। ঢাকার ছাত্রলীগ ও আমাদের সাথের কেউ আনোয়ার সাহেবকে দেখতে পারত না। একমাত্র শাহ আজিজুর রহমান সাহেবই ঢাকায় আনোয়ার সাহেবের দলে ছিলেন।

শাহ সাহেব চমৎকার বক্তৃতা করতে পারতেন। বগুড়ায় তাঁকে আমি প্রথম দেখি। আনোয়ার সাহেব কলকাতা ও ঢাকায় কনফারেন্স করতে সাহস না পেয়ে কুষ্টিয়ায় শাহ আজিজুর রহমানের নিজের জেলায় বার্ষিক প্রাদেশিক সম্মেলন ডাকলেন। এই সময় আনোয়ার সাহেব ও নূরুদ্দিনের দলের মধ্যে ভীষণ গোলমাল শুরু হয়ে গেছে। আনোয়ার সাহেব আমার কাছে লোক পাঠালেন এবং অনুরোধ করলেন, তাঁর সাথে এক হয়ে কাজ করতে। তিনি আমাকে পদের লোভও দেখালেন। আমি বললাম, আমার পদের দরকার নাই, তবে সবার সাথে আলোচনা করা দরকার। নূরুদ্দিন সাহেবের দলও আমার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালায়। একপক্ষ আমাকে নিতেই হবে, কারণ আমার এমন শক্তি কলকাতা ছাড়া অন্য কোথাও ছিল না যে ইলেকশনে কিছু করতে পারব। ফজলুল কাদের চৌধুরী সাহেব লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে চট্টগ্রামে চলে গেছেন। জহির সাহেব ছাত্র আন্দোলন নিয়ে মাথা ঘামান না, মুসলিম লীগেরই কাজ করেন।

কলকাতায় যে সকল ছাত্র-কর্মী ছিল তারা প্রায়ই হাশিম সাহেবের কাছে যাওয়া-আসা করে। তাঁর কাছে যেয়ে ক্লাস করে, এইভাবে তাদের সাথে আমার বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। যে সমস্ত নিঃস্বার্থ কর্মী সে সময় কাজ করত তাদের মধ্যে নূরুদ্দিন, বর্ধমানের খন্দকার নূরুল আলম ও শরফুদ্দিন, সিলেটের মোয়াজ্জেম আহমদ চৌধুরী, খুলনার একরামুল হক, চট্টগ্রামের মাহাবুব আলম, নূরুদ্দিনের চাচাতো ভাই এস. এ. সালেহ অন্যতম ছিল। শেষ পর্যন্ত এদের সাথেই আমার মিল হল, কারণ আমরা সকলেই শহীদ সাহেব ও আবুল

হাশিম সাহেবের ভক্ত ছিলাম আনোয়ার সাহেবের দল হাশিম সাহেবকে দেখতে পারতেন না। কিন্তু শহীদ সাহেবের ভক্ত ছিলেন। শহীদ সাহেব অবস্থা বুঝে আমাদের দুই দলের নেতৃবৃন্দকে ডাকলেন একটা মিটমাট করাবার জন্য। শেষ পর্যন্ত মিটমাট হয় নাই। এই সময় শহীদ সাহেবের সাথে আমার কথা কাটাকাটি হয়। তিনি আনোয়ার সাহেবকে একটা পদ দিতে বলেন, আমি বললাম কখনোই হতে পারে না। সে প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোটারি করেছে, ভাল কর্মীদের জায়গা দেয় না। কোনো হিসাব-নিকাশও কোনোদিন দাখিল করে না। শহীদ সাহেব আমাকে হঠাৎ বলে বসলেন, "Who are you? You are nobody." আমি বললাম "If I am nobody, then why you have invited me? You have no right to insult me. I will prove that I am somebody. Thank you Sir. I will never come to you again." এ কথা বলে চিৎকার করতে করতে বৈঠক ছেড়ে বের হয়ে এলাম। আমার সাথে সাথে নূরুদ্দিন, একরাম, নূরুল আলমও উঠে দাঁড়াল এবং শহীদ সাহেবের কথার প্রতিবাদ করল। বর্তমান বুলবুল একাডেমির[১৩] সেক্রেটারি মাহমুদ নূরুল হুদা সাহেব শহীদ সাহেবের খুব ভক্ত ছিলেন। সকল সময় শহীদ সাহেবের কাছে থাকতেন। আমরা তাঁকে 'হুদা ভাই' বলে ডাকতাম। হুদা ভাইয়ের ব্যবহার ছিল চমৎকার। কারও কোনো বিপদ হলে, আর খবর পৌঁছে দিলে যত রাতই হোক না কেন হাজির হতেন। হুদা ভাই ঐ সময় উপস্থিত ছিলেন। আমি যখন বিখ্যাত ৪০ নম্বর থিয়েটার রোড থেকে রাগ হয়ে বেরিয়ে আসছিলাম শহীদ সাহেব হুদা ভাইকে বললেন, "ওকে ধরে আনো।" রাগে আমার চোখ দিয়ে পানি পড়ছিল। হুদা ভাই দৌড়ে এসে আমাকে ধরে ফেললেন। শহীদ সাহেবও দোতালা থেকে আমাকে ডাকছেন ফিরে আসতে। আমাকে হুদা ভাই ধরে আনলেন। বন্ধুবান্ধবরা বলল, "শহীদ সাহেব ডাকছেন, বেয়াদবি কর না, ফিরে এস।" উপরে এলাম। শহীদ সাহেব বললেন, "যাও তোমরা ইলেকশন কর, দেখ নিজেদের মধ্যে গোলমাল কর না।" আমাকে আদর করে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন। বললেন, "তুমি বোকা, আমি তো আর কাউকেই একথা বলি নাই, তোমাকে বেশি আদর ও স্নেহ করি বলে তোমাকেই বলেছি।" আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। তিনি যে সত্যিই আমাকে ভালবাসতেন ও স্নেহ করতেন, তার প্রমাণ আমি পেয়েছি তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার দিন পর্যন্ত। যখনই তাঁর কথা এই কারাগারে বসে ভাবি, সেকথা আজও মনে পড়ে। দীর্ঘ বিশ বৎসর পরেও একটুও এদিক ওদিক হয় নাই। সেইদিন থেকে আমার জীবনে প্রত্যেকটা দিনই তাঁর স্নেহ পেয়েছি। এই দীর্ঘদিন আমাকে তাঁর কাছ থেকে কেউই ছিনিয়ে নিতে পারে নাই এবং তাঁর স্নেহ থেকে কেউই আমাকে বঞ্চিত করতে পারে নাই।

শহীদ সাহেবের বাড়িতে দুই দল বসেও যখন আপোস হল না, তখন ইলেকশনে লড়তে হবে। ফজলুল কাদের চৌধুরী সাহেব চট্টগ্রাম জেলা মুসলিম লীগ, ছাত্রলীগ কর্মীদের সাহায্য নিয়ে দখল করতে সক্ষম হলেন। খান বাহাদুররা জেলা লীগ কনফারেন্সে পরাজিত হলেন। ১৯৪৩ সাল থেকে চট্টগ্রামের এই কর্মীদের সাথে আমার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে, আজ পর্যন্ত সে বন্ধুত্ব অটুট আছে। চট্টগ্রামের এম. এ. আজিজ, জহুর আহমদ চৌধুরী, আজিজুর

রহমান, ডা. সুলতান আহমেদ (এখন কুমিল্লায় আছেন), আবুল খায়ের চৌধুরী এবং আরও অনেকে ছাত্রলীগ ও মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠানে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। অনেকেই ছিটকে পড়েছেন। আজিজ ও জহুর আজও সক্রিয় রাজনীতি করছেন। জহুর শ্রমিক আন্দোলন করেন এবং সিটি আওয়ামী লীগের সভাপতি। এম. এ. আজিজ (এখন চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সম্পাদক) পাকিস্তান হওয়ার পরে অনেকবার ও অনেক দিন জেলে কষ্ট ভোগ করেছেন। ফজলুল কাদের চৌধুরী সাহেব তখন এদের নেতা ছিলেন। পরে তিনি মুসলিম লীগেই থেকে যান। আজিজ ও জহুর আওয়ামী লীগে চলে আসেন। চৌধুরী সাহেব খুবই স্বার্থপর হয়ে ওঠেন এবং একগুঁয়েমি করতেন, সেজন্য যারা তাঁকে চট্টগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, পরে তারা সকলেই তাঁকে ত্যাগ করেন।

চট্টগ্রামে টেলিগ্রাম করলাম কুষ্টিয়ায় ছাত্রলীগের প্রতিনিধি পাঠাতে। লোক পাঠালাম সমস্ত জেলায়। নূরুদ্দিন, একরাম, শরফুদ্দিন, খন্দকার নূরুল আলম, আমি ও আমার সহকর্মীরা রাতদিন কাজ করতে আরম্ভ করলাম। আমাদের অর্থের খুব অভাব, কারণ হাশিম সাহেবের টাকা পয়সা ছিল না। শহীদ সাহেব আমাদের সামান্য সাহায্য করেছিলেন। আমরা নিজেরা চাঁদা তুললাম এবং দলবল নিয়ে কুষ্টিয়া পৌঁছালাম। কিউ. জে. আজমিরী ও হামিদ আলী নামে দুইজন ভাল কর্মী ছিল। আজমিরী ভীষণ রাগী ছিল। কথায় কথায় মারপিট করে ফেলত, শক্তিও ছিল, সাহসও ছিল। আজমিরী হাশিম সাহেবের আত্মীয়। ফরিদপুর কুষ্টিয়ার কাছে। ফরিদপুরে ছাত্রদের দুই ভাগ ছিল। এক ভাগ আমার সাথে আর একভাগ মোহন মিয়া সাহেবের সমর্থক। মোহন মিয়া সাহেব আনোয়ার সাহেবকে সমর্থন করতেন। কুষ্টিয়ায় যখন আমরা পৌঁছালাম তখন দেখা গেল যত কাউন্সিলার এসেছে তার মধ্যে শতকরা সত্তরজন আমাদের সমর্থক। দুই দলের নেতৃবৃন্দের এক জায়গায় বসা হল, উদ্দেশ্য আপোস করা যায় কি না? বগুড়ার ফজলুল বারীকে (এখন পূর্ব বাংলার গভর্নর মোনেম খান সাহেবের মন্ত্রী হয়েছেন) সভাপতি করে আলোচনা চলল। কথায় কথায় ঝগড়া, তারপর মারামারি হল, শাহ সাহেব অনেক গুণ্ডা জোগাড় করে এনেছিলেন। আমরা বলেছিলাম, যদি গুণ্ডামি করা হয়, তবে কলকাতায় তাকে থাকতে হবে না। শেষ পর্যন্ত আপোস হল না। কুমিল্লার ছাত্রলীগ নেতারা আমাদের সাথেই ছিলেন। সকালে শোনা গেল তাঁরা আনোয়ার সাহেবের দলের সাথে মিশে গেছেন, কারণ তাঁদের তিনটা পদ দেয়া হয়েছে। রফিকুল হোসেনকে আমাদের দলই কলকাতা থেকে কাউন্সিলার করে। তিনি আমাদের সকল পরামর্শ সভায়ও যোগদান করতেন। শফিকুল ইসলামও বেকার হোস্টেলে থাকত। আমাদের সাথেই আনোয়ার সাহেবের দলের বিরুদ্ধে কাজ করত। আর আবদুল হাকিম সাহেব তো আমার ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন। তখন থেকেই একসাথে কাজ করেছি। সকালবেলা এরা দল ত্যাগ করল। তথাপি আমরা সংখ্যায় অনেক বেশি। কোনো ভয় নাই, আনোয়ার সাহেবের দল পরাজিত হবেই।

সিনেমা হলে কাউন্সিল অধিবেশন হবে। জনাব হামুদুর রহমান সাহেব (এখন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি) সভাপতির আসন গ্রহণ করবেন। তিনি এডহক কমিটির সদস্য

ছিলেন। অল ইন্ডিয়া মুসলিম ছাত্রলীগ ফেডারেশনের পক্ষ হতে তিনি সভাপতিত্ব করবেন এটা আমাদেরই দাবি ছিল। আমরা যখন হলে ঢুকলাম তখন দেখলাম অনেক বাইরের লোক হলে বসে আছে। আমরা সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। আমাদের পক্ষ থেকে একরামুল হক বৈধতার প্রশ্ন তুলল এবং দাবি করল, 'সকল প্রতিনিধি, হল থেকে বের হয়ে যাবে, দুইটা গেট খোলা থাকবে, দুই পক্ষ থেকে দুইজন করে চারজন প্রতিনিধি প্রত্যেকের কার্ড পরীক্ষা করে হলে আসতে দিবে।'

এই সময় হলের উপর তলার বারান্দায় বাইরের ছাত্ররা অনেক এসেছে, তারা দর্শক। একজন ছাত্র, হাফপ্যান্ট পরা চিৎকার করে বলছে, "আমি জানি এরা অনেকেই ছাত্র না, বাইরের লোক। শাহ আজিজ দল বড় করবার জন্য এদের এনেছে।" পরে খবর নিয়ে জানলাম, ছেলেটির নাম কামারুজ্জামান (পরে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সভাপতি এবং আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে পূর্ব বাংলা পরিষদের সদস্য হয়েছিল)। জনাব হামুদুর রহমান সাহেব আমাদের কথা মানলেন না, তিনি সভার কাজ শুরু করে দিলেন। যেখানে বিশজন ছাত্রকে কো-অপ্ট করা হবে কনফারেন্স শুরু হবার সময়, সেখানে তিনি ভোটে দিয়ে দিলেন। আমরা বাইরের লোকদের বের করে দিতে অনুরোধ করতে থাকলাম। ভীষণ চিৎকার শুরু হল, আমরা দেখলাম মারপিট হবার সম্ভাবনা আছে। কয়েকজন বসে পরামর্শ করে আমাদের সমর্থকদের নিয়ে সভা ত্যাগ করলাম প্রতিবাদ করে। আমরা ইচ্ছা করলে আর একটা প্রতিষ্ঠান করতে পারতাম। প্রায় সমস্ত জেলায়ই আমাদের সমর্থক ছিল। তা করব না ঠিক করলাম, তবে কলকাতায় এদের কোন সভা করতে দেব না। কলকাতা মুসলিম ছাত্রলীগের নামেই আমরা কাজ করে যেতে লাগলাম। অল বেঙ্গল নেতাদের কোনো স্থান ছিল না।

১৯৪৭ সাল পর্যন্ত আর কোন ইলেকশন এরা করে নাই। মুসলিম ছাত্রলীগ দুই দলে ভাগ হয়ে গেল, একদল পরিচিত হত শহীদ সাহেব ও হাশিম সাহেবের দল বলে, আরেক দল পরিচিত হত খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেব এবং মওলানা আকরম খাঁ সাহেবের দল বলে। আমরা মওলানা আকরম খাঁ সাহেবকে সকলেই শ্রদ্ধা ও ভক্তি করতাম। তাঁর বিরুদ্ধে আমাদের কিছুই বলার ছিল না।

এই সময় একটা আলোড়নের সৃষ্টি হল। হাশিম সাহেব শহীদ সাহেবের সাথে পরামর্শ করে মুসলিম লীগের একটা ড্রাফট ম্যানিফেস্টো বের করলেন। মুসলিম লীগ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং এর রাজনৈতিক দাবিও থাকবে, ভবিষ্যতে পাকিস্তান পেলে অর্থনৈতিক কাঠামো কি হবে তাও থাকতে হবে। জমিদারি প্রথা বিলোপসহ আরও অনেক কিছু এতে ছিল। ভীষণ হৈচৈ পড়ে গেল। আমরা যুবক, ছাত্র ও প্রগতিবাদীরা এটা নিয়ে ভীষণভাবে প্রপাগান্ডা শুরু করলাম। পাকিস্তান আমাদের আদায় করতে হবে এবং পাকিস্তান কায়েম হওয়ার পরে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামো কি হবে তার একটা সুস্পষ্ট রূপরেখা থাকা দরকার। হাশিম সাহেব আমাদের নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ক্লাস করতেন। ঢাকায় এসে কয়েকদিন থাকতেন এবং কর্মীদের নিয়ে আলোচনা সভা করতেন। কলকাতা লীগ অফিসে

তিনি থাকতেন, ঢাকার লীগ অফিসেও তিনি থাকতেন। কর্মীদের সাথে তিনি ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ রাখতেন। আমি তাঁর সাথে কয়েক জায়গায় সভা করতে গিয়েছি।

এই সময়কার একজন ছাত্রনেতার নাম উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে; কারণ, তিনি কোনো গ্রুপে ছিলেন না এবং অন্যায় সহ্য করতেন না। সত্যবাদী বলে সকলে তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। নেতাদের সকলেই তাঁকে স্নেহ করতেন। তাঁর নাম এখন সকলেই জানেন, জনাব আবু সাঈদ চৌধুরী বার এট ল'। এখন ঢাকা হাইকোর্টের জজ সাহেব। তিনি দুই গ্রুপের মধ্যে আপোস করতে চেষ্টা করতেন। শহীদ সাহেবও চৌধুরী সাহেবের কথার যথেষ্ট দাম দিতেন। জনাব আবদুল হাকিম এখন হাইকোর্টের জজ হয়েছেন। তিনি টেইলর হোস্টেলের সহ-সভাপতি ছিলেন, ছাত্র আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন। জজ মকসুমুল হাকিম সাহেব ছাত্রলীগের সাথে জড়িত ছিলেন না। বেকার হোস্টেলের প্রিমিয়ার হয়েছিলেন, ভাল ছাত্র ছিলেন, লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন।

এই সময় শহীদ নজীর আহমেদ নিহত হবার পরে ঢাকার ছাত্রদের নেতৃত্ব দিতেন জনাব শামসুল হক সাহেব, শামসুদ্দিন আহমেদ, নোয়াখালীর আজিজ আহমেদ ও খোন্দকার মোশতাক আহমদ এবং আরও অনেকে। এরা সকলেই শহীদ সাহেবের ভক্ত ছিলেন। পরে হাশিম সাহেবেরও ভক্ত হন। এরা সকলেই ছাত্র আন্দোলনের সাথে সাথে মুসলিম লীগ সংগঠনকে কোটারির হাত থেকে বাঁচাবার জন্য মুসলিম লীগের কাজে যোগদান করেছিলেন। ঢাকায় প্রাদেশিক লীগের একটা আঞ্চলিক শাখা অফিস হাশিম সাহেব খোলেন ১৫০ নম্বর মোগলটুলিতে। কমিউনিস্ট পার্টির মত হোলটাইম ওয়ার্কার হিসাবে এরা অনেকেই যোগদান করেন। শামসুল হক সাহেব এই অফিসের ভার নেন। আমরাও কলকাতা অফিসের হোলটাইম ওয়ার্কার হয়ে যাই। যদিও হোস্টেলে আমার রুম থাকত, তবু আমরা প্রায়ই লীগ অফিসে কাটাতাম। রাতে একটু লেখাপড়া করতাম। সময় সময় কলেজে পার্সেন্টেজ রাখতাম। পাকিস্তান না আনতে পারলে লেখাপড়া শিখে কি করব? আমাদের অনেকের মধ্যে এই মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছিল।

কলকাতার আহমেদ আলী পার্কে মুসলিম লীগ কাউন্সিল সভা হবে, তখন দুই পক্ষের মোকাবেলা হবে। আমরা হাশিম সাহেবকে জেনারেল সেক্রেটারি করব এবং ম্যানিফেস্টো পাস করাব। অন্য দল হাশিম সাহেবকে সেক্রেটারি হতে দেবে না। নেতাদের মধ্যে অনেকেই শহীদ সাহেবের সমর্থক ছিলেন। তারা শহীদ সাহেবকে সমর্থন করতেন কিন্তু হাশিম সাহেবকে দেখতে পারতেন না। শেষ পর্যন্ত মওলানা আকরম খাঁ সাহেব, শহীদ সাহেব ও খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেব বসে একটা প্যানেল ঠিক করলেন। হাশিম সাহেবই সেক্রেটারি থাকবেন তবে ম্যানিফেস্টো এবার পাস হবে না। একটা সাব-কমিটি করা হবে, তাদের রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা করে ম্যানিফেস্টো ঠিক হবে। আমার মনে হয়, ম্যানিফেস্টো সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্তই নেওয়া হয়েছিল। আর কি কি সিদ্ধান্ত হয়েছিল আমার ঠিক মনে নাই। যাহোক, শহীদ সাহেব বললেন, "এখন গোলমাল করার সময় নয়। পাকিস্তানের জন্য সংগ্রাম করতে হবে। নিজেদের মধ্যে গোলমাল হলে পাকিস্তান দাবির সংগ্রাম পিছিয়ে যাবে।"



এই সময় বাংলায় মুসলিম লীগ সরকারের পতন হয়। গভর্নর শাসন ক্ষমতা নিজের হাতে নেন। শহীদ সাহেব দেখলেন যুদ্ধের সময় অধিক লাভের আশায় ব্যবসায়ীরা কালো বাজারে কাপড় বিক্রি করার জন্য গুদামজাত করতে শুরু করছে। একদিকে খাদ্য সমস্যা ভয়াবহ, শহীদ সাহেব রাতদিন পরিশ্রম করছেন, আর একদিকে অসাধু ব্যবসায়ীরা জনগণের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে শুরু করেছে। শহীদ সাহেব সমস্ত কর্মচারীদের হুকুম দিলেন, মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীদের আড্ডাখানা বড়বাজার ঘেরাও করতে। সমস্ত বড়বাজার ঘেরাও করা হল। হাজার হাজার গজ কাপড় ধরা পড়ল, এমনকি দালানগুলির নিচেও এক একটা গুদাম করে রেখেছিল তাও বাদ গেল না। এমনি করে সমস্ত শহরে চাউল গুদামজাতকারীদের ধরবার জন্য একইভাবে তল্লাশি শুরু করলেন। মাড়োয়ারিরাও কম পাত্র ছিল না। কয়েক লক্ষ টাকা তুলে লীগ মন্ত্রিসভাকে খতম করার জন্য কয়েকজন এমএলএকে কিনে ফেলল। ফলে এক ভোটে লীগ মন্ত্রিত্বকে পরাজয়বরণ করতে হল। যদিও এটা অনাস্থা প্রস্তাব ছিল না। খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেব চ্যালেঞ্জ দিলেন এই কথা বলে যে, আগামীকাল আমি আস্থা ভোট নেব, যদি আস্থা ভোট না পাই তবে পদত্যাগ করব। স্পিকার ছিলেন নওশের আলী সাহেব। পরের দিন তিনি এ ব্যাপারে রুলিং দিলেন, মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাস হয়ে গেছে, আর আস্থা ভোটের দরকার নাই।

আমি কিছু সংখ্যক ছাত্র নিয়ে সেখানে উপস্থিত ছিলাম। খবর যখন রটে গেল লীগ মন্ত্রিত্ব নাই, তখন দেখি টুপি ও পাগড়ি পরা মাড়োয়ারিরা বাজি পোড়াতে শুরু করেছে এবং হৈচৈ করতে আরম্ভ করেছে। সহ্য করতে না পেরে, আরও অনেক কর্মী ছিল, মাড়োয়ারিদের খুব মারপিট করলাম, ওরা তাগতে শুরু করল। জনাব মোহাম্মদ আলী বাইরে এসে আমাকে ধরে ফেললেন এবং সকলকে বুঝাতে চেষ্টা করলেন। হিন্দু নেতারাও বাইরে এসে প্রতিবাদ করল। যাহোক, কিছু সময়ের মধ্যে সব শান্ত হয়ে গেল, আমরা ফিরে এলাম। এই সময় বোধহয় দেড় বছরের মত মুসলিম লীগ শাসন করে, যদিও গভর্নরই সর্বময় ক্ষমতার মালিক ছিলেন। আমি নিজে জানি, শহীদ সাহেব কলকাতা ক্লাবের সদস্য ছিলেন। রাতে একবার দুই এক ঘণ্টার জন্য কলকাতায় থাকলে ক্লাবে যেতেন, কিন্তু যেদিন তিনি সিভিল সাপ্লাইয়ের মন্ত্রী হন, তারপর থেকে এক মুহূর্তও সময় পান নাই কলকাতা ক্লাবে যেতে। রাত বারটা পর্যন্ত তিনি অফিস করতেন। আমি ও নূরুদ্দিন রাত বারটার পরেই শহীদ সাহেবের সাথে দেখা করতে এবং রাজনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করতে প্রায়ই তাঁর বাড়িতে যেতাম। কারণ, দিনেরবেলায় তিনি সময় পেতেন না। তিনি আমাদের এই সময়ের কথা বলে দিয়েছিলেন।

এর পূর্বে আমার ধারণা ছিল না যে, এমএলএরা এইভাবে টাকা নিতে পারে। এরাই দেশের ও জনগণের প্রতিনিধি! আমার মনে আছে, আমাদের উপর ভার পড়ল কয়েকজন এমএলএকে পাহারা দেবার, যাতে তারা দল ত্যাগ করে অন্য দলে না যেতে পারে। আমি তাদের নাম বলতে চাই না, কারণ অনেকেই মৃত্যুবরণ করেছেন। একজন এমএলএকে

মুসলিম লীগ অফিসে আটকানো হল। তিনি বার বার চেষ্টা করেন বাইরে যেতে, কিন্তু আমাদের জন্য পারছেন না। কিছু সময় পরে বললেন, "আমাকে বাইরে যেতে দিন, কোনো ভয় নাই। বিরোধী দল টাকা দিতেছে, যদি কিছু টাকা নিয়ে আসতে পারি আপনাদের ক্ষতি কি? ভোট আমি মুসলিম লীগের পক্ষেই দিব।" আশ্চর্য হয়ে চেয়ে রইলাম তাঁর দিকে। বৃদ্ধ লোক, সুন্দর চেহারা, লেখাপড়া কিছু জানেন, কেমন করে এই কথা বলতে পারলেন আমাদের কাছে? টাকা নেবেন একদল থেকে অন্য দলের সভ্য হয়ে, আবার টাকা এনে ভোটও দেবেন না। কতটা অধঃপতন হতে পারে আমাদের সমাজের! এই ভদ্রলোককে একবার রাস্তা থেকে আমাদের ধরে আনতে হয়েছিল। শুধু সুযোগ খুঁজছিলেন কেমন করে অন্য দলের কাছে যাবেন।

এই সময় ফজলুর রহমান সাহেব আমাকে ডাকলেন, তিনি চিফ হুইপ ছিলেন। আমাকে বললেন, "আপনাকে এই বারটার সময় আসাম-বেঙ্গল ট্রেনে রংপুর যেতে হবে। মুসলিম লীগের একজন এমএলএ, যিনি 'খান বাহাদুর'ও ছিলেন তাঁকে নিয়ে আসতে হবে। টেলিগ্রাম করেছি, লোকও পাঠিয়েছি, তবু আসছেন না, আপনি না গেলে অন্য কেউই আনতে পারবে না। শহীদ সাহেব আপনাকে যেতে বলেছেন। আপনার জন্য টিকিট করা আছে।" কয়েকখানা চিঠি দিলেন। আমি বেকার হোস্টেলে এসে একটা হাত ব্যাগে কয়েকটা কাপড় নিয়ে সোজা স্টেশনে চলে আসলাম। খাওয়ার সময় পেলাম না। যুদ্ধের সময় কোথাও খাবার পাওয়াও কষ্টকর। ট্রেন চেপে বসলাম। তখন ট্রেনের কোন সময়ও ঠিক ছিল না, মিলিটারিদের ইচ্ছামত চলত। রাত আটটায় রংপুর পৌঁছাব এটা ছিল ঠিক সময়, কিন্তু পৌঁছালাম রাত একটায়। পথে কিছু খেতেও পারি নাই, ভীষণ ভিড়। এর পূর্বে রংপুরে আমি কোনোদিন যাই নাই। শুনলাম স্টেশন থেকে শহর তিন মাইল দূরে। অনেক কষ্ট করে একটা রিকশা জোগাড় করা গেল। রিকশাওয়ালা খান বাহাদুর সাহেবের বাড়ি চিনে, আমাকে ঠিকই পৌঁছে দিল। আমি অনেক ডাকাডাকি করে তাঁকে তুললাম, চিঠি দিলাম। তিনি আমাকে জানেন। বললেন, "আগামীকাল আমি যাব। আজ ভোর পাঁচটায় যে ট্রেন আছে সে ট্রেনে যেতে পারব না।" আমি বললাম, "তাহলে আপনি চিঠি দিয়ে দেন, আমি ভোর পাঁচটার ট্রেনেই ফিরে যেতে চাই।" তিনি বললেন, "সেই ভাল হয়।" আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন না কিছু খাব কি না, পথে খেয়েছি কি না। বললেন, "এখন তো রাত তিনটা বাজে, বিছানার কি দরকার হবে?" বললাম, "দরকার নাই, যে সময়টা আছে বসেই কাটিয়ে দিব। ঘুমালে আর উঠতে পারব না খুবই ক্লান্ত।" একদিকে পেট টনটন করছে, অন্যদিকে অচেনা রংপুরের মশা। গতরাতে কলকাতায় বেকার হোস্টেলে ভাত খেয়েছি। বললাম, এক গ্লাস পানি পাঠিয়ে দিলে ভাল হয়। তিনি তার বাড়ির পাশেই কোথাও রিকশাওয়ালারা থাকে, তার একজনকে ডেকে বললেন, আমাকে যেন পাঁচটার ট্রেনে দিয়ে আসে। আমি চলে এলাম সকালের ট্রেনে।

কলকাতায় পৌঁছালাম আরেক সন্ধ্যায়। রাস্তায় চা বিস্কুট কিছু খেয়ে নিয়েছিলাম। রাতে আবার হোস্টেলে এসে ভাত খাই। ভীষণ কষ্ট পেয়েছি, ক্ষেপেও গিয়েছি। ফজলুর

রহমান সাহেবকে বললাম, "আর কোনোদিন এই সমস্ত লোকদের কাছে যেতে বলবেন না।"

একদিন পরে তিনি এসেছিলেন। তাঁকে পাহারা দেয়ার জন্য লোক রাখা হয়েছিল। তবু পিছনের দরজা দিয়ে এক ফাঁকে তিনি পালিয়ে গিয়েছিলেন। খোঁজাখুঁজি করেও তাঁকে আর পাওয়া যায় নাই। আমরা ছাত্র ছিলাম, দেশকে ভালবাসতাম, দেশের জন্য কাজ করতাম, এই সকল জঘন্য নীচতা এই প্রথম দেখলাম, পরে যদিও অনেক দেখেছি, কিন্তু এই প্রথমবার। এই সমস্ত খান বাহাদুরদের দ্বারা পাকিস্তান আসবে, দেশ স্বাধীন হবে, ইংরেজকে তাড়ানোও যাবে, বিশ্বাস করতে কেন যেন কষ্ট হত! মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠান পূর্বে ছিল খান সাহেব, খান বাহাদুর ও ব্রিটিশ খেতাবধারীদের হাতে, আর এদের সাথে ছিল জমিদার, জোতদার শ্রেণীর লোকেরা। এদের দ্বারা কোনোদিন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হত না। শহীদ সাহেব ও হাশিম সাহেব যদি বাংলার যুবক ও ছাত্রদের মধ্যে মুসলিম লীগকে জনপ্রিয় না করতে পারতেন এবং বুদ্ধিজীবী শ্রেণীকে টেনে আনতে না পারতেন, তাহলে কোনোদিনও পাকিস্তান আন্দোলন বাংলার কৃষকদের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারত না। যদিও এই সমস্ত নেতাদের আমরা একটু বাধা দিতে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করতে পারি নাই। যার ফলে পাকিস্তান হওয়ার সাথে সাথেই এই খান বাহাদুর ও ব্রিটিশ খেতাবধারীরা তৎপর হয়ে উঠে ক্ষমতা দখল করে ফেলল। কি কারণে এমন ঘটল তা পরবর্তী ঘটনায় পরিষ্কার হয়ে যাবে।

⁂

শহীদ সাহেব মন্ত্রিত্ব চলে যাওয়ার পরে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠানের দিকে মন দিলেন। যুদ্ধের প্রথম ধাক্কা সামলিয়ে ইংরেজ যুদ্ধের গতির পরিবর্তন করে ফেলল। এই সময় কংগ্রেস 'ভারত ত্যাগ কর আন্দোলন' ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল। পাকিস্তান আন্দোলনকেও শহীদ সাহেব এবং হাশিম সাহেব জনগণের আন্দোলনে পরিণত করতে পেরেছিলেন। ইংরেজের সাথেও আমাদের লড়তে হবে, এই শিক্ষাও হাশিম সাহেব আমাদের দিচ্ছিলেন। আমাদেরও ইংরেজের বিরুদ্ধে একটা জাত ক্রোধ ছিল। হিটলারের ফ্যাসিস্ট নীতি আমরা সমর্থন করতাম না, তথাপি যেন ইংরেজের পরাজিত হওয়ার খবর পেলেই একটু আনন্দ লাগত। এই সময় নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করে ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলমান সৈন্যদের দলে নিয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছেন। মনে হত, ইংরেজের থেকে জাপানই বোধহয় আমাদের আপন। আবার ভাবতাম, ইংরেজ যেয়ে জাপান আসলে স্বাধীনতা কোনোদিনই দিবে না। জাপানের চীন আক্রমণ আমাদের ব্যথাই দিয়েছিল। মাঝে মাঝে সিঙ্গাপুর থেকে সুভাষ বাবুর বক্তৃতা শুনে চঞ্চল হয়ে উঠতাম। মনে হত, সুভাষ বাবু একবার বাংলাদেশে আসতে পারলে ইংরেজকে তাড়ান সহজ হবে। আবার মনে হত, সুভাষ বাবু আসলে তো পাকিস্তান হবে না। পাকিস্তান না হলে দশ কোটি

মুসলমানের কি হবে? আবার মনে হত, যে নেতা দেশ ত্যাগ করে দেশের স্বাধীনতার জন্য সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে পারেন তিনি কোনোদিন সাম্প্রদায়িক হতে পারেন না। মনে মনে সুভাষ বাবুকে তাই শ্রদ্ধা করতাম।

অখণ্ড ভারতে যে মুসলমানদের অস্তিত্ব থাকবে না এটা আমি মন প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করতাম। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হিন্দু নেতারা ক্ষেপে গেছেন কেন? ভারতবর্ষেও মুসলমান থাকবে এবং পাকিস্তানেও হিন্দুরা থাকবে। সকলেই সমান অধিকার পাবে। পাকিস্তানের হিন্দুরাও স্বাধীন নাগরিক হিসাবে বাস করবে। ভারতবর্ষের মুসলমানরাও সমান অধিকার পাবে। পাকিস্তানের মুসলমানরা যেমন হিন্দুদের ভাই হিসাবে গ্রহণ করবে, ভারতবর্ষের হিন্দুরাও মুসলমানদের ভাই হিসাবে গ্রহণ করবে। এই সময় আমাদের বক্তৃতার ধারাও বদলে গেছে। অনেক সময় হিন্দু বন্ধুদের সাথে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এ নিয়ে আলোচনা হত। কিছুতেই তারা বুঝতে চাইত না। ১৯৪৪-৪৫ সালে ট্রেনে, স্টিমারে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে তুমুল তর্ক-বিতর্ক হত। সময় সময় এমন পর্যায়ে আসত যে, মুখ থেকে হাতের ব্যবহার হবার উপক্রম হয়ে উঠত। এখন আর মুসলমান ছেলেদের মধ্যে মতবিরোধ নাই। পাকিস্তান আনতে হবে এই একটাই স্লোগান সকল জায়গায়।

একদিন হক সাহেব আমাদের ইসলামিয়া কলেজের কয়েকজন ছাত্র প্রতিনিধিকে খাওয়ার দাওয়াত করলেন। দাওয়াত নিব কি নিব না এই নিয়ে দুই দল হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত আমি বললাম, "কেন যাব না, নিশ্চয়ই যাব। হক সাহেবকে অনুরোধ করব মুসলিম লীগে ফিরে আসতে। আমাদের আদর্শ যদি এত হালকা হয় যে, তাঁর কাছে গেলেই আমরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে চলে যাব, তাহলে সে পাকিস্তান আন্দোলন আমাদের না করাই উচিত।" আমি খুলনার একরামুল হককে সাথে নিলাম, যদিও সে ইসলামিয়ায় পড়ে না। তথাপি তার একটা প্রভাব আছে। আমাকে সে মিয়াভাই বলত। আমরা ছয়-সাতজন গিয়েছিলাম। শেরে বাংলা আমাদের নিয়ে খেতে বসলেন এবং বললেন, "আমি কি লীগ ত্যাগ করেছি, না, আমাকে বের করে দেয়া হয়েছে? জিন্নাহ সাহেব আমাকে ও আমার জনপ্রিয়তাকে সহ্য করতে পারেন না। আমি বাঙালি মুসলমানদের জন্য যা করেছি জিন্নাহ সাহেব সারা জীবনে তা করতে পারবেন না। বাঙালিদের স্থান কোথাও নাই, আমাকে বাদ দিয়ে নাজিমুদ্দীনকে নেতা করার ষড়যন্ত্র।" আমরাও আমাদের মতামত বললাম। একরামুল হক বলল "স্যার, আপনি মুসলিম লীগে থাকলে আর পাকিস্তান সমর্থন করলে আমরা বাংলার ছাত্ররা আপনার সাথে না থেকে অন্য কারও সাথে থাকতে পারি না। 'পাকিস্তান' না হলে মুসলমানদের কি হবে?" শেরে বাংলা বলেছিলেন, "১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব কে করেছিল, আমিই তো করেছিলাম! জিন্নাহকে চিনত কে?" আমরা তাঁকে আবার অনুরোধ করে সালাম করে চলে আসলাম। আরও অনেক আলাপ হয়েছিল, আমার ঠিক মনে নাই। তবে যেটুকু মনে আছে সেটুকু বললাম। তাঁর সঙ্গে স্কুল জীবনে একবার ১৯৩৮ সালে দেখা হয়েছিল ও সামান্য কথা হয়েছিল গোপালগঞ্জে। আজ শেরে বাংলার সামনে বসে আলাপ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

এদিকে মুসলিম লীগ অফিসে ও শহীদ সাহেবের কানে পৌঁছে গিয়েছে আমরা শেরে বাংলার বাড়িতে যাওয়া-আসা করি। তাঁর দলে চলে যেতে পারি। কয়েকদিন পরে যখন আমি শহীদ সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যাই তিনি হাসতে হাসতে বললেন, "কি হে, আজকাল খুব হক সাহেবের বাড়িতে যাও, খানাপিনা কর?" বললাম, "একবার গিয়েছি জীবনে।" তাঁকে সমস্ত ঘটনা বললাম। তিনি বললেন, "ভালই করছ, তিনি যখন ডেকেছেন কেন যাবে না?" আরও বললাম, "আমরা তাঁকে অনুরোধ করেছি মুসলিম লীগে আসতে।" শহীদ সাহেব বললেন, "ভালই তো হত যদি তিনি আসতেন। কিন্তু আসবেন না, আর আসতে দিবেও না। তাঁর সাথে কয়েকজন লোক আছে, তিনি আসলে সেই লোকগুলির জায়গা হবে না কোথাও। তাই তাঁকে মুসলিম লীগের বাইরে রাখতে চেষ্টা করছে।"

শহীদ সাহেব ছিলেন উদার, কোন সংকীর্ণতার স্থান ছিল না তাঁর কাছে। কিন্তু অন্য নেতারা কয়েকদিন খুব হাসি তামাশা করেছেন আমাদের সাথে। আমি খুব রাগী ও একগুঁয়ে ছিলাম, কিছু বললে কড়া কথা বলে দিতাম। কারও বেশি ধার ধারতাম না। আমাকে যে কাজ দেওয়া হত আমি নিষ্ঠার সাথে সে কাজ করতাম। কোনোদিন ফাঁকি দিতাম না। ভীষণভাবে পরিশ্রম করতে পারতাম। সেইজন্য আমি কড়া কথা বললেও কেউ আমাকে কিছুই বলত না। ছাত্রদের আপদে-বিপদে আমি তাদের পাশে দাঁড়াতাম। কোন ছাত্রের কি অসুবিধা হচ্ছে, কোন ছাত্র হোস্টেলে জায়গা পায় না, কার ফ্রি সিট দরকার, আমাকে বললেই প্রিন্সিপাল ড. জুবেরী সাহেবের কাছে হাজির হতাম। আমি অন্যায় আবদার করতাম না। তাই শিক্ষকরা আমার কথা শুনতেন। ছাত্ররাও আমাকে ভালবাসত। হোস্টেল সুপারিনটেনডেন্ট সাইদুর রহমান সাহেব জানতেন, আমার অনেক অতিথি আসত। বিভিন্ন জেলার ছাত্রনেতারা আসলে কোথায় রাখব, একজন না একজন ছাত্র আমার সিটে থাকতই। কারণ, সিট না পাওয়া পর্যন্ত আমার রুমই তাদের জন্য ফ্রি রুম। একদিন বললাম, "স্যার, কোনো ছাত্র রোগগ্রস্ত হলে যে কামরায় থাকে, সেই কামরাটা আমাকে দিয়ে দেন। সেটা অনেক বড় কামরা দশ-পনেরজন লোক থাকতে পারে।" বড় কামরাটায় একটা বিজলি পাখাও ছিল। নিজের কামরাটা তো থাকলই। তিনি বললেন, "ঠিক আছে, দখল করে নাও। কোনো ছাত্র যেন নালিশ না করে।" বললাম, "কেউই কিছু বলবে না। দু'একজন আমার বিরুদ্ধে থাকলেও সাহস পাবে না।"

বেকার হোস্টেলে কতগুলি ফ্রি রুম ছিল, গরিব ছাত্রদের জন্য। তখনকার দিনে সত্যিকার যার প্রয়োজন তাকেই তা দেওয়া হত। আজকালকার মত টেলিফোনে দলীয় ছাত্রদের রুম দেওয়ার জন্য অনুরোধ আসত না। ইসলামিয়া কলেজে গরিব ছেলেদের সাহায্য করবার জন্য একটা ফান্ড ছিল। সেই ফান্ড দেখাশোনা করার ভার ছিল বিজ্ঞানের শিক্ষক নারায়ণ বাবুর। আমি আর্টসের ছাত্র ছিলাম, তবু নারায়ণ বাবু আমাকে খুব ভালবাসতেন। তিনি যদিও জানতেন, আমি প্রায় সকল সময়ই 'পাকিস্তান, পাকিস্তান' করে বেড়াই। ইসলামিয়া কলেজের সকল ছাত্রই মুসলমান। একজন হিন্দু শিক্ষককে সকলে এই কাজের ভার দিত কেন? কারণ, তিনি সত্যিকারের একজন শিক্ষক ছিলেন। হিন্দুও

না, মুসলমানও না। যে টাকা ছাত্রদের কাছ থেকে উঠত এবং সরকার যা দিত, তা ছাড়াও তিনি অনেক দানশীল হিন্দু-মুসলমানদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে জমা করতেন এবং ছাত্রদের সাহায্য করতেন। এই রকম সহানুভূতিপরায়ণ শিক্ষক আমার চোখে খুব কমই পড়েছে।

এই সময় আমি বাধ্য হয়ে কিছুদিনের জন্য ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হই। অনেক চেষ্টা করেও দুই গ্রুপের মধ্যে আপোস করতে পারলাম না। দুই গ্রুপই অনুরোধ করল, আমাকে সাধারণ সম্পাদক হতে, নতুবা তাদের ইলেকশন করতে দেওয়া হোক। পূর্বের দুই বৎসর নির্বাচন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় করেছি। ইলেকশন আবার শুরু হলে আর বন্ধ করা যাবে না। মিছামিছি গোলমাল, লেখাপড়া নষ্ট, টাকা খরচ হতে থাকবে। আমি বাধ্য হয়ে রাজি হলাম এবং বলে দিলাম তিন মাসের বেশি আমি থাকব না। কারণ, পাকিস্তান ইস্যুর ওপর ইলেকশন আসছে, আমাকে বাইরে বাইরে কাজ করতে হবে। কলেজে আসতেও সময় পাব না। আমি তিন মাসের মধ্যেই পদত্যাগপত্র দিয়ে আরেকজনকে সাধারণ সম্পাদক করে দেই।

১৯৪৫ সালের গোড়ার থেকেই ইলেকশনের তোড়জোড় শুরু হয়েছে। ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে ইলেকশন হবে, সমস্ত ভারতবর্ষব্যাপী মুসলমানরা 'পাকিস্তান' চায় কি চায় না তা নির্ধারণ করতে। কারণ, কংগ্রেস দাবি করে যে, তারা হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করেন। নজির হিসাবে তারা বলেন, মওলানা আবুল কালাম আজাদ কংগ্রেসের সভাপতি। একথা সত্য যে, কয়েকজন খ্যাতনামা মুসলমান নেতা তখন পর্যন্ত কংগ্রেসে ছিলেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল যে, ভারতবর্ষ এক থাকলে দশ কোটি মুসলমানের উপর হিন্দুরা অত্যাচার করতে সাহস পাবে না। তাছাড়া কতগুলি প্রদেশে মুসলমান সংখ্যাগুরু আছে। আর যদি পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান দুইটা রাষ্ট্র হয়, তবে হিন্দুস্থানে যে সমস্ত মুসলমানরা থাকবে তাদের অস্তিত্ব থাকবে না। অন্যদিকে মুসলিম লীগের বক্তব্য পরিষ্কার, পাকিস্তানের হিন্দুরাও সমান নাগরিক অধিকার পাবে। আর হিন্দুস্থানের মুসলমানরা সমান নাগরিক অধিকার পাবে। লাহোর প্রস্তাবে একথা পরিষ্কার করে লেখা আছে।

লাহোর প্রস্তাব: ২৩ মার্চ ১৯৪০

1. While approving and endorsing the action taken by the Council and the Working Committee of the All-India Muslim League as indicated in their resolutions dated the 27th of August, 17th & 18th of September and 22nd of October 1939, and 3rd of February 1940 on the constitutional issue, this session

of the All-India Muslim League emphatically reiterates that the scheme of Federation embodied in the Government of India Act, 1935 is totally unsuited to and unworkable in the peculiar conditions of this country and is altogether unacceptable to Muslims of India.

2. It further records its emphatic view that while the declaration dated the 18th of October 1939, made by the Viceroy on behalf of His Majesty's Government is reassuring in so far as it declares that the policy and plan on which the Government of India Act 1935, is based will be reconsidered in consultation with the various parties, interests and communities in India, Muslims India will not be satisfied unless the whole constitutional plan is reconsidered de novo, and that no revised plan would be acceptable to the Muslims unless it is framed with their approval and consent.

3. Resolved that it is the considered view of this session of the All-India Muslim League that no constitutional plan would be workable in the country or acceptable to the Muslims unless it is designed on the following basic principles, viz, that geographically contiguous units are demarcated into regions which should be so constituted with such territorial readjustments as may be necessary that the areas in which the Muslims are numerically in a majority as in the north-western and eastern zones of India should be grouped to constitute 'independent states' in which the constituent units shall be autonomous and sovereign.

4. That adequate, effective and mandatory safeguards should be specifically provided in the constitution for the minorities in the units and in the regions for the protection of their religious, cultural, economic, political, administrative and other rights and interests in consultation with them.

5. This session further authorises the Working Committee to frame a scheme of constitution in accordance with these basic principles, providing for the assumption finally by the respective region of all powers such as defence, external affairs, communications, customs and such others matters as may be necessary.



দৈনিক *আজাদই* ছিল একমাত্র বাংলা খবরের কাগজ, যা মুসলিম লীগ ও পাকিস্তান আন্দোলনকে সমর্থন করত। এই কাগজের প্রতিষ্ঠাতা ও মালিক মওলানা আকরম খাঁ সাহেব ছিলেন বাংলা প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি। তিনি আবুল হাশিম সাহেবকে দেখতে পারতেন না। আবুল হাশিম সাহেবকে শহীদ সাহেব সমর্থন করতেন বলে মওলানা সাহেব তাঁর উপর ক্ষেপে গিয়েছিলেন। আমাদেরও ঐ একই দশা। তাই আমাদের কোনো সংবাদ সহজে ছাপা হত না। মাঝে মাঝে জনাব মোহাম্মদ মোদাব্বের সাহেবের মারফতে কিছু সংবাদ উঠত। পরে সিরাজুদ্দিন হোসেন (বর্তমানে দৈনিক *ইত্তেফাক*-এর বার্তা সম্পাদক) এবং আরও দু'একজন বন্ধু আজাদ অফিসে চাকরি করত। তারা ফাঁকে ফাঁকে দুই একটা সংবাদ ছাপাত। দৈনিক *মর্নিং নিউজের* কথা বাদই দিলাম। ঐ পত্রিকা যদিও পাকিস্তান আন্দোলনকে পুরাপুরি সমর্থন করত, তবুও ওটা একটা গোষ্ঠীর সম্পত্তি ছিল, যাদের শোষক শ্রেণী বলা যায়। আমাদের সংবাদ দিতেই চাইত না। ঐ পত্রিকা হাশিম সাহেবকে মোটেই পছন্দ করত না। ছাত্র ও লীগ কর্মীরা হাশিম সাহেবকে সমর্থন করত, তাই বাধ্য হয়ে মাঝে মাঝে সংবাদ দিত। আমরা বুঝতে পারলাম, অন্ততপক্ষে একটা সাপ্তাহিক খবরের কাগজ হলেও আমাদের বের করতে হবে, বিশেষ করে কর্মীদের মধ্যে নতুন ভাবধারার প্রচার করার জন্য। হাশিম সাহেবের পক্ষে কাগজ বের করা কষ্টকর। কারণ টাকা পয়সার অভাব। শহীদ সাহেব হাইকোর্টে ওকালতি করতে শুরু করেছেন। তিনি যথেষ্ট উপার্জন করতেন, ভাল ব্যারিস্টার হিসাবে কলকাতায় নামও ছিল। কলকাতায় গরিবরাও যেমন শহীদ সাহেবকে ভালবাসতেন, মুসলমান ধনীক শ্রেণীকেও শহীদ সাহেব যা বলতেন, শুনত। টাকা পয়সার দরকার হলে কোনোদিন অসুবিধা হতে দেখি নাই। হাশিম সাহেব শহীদ সাহেবের কাছে প্রস্তাব করলেন কাগজটা প্রকাশ করতে এবং বললেন যে, একবার যে খরচ লাগে তা পেলে পরে আর জোগাড় করতে অসুবিধা হবে না। নুরুদ্দিন ও আমি এই দুইজনই শহীদ সাহেবকে রাজি করতে পারব, এই ধারণা অনেকেরই ছিল।

আমরা দুইজন একদিন সময় ঠিক করে তাঁর সাথে দেখা করতে যাই এবং বুঝিয়ে বলি বেশি টাকা লাগবে না, কারণ সাপ্তাহিক কাগজ। আমাদের মধ্যে ভাল ভাল লেখার হাত আছে, যারা সামান্য হাত খরচ পেলেই কাজ করবে। অনেককে কিছু না দিলেও চলবে। আরও দু'একবার দেখা করার পরে শহীদ সাহেব রাজি হলেন।

মুসলিম লীগ অফিসের নিচের তলায় অনেক খালি ঘর ছিল। তাই জায়গার অসুবিধা হবে না। হাশিম সাহেব নিজেই সম্পাদক হলেন এবং কাগজ বের হল। আমরা অনেক কর্মীই রাস্তায় হকারী করে কাগজ বিক্রি করতে শুরু করলাম। কাজী মোহাম্মদ ইদ্রিস সাহেবই কাগজের লেখাপড়ার ভার নিলেন। সাংবাদিক হিসাবে তাঁর যথেষ্ট নাম ছিল। ব্যবহারও অমায়িক ছিল। সমস্ত বাংলাদেশেই আমাদের প্রতিনিধি ছিল। তারা কাগজ চালাতে শুরু করল। বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের কাছে কাগজটা খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করতে লাগল। হিন্দুদের মধ্যেও অনেকে কাগজটা পড়তেন। এর নাম ছিল 'মিল্লাত'।

হাশিম সাহেবের গ্রুপকে অন্য দল কমিউনিস্ট বলতে শুরু করল, কিন্তু হাশিম সাহেব ছিলেন মওলানা আজাদ সোবহানীর একজন ভক্ত। তিনি বিখ্যাত ফিলোসফার ছিলেন। মওলানা আজাদ সোবহানী সাহেবকে হাশিম সাহেব আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন কলকাতায়। আমাদের নিয়ে তিনি ক্লাস করেছিলেন। আমার সহকর্মীরা অধিক রাত পর্যন্ত তাঁর আলোচনা শুনতেন। আমার পক্ষে ধৈর্য ধরে বসে থাকা কষ্টকর। কিছু সময় যোগদান করেই ভাগতাম। আমি আমার বন্ধুদের বলতাম, "তোমরা পণ্ডিত হও, আমার অনেক কাজ। আগে পাকিস্তান আনতে দাও, তারপরে বসে বসে আলোচনা করা যাবে।" হাশিম সাহেব তখন চোখে খুব কম দেখতেন বলে রক্ষা। আমি পিছন থেকে ভাগতাম, তিনি কিন্তু বুঝতে পারতেন! পরের দিন দেখা করতে গেলেই জিজ্ঞাসা করতেন, "কি হে, তুমি তো গতরাতে চলে গিয়েছিলে।" আমি উত্তর দিতাম, "কি করব, অনেক কাজ ছিল।" কাজ তো থাকতই ছাত্রদের সাথে, দল তো ঠিক রাখতে হবে।

✲

ইলেকশনের দিন ঘোষণা হয়ে গেছে। মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ড গঠন হবে। কাউন্সিল সভা ডাকা হল, কলকাতা মুসলিম ইনস্টিটিউটে। মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ডে নয়জন সদস্য থাকবে। তার মধ্যে দুইজন এক্স-অফিসিও, আর মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি পার্টি থেকে একজন, আর একজন এমএলএদের মধ্য থেকে, বাকি পাঁচজনকে কাউন্সিল নির্বাচিত করবে। পূর্বের থেকেই দলে দুই গ্রুপ হয়ে গেছে। তথাপি পাকিস্তান ইস্যুর ওপর নির্বাচন, এ সময় গোলমাল না হওয়াই বাঞ্ছনীয় ছিল। আমরা ভালভাবেই বুঝতাম, চারজনের মধ্যে একজন প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি যথা মওলানা আকরম খাঁ সাহেব, একজন মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা হিসাবে খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেব, আর পার্লামেন্টারি পার্টি একজন প্রতিনিধি দিবেন এবং একজন আপার হাউজের মুসলিম লীগ গ্রুপ থেকে নির্বাচিত হবেন। নাজিমুদ্দীন সাহেব পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা ছিলেন, এমএলএ ও এমএলসিরা[১৪] তাঁরই ভক্ত বেশি ছিল। শহীদ সাহেব ডেপুটি লিডার হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে প্রতিনিধি না করে নাজিমুদ্দীন সাহেব ফজলুর রহমান সাহেবকে পাঠালেন। শহীদ সাহেবকে বললেন, আপনাকে নির্বাচিত করে লাভ কি? আপনি তো কাউন্সিল থেকে ইলেকশন করে বোর্ডের মেম্বার হতে পারবেন। ফজলুর রহমান সাহেব পারবেন না, তাই তাঁকেই সদস্য করলাম। আপার হাউস মুসলিম লীগ গ্রুপ থেকে বোধহয় নূরুল আমিন সাহেবকে নিলেন। এইভাবে নয়জনের মধ্যে চারজন তাঁর দলেরই হয়ে গেল। যেভাবেই হোক আর একজনকে তিনি ইলেকশনের মাধ্যমে পার করে নিতে পারবেন। এতেই গোলমাল শুরু হয়ে গেল। আমরা প্রতিবাদ করলাম এবং বললাম, শহীদ সাহেবকে এমএলএদের পক্ষ থেকে কেন নেওয়া হবে না? তাঁকে অপমান করা হয়েছে। কারণ, তিনি ডেপুটি লিডার মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির। এটা একটা ষড়যন্ত্র! শহীদ সাহেব আমাদের

বোঝাতে চেষ্টা করলেন, "ঠিক আছে, এতে কি হবে!" আমরা বললাম, "আপনি আর উদারতা দেখাবেন না। নাজিমুদ্দীন সাহেবের মনে রাখা উচিত ছিল যে, তিনি আজ মুসলিম লীগ পার্টির নেতা ও এমএলএ হয়েছেন একমাত্র আপনার জন্য। পটুয়াখালীতে শেরে বাংলা তাঁকে পরাজিত করে রাজনীতি থেকে বিদায় দিয়েছিলেন। বাংলাদেশের কোনো জেলা থেকেই তিনি হক সাহেবের সাথে ইলেকশন করে জিততে পারতেন না, যদি না আপনি তাঁকে আপনার একটা সিট থেকে পদত্যাগ করে পাস করিয়ে নিতেন। তাও আবার কলকাতা না হলে আপনিও পারতেন না।"

শহীদ সাহেব ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কলকাতা থেকে দুইটা সিটে এমএলএ হন। নাজিমুদ্দীন সাহেব পটুয়াখালী থেকে পরাজিত হয়ে ফিরে আসলেন। তাঁর রাজনীতি থেকে সরে পড়া ছাড়া উপায় ছিল না। শহীদ সাহেব হক সাহেবকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বললেন, আমি নাজিমুদ্দীন সাহেবকে কলকাতা থেকে বাই ইলেকশনে পাস করিয়ে নেব। যদি হক সাহেব পারেন, তাঁর প্রতিনিধি দিয়ে মোকাবেলা করাতে পারেন। হক সাহেবও লোক দাঁড় করিয়েছিলেন নাজিমুদ্দীন সাহেবের বিরুদ্ধে। নাজিমুদ্দীন সাহেবই শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করলেন, শহীদ সাহেবের দয়ায়। সেই নাজিমুদ্দীন সাহেব শহীদ সাহেবকে অপমানই করলেন। যাহোক, আমাদের পক্ষ থেকে পাঁচজনই আমরা কাউন্সিলে দাঁড় করাব, নাজিমুদ্দীন সাহেবের দলের কাউকেও হতে দেব না। কারণ, আমাদের ভরসা ছিল কাউন্সিলে শহীদ সাহেব সংখ্যাগুরু।

মওলানা আকরম খাঁ সাহেব একটা আপোস করার চেষ্টা করলেন। মওলানা সাহেবের বাড়িতে শহীদ সাহেব ও মওলানা সাহেবের আলোচনা হল। শহীদ সাহেব নরম হয়ে গেছেন দেখলাম। তিনি বললেন, "এখন পাকিস্তানের জন্য সংগ্রাম, গোলমাল করে কি হবে, একটা আপোস হওয়াই ভাল।" আমরা বললাম, চারজনের মধ্যে দুইজনই তো নাজিমুদ্দীন সাহেবের ছিলেন, তিনি নিজে ও মওলানা সাহেব। কেন আর দুইজনের মধ্যে একজন আপনার গ্রুপ থেকে দিলেন না, আপনাকে না দিত। আমরা বললাম, কিছুতেই হবে না।

দিন তারিখ আমার মনে নাই, তবে ঘটনাটা মনে আছে। বিকালে কলকাতা এ্যাসেম্বলি পার্টি রুমে এমএলএ, এমএলসি ও লীগ নেতাদের বৈঠক হবে, সেখানে আপোস হবে। আমরাও খবর পেলাম। বেকার হোস্টেল ও অন্যান্য হোস্টেলে খবর দিয়ে দুই তিনশত ছাত্র নিয়ে আমিও উপস্থিত হলাম। দরজা বন্ধ করে সভা হচ্ছিল। আমি দরজায় যেয়ে বললাম, "আমাদের কথা আছে, শুনতে হবে। শেষ পর্যন্ত নেতারা রাজি হলেন। দরজাগুলি খুলে দিলেন। ছাত্ররা ভিতরে বসল। আমিই প্রথম বক্তা, প্রায় আধা ঘণ্টা বক্তৃতা করলাম এবং শহীদ সাহেবকে বললাম, "আপোস করার কোনো অধিকার আপনার নাই। আমরা খাজাদের সাথে আপোস করব না। কারণ, ১৯৪২ সালে তিনি প্রধানমন্ত্রী হয়ে নিজের ভাইকে মন্ত্রী বানিয়েছিলেন। আবার তাঁর বংশের থেকে এগারজনকে এমএলএ বানিয়েছিলেন। এদেশে তারা ছাড়া আর লোক ছিল না? মুসলিম লীগে কোটারি করতে আমরা দিব না। আমরাই হক সাহেবের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছি, দরকার হয় আপনাদের বিরুদ্ধেও আন্দোলন করব।" শহীদ সাহেবকে বাধ্য করে সভা থেকে উঠিয়ে নিয়ে চলে এসেছিলাম।

আমার পরে ফজলুল কাদের চৌধুরী ও ফরিদপুরের লাল মিয়া সাহেবও আমাকে সমর্থন করে বক্তৃতা করেন। রাতে আমাদের সভা হল। আমরা প্রায় রাতভরই শহীদ সাহেবের সাথে রইলাম। শহীদ সাহেবের কাছে জনাব নাজিমুদ্দীন সাহেব জানতে চেয়েছেন, আপোস হবে কি না তাকে জানাতে। তিনি শহীদ সাহেবকে ফোনের মাধ্যমে অনুরোধ করলেন, আমরা বুঝতে পারলাম। শহীদ সাহেব বললেন, "যা হয় আগামীকাল সকাল নয়টার মধ্যে জানিয়ে দিব।" আমাদের সকাল আটটার মধ্যে তাঁর বাসায় আসতে বলে দিলেন। এই সময় নূরুদ্দিন, একরাম, নূরুল আলম, শরফুদ্দিন, জহির, আমরা প্রায় সকল সময় একসাথেই থাকি; ফজলুল কাদের চৌধুরী সাহেবও দলবল নিয়ে কলকাতায়ই ছিলেন। চট্টগ্রামের ছাত্রদের মধ্যে তিনি জনপ্রিয় ছিলেন।

আমরা সকালে শহীদ সাহেবের বাড়িতে যথাসময়ে হাজির হলাম। তিনি রাতে অনেকের সাথে আলাপ করেছিলেন। তিনি আমাদের নিয়ে বসলেন, আমি তাঁর কাছেই বসলাম। শহীদ সাহেব বললেন, "বুঝতে পারছি না তোমরা পাঁচটা সিটই দখল করতে পারবে কি না?" আমি বললাম, "স্যার, বিশ্বাস করেন আমরা নিশ্চয়ই জিতব, খোদার মর্জি থাকলে আমাদের পরাজিত হবার কোনো কারণ নাই।" আমি টেলিফোন তাঁর হাতে তুলে দিয়ে বললাম, "বলে দেন খাজা সাহেবকে ইলেকশন হবে।" শহীদ সাহেব নাজিমুদ্দীন সাহেবকে টেলিফোন করে বললেন, "ইলেকশনই হবে। যাই হোক না কেন, ইলেকশনের মাধ্যমেই হবে। সকলেই তো মুসলিম লীগার, আমরা কেন উপরের থেকে চাপাতে যাব।" নাজিমুদ্দীন সাহেব কি যেন বললেন। শহীদ সাহেব বললেন, "আর হয় না। আপনারা ভাল ব্যবহার করেন নাই।"

আমরা বিদায় নিয়ে চলে এলাম। রাতে জেলা প্রতিনিধিরা লীগ অফিসে আসলেন। একজনের কথা আমার বিশেষভাবে মনে আছে, তিনি হলেন নোয়াখালী জেলা মুসলিম লীগের সেক্রেটারি মুজিবুর রহমান মোক্তার সাহেব। তিনি জেলার নেতাদের কাছে একটা চমৎকার বক্তৃতা করেন। সমস্ত নোয়াখালী জেলা শহীদ সাহেবের ভক্ত ছিল।

হাশিম সাহেবের নেতৃত্বে আমাদের অফিস ভালভাবে চলছিল। আমরা শিয়ালদহ ও হাওড়ায় লোক রাখলাম—কাউন্সিলারদের অভ্যর্থনার জন্য, থাকার জায়গারও বন্দোবস্ত করলাম। ছাত্রকর্মীরা কলেজ হোস্টেল ছেড়ে বের হয়ে পড়েছে, যার যার জেলার কাউন্সিলারদের সাথে দেখা করার জন্য। দুই দিন পর্যন্ত রাতদিন ভীষণভাবে কাজ চলল। মওলানা রাগীব আহসান ও জনাব ওসমান সাহেব ছিলেন কলকাতা মুসলিম লীগের নেতা। কলকাতা মুসলিম লীগের সকলেই শহীদ সাহেবের ভক্ত। তারাও গাড়ি ও কর্মী নিয়ে প্রচারে নেমে পড়ল। সভার দিন দেখা গেল, শত শত কর্মী হাজির হয়ে গেছে। আমরা যারা কাউন্সিলের সভ্য তারা হলের ভিতরে চলে গেলাম, আর কর্মীরা দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ক্যানভাস করতে লাগল। মাঝে মাঝে 'শহীদ সোহরাওয়ার্দী জিন্দাবাদ', 'আবুল হাশিম জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিচ্ছিল।

শহীদ সাহেব ও হাশিম সাহেব পরামর্শ করে পাঁচজনের নাম ঠিক করলেন: ১. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, ২. আবুল হাশিম, ৩. মওলানা রাগীব আহসান, ৪. আহমদ হোসেন

এবং ৫. লাল মিয়া আমাদের পক্ষের, অন্য পক্ষ থেকে নাজিমুদ্দীন সাহেবও পাঁচজনের নাম দিলেন। এই সময় ফজলুল কাদের চৌধুরী সাহেব পার্লামেন্টারি বোর্ডের সদস্য হবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন ও ভীষণ ক্যানভাস শুরু করেন। আমিও তাঁর জন্য তদ্বির করেছিলাম। শহীদ সাহেবও প্রায় রাজি হয়ে গিয়েছিলেন। লাল মিয়াকে বাদ দিয়ে ফজলুল কাদের চৌধুরীকে নেওয়া হবে, তখনও ফাইনাল হয় নাই। এই অবস্থায় রাতে ফজলুল কাদের চৌধুরী সাহেব নাজিমুদ্দীন সাহেবের সাথে দেখা করলেন এবং তাঁকে নমিনেশন দিলে তিনি চট্টগ্রাম গ্রুপ নিয়ে তাঁর দলে যোগদান করবেন বলে প্রস্তাব দিলেন। শহীদ সাহেব রাতেই খবর পেলেন এবং বললেন, "কিছুতেই ওকে নমিনেশন দেওয়া হবে না, কারণ এই বয়সেই ওর এত লোভ।" ওদিকে নাজিমুদ্দীন সাহেবও তাঁকে তাঁর দল থেকে নমিনেশন দিতে রাজি হলেন না। শেষ পর্যন্ত চৌধুরী সাহেব শহীদ সাহেবের দলকেই ভোট দিলেন। তাঁর দলের সকলেই শহীদ সাহেবের ভক্ত। এম. এ. আজিজ, জহুর আহমদ চৌধুরী, আবুল খায়ের সিদ্দিকী, আজিজুর রহমান চৌধুরী সকলেই শহীদ সাহেবের ভক্ত ছিলেন। চৌধুরী সাহেবের এই ব্যবহারে তাঁরাও কিছুটা মনঃক্ষুণ্ণই হয়েছিলেন। এরা সবাই ছিলেন আমার ব্যক্তিগত বন্ধু।

কাউন্সিল সভা যখন শুরু হল, মওলানা আকরম খাঁ সাহেব কিছু সময় বক্তৃতা করলেন। তারপরই আবুল হাশিম সাহেব সেক্রেটারি হিসাবে বক্তৃতা দিতে উঠলেন। কিছু সময় বক্তৃতা দেওয়ার পরই নাজিমুদ্দীন সাহেবের দলের কয়েকজন তাঁর বক্তৃতার সময় গোলমাল করতে আরম্ভ করলেন। আমরাও তার প্রতিবাদ করলাম, সাথে সাথে গণ্ডগোল শুরু হয়ে গেল। সমস্ত যুবক সদস্যই ছিল শহীদ সাহেবের দলে, আমাদের সাথে টিকবে কেমন করে! নাজিমুদ্দীন সাহেবকে কেউ কিছু বলল না। তবে তাঁর দলের সকলেরই কিছু কিছু মারপিট কপালে জুটেছিল। আমি ও আমার বন্ধু আজিজ সাহেব দেখলাম, শাহ আজিজুর রহমান সাহেব ছাত্রলীগের ফাইল নিয়ে নাজিমুদ্দীন সাহেবের পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি ও আজিজ পরামর্শ করছি শাহ সাহেবের কাছ থেকে এই খাতাগুলি কেড়ে নিতে হবে, আমাদের ছাত্রলীগের কাজে সাহায্য হবে। নাজিমুদ্দীন সাহেব যখন চলে যাচ্ছিলেন, শাহ সাহেবও রওয়ানা করলেন, আজিজ তাঁকে ধরে ফেলল। আমি খাতাগুলি কেড়ে নিয়ে বললাম, কথা বলবেন না, চলে যাবেন। আজকাল যখন শাহ সাহেবের সাথে কথা হয় ও দেখা হয় তখন সেই কথা মনে করে হাসাহাসি করি। শাহ সাহেব ১৯৬৪ সালে আওয়ামী লীগে যোগদান করেন এবং ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলিতে আওয়ামী লীগ পার্টির নেতা এবং বিরোধী দলের ডেপুটি লিডার হন। তাঁর সাথে আমার মতবিরোধ ১৯৫৮ সালের মার্শাল ল' জারি হওয়া পর্যন্ত চলে।

মওলানা সাহেব পরের দিন পর্যন্ত সভা মুলতবি রাখলেন এবং দশটায় ভোটগ্রহণ শুরু হবে বলে ঘোষণা করলেন। ব্যালট করা হল। পাশের রুমে বাক্স রাখা হল। একজন পাঁচটা করে ভোট দিতে পারবে। আমি ভিতরের গেটে দাঁড়িয়ে ক্যানভাস করছিলাম, মওলানা সাহেবের কাছে কে যেন নালিশ করেছে। তিনি আমাকে বললেন, "তুমি ওখানে

কি করছ ছোকরা?" আমি বললাম, "আমিও একজন সদস্য, ছোকরা না।" মওলানা সাহেব হেসে চলে গেলেন।

সন্ধ্যা পর্যন্ত ভোট গণনা হয়ে গেল। শহীদ সাহেবের দলের পাঁচজনই জিতলেন। আমি ফুলের মালা জোগাড় করেই রেখেছিলাম, আরও অনেকেই মালা জোগাড় করে রেখেছিল। আমি যখন শহীদ সাহেবের গলায় মালা দিলাম, শহীদ সাহেব আমাকে আদর করে বললেন, তুমি ঠিক বলেছিলে। লাল মিয়া সাহেবকে নিয়ে আমাদের ভয় ছিল। আমি ব্যক্তিগতভাবে অনেককে অনুরোধ করেছিলাম, তাঁকে একটা ভোট দিতে। ফরিদপুর জেলার মাত্র সামান্য কয়েকটা ভোটই শহীদ সাহেবের দল পেয়েছিল। লাল মিয়া সাহেব, আমি ও আরও কয়েকজন ভোট দিয়েছি, আর সকল ভোটই তমিজুদ্দিন সাহেব, মোহন মিয়া ও সালাম সাহেবের নেতৃত্বে নাজিমুদ্দীন সাহেবের দল পেয়েছিল। লাল মিয়া সাহেবের জন্য দুই চারটা ভোট ফরিদপুর থেকে আমি জোগাড় করেছিলাম। লাল মিয়া সাহেব মোহন মিয়া সাহেবের সহোদর ভাই হলেও তিনি লাল মিয়ার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন।

অন্য কথায় যাওয়ার পূর্বে আর একটা কথা না বললে অন্যায় হবে। লাল মিয়া সাহেব পার্লামেন্টারি বোর্ডের মেম্বার হওয়ার পরে ফরিদপুরের সদস্য নমিনেশনের সময় ভাইয়ের পক্ষ অবলম্বন করেন। আমাদের দলের লোককে নমিনেশন দিতে রাজি হন নাই। ফরিদপুরের ছয়টা সিটের মধ্যে অনেক ঝগড়া করে মাত্র দুইটা সিট আমরা পেয়েছিলাম। একটা রাজবাড়ীর খান বাহাদুর ইউসুফ হোসেন চৌধুরীর সিট, আরেকটা মাদারীপুরের ইস্কান্দার আলী সাহেবের। মোহন মিয়া নির্বাচনে দত্তপাড়ার শামসুদ্দিন আহমদ চৌধুরী ওরফে বাদশা মিয়ার কাছে পরাজিত হন। বাদশা মিয়া ফল ঘোষণা হওয়ার সাথে সাথেই ঘোষণা করলেন, আমার জয় মুসলিম লীগের জয় ও পাকিস্তানের জয়। লাল মিয়া ও মোহন মিয়া সকল সময়ই ভিন্ন দলে থাকতেন। প্রথমে লাল মিয়া সাহেব কংগ্রেস করতেন, মোহন মিয়া সাহেব মুসলিম লীগ করতেন। আবার মুসলিম লীগে যখন যোগদান করলেন, এক ভাই রইলেন শহীদ সাহেবের দলে, আরেক ভাই খাজা নাজিমুদ্দীনের দলে। আবার পাকিস্তান আমলে আইয়ুবের মার্শাল 'ল আসলে, এক ভাই আইয়ুব খান সাহেবের দলে, আর এক ভাই বিরোধী দলে। যে দলই ক্ষমতায় থাকুক না কেন, তাঁদের ক্ষমতা ঠিকই থাকে। এই অপূর্ব খেলা আমরা দেখেছি জীবনভর! রাতেরবেলা দুই ভাই এক, নিজেদের স্বার্থের বেলায় মুহূর্তের মধ্যেই এক হয়ে যান।



এই সময় আমাদের উপর মুসলিম লীগ থেকে হুকুম হল, জেলায় জেলায় চলে গিয়ে ইলেকশন অফিসের ভার নিতে। প্রত্যেক জেলায় ও মহকুমায় ইলেকশন অফিস ও কর্মী শিবির খোলা হবে। জেলায় জেলায় ভাল ভাল কর্মীদের কর্মী শিবিরের চার্জ নিতে হবে।

আমার কয়েকটা জেলার কথা মনে আছে। কামরুদ্দিন সাহেব ঢাকা জেলা, শামসুল হক সাহেব ময়মনসিংহ, খোন্দকার মোশতাক আহমদ কুমিল্লা, একরামুল হক খুলনা এবং আমাকে ফরিদপুর জেলার ভার দেওয়া হয়েছিল। আমরা রওয়ানা হয়ে চলে এলাম সাইকেল, মাইক্রোফোন, হর্ন, কাগজপত্র নিয়ে। জেলা লীগ আমাদের সাথে সহযোগিতা করবে। আমরা প্রত্যেক মহকুমায় ও থানায় একটা করে কর্মী শিবির খুলব। আমাকে কলেজ ছেড়ে চলে আসতে হল ফরিদপুরে। ফরিদপুর শহরে মিটিং করতে এসেছি মাঝে মাঝে, কিন্তু কোনোদিন থাকি নাই। আমাকে ভার দেওয়ার জন্য মোহন মিয়া সাহেব ক্ষেপে যান। সকলকে সাবধান করে দেন, কেউ যেন আমাকে বাড়ি ভাড়া না দেয়। তিনি মুসলিম লীগের সভাপতি, কিন্তু আমাকে চান না। আমি আবদুল হামিদ চৌধুরী ও মোল্লা জালালউদ্দিনকে সকল কিছু দিয়ে পাঠিয়ে দিলাম। হামিদ ও জালাল ফরিদপুর কলেজে পড়ত, তাদেরও লেখাপড়া ছেড়ে আসতে হল। শহরের উপরে কেউই বাড়ি দিতে রাজি হল না। আমার এক দূরসম্পর্কের আত্মীয় শহর থেকে একটু দূরে তার একটা দোতলা বাড়ি ছিল, ভাড়া দিতে রাজি হল। বাধ্য হয়ে আমাকে সেখানে থাকতে হল। সেখানে আমরা অফিস খুললাম, কর্মীদের ট্রেনিং দেয়ার বন্দোবস্ত হল। সমস্ত জেলায় ঘুরতে শুরু করলাম। মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ ও রাজবাড়ীতে অফিস খুলে দিলাম, কাজ শুরু হল। থানায় থানায়ও অফিস করলাম। এই সময় মাঝে মাঝে আমাকে কলকাতায় যেতে হত। শহীদ সাহেব ও হাশিম সাহেব কিছুদিন পূর্বে একবার গোপালগঞ্জ এসেছিলেন। বিরাট সভা করে গিয়েছিলেন। এই সময় সালাম সাহেবের দল শহীদ সাহেব ও হাশিম সাহেবকে সংবর্ধনা দিতে রাজি হয় নাই, কারণ আমার অনুরোধে তাঁরা এসেছিলেন। তাঁর দলবল প্রশ্ন করল, আমি মুসলিম লীগের একজন সদস্য মাত্র। অফিসিয়াল লীগের কেউই নই, এই নিয়ে ঝগড়া হয়ে গেল গোপালগঞ্জে। শহীদ সাহেব আসবার মাত্র দুই দিন পূর্বে আমি বললাম, আমি গোপালগঞ্জ মুসলিম লীগের জন্মদাতা। শহীদ সাহেব আসবেন, তাঁকে সংবর্ধনা দিব, যদি কেউ পারে যেন মোকাবেলা করে। আমি রাতে লোক পাঠিয়ে দিলাম। যেদিন দুপুরে শহীদ সাহেব আসবেন সেদিন সকালে কয়েক হাজার লোক সড়কি, বল্লম, দেশী অস্ত্র নিয়ে হাজির হল। সালাম সাহেবের লোকজনও এসেছিল। তিনি বাধা দেবার চেষ্টা করেন নাই। তবে, শহীদ সাহেব, হাশিম সাহেব ও লাল মিয়া সাহেবের বক্তৃতা হয়ে গেলে সালাম সাহেব যখন বক্তৃতা করতে উঠলেন তখন 'সালাম সাহেব জিন্দাবাদ' দিলেই আমাদের লোকেরা 'মুর্দাবাদ' দিয়ে উঠল। দুই পক্ষে গোলমাল শুরু হল। শেষ পর্যন্ত সালাম সাহেবের লোকেরা চলে গেল। আমাদের লোকেরা তাদের পিছে ধাওয়া করল। শহীদ সাহেব মিটিং ছেড়ে দুই পক্ষের ভিতর ঢুকে পড়লেন। তখন দুই পক্ষের হাতেই ঢাল, তলোয়ার রয়েছে। কতজন খুন হবে ঠিক নাই। শহীদ সাহেব এইভাবে খালি হাতে দাঙ্গাকারী দুই দলের মধ্যে চলে আসতে পারেন দেখে সকলে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। হাশিম সাহেব পূর্বেই আমার বাড়িতে চলে গেছেন। এই ঘটনার জন্য শহীদ সাহেব ও হাশিম সাহেব সালাম সাহেবের উপর ক্ষেপে গিয়েছিলেন।

আবার শহীদ সাহেব মাদারীপুর হয়ে গোপালগঞ্জ এলেন জনমত যাচাই করতে। অনেক লোক ইলেকশনে দাঁড়াতে চায়, কার বেশি জনপ্রিয়তা দেখতে হবে। পূর্বেকার এমএলএ খন্দকার শামসুদ্দীন আহমেদ সাহেবও মুসলিম লীগে চলে এসেছেন, পেনশনপ্রাপ্ত ডেপুটি পুলিশ কমিশনার খান বাহাদুর সামসুদ্দোহা, আবদুস সালাম খান সাহেব এবং আরও দুই একজন ছিলেন। সালাম সাহেব ব্যক্তিগতভাবে গোপালগঞ্জে খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। শতকরা আশি ভাগ লোকই তাঁকে চায়। সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ ছিল না। আমার আব্বাকে শহীদ সাহেব জিজ্ঞাসা করলে আব্বা বলেছিলেন, সালাম সাহেবকে লোকে চায়। তবে সালাম সাহেব ও খন্দকার শামসুদ্দীন সাহেব উভয়ই উপযুক্ত প্রার্থী। শহীদ সাহেব বললেন আমাকে, জনসাধারণ তো সালাম সাহেবকে চায়, তোমার আব্বাও তো তাকে সমর্থন করেন। আমি বললাম, যাকে লোকে চায়, তাকেই দিবেন, আমার কোনো আপত্তি নাই। এর পূর্বেই সালাম সাহেবের সাথেও আমার কথা হয়েছিল। কিন্তু হাশিম সাহেব কিছুতেই রাজি হলেন না। এর কারণ জানি না। শেষ পর্যন্ত আমিও হাশিম সাহেবকে বলেছিলাম, সালাম সাহেবকে নমিনেশন দিতে। সেজন্য আমার উপর রাগ করেছিলেন তিনি। শহীদ সাহেব রিপোর্ট দিলেন, সালাম সাহেবই সকলের চেয়ে জনপ্রিয়। তিনি সালাম সাহেবকে নমিনেশন দিতে প্রস্তাব করেছিলেন। লাল মিয়া ও হাশিম সাহেব বেঁকে বসলেন। এই সময় কিছু টাকা পয়সার ছড়াছড়ি হচ্ছিল, আমি খবর পেতাম, যদিও চোখে দেখি নাই। শেষ পর্যন্ত খান বাহাদুর সামসুদ্দোহা সাহেবকে নমিনেশন দিল প্রাদেশিক পার্লামেন্টারি বোর্ড। কেন্দ্রীয় বোর্ড খান বাহাদুর সাহেবকে কেটে দিয়ে খন্দকার শামসুদ্দীন আহমেদকে নমিনেশন দিল। সালাম সাহেব ইলেকশন করলে বোধহয় নির্বাচিত হতে পারতেন, কিন্তু মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে নির্বাচন করলেন না। কারণ পাকিস্তানের উপর ভোট। খন্দকার শামসুদ্দীন আহমেদও নমিনেশন পেতে পারেন না, কারণ মাত্র কয়েক মাস পূর্বে তিনি মুসলিম লীগে যোগদান করেন। তিনি মুসলিম লীগের নমিনেশন পেলেন কারণ তাঁর চাচাতো ভাই খাজা শাহাবুদ্দীন সাহেবের মেয়েকে বিবাহ করেন। তাই নাজিমুদ্দীন সাহেব, চৌধুরী খালিকুজ্জামান সাহেবকে বলে নমিনেশন নিয়ে আসেন।

শহীদ সাহেব ছিলেন উদার, নীচতা ছিল না, দল মত দেখতেন না, কোটারি করতে জানতেন না, গ্রুপ করারও চেষ্টা করতেন না। উপযুক্ত হলেই তাকে পছন্দ করতেন এবং বিশ্বাস করতেন। কারণ, তাঁর আত্মবিশ্বাস ছিল অসীম। তাঁর সাধুতা, নীতি, কর্মশক্তি ও দক্ষতা দিয়ে মানুষের মন জয় করতে চাইতেন। এজন্য তাঁকে বার বার অপমানিত ও পরাজয়বরণ করতে হয়েছে। উদারতা দরকার, কিন্তু নীচ অন্তঃকরণের ব্যক্তিদের সাথে উদারতা দেখালে ভবিষ্যতে তালর থেকে মন্দই বেশি হয়, দেশের ও জনগণের ক্ষতি হয়।

আমাদের বাঙালির মধ্যে দুইটা দিক আছে। একটা হল 'আমরা মুসলমান, আর একটা হল, আমরা বাঙালি।' পরশ্রীকাতরতা এবং বিশ্বাসঘাতকতা আমাদের রক্তের মধ্যে রয়েছে। বোধহয় দুনিয়ার কোন ভাষায়ই এই কথাটা পাওয়া যাবে না, 'পরশ্রীকাতরতা'। পরের শ্রী দেখে যে কাতর হয়, তাকে 'পরশ্রীকাতর' বলে। ঈর্ষা, দ্বেষ সকল ভাষায়ই পাবেন,

সকল জাতির মধ্যেই কিছু কিছু আছে, কিন্তু বাঙালিদের মধ্যে আছে পরশ্রীকাতরতা। ভাই, ভাইয়ের উন্নতি দেখলে খুশি হয় না। এই জন্যই বাঙালি জাতির সকল রকম গুণ থাকা সত্ত্বেও জীবনভর অন্যের অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। সুজলা, সুফলা বাংলাদেশ সম্পদে ভর্তি। এমন উর্বর জমি দুনিয়ায় খুব অল্প দেশেই আছে। তবুও এরা গরিব। কারণ, যুগ যুগ ধরে এরা শোষিত হয়েছে নিজের দোষে। নিজকে এরা চেনে না, আর যতদিন চিনবে না এবং বুঝবে না ততদিন এদের মুক্তি আসবে না।

অনেক সময় দেখা গেছে, একজন অশিক্ষিত লোক লম্বা কাপড়, সুন্দর চেহারা, ভাল দাড়ি, সামান্য আরবি ফার্সি বলতে পারে, বাংলাদেশে এসে পীর হয়ে গেছে। বাঙালি হাজার হাজার টাকা তাকে দিয়েছে একটু দোয়া পাওয়ার লোভে। ভাল করে খবর নিয়ে দেখলে দেখা যাবে এ লোকটা কলকাতার কোন ফলের দোকানের কর্মচারী অথবা ডাকাতি বা খুনের মামলার আসামি। অন্ধ কুসংস্কার ও অলৌকিক বিশ্বাসও বাঙালির দুঃখের আর একটা কারণ।

বাঙালিরা শহীদ সাহেবকে প্রথম চিনতে পারে নাই। যখন চিনতে পারল, তখন আর সময় ছিল না। নির্বাচনের সব খরচ, প্রচার, সংগঠন তাঁকেই এককভাবে করতে হয়। টাকা বোধহয় সামান্য কিছু কেন্দ্রীয় লীগ দিয়েছিল, বাকি শহীদ সাহেবকেই জোগাড় করতে হয়েছিল। শত শত সাইকেল তাকেই কিনতে হয়েছিল। আমার জানা মতে পাকিস্তান হয়ে যাবার পরেও তাঁকে কলকাতায় বসে দেনা শোধ করতে হয়। আমি পূর্বেই বলেছি, শহীদ সাহেব সরল লোক ছিলেন। তিনি ধোঁকায় পড়ে গেলেন। পার্লামেন্টারি বোর্ডে তাঁর দল সংখ্যাগুরু থাকা সত্ত্বেও নিজের লোককে তিনি নমিনেশন দিতে পারলেন না। নাজিমুদ্দীন সাহেবের দল পরাজিত হওয়ার পরে তারা অন্য পন্থা অবলম্বন করলেন। ঘোষণা করলেন, তিনি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না অর্থাৎ শহীদ সাহেবই দলের নেতা হবেন। তিনি শহীদ সাহেবকে অনুরোধ করলেন যারা পূর্ব থেকে মুসলিম লীগে আছে তাদের নমিনেশন দেওয়া হোক, কারণ এরা সকলেই শহীদ সাহেবকে সমর্থন করবেন। খাজা সাহেব যখন নির্বাচন করবেন না তখন আর ভয় কি? শহীদ সাহেব এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে পুরানা এমএলএ প্রায় সকলকেই নমিনেশন দিয়ে দেন। বোধহয় তখন বাংলাদেশে একশত উনিশটা সিট মুসলমানদের ছিল। এই চাতুর্যে প্রায় পঞ্চাশজন খাজা সাহেবের দলের লোক নমিনেশন পেয়ে গেল। আবার কেন্দ্রীয় লীগে খাজা সাহেবের সমর্থক বেশি ছিলেন। লিয়াকত আলী খান, খালিকুজ্জামান, হোসেন ইমাম, চুন্দ্রিগড় সাহেব সকলেই শহীদ সাহেবকে মনে মনে ভয় করতেন। কারণ সকল বিষয়েই শহীদ সাহেব এঁদের থেকে উপযুক্ত ছিলেন। কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারি বোর্ডও প্রায় ত্রিশজনের নমিনেশন পাল্টিয়ে দিলেন। এদের মধ্যে দুই একজন শহীদ সাহেবেরও সমর্থক ছিলেন, একথা অস্বীকার করা যায় না।

নির্বাচনের পরে দেখা গেল একশত উনিশটার মধ্যে বোধহয় একশত ষোলটা সিট লীগ দখল করল। সংখ্যা দু'একটা ভুল হতে পারে, আমার ঠিক মনে নাই। এই একশত ষোলজনের

মধ্যে নাজিমুদ্দীন সাহেবের দলই বেশির ভাগ, যদিও তারা শহীদ সাহেবকে লিডার বানাতে বাধ্য হল, কিন্তু তলে তলে তাদের গ্রুপিং চলল। শহীদ সাহেব গ্রুপ করতেন না, তিনি উপযুক্ত দেখেই মন্ত্রী করলেন। নাজিমুদ্দীন সাহেবের দলের অনেককে পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি ও হুইপ করলেন। জনাব ফজলুর রহমানকেও মন্ত্রী করলেন।



যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে মিস্টার চার্চিল ভারতে ক্রিপস মিশন পাঠিয়ে ছিলেন, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। যুদ্ধের পরে যখন মিস্টার ক্লিমেন্ট এটলি লেবার পার্টির পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী হন তখন তিনি ১৯৪৬ সালের ১৫ই মার্চ তারিখে ক্যাবিনেট মিশন পাঠাবার কথা ঘোষণা করলেন; তাতে তিনজন মন্ত্রী থাকবেন, তাঁরা ভারতবর্ষে এসে বিভিন্ন দলের সাথে পরামর্শ করে ভারতবর্ষকে যাতে তাড়াতাড়ি স্বাধীনতা দেওয়া যায় তার চেষ্টা করবেন। ভারতবর্ষে বিভিন্ন দলের প্রতিনিধি নিয়ে যত তাড়াতাড়ি হয় একটা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হবে—বড়লাটের সাথে পরামর্শ করে। এই ক্যাবিনেট মিশনের সদস্য ছিলেন, লর্ড পেথিক লরেন্স, সেক্রেটারি অব স্টেট ফর ইন্ডিয়া, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস, প্রেসিডেন্ট অব দ্য বোর্ড অব ট্রেড এবং মিস্টার এ. ভি. আলেকজান্ডার, ফার্স্ট লর্ড অব এডমাইরালটি (Lord Pethick Lawrence, Secretary of State for India, Sir Stafford Cripps, President of the Board of Trade, and A. V. Alexander, First Lord of the Admiralty)—এঁরা ভারতবর্ষে এসে বড় লাটের সাথে এবং রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সাথে পরামর্শ করে একটা কর্মপন্থা অবলম্বন করবেন। মিস্টার এটলির বক্তৃতায় মুসলমানদের পাকিস্তান দাবির কথা উল্লেখ তো নাই-ই বরং সংখ্যালঘুদের দাবিকে তিনি কটাক্ষ করেছিলেন। মিস্টার এটলি তাঁর বক্তৃতার এক জায়গায় যা বলেছিলেন, তাই তুলে দিলাম: "Mr. Atlee declares that minorties cannot be allowed to impede the progress of majorities." মিস্টার এটলির বক্তৃতায় কংগ্রেস মহল সন্তোষ প্রকাশ করলেন। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এই বক্তৃতার তীব্র সমালোচনা করলেন।

ক্যাবিনেট মিশন ২৩শে মার্চ তারিখে ভারতবর্ষে এসে পৌঁছালেন। তাঁরা ভারতবর্ষে এসে যে সকল বিবৃতি দিলেন তাতে আমরা একটু বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম। আমরা দলবল বেঁধে শহীদ সাহেবের কাছে যেতাম, তাঁকে বিরক্ত করতাম, জিজ্ঞাসা করতাম, কি হবে? শহীদ সাহেব শান্তভাবে উত্তর দিতেন, "ভয়ের কোন কারণ নাই, পাকিস্তান দাবি ওদের মানতেই হবে।" আমরা দিনেরবেলা তাঁর দেখা পেতাম খুব অল্পই, তাই রাতে এগারটার সময় নূরুদ্দিন ও আমি যেতাম। কথা শেষ করে আসতে আমাদের অনেক রাত হয়ে যেত।

আমরা প্রায়ই হাঁটতে হাঁটতে থিয়েটার রোড থেকে বেকার হোস্টেলে ফিরে আসতাম। দু'একদিন আমরা রিপন স্ট্রিটে মিল্লাত অফিসে এসে চেয়ারেই শুয়ে পড়তাম। 'মিল্লাত'

কাগজের জন্য নতুন প্রেস হয়েছে, অফিস হয়েছে, হাশিম সাহেব সেখানেই থাকতেন। খন্দকার নূরুল আলম তখন *মিল্লাত* কাগজের ম্যানেজার হয়েছেন। তখন লীগ অফিসের থেকে আমাদের আলোচনা সভা মিল্লাত অফিসেই বেশি হত। মুসলিম লীগ অফিসে এমএলএরা ও মফস্বলের কর্মীরা এসে থাকতেন। বরিশালের ফরমুজুল হক সাহেব মুসলিম লীগের জয়েন্ট সেক্রেটারি ছিলেন, তিনি অফিসেই তাঁর ফ্যামিলি নিয়ে থাকতেন। শহীদ সাহেব তাঁকে মাসে মাসে বেতন দিতেন।



হঠাৎ খবর আসল, জিন্নাহ সাহেব ৭, ৮, ৯ এপ্রিল দিল্লিতে সমস্ত ভারতবর্ষের মুসলিম লীগপন্থী কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের কনভেনশন ডেকেছেন। বিগত নির্বাচনে বাংলাদেশ ও মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশগুলিতে মুসলিম লীগ একচেটিয়াভাবে জয়লাভ করেছে। তবে অধিকাংশ মুসলিম জনসংখ্যা অধ্যুষিত পাঞ্জাব, সিন্ধু ও সীমান্ত প্রদেশে মুসলিম লীগ এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে পারে নাই। তাই শুধুমাত্র বাংলাদেশে জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ সরকার গঠন হয়েছে। পাঞ্জাবে খিজির হায়াত খান তেওয়ানার নেতৃত্বে ইউনিয়নিস্ট সরকার, সীমান্তে ডা. খান সাহেবের নেতৃত্বে কংগ্রেস সরকার, সিন্ধুতে জনাব আল্লাহ বক্সের নেতৃত্বে মুসলিম লীগবিরোধী সরকার গঠিত হয়েছে। চারটা মুসলমান সংখ্যাগুরু প্রদেশের মধ্যে মাত্র বাংলাদেশেই এককভাবে মুসলিম লীগ সরকার গঠন করেছে। অন্যান্য প্রদেশে মুসলিম লীগবিরোধী দল হিসাবে আসন গ্রহণ করেছে। সমস্ত ভারতবর্ষে তখন এগারটা প্রদেশ ছিল।

শহীদ সাহেব স্পেশাল ট্রেনের বন্দোবস্ত করতে হুকুম দিলেন। বাংলা ও আসামের মুসলিম লীগ এমএলএ ও কর্মীরা এই ট্রেনে দিল্লি যাবেন। ট্রেনের নাম দেওয়া হল 'পূর্ব পাকিস্তান স্পেশাল'। হাওড়া থেকে ছাড়বে। আমরাও বাংলাদেশ থেকে দশ-পনেরজন ছাত্রকর্মী কনভেনশনে যোগদান করব। এ ব্যাপারে শহীদ সাহেবের অনুমতি পেলাম। সমস্ত ট্রেনটাকে সাজিয়ে ফেলা হল মুসলিম লীগ পতাকা ও ফুল দিয়ে। দুইটা ইন্টারক্লাস বগি আমাদের জন্য ঠিক করে ফেললাম। ছাত্ররা দুষ্টামি করে বগির সামনে লিখে দিল, 'শেখ মুজিবর ও পার্টির জন্য রিজার্ভড'; এ লেখার উদ্দেশ্য হল, আর কেউ এই ট্রেনে যেন না ওঠে। আর আমার কথা শুনলে শহীদ সাহেব কিছুই বলবেন না, এই ছিল ছাত্রদের ধারণা। যদিও ছাত্রদের নেতা ছিল নূরুদ্দিন। তাকেই আমরা মানতাম।

শহীদ সাহেব ও হাশিম সাহেবের কামরায় দুইটা মাইক্রোফোন লাগিয়ে দেওয়া হল। হাওড়া থেকে দিল্লি পর্যন্ত প্রায় সমস্ত স্টেশনেই শহীদ সাহেব ও তাঁর দলবলকে সম্বর্ধনা জানাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাংলাদেশে মুসলিম লীগের জয়ে সমস্ত ভারতবর্ষের মুসলমানদের মধ্যে একটা বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। জহিরুদ্দিনকে হাশিম সাহেবের কামরার কাছেই থাকার বন্দোবস্ত হয়েছিল। কারণ, তাকে সমস্ত পথে উর্দুতে বক্তৃতা করতে

হবে। সেই একমাত্র বক্তা যে উর্দু, বাংলা ও ইংরেজিতে সমানে বক্তৃতা করতে পারত। কলকাতার কোনো মহল্লায় সভা হলে জহির উর্দু ও আমি বাংলায় বক্তৃতা করতাম। নূরুদ্দিন, জহিরুদ্দিন, নূরুল আলম, শরফুদ্দিন, কিউ. জে. আজমিরী, আনোয়ার হোসেন (এখন ইস্টার্ন ফেডারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির বড় কর্মকর্তা), শামসুল হক সাহেব, খোন্দকার মোশতাক আহমদ ও অনেক লীগ কর্মীর মধ্যে মুর্শিদাবাদের কাজী আবু নাছের, আমার মামা শেখ জাফর সাদেক আরও অনেকে পূর্ব থেকেই প্রস্তুত হয়েছিলেন, দিল্লি যাবার অনুমতিও পেয়েছিলেন। এছাড়া যে সকল ছাত্র আমাদের হাওড়া স্টেশনে বিদায় দিতে এসেছিল, তারাও স্পেশাল ট্রেনে তাড়া লাগবে না শুনে এক কাপড়েই ট্রেনে চেপে বসল। প্রায় আট-দশজন হবে, তাদের 'না' বলার ক্ষমতা আমাদের ছিল না। তারা ভাল কর্মী। 'নারায়ে তকবির', 'মুসলিম লীগ জিন্দাবাদ', 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ', 'মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ জিন্দাবাদ,' 'শহীদ সোহরাওয়ার্দী জিন্দাবাদ' ধ্বনির মধ্যে ট্রেন ছেড়ে দিল।

সমস্ত ট্রেনে মাইক্রোফোনের হর্ন লাগানো ছিল। জহির, আজমিরী ও আমি বেশি স্লোগান দিতাম মাইক্রোফোন থেকে। প্রত্যেক স্টেশনে আমাদের গাড়ি থামাতে হত—যদিও সব জায়গায় গাড়ি দাঁড় করাবার কথা ছিল না। হাজার হাজার লোক শহীদ সাহেবকে ও বাংলার মুসলিম লীগকে সম্বর্ধনা দেওয়ার জন্য হাজির হয়েছিল। সকালে যখন পাটনায় পৌঁছালাম তখন দেখি সমস্ত পাটনা স্টেশন লোকে লোকারণ্য। তারা 'বাংলাকা মুসলমান জিন্দাবাদ', 'শহীদ সোহরাওয়ার্দী জিন্দাবাদ' 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ', 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান', এই রকম নানা স্লোগান দিতে থাকে। আমাদের প্রত্যেকের খাওয়ার বন্দোবস্ত করেছে বিহার মুসলিম লীগ এবং প্রত্যেককে একটা করে ফুলের মালা উপহার দিয়েছে। আমাদের ট্রেন যে সময় মত দিল্লিতে পৌঁছাতে পারবে না এটা আমরা বুঝতে পারলাম। অনেক দেরি হবে। আমরাও যেখানেই কিছু লোক স্লোগান দেয়, সেখানেই ট্রেন থামিয়ে দেই। এজন্য শহীদ সাহেব রাগ করতেন। আমি বললাম, কয়েক ঘণ্টা ধরে লোকগুলি দাঁড়িয়ে আছে। আপনাকে দেখার জন্য কত দূর দূর থেকে এরা এসেছে! আর আমরা এক মিনিটের জন্য ট্রেন না থামালে কত বড় অন্যায় হবে। যাহোক, এমনি করে সারা রাত জনসাধারণ ছোট ছোট স্টেশনেও জমা হয়ে আছে। আমাদের ট্রেন দেখলেই তারা বুঝতে পারত। এলাহাবাদ স্টেশনে আমাদের সমস্ত ট্রেনটাকে নতুন করে ফুল দিয়ে তারা সাজিয়ে দিয়েছিল। পথে পথে বিহার ও ইউপি থেকে অনেক ছাত্র আমাদের ট্রেনে উঠে পড়েছিল। তাদের অনেকের সাথে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল, পাকিস্তান হওয়ার পরেও আমাদের বন্ধুত্ব বজায় ছিল। এদের অনেকে পাকিস্তানে চলে এসেছে।

দিল্লি যখন পৌঁছালাম তখন দেখা গেল, যেখানে সকালে আমরা পৌঁছাব সেখানে বিকালে পৌঁছালাম। আট ঘণ্টা দেরি হয়েছে। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কনভেনশন বন্ধ করে রেখেছেন আমাদের জন্য। সকাল ন'টায় শুরু হবার কথা ছিল, আমাদের ট্রেন থেকে সোজা সভাস্থলে নিয়ে যাওয়া হল। দিল্লির লীগ কর্মীরা আমাদের মালপত্রের ভার নিলেন। আমরা বাংলায় স্লোগান দিতে দিতে সভায় উপস্থিত হলাম। সমস্ত সদস্য জায়গা থেকে

উঠে সম্বর্ধনা জানাল। জিন্নাহ্ সাহেব যেখানে বসেছেন, তাঁর কাছেই আমাদের স্থান। যখন উর্দু স্লোগান উঠত, আমরাও তখন বাংলা স্লোগান শুরু করতাম।

জিন্নাহ সাহেব বক্তৃতা করলেন, সমস্ত সভা নীরবে ও শান্তভাবে তাঁর বক্তৃতা শুনল। মনে হচ্ছিল সকলের মনেই একই কথা, পাকিস্তান কায়েম করতে হবে। তাঁর বক্তৃতার পরে সাবজেক্ট কমিটি গঠন হল। আট তারিখে সাবজেক্ট কমিটির সভা হল। প্রস্তাব লেখা হল, সেই প্রস্তাবে লাহোর প্রস্তাব থেকে আপাতদৃষ্টিতে ছোট কিন্তু মৌলিক একটা রদবদল করা হল। একমাত্র হাশিম সাহেব আর সামান্য কয়েকজন যেখানে পূর্বে 'স্টেটস' লেখা ছিল, সেখানে 'স্টেট' লেখা হয় তার প্রতিবাদ করলেন; তবুও তা পাস হয়ে গেল।[১৫] ১৯৪০ সালে লাহোরে যে প্রস্তাব কাউন্সিল পাস করে সে প্রস্তাব আইনসভার সদস্যদের কনভেনশনে পরিবর্তন করতে পারে কি না এবং সেটা করার অধিকার আছে কি না এটা চিন্তাবিদরা ভেবে দেখবেন। কাউন্সিলই মুসলিম লীগের সুপ্রিম ক্ষমতার মালিক। পরে আমাদের বলা হল, এটা কনভেনশনের প্রস্তাব, লাহোর প্রস্তাব পরিবর্তন করা হয় নাই। জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে ঐ প্রস্তাব পেশ করতে জনাব মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ অনুরোধ করলেন, কারণ তিনিই বাংলার এবং তখন একমাত্র মুসলিম লীগ প্রধানমন্ত্রী।

কাউন্সিল প্রস্তাব

Whereas in this vast subcontinent of India a hundred million Muslims are the adherents of a faith which regulates every department of their life—educational, social, economic and political—whose code is not confined merely to spiritual doctrines and tenets or rituals and ceremonies and which stands in sharp contrast to the exclusive nature of Hindu Dharma and Philosophy which has fostered and maintained rigid caste system for thousands of years, resulting in the degradation of 60 million human beings to the position of untouchables, creation of unnatural barriers between man and man and superimposition of social and economic inequalities on a large body of the people of this country and which threatens to reduce Muslims, Christians and other minorities to the status of irredeemable helots, socially and economically;

Whereas the Hindu caste system is a direct negation of nationalism, equality, democracy and all the noble ideals that Islam stands for;

Whereas, different historical backgrounds, traditions, cultures social and economic orders of the Hindus and the Muslims made impossible the evolution of a single Indian Nation inspired by

common aspirations and ideals and whereas after centuries they still remain two distinct major nations;

Whereas, soon after the introduction by the British of the policy of setting up political institutions in India on the lines of western democracies based on majority rule which means that the majority of the nation or society could impose its will on the minority of the nation or society in spite of their opposition as amply demonstrated during the two and half years' regime of 'Congress Governments in the Hindu majority provinces under the Government of India Act, 1935, when the Muslims were subjected to untold harassment and oppression as a result of which they were convinced of the futility and ineffectiveness of the so-called safeguards provided in the constitution and in the Instruments of Instructions to the Governors and were driven to the irresistible conclusion that in a United India Federation, if established, the muslims even in Muslims majority provinces, could meet with no better fate and their rights and interests could never be adequately protected against the perpetual Hindu majority at the centre;

Whereas the Muslims are convinced that with a view to saving Muslim India from the domination of the Hindus and in order to afford them full scope to develop themselves according to their genius, it is necessary to constitute a sovereign, independent state comprising Bengal and Assam in the North-East zone and in Punjab, North-West Frontier Province, Sind and Baluchistan in the North-West zone;

This convention of the Muslim League legislators of India, central and provincial, after careful consideration, hereby declares that the Muslim nation will never submit to any constitution for a United India and will never participate in any single constitution-making machinery set up for the purpose, and any formula devised by the British government for transferring power from the British to the people of India, which does not conform to the following just and equitable principles calculated to maintain internal peace and tranquility in the country, will not contribute to the solution of the Indian problem:

1. That the zones comprising Bengal and Assam in the North-East and the Punjab, North-West Frontier Province, Sind

and Balucbistan in the North West of India, namely Pakistan Zones, where the Muslims are in a dominant majority, be constituted into one sovereign independent state and that an unequivocal undertaking be given to implement the establishment of Pakistan without delay.

2. That two separate constitution making bodies be set up by the peoples of Pakistan and Hindustan for the purpose of framing their respective constitutions.
3. That the minorities in Pakistan and Hindustan be provided with safeguards on the line of the All India Muslim League resolution passed on March 23, 1940 at Lahore.
4. That the acceptance of the Muslim League demand for Pakistan and its implementation without delay are the sine qua non for the Muslim League co-operation and participation in the formation of an interim Government at the centre.

This convention further emphatically declares that any attempt to impose a constitution on a United India basis or to force any interim arrangement at the centre contrary to the Muslim demand, will leave the Muslims no alternative but to resist such imposition by all possible means for their survival and national existence.

জনাব সোহরাওয়ার্দীর বক্তৃতার পরে প্রায় বিশ-পঁচিশজন নেতা বিভিন্ন প্রদেশ থেকে বক্তৃতা করেন এবং প্রস্তাবটা সমর্থন করেন। জনাব আবুল হাশিম সাহেবও চমৎকার বক্তৃতা করেছিলেন। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে পাস হওয়ার পরে জনাব লিয়াকত আলী খান একটা শপথনামা পেশ করেন এবং সমস্ত প্রদেশের আইনসভার মুসলিম লীগ দলীয় সদস্যরা এতে দস্তখত করেন।



কনভেনশন সমাপ্ত হওয়ার পরে যারা হাওড়া স্টেশনে আমাদের বিদায় জানাতে এসে ট্রেনে উঠে পড়েছিল তারা মহাবিপদের সম্মুখীন হল। কি করে কলকাতা ফিরে আসবে? স্পেশাল ট্রেন তো আর কলকাতা ফিরে যাবে না। কি করি, ভেবে আর কূল পাই না। আমরা পূর্ব থেকে প্রস্তুত হয়ে এসেছিলাম দিল্লি থেকে আজমীর শরীফে খাজাবাবার দরগাহ জিয়ারত করব, আবার আজমীর থেকে আগ্রায় তাজমহল দেখতে যাব। ১৯৪৩ সালে তাজমহল না দেখে ফিরে যেতে হয়েছিল। এবার যেভাবে হয় দেখতেই হবে। ছোটকাল

থেকে আশা করে রয়েছি, সুযোগ আবার কখন হবে কে জানে? যাহোক, আমি ও আরও কয়েকজন সহকর্মী শহীদ সাহেবের শরণাপন্ন হলাম এবং ছাত্রদের অসুবিধার কথা বললাম। শহীদ সাহেব বললেন, "কেন, একজন তো টাকা নিয়ে গেছে, এদের ভাড়া দেবার কথা বলে। তোমার সাথে আলোচনা করে টাকা দিতে বলেছি।" বললাম, "জানি না তো স্যার, সে তো চলে গিয়েছে।" শহীদ সাহেব রাগ করলেন। তিনি ছাত্র নন, তার নাম আজ আর আমি বলতে চাই না। শহীদ সাহেব আবারও কিছু টাকা দিলেন। হিসাব করে প্রত্যেককে পঁচিশ টাকা করে, এতেই হয়ে যাবে। খন্দকার নূরুল আলম ও আমি সকলকে পঁচিশ টাকা করে দিয়ে রসিদ নিয়ে নিলাম, প্রত্যেকের কাছ থেকে। তারা বিদায় হয়ে কলকাতায় চলে গেল। আমরা আট-দশজন জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরী সাহেবের সাথে আজমীর শরীফ রওয়ানা করলাম। চৌধুরী সাহেব সাথে আছেন, টাকার দরকার পড়লে অসুবিধা হবে না। আবার দিল্লি শহরকে ভাল করে দেখে নিলাম। শত শত বৎসর মুসলমানরা দিল্লি থেকে সমস্ত ভারতবর্ষ শাসন করেছে। তখন কি জানতাম, এই দিল্লির উপর আমাদের কোনো অধিকার থাকবে না। দিল্লির লালকেল্লা, কুতুব মিনার, জামে মসজিদ আজও অনন্য মুসলিম শিল্পের নিদর্শন ঘোষণা করছে। পুরানা দিল্লি ও তার আশপাশে যখনই বেড়াতে গিয়েছি দেখতে পেয়েছি সেই পুরানা স্মৃতি।

আমরা দলেবলে আজমীর শরীফ যাবার উদ্দেশ্যে ট্রেনে চড়ে বসলাম। কত গল্পই না শুনেছি বাড়ির গুরুজনদের কাছ থেকে। 'খাজাবাবার দরগায় গিয়ে যা চাওয়া যায়, তাই পাওয়া যায়, যদি চাওয়ার মত চাইতে পারো।' আমরা যখন আজমীর শরীফ স্টেশনে পৌঁছালাম দেখি বহু লোক তাদের কামরায় থাকবার জন্য আমাদের অনুরোধ করছিলেন। ভাবলাম, ব্যাপার কি? আমাদের এত আদর কেন? আমরা কারও দাওয়াত কবুল করছি না, কারণ চৌধুরী সাহেবই আমাদের প্রতিনিধি। তিনি যা করবেন তাই আমাদের করতে হবে। তিনি মালপত্র নিয়ে প্রথম শ্রেণী থেকে নেমে আসলেন এবং একজন ভদ্রলোককে বললেন, চলুন আপনার ওখানেই যাওয়া যাবে। তিনি তাড়াতাড়ি গাড়ি ডেকে আমাদের নিয়ে চললেন। আমাদের জন্য কামরার অভাব নাই। গোসল করলাম, খাওয়া-দাওয়া করলাম। পরে বুঝতে পারলাম, এরাই খাদেম। আজমীর শরীফের খাদেমদের যথেষ্ট ভদ্রতাবোধ আছে দেখলাম, তারা কিছুই চেয়ে নেয় না। থাকার বন্দোবস্ত করবে, খাবার ব্যবস্থা করবে, সাথে লোক দেবে, যে খরচগুলি করার একটা নিয়ম আছে সেগুলিই শুধু আপনাকে দিতে হবে। ফিরে আসার সময় আপনারা যা দিবেন, তাই তারা গ্রহণ করবে। শুনেছি, যে টাকা তারা গ্রহণ করে, তার একটা অংশ নাকি দিতে হয় দরগাহ কমিটিকে। কারণ, দরগাহ কমিটির যথেষ্ট খরচ আছে। খাজাবাবার দরগায় কোন লোক না খেয়ে থাকে না। পাক হতে থাকে, মানুষ খেতে থাকে।

আমরা দরগায় রওয়ানা করলাম, পৌঁছে দেখি এলাহী কাণ্ড! শত শত লোক আসে আর যায়। সেজদা দিয়ে পড়ে আছে অনেক লোক। চিৎকার করে কাঁদছে, কারো কারো বা দুঃখে দুই চক্ষু বেয়ে পানি পড়ছে। সকলের মুখে একই কথা, 'খাজাবাবা, দেখা দে।'

খাজাবাবার দরগার পাশে বসে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান হচ্ছে। যদিও বুঝতাম না ভাল করে, তবুও মনে হত আরও শুনি। আমরা দরগাহ জিয়ারত করলাম, বাইরে এসে গানের আসরে বসলাম। অনেকক্ষণ গান শুনলাম, যাকে আমরা 'কাওয়ালী' বলি। কিছু কিছু টাকা আমরা সকলেই কাওয়ালকে দিলাম। ইচ্ছা হয় না উঠে আসি। তবুও আসতে হবে। আমরা তারাগড় পাহাড়ে যাব, সেখানে কয়েকটি মাজার আছে। তাঁরা খাজাবাবার খলিফা ছিলেন। তারাগড় পাহাড় অনেক উঁচুতে, আমাদের উঠতে হবে তার উপরে। কি করে এই পাহাড় অতিক্রম করে মুসলমান সৈন্যরা পৃথ্বীরাজকে যুদ্ধে পরাজিত করেছিল? সেই যুদ্ধে, যখন হাওয়াই জাহাজের জন্ম হয় নাই।

ইতিহাসের ছাত্রদের জানা আছে, খাজাবাবা কেনই বা এই জায়গা বেছে নিয়েছিলেন। সে ইতিহাসও খাদেম সাহেবের প্রতিনিধি আমাদের শোনাল। খাদেম সাহেব একজন প্রতিনিধি আমাদের সাথে দিয়েছিল। আমরা তারাগড়ে উঠলাম। অনেকক্ষণ সেখানে ছিলাম। তারাগড় পাহাড় থেকে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায় শুধু মরুভূমি। আর একদিকে আজমীর শহর। সেখান থেকে নেমে আসলাম যখন তখন দুপুর পার হয়ে গেছে। আমরা খাদেম সাহেবের আস্তানায় এসে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে আবার বেরিয়ে পড়লাম, আনার সাগরে যাবার উদ্দেশে।

বিরাট লেক, সকল পাড়েই শহর গড়ে উঠেছে আজকাল। একপাশে মোগল আমলের কীর্তি পড়ে আছে। এখানে এসে বাদশা ও বেগমরা বিশ্রাম করতেন। বাদশা শাহজাহানের কীর্তিই সকলের চেয়ে বেশি। বাদশা ও বেগম যেখানে থাকতেন সে জায়গাটা আজও আছে। সাদা মর্মর পাথরের দ্বারা তৈরি। আমরা সমস্ত সন্ধ্যা সেখানেই কাটালাম। সন্ধ্যার পর আস্তে আস্তে শহরের দিকে রওয়ানা করলাম। পানির দেশের মানুষ আমরা, পানিকে বড় ভালবাসি। আর মরুভূমির ভিতর এই পানির জায়গাটুকু ছাড়তে কত যে কষ্ট হয় তা কি করে বোঝাব! আমাদের বন্ধুদের মধ্যে একজন বলেছিল, রাতটা এখানে কাটালে কেমন হয়? সত্যিই ভাল হত, কিন্তু উপায় নাই। রাতে কাউকেও থাকতে দেওয়া হয় না, এই জায়গাটায়। আবার থাকতে চেষ্টা করলে যদি পুলিশ বাহাদুররা গ্রেফতার করে নিয়ে যায় তবে কে এই বিভূঁই বিদেশে আমাদের হাজত থেকে রক্ষা করবে!

সন্ধ্যার পরে খাজাবাবার দরগাহে ফিরে এলাম। কিছু সময় সেখানে থেকে আবার আমাদের আস্তানায় চলে এলাম। খাদেম সাহেব আমাদের জন্য খুব ভাল খাবার বন্দোবস্ত করেছে। রাতটা খুব আরামেই ঘুমালাম।

আজমীর শরীফকে বিদায় দিয়ে আবার আমরা ট্রেনে উঠে বসলাম আগ্রার দিকে, যেখানে মমতাজ বেগম শুয়ে আছেন তাজমহলকে বুকে করে। বহুদিনের স্বপ্ন তাজমহল দেখব মোগল শিল্পের ও স্থাপত্যকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এই তাজ। বাদশা শাহজাহানের অমর প্রেমের নিদর্শন এই তাজ। পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম এই তাজ। আমাদের নিজেদের মধ্যে তাজ দেখা নিয়ে অনেক আলোচনা হল। দুনিয়ার বহু দেশ থেকে বহু লোক শুধু তাজ দেখার জন্য ভারতবর্ষে আসত। তাজমহলের কথা জানে না, এমন মানুষ দুনিয়ায় খুব

বিরল। আমাদের দেরি আর সইছে না। মনে হচ্ছে ট্রেন খুব আস্তে আস্তে চলছে, কারণ তাজ দেখার উদগ্র আগ্রহ আমাদের পেয়ে বসেছে। আমরা তো ভাবি নাই ঠিক পূর্ণিমার দিনে আগ্রা পৌঁছাব। আমরা হিসাব করে দিন ঠিক করে আসি নাই। মনে মনে পূর্ণিমাকে ধন্যবাদ দিলাম, আর আমাদের কপালকে ধন্যবাদ না দিলে অন্যায় হত, তাই তাকেও দিলাম। আমরা আগ্রায় পৌঁছালাম সকালের দিকে। দুই দিন আমরা আগ্রায় থাকব। কোন একটা হোটেলে উঠব ঠিক করলাম। লোক তো আমরা কম না, প্রায় বার চৌদ্দজন। অনেক টাকা খরচ করতে হবে। মোসাফিরখানা হলেই আমাদের সুবিধা হত। আগ্রা স্টেশনে পৌঁছালাম, অনেক হোটেলের লোকই তাদের হোটেলে থাকতে আমাদের অনুরোধ করল। এক ভদ্রলোক এলেন, তিনি বললেন, "আপনারা বাংলাদেশ থেকে এসেছেন, একটা বাঙালি হোটেল আছে, সেখানেই আপনাদের সুবিধা হবে।" চৌধুরী সাহেব বললেন, "আপনাদের হোটেলে তাঁবু আছে? আমরা অনেক লোক।" তিনি বললেন, "তাঁবু খাটিয়ে দিতে পারব।" ঠিক হল, আগ্রা হোটেলেই যাব। চৌধুরী সাহেব একটা রুম নিলেন, আমাদের জন্য দুইটা তাঁবু ঠিক করে দেওয়া হল। আমরা খাটিয়া পেলেই খুশি। শুধু প্রয়োজন আমাদের গোসল করার পানি, আর পায়খানা। হোটেলের মালিক বাঙালি, খুব ভদ্রলোক, আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। আমাদের যাবতীয় বন্দোবস্ত করতে ম্যানেজারকে হুকুম দিলেন। কত টাকা দিতে হবে চৌধুরী সাহেবই ঠিক করলেন, তিনিই দিয়েছিলেন। আমাদের কিছুই দিতে হয় নাই।

তাড়াতাড়ি আমরা গোসল করে কিছু খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম, মন তো মানছে না, তাজ দেখার উদগ্র আগ্রহ। টাঙ্গা ভাড়া করে তাজ দেখতে রওয়ানা করলাম। প্রখর রৌদ্র। কি দেখলাম ভাষায় প্রকাশ আমি করতে পারব না। ভাষার উপর আমার সে দখলও নাই। শুধু মনে হল, এও কি সত্য! কল্পনায় যা করেছিলাম, তার চেয়ে যে এ অনেক সুন্দর ও গাম্ভীর্যপূর্ণ। তাজকে ভালভাবে দেখতে হলে আসতে হবে সন্ধ্যায় সূর্য অস্ত যাবার সময়, চাঁদ যখন হেসে উঠবে তখন। আমরা বেশি দেরি করলাম না, কারণ আগ্রা দুর্গ ও ইতমতউদ্দৌলা দেখতে হবে সন্ধ্যার পূর্বেই। যখন সূর্য অস্ত যাবে তার একটু পূর্বেই ফিরে আসতে হবে তাজমহলে। টাঙ্গাগুলিকে আমরা দাঁড় করেই রেখেছিলাম।

ইতমতউদ্দৌলা—বেগম নূরজাহানের পিতার কবর। আমরা আগ্রা দুর্গে এলাম। দেওয়ানি আম, মতি মসজিদ, মছি তবন, নাগিনা মসজিদ সবই ঘুরে ঘুরে দেখলাম। দেওয়ানি খাস ও জেসমিন টাওয়ার দেখতেও ভুল করলাম না। দিল্লির লালকেল্লার সাথে এর যথেষ্ট মিল আছে। মোগল আমলের শিল্প একই রকমের, দেখলেই বোঝা যায়। যমুনার দিকে বারান্দায় কতগুলি পাথর ছিল। সেই পাথরের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে তাজকে দেখা যেত। এখন আর পাথরগুলি নাই। একটা কাঁচ লাগান আছে। এই কাঁচের মধ্যেও পরিষ্কারভাবে তাজকে দেখা যায়। আমরা সকলেই দেখলাম, শীশ মহল দেখে রওয়ানা করলাম। আমাদের যে ভদ্রলোক ঘুরে দেখাচ্ছিলেন, তিনি অনেক কথাই বলছিলেন। কিছু সত্য, কিছু গল্প, তবে একটা কথা সত্য, মোগলদের পতনের পরে বার বার লুটতরাজ হয়েছে। জাঠ ও মারাঠি এবং শেষ আঘাত হেনেছে ইংরেজ। জাঠ ও মারাঠিরা কিছু কিছু লুট করেই চলে গিয়েছিল,

পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠার চিত্রলিপি

কিন্তু ইংরেজ সবকিছু লুট করেই নিয়ে গিয়েছে ভারতবর্ষ থেকে। লর্ড স্থানীয় লোকরাই এই লুটের প্রধান কর্ণধার ছিলেন। ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের অনেক জায়গায়ই মোগল শিল্পের অনেক নিদর্শন আছে। আমরা ইতমতউদ্দৌলা দেখে ফিরে চললাম তাজমহল দেখতে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। দিল্লির লালকেল্লা পূর্বেই দেখেছি, তাই আগ্রা দুর্গ দেখতে আমাদের সময় লাগার কথা না।

সূর্য অস্তাচলগামী, আমরাও তাজমহলের দরজায় হাজির। অনেকক্ষণ থাকব, রাত দশটা পর্যন্ত দরজা খোলা থাকে, তারপর দারোয়ান সাহেবরা এসে ঘণ্টা দিয়ে জানিয়ে দিবে সময় হয়ে গেছে। তাজকে ত্যাগ করতে হবে, রাতের জন্য। আমরা বসে পড়লাম, একটা জায়গা বেছে নিয়ে কয়েকজন নামাজ পড়তে গেলেন। আজানের ধ্বনি কানে এসেছে। পাকিস্তান হওয়ার পরও আজান হয় কি না জানি না। এই দিনে অনেক লোক দেশ-বিদেশ থেকে এসেছে। বাঙালি, মারাঠি, পাঞ্জাবি—মনে হল ভারতবর্ষের সকল জায়গার লোকই এসেছে। আমাদের পথপ্রদর্শককে জিজ্ঞাসা করলাম, এত ভিড় কি সকল সময়ই থাকে? বললেন, না, পূর্ণ চন্দ্রের সময়ই অনেক লোক বিশেষ করে আসে। সূর্য যখন অস্ত গেল, সোনালি রঙ আকাশ থেকে ছুটে আসছে। মনে হল, তাজের যেন আর একটা নতুন রূপ। সন্ধ্যার একটু পরেই চাঁদ দেখা দিল। চাঁদ অন্ধকার ভেদ করে এগিয়ে আসছে আর সাথে সাথে তাজ যেন ঘোমটা ফেলে দিয়ে নতুন রূপ ধারণ করেছে। কি অপূর্ব দেখতে! আজও একুশ বৎসর পরে লিখতে বসে তাজের রূপকে আমি ভুলি নাই, আর ভুলতেও পারব না। দারোয়ান দরোজা বন্ধ করার পূর্ব পর্যন্ত আমরা তাজমহলেই ছিলাম।

পরের দিন সকালবেলা আমাদের যেতে হবে ফতেহপুর সিক্রিতে। চৌধুরী সাহেব একটা মোটর বাস ঠিক করেছিলেন। ফতেহপুর সিক্রি ও সেকেন্দ্রা দেখে বিকালে ফিরে আসব এবং রাতেই আমাদের রওয়ানা করতে হবে তুন্দলার পথে। তুন্দলা একটা জংশন। দিল্লি থেকে তুন্দলা হয়ে ট্রেন হাওড়া যায়। হাওড়াগামী ট্রেন ধরা হবে। সকালবেলায় মোটর বাস এসে হাজির। আমরা তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে গাড়িতে চেপে বসলাম। চৌধুরী সাহেব এলেই গাড়ি ছেড়ে দিল। মাত্র আটাশ মাইল পথ; কত সময়ই বা লাগবে! মোগলদের স্থাপত্য শিল্পের গল্প করতে করতেই আমরা এসে পড়লাম ফতেহপুর সিক্রিতে। আকবর বাদশা নিজেই ফতেহপুর সিক্রি নির্মাণ করেছিলেন। এখানে সম্রাট আকবর তাঁর রাজধানী করেছিলেন। আগ্রার দুর্গের সাথে এর বিশেষ পার্থক্য ছিল না। তবে ফতেহপুর সিক্রি অনেক বড়। এই ফতেহপুর সিক্রির সামনেই যে বিরাট ময়দান দেখা যায় এর নামই খানওয়া। এখানেই সম্রাট বাবর সংগ্রাম সিংহকে পরাজিত করে ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি গড়ে তুলেছিলেন। কেন যে আকবর বাদশা এখানে দুর্গ তৈরি করেন তা বলা কষ্টকর। এ বিষয়ে বিভিন্ন ঐতিহাসিকের বিভিন্ন মত। আমরা আগ্রা গেট পার হয়ে ভিতরে এলাম, সামনে বুলন্দ দরোজা। এটাই হল দুর্গের প্রধান গেট। একশত চৌত্রিশ ফিট উঁচু বুলন্দ দরোজা পার হয়েই আমরা প্রথম দেখতে পেলাম সেলিম চিশতীর দরগাহ। তাঁর মাজার জিয়ারত করে আমরা দুর্গের ভিতর প্রবেশ করব। দরগাহ জিয়ারত করলাম। সেলিম চিশতী ছিলেন

বাদশাহ আকবরের পীর। আজমীরের খাজাবাবার দরগায় দেখলাম গান বাজনা চলছে সমানে, এখানেও দেখলাম সেই একই অবস্থা। আমাদের বাংলাদেশের মাজারে গান বাজনা করলে আর উপায় থাকত না। খাজাবাবা মঈনুদ্দিন চিশতী ও সেলিম চিশতী দুইজনই নাকি গান ভালবাসতেন। আমরা এক এক করে এবাদতখানা থেকে আরম্ভ করে আবুল ফজলের বাড়ি, হামামখানা, ধর্মশালা, মিনা মসজিদ, যোধাবাঈ মহল ও সেলিম গড় দেখতে শুরু করলাম।

এক একজনে এক একটা জায়গা দেখতে চায়। আমি দেখতে চেয়েছিলাম তানসেনের বাড়ি। শেষ পর্যন্ত তানসেনের বাড়ি দেখতে গেলাম। তাঁর বাড়িটা প্রাসাদের বাইরে, পাহাড়ের ওপর ছোট্ট একটা বাড়ি। বোধহয় সঙ্গীত সাধনায় ব্যাঘাত হবে, তাই তিনি দূরে থাকতেই ভালবাসতেন। আমার মন যেন সান্ত্বনা পেল না তানসেনের বাড়ি দেখে। যা হোক, বহুদিনের কথা, এ বাড়িতে তিনি ছিলেন কি না শেষ পর্যন্ত তারই বা ঠিক কি? সম্রাট তো এত অর্থ খরচ করে যে প্রাসাদ ও দুর্গ তৈরি করলেন, দু'বছরের বেশি থাকতে পারেন নাই, আবার আগ্রা দুর্গে ফিরে যেতে হয়েছিল। ঐতিহাসিকদের মতে, পানির অভাবের জন্য। আমার মন স্বীকার করতে চায় না যে, পানির জন্য তিনি চলে যান। মনে হয় অন্য কোন কারণ ছিল। আট বর্গমাইল জায়গা নিয়ে ফতেহপুর সিক্রি, রাজপ্রাসাদ ও দুর্গ গড়ে তোলেন—যার মধ্যে দুই হাজার নয়শত ঘর ছিল। আগ্রা দুর্গে ছিল প্রায় পাঁচশত ঘর। ফতেহপুর সিক্রিতে সম্রাটের সমস্ত অমাত্যবৃন্দের থাকার জায়গা হয়েও ষাট হাজার সৈন্য থাকতে পারত। সম্রাট আকবরের শক্তি এবং সামর্থ্য ছিল, তিনি এদের জন্য পানির ব্যবস্থা করতে পারেন নাই, পানির কষ্টেই তিনি ফতেহপুর সিক্রি ছেড়ে আসেন, এটা যেন বিশ্বাস করতে মন চাইল না।

আমাদের আবার সন্ধ্যায় ট্রেন ধরতে হবে। লোকাল ট্রেন আগ্রা থেকে তুন্দলা পর্যন্ত যায়। ফতেহপুর সিক্রির পাশেই একটা ডাকবাংলো আছে। আমরা সকলেই কিছু খেয়ে নিয়ে রওয়ানা করলাম সেকেন্দ্রায়, যেখানে সম্রাট আকবর চিরনিদ্রায় শায়িত। এই সমাধি স্থান তিনি নিজেই ঠিক করে গিয়েছিলেন। দিল্লি থেকে শুরু করে অনেক রাজা-বাদশার সমাধি আমি দেখেছি, কিন্তু সেকেন্দ্রায় আকবরের সমাধির ভাবগম্ভীর ও সাদাসিধে পরিবেশটা আমার বেশ লেগেছিল। সমস্ত জায়গাটা জুড়ে অনেক রকমের গাছপালায় ভরা, ফল ও ফুলের গাছ! সমাধিটা সাদা পাথরের তৈরি।

আমাদের সময় হয়ে এসেছে, ফিরতে হবে। চৌধুরী সাহেব তাড়া দিলেন। আমরাও গাড়িতে উঠে বসলাম। আগ্রায় ফিরে এসেই মালপত্র নিয়ে রওয়ানা করলাম তুন্দলা স্টেশনে। এসে দেখি বাংলাদেশের অনেক সহকর্মীই এখানে আছেন। অনেক ভিড়। মালপত্র চৌধুরী সাহেবের প্রথম শ্রেণীর গাড়িতে ফেলে আমরা তাড়াতাড়ি উঠে পড়তে চেষ্টা করলাম। যখন সকলেই উঠে গেছে ট্রেনে, আমি আর উঠতে না পেরে এক ফার্স্ট ক্লাসের দরোজার হাতল ধরে দাঁড়ালাম। আমার সাথে আরেক বন্ধু ছিল। পরের স্টেশনে যে কোন বগিতে উঠে পড়ব। অনেক ধাক্কাধাক্কি করলাম, প্রথম শ্রেণীর ভদ্রলোক দরোজা খুললেন না। ট্রেন ভীষণ জোরে চলছে, আমাদের ভয় হতে লাগল, একবার হাত ছুটে গেলে আর উপায়

নাই। আমি দুই হাতলের মধ্যে দুই হাত ভরে দিলাম, আর ওকে বুকের কাছে রাখলাম। মেলট্রেন—স্টেশন কাছাকাছি হবে না। আমাদের কিন্তু অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ছিল। বাতাসে হাত-পা অবশ হতে চলেছে। আর কিছু সময় চললে আর উপায় নাই। কিছুক্ষণ পরেই হঠাৎ ট্রেন থেমে গেল। আমরা নেমে পড়লাম। 'আনোয়ার' 'আনোয়ার' বলে ডাকতে শুরু করলাম। মধ্যম শ্রেণীতে আনোয়ার ছিল, ওর কাছেই আমার বিছানা। আমাদের জন্য আনোয়ার খুব উদ্বিগ্ন ছিল। জানালা দিয়ে কোনক্রমে ট্রেনের ভিতর উঠলাম। ট্রেন ছেড়ে দিল। পরের দিন সন্ধ্যায় আমরা হাওড়া স্টেশনে পৌঁছালাম। সকলের সকল কিছুই আছে, আমার সুটকেসটা হারিয়ে গেছে। শুধু বিছানাটা নিয়ে কলকাতা ফিরে এলাম।

এরপর ভাবলাম কিছুদিন লেখাপড়া করব। মাহিনা বাকি পড়েছিল, টাকা পয়সার অভাবে। এত টাকা বাড়ি না গেলে আব্বার কাছ থেকে পাওয়া যাবে না। এক বৎসর মাহিনা দেই নাই। কাপড় জামাও নতুন করে বানাতে হবে। প্রায় সকল কাপড়ই চুরি হয়ে গেছে। বাড়িতে এসে রেণুর কাছে আমার অবস্থা প্রথমে জানালাম। দিল্লি ও আগ্রা থেকে রেণুকে চিঠিও দিয়েছিলাম। আব্বাকে বলতেই হবে। আব্বাকে বললে তিনি অসন্তুষ্ট হলেন মনে হল। কিছুই বললেন না। পরে বলেছিলেন, "বিদেশ যখন যাও বেশি কাপড় নেওয়া উচিত নয় এবং সাবধানে থাকতে হয়।" টাকা দিয়ে আব্বা বললেন, "কোনো কিছুই শুনতে চাই না। বিএ পাস ভালভাবে করতে হবে। অনেক সময় নষ্ট করেছ, 'পাকিস্তানের আন্দোলন' বলে কিছুই বলি নাই। এখন কিছুদিন লেখাপড়া কর।" আব্বা, মা, ভাইবোনদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রেণুর ঘরে এলাম বিদায় নিতে। দেখি কিছু টাকা হাতে করে দাঁড়িয়ে আছে। 'অমঙ্গল অশ্রুজল' বোধহয় অনেক কষ্টে বন্ধ করে রেখেছে। বলল, "একবার কলকাতা গেলে আর আসতে চাও না। এবার কলেজ ছুটি হলেই বাড়ি এস।"

কলকাতা এসে মাহিনা পরিশোধ করে যে বইপত্রগুলি বন্ধুবান্ধবরা পড়তে নিয়েছিল, তার কিছু কিছু চেয়ে নিলাম। কলেজে যখন ক্লাস করতে যেতাম প্রফেসর সাহেবরা জানতেন, আর দু'একজন বলতেনও, "কি সময় পেয়েছ কলেজে আসতে।" আমি কোনো উত্তর না দিয়ে নিজেই হাসতাম, সহপাঠীরাও হাসত। পড়তে চাইলেই কি আর লেখাপড়া করা যায়! ক্যাবিনেট মিশন তখন ভারতবর্ষে। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ তাদের দাবি নিয়ে আলোচনা করছে ক্যাবিনেট মিশনের সাথে। আমরাও পাকিস্তান না মানলে, কোনোকিছু মানব না। মুসলিম লীগ ও মিল্লাত অফিসে রোজ চায়ের কাপে ঝড় উঠত। মাঝে মাঝে মিটিং হয়, বক্তৃতাও করি। এই সময় ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ গ্রহণ করবে। তাতে দেশ রক্ষা, পররাষ্ট্র ও যোগাযোগব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকবে এবং বাকি সব বিষয়ই প্রদেশের হাতে দেওয়া হয়েছিল। পরে কংগ্রেস চুক্তিভঙ্গ করে, যার ফলে ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান পরিত্যক্ত হয়। এমনভাবে ক্যাবিনেট মিশন আলোচনা করছিল, আমাদের মনে হচ্ছিল ইংরেজ সরকার কংগ্রেসের হাতে শাসন ক্ষমতা দিয়ে চলে যেতে পারলে বাঁচে। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কংগ্রেস ও ব্রিটিশ সরকারকে ভালভাবে জানতেন ও বুঝতেন, তাই তাঁকে ফাঁকি দেওয়া সোজা ছিল না।

পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠার চিত্রলিপি



২৯ জুলাই জিন্নাহ সাহেব অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ কাউন্সিল সভা বোম্বে শহরে আহ্বান করলেন। অর্থের অভাবের জন্য আমি যেতে পারলাম না। জিন্নাহ সাহেব ১৬ আগস্ট তারিখে 'ডাইরেক্ট এ্যাকশন ডে' ঘোষণা করলেন। তিনি বিবৃতির মারফত ঘোষণা করেছিলেন, শান্তিপূর্ণভাবে এই দিবস পালন করতে। ব্রিটিশ সরকার ও ক্যাবিনেট মিশনকে তিনি এটা দেখাতে চেয়েছিলেন যে, ভারতবর্ষের দশ কোটি মুসলমান পাকিস্তান দাবি আদায় করতে বদ্ধপরিকর। কোনো রকম বাধাই তারা মানবে না। কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার নেতারা এই 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস', তাদের বিরুদ্ধে ঘোষণা করা হয়েছে বলে বিবৃতি দিতে শুরু করলেন।

আমাদের আবার ডাক পড়ল এই দিনটা সুষ্ঠুভাবে পালন করার জন্য। হাশিম সাহেব আমাদের নিয়ে সভা করলেন। আমাদের বললেন, "তোমাদের মহল্লায় মহল্লায় যেতে হবে, হিন্দু মহল্লায়ও তোমরা যাবে। তোমরা বলবে, আমাদের এই সংগ্রাম হিন্দুদের বিরুদ্ধে নয়, ব্রিটিশের বিরুদ্ধে, আসুন আমরা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে এই দিনটা পালন করি।" আমরা গাড়িতে মাইক লাগিয়ে বের হয়ে পড়লাম। হিন্দু মহল্লায় ও মুসলমান মহল্লায় সমানে প্রপাগান্ডা শুরু করলাম। অন্য কোন কথা নাই, 'পাকিস্তান' আমাদের দাবি। এই দাবি হিন্দুর বিরুদ্ধে নয়, ব্রিটিশের বিরুদ্ধে। ফরোয়ার্ড ব্লকের কিছু নেতা আমাদের বক্তৃতা ও বিবৃতি শুনে মুসলিম লীগ অফিসে এলেন এবং এই দিনটা যাতে শান্তিপূর্ণভাবে হিন্দু মুসলমান এক হয়ে পালন করা যায় তার প্রস্তাব দিলেন। আমরা রাজি হলাম। কিন্তু হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেসের প্রপাগান্ডার কাছে তারা টিকতে পারল না। হিন্দু সম্প্রদায়কে বুঝিয়ে দিল এটা হিন্দুদের বিরুদ্ধে।

সোহরাওয়ার্দী সাহেব তখন বাংলার প্রধানমন্ত্রী। তিনিও বলে দিলেন, "শান্তিপূর্ণভাবে যেন এই দিনটা পালন করা হয়। কোনো গোলমাল হলে মুসলিম লীগ সরকারের বদনাম হবে।" তিনি ১৬ই আগস্ট সরকারি ছুটি ঘোষণা করলেন। এতে কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা আরও ক্ষেপে গেল।

১৫ই আগস্ট কে কোথায়, কোন এরিয়ায় থাকবে ঠিক হয়ে গেল। ১৬ই আগস্ট কলকাতার গড়ের মাঠে সভা হবে। সমস্ত এরিয়া থেকে শোভাযাত্রা করে জনসাধারণ আসবে। কলকাতার মুসলমান ছাত্ররা ইসলামিয়া কলেজে সকাল দশটায় জড়ো হবে। আমার উপর ভার দেওয়া হল ইসলামিয়া কলেজে থাকতে। শুধু সকাল সাতটায় আমরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাব মুসলিম লীগের পতাকা উত্তোলন করতে। আমি ও নূরুদ্দিন সাইকেলে করে বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত হলাম। পতাকা উত্তোলন করলাম। কেউই আমাদের বাধা দিল না। আমরা চলে আসার পরে পতাকা নামিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিল শুনেছিলাম। আমরা কলেজ স্ট্রিট থেকে বউবাজার হয়ে আবার ইসলামিয়া কলেজে ফিরে এলাম। কলেজের দরজা ও হল খুলে দিলাম। আর যদি আধা ঘণ্টা দেরি করে আমরা বউবাজার হয়ে আসতাম তবে আমার ও নূরুদ্দিনের লাশও আর কেউ খুঁজে পেত না। তাবসাব যে

খারাপ আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যখন ফিরে আসি। নূরুদ্দিন আমাকে কলেজে রেখে লীগ অফিসে চলে গেল। বলে গেল, শীঘ্রই ফিরে আসবে।

বেকার হোস্টেল থেকে মাত্র কয়েকজন কর্মী এসে পৌঁছেছে। আমি ওদের সভাকক্ষ খুলে টেবিল চেয়ার ঠিক করতে বললাম। কয়েকজন মুসলিম ছাত্রী মনুজান হোস্টেল থেকে ইসলামিয়া কলেজে এসে পৌঁছেছেন। এরা সকলেই মুসলিম ছাত্রলীগের কর্মী ছিলেন। এর মধ্যে হাজেরা বেগম (এখন হাজেরা মাহমুদ আলী), হালিমা খাতুন (এখন নূরুদ্দিন সাহেবের স্ত্রী), জয়নাব বেগম (এখন মিসেস জলিল), সাদেকা বেগম (এখন সাদেকা সামাদ) তাদের নাম আমার মনে আছে। এরা ইসলামিয়া কলেজে পৌঁছার কয়েক মিনিটের মধ্যে দেখা গেল কয়েকজন ছাত্র রক্তাক্ত দেহে কোনোমতে ছুটে এসে ইসলামিয়া কলেজে পৌঁছেছে। কারও পিঠে ছোরার আঘাত, কারও মাথা ফেটে গেছে। কি যে করব কিছুই বুঝতে পারছি না। কারণ, এ জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। মেয়েরা এগিয়ে এসে বললেন, "যারা জখম হয়েছে, তাদের আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেন। পানির বন্দোবস্ত করেন।" কোথায় এরা কাপড় পাবে ব্যান্ডেজ করতে? যার যার ওড়না ছিঁড়ে, শাড়ি কেটে ব্যান্ডেজ করতে শুরু করল। কাছেই হোস্টেল, তাড়াতাড়ি খবর দিলাম। এদের ব্যান্ডেজ করেই একজন পরিচিত ডাক্তার ছিলেন তাঁর বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে শুরু করলাম।

একজন ছাত্র বলল, দল বেঁধে আসলে হিন্দুরা আক্রমণ করছে না, তবে একজন দু'জন পেলেই আক্রমণ করছে। আরও খবর এল, রিপন কলেজে ছাত্ররা পতাকা উত্তোলন করতে গেলে তাদের উপর আক্রমণ হয়েছে।

ইসলামিয়া কলেজের কাছেই সুরেন ব্যানার্জি রোড, তারপরেই ধর্মতলা ও ওয়েলিংটন স্কয়ারের জংশন। এখানে সকলেই প্রায় হিন্দু বাসিন্দা। আমাদের কাছে খবর এল, ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মসজিদে আক্রমণ হয়েছে। ইসলামিয়া কলেজের দিকে হিন্দুরা এগিয়ে আসছে। কয়েকজন ছাত্রকে ছাত্রীদের কাছে রেখে, আমরা চল্লিশ পঞ্চাশজন ছাত্র প্রায় খালি হাতেই ধর্মতলার মোড় পর্যন্ত গেলাম। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা কাকে বলে এ ধারণাও আমার ভাল ছিল না। দেখি শত শত হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক মসজিদ আক্রমণ করছে। মৌলভী সাহেব পালিয়ে আসছেন আমাদের দিকে। তাঁর পিছে ছুটে আসছে একদল লোক লাঠি ও তলোয়ার হাতে। পাশেই মুসলমানদের কয়েকটা দোকান ছিল। কয়েকজন লোক কিছু লাঠি নিয়ে আমাদের পাশে দাঁড়াল। আমাদের মধ্য থেকে কয়েকজন 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' দিতে শুরু করল। দেখতে দেখতে অনেক লোক জমা হয়ে গেল। হিন্দুরা আমাদের সামনা সামনি এসে পড়েছে। বাধা দেওয়া ছাড়া উপায় নাই। ইঁট পাটকেল যে যা পেল তাই নিয়ে আক্রমণের মোকাবেলা করে গেল। আমরা সব মিলে দেড় শত লোকের বেশি হব না। কে যেন পিছন থেকে এসে আত্মরক্ষার জন্য আমাদের কয়েকখানা লাঠি দিল। এর পূর্বে শুধু ইঁট দিয়ে মারামারি চলছিল। এর মধ্যে একটা বিরাট শোভাযাত্রা এসে পৌঁছাল। এদের কয়েক জায়গায় বাধা দিয়েছে, রুখতে পারে নাই। তাদের সকলের হাতেই লাঠি। এরা এসে আমাদের সঙ্গে যোগদান করল। কয়েক মিনিটের জন্য হিন্দুরা ফিরে গেল,

আমরাও ফিরে এলাম। পুলিশ কয়েকবার এসে এর মধ্যে কাঁদানে গ্যাস ছেড়ে চলে গেছে। পুলিশ টহল দিচ্ছে। এখন সমস্ত কলকাতায় হাতাহাতি মারামারি চলছে। মুসলমানরা মোটেই দাঙ্গার জন্য প্রস্তুত ছিল না, একথা আমি বলতে পারি।

আমরা রওয়ানা করলাম গড়ের মাঠের দিকে। এমনিই আমাদের দেরি হয়ে গেছে। লাখ লাখ লোক সভায় উপস্থিত। কালীঘাট, ভবানীপুর, হ্যারিসন রোড, বড়বাজার সকল জায়গায় শোভাযাত্রার উপর আক্রমণ হয়েছে। শহীদ সাহেব বক্তৃতা করলেন এবং তাড়াতাড়ি সকলকে বাড়ি ফিরে যেতে হুকুম দিলেন। কিন্তু যাদের বাড়ি বা মহল্লা হিন্দু এরিয়ার মধ্যে তারা কোথায় যাবে? মুসলিম লীগ অফিস লোকে লোকারণ্য। কলকাতা সিটি মুসলিম লীগ অফিসেরও একই অবস্থা। বহু লোক জাকারিয়া স্ট্রিটে চলে গেল। ওয়েলেসলী, পার্ক সার্কাস, বেনিয়া পুকুর এরিয়া মুসলমানদের এরিয়া বলা চলে। বহু জখম হওয়া লোক এসেছে; তাদের পাঠাতে হয়েছে মেডিকেল কলেজ, ক্যাম্বেল ও ইসলামিয়া হসপিটালে। মিনিটে মিনিটে টেলিফোন আসছে, শুধু একই কথা, 'আমাদের বাঁচাও, আমরা আটকা পড়ে আছি। রাতেই আমরা ছেলেমেয়ে নিয়ে শেষ হয়ে যাব।' কয়েকজন ফোনের কাছে বসে আছে, শুধু টেলিফোন নাম্বার ও ঠিকানা লিখে রাখবার জন্য। লীগ অফিস রিফিউজি ক্যাম্প হয়ে গেছে, ইসলামিয়া কলেজও খুলে দেওয়া হয়েছে। কলকাতা মাদ্রাসা যখন খুলতে যাই, তখন দারোয়ান কিছুতেই খুলতে চাইছে না। আমি দৌড়ে প্রিন্সিপাল সাহেবের কাছে গেলে তিনি নিজেই এসে হুকুম দিলেন দরজা খুলে দিতে। আশেপাশে থেকে কিছু লোক কিছু কিছু খবর দিতে লাগল। বেকার হোস্টেল, ইলিয়ট হোস্টেল পূর্বেই ভরে গেছে। এখন চিন্তা হল টেইলর হোস্টেলের ছেলেদের কি করে বাঁচাই। কোন কিছুই জোগাড় হচ্ছে না। কিছু ছাত্র দুপুরে চলে এসেছে। কিছু আটকা পড়েছে। বিল্ডিংটা এমনভাবে ছিল যে, একটা মাত্র গেট। চারপাশে হিন্দু বাড়ি, আগুন দিলে সমস্ত হিন্দু মহল্লা শেষ হয়ে যাবে। রাতে কয়েকবার গেট ভাঙবার চেষ্টা করেছে, পারে নাই। সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে ধরতে পারছি না। ফোন করলেই খবর পাই লালবাজার আছেন। লালবাজার পুলিশ হেডকোয়ার্টার। নূরুদ্দিন অনেক রাতে একটা বড় গাড়ি ও কিছু পুলিশ জোগাড় করে তাদের উদ্ধার করে আনার ব্যবস্থা করেছিল। অনেক হিন্দু তালতলায়, ওয়েলেসলী এরিয়ায় ছিল। তাদের মধ্যে কিছু লোক গোপনে আমাদের সাহায্য চাইল। অনেক কষ্টে কিছু পরিবারকে আমরা হিন্দু এরিয়ায় পাঠাতে সক্ষম হলাম, বিপদ মাথায় নিয়ে। বেকার হোস্টেলের আশেপাশে কিছু কিছু হিন্দু পরিবার ছিল, তাদেরও রক্ষা করা গিয়েছিল। এদের সুরেন ব্যানার্জি রোডে একবার পৌঁছে দিতে পারলেই হয়।

আমি নিজেও খুব চিন্তাযুক্ত ছিলাম। কারণ, আমরা ছয় ভাইবোনের মধ্যে পাঁচজনই তখন কলকাতা ও শ্রীরামপুরে। আমার মেজোবোনের জন্য চিন্তা নাই, কারণ সে বেনিয়া পুকুরে আছে। সেখানে এক বোন বেড়াতে এসেছে। এক বোন শ্রীরামপুরে ছিল। একমাত্র ভাই শেখ আবু নাসের ম্যাট্রিক পড়ে। একেবারে ছেলেমানুষ। একবার মেজো জনের বাড়ি, একবার আমার ছোটবোনের বাড়ি এবং মাঝে মাঝে আমার কাছে বেড়িয়ে বেড়ায়। কারো

কথা বেশি শোনে না। খুবই দুষ্ট ছিল ছোটবেলায়। নিশ্চয়ই গড়ের মাঠে এসেছিল। আমার কাছে ফিরে আসে নাই। বেঁচে আছে কি না কে জানে! শ্রীরামপুরের অবস্থা খুবই খারাপ। যে পাড়ায় আমার বোন থাকে, সে পাড়ায় মাত্র দুইটা ফ্যামিলি মুসলমান।

কলকাতা শহরে শুধু মরা মানুষের লাশ বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে আছে। মহল্লার পর মহল্লা আগুনে পুড়ে গিয়েছে। এক ভয়াবহ দৃশ্য! মানুষ মানুষকে এইভাবে হত্যা করতে পারে, চিন্তা করতেও ভয় হয়! এক এক করে খবর নিতে চেষ্টা করলাম। ছোট ভগ্নিপতি হ্যারিসন রোডে টাওয়ার লজে থাকে। সেখানে ফায়ার ব্রিগেডের গাড়িতে যেয়ে খবর নিলাম, সে চলে গেছে কারমাইকেল হোস্টেলে। নাসের মেজোবোনের কাছেও নাই, আমার কাছেও নাই। আমার সবচেয়ে ছোট ভগ্নিপতি সৈয়দ হোসেনকে জিজ্ঞাসা করতে সে বলল, "নাসের ভাই ১৬ই আগস্ট আমার এখানে এসেছিল, থাকতে বললাম থাকল না, আমিও জোর করলাম না। কারণ আমার জায়গাটাও ভাল না। আমাদেরও পালাতে হবে।"

তারপরে আর খোঁজ নাই, কি করে খবর নিই! লেডী ব্র্যাবোর্ন কলেজে রিফিউজিদের থাকার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। দোতলায় মেয়েরা, আর নিচে পুরুষরা। কর্মীদের ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। আমাকেও মাঝে মাঝে থাকতে হয়। মুসলমানদের উদ্ধার করার কাজও করতে হচ্ছে। দু'এক জায়গায় উদ্ধার করতে যেয়ে আক্রান্তও হয়েছিলাম। আমরা হিন্দুদেরও উদ্ধার করে হিন্দু মহল্লায় পাঠাতে সাহায্য করেছি। মনে হয়েছে, মানুষ তার মানবতা হারিয়ে পশুতে পরিণত হয়েছে। প্রথম দিন ১৬ই আগস্ট মুসলমানরা ভীষণভাবে মার খেয়েছে। পরের দুই দিন মুসলমানরা হিন্দুদের ভীষণভাবে মেরেছে। পরে হাসপাতালের হিসাবে সেটা দেখা গিয়েছে।

এদিকে হোস্টেলগুলিতে চাউল, আটা ফুরিয়ে গিয়েছে। কোন দোকান কেউ খোলে না, লুট হয়ে যাবার ভয়ে। শহীদ সাহেবের কাছে গেলাম। কি করা যায়? শহীদ সাহেব বললেন, "নবাবজাদা নসরুল্লাহকে (ঢাকার নবাব হাবিবুল্লাহ সাহেবের ছোট ভাই, খুব অমায়িক লোক ছিলেন, শহীদ সাহেবের ভক্ত ডেপুটি চিফ হুইপ ছিলেন) ভার দিয়েছি, তার সাথে দেখা কর।" আমরা তাঁর কাছে ছুটলাম। তিনি আমাদের নিয়ে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে গেলেন এবং বললেন, "চাউল এখানে রাখা হয়েছে তোমরা নেবার বন্দোবস্ত কর। আমাদের কাছে গাড়ি নাই। মিলিটারি নিয়ে গিয়েছে প্রায় সমস্ত গাড়ি। তবে দেরি করলে পরে গাড়ির বন্দোবস্ত করা যাবে।" আমরা ঠেলাগাড়ি আনলাম, কিন্তু ঠেলবে কে? আমি, নূরুদ্দিন ও নূরুল হুদা (এখন ডিআইটির ইঞ্জিনিয়ার) এই তিনজনে ঠেলাগাড়িতে চাউল বোঝাই করে ঠেলতে শুরু করলাম। নূরুদ্দিন সাহেব তো 'তালপাতার সেপাই'— শরীরে একটুও বল নাই। আমরা তিনজনে ঠেলাগাড়ি করে বেকার হোস্টেল, ইলিয়ট হোস্টেলে চাউল পৌঁছে দিলাম। এখন কারমাইকেল হোস্টেলে কি করে পৌঁছাই? অনেক দূর, হিন্দু মহল্লা পার হয়ে যেতে হবে। ঠেলাগাড়িতে পৌঁছান সম্পূর্ণ অসম্ভব। নূরুদ্দিন চেষ্টা করে একটা ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি জোগাড় করে আনল। আমরা তিনজন কিছু চাল নিয়ে কারমাইকেল হোস্টেলে পৌঁছে ফিরে আসলাম।

শ্রীরামপুরে কোনো গোলমাল হয় নাই শুনলাম, কিন্তু নাসের কোথায়? লোক পাঠালাম শ্রীরামপুরে খবর আনতে। দাঙ্গা ও লুটতরাজ একটু বন্ধ হয়েছে। নাসের কলকাতায় এসেছিল ১৬ই আগস্ট। হ্যারিসন রোডে এসে বিপদে পড়ে। তারপর একটা এ্যাম্বুলেন্স গাড়িতে উঠে জীবনটা বাঁচায়। নাসেরের একটা পা ছোটকালে টাইফয়েড হয়ে খোঁড়া হয়ে গিয়েছিল। পা টেনে টেনে হাঁটতে হয়। সেই পা দেখিয়ে এ্যাম্বুলেন্সে উঠে পড়ে। দিনভর এ্যাম্বুলেন্সে থাকে, সন্ধ্যায় হাওড়া থেকে ট্রেনে উঠে শ্রীরামপুর যায়। ট্রেনে তিন ঘণ্টা লাগে। কয়েকবার ট্রেনে আক্রমণ হয়েছে। কোনোমতে বেঁচে গিয়েছে। একটা কথা সত্য, অনেক হিন্দু মুসলমানদের রক্ষা করতে যেয়ে বিপদে পড়েছে। জীবনও হারিয়েছে। আবার অনেক মুসলমান হিন্দু পাড়াপড়শীকে রক্ষা করতে যেয়ে জীবন দিয়েছে। আমি নিজেই এর প্রমাণ পেয়েছি। মুসলিম লীগ অফিসে যেসব টেলিফোন আসত, তার মধ্যে বহু টেলিফোন হিন্দুরাই করেছে। তাদের বাড়িতে মুসলমানদের আশ্রয় দিয়েছে, শীঘ্রই এদের নিয়ে যেতে বলেছে, নতুবা এরাও মরবে, আশ্রিত মুসলমানরাও মরবে।

একদল লোককে দেখেছি দাঙ্গাহাঙ্গামার ধার ধারে না। দোকান ভাঙছে, লুট করছে, আর কোনো কাজ নাই। একজনকে বাধা দিতে যেয়ে বিপদে পড়েছিলাম। আমাকে আক্রমণ করে বসেছিল। কারফিউ জারি হয়েছে, রাতে কোথাও যাবার উপায় নাই। সন্ধ্যার পরে কোন লোক রাস্তায় বের হলে আর রক্ষা নাই। কোন কথা নাই, দেখামাত্র শুধু গুলি। মিলিটারি গুলি করে মেরে ফেলে দেয়। এমনকি জানালা খোলা থাকলেও গুলি করে। ভোরবেলা দেখা যেত অনেক লোক রাস্তায় গুলি খেয়ে মরে পড়ে আছে। কোনো কথা নেই শুধু গুলি।

একবার আমার ও সিলেটের মোয়াজ্জেম চৌধুরীর (এখন কনভেনশন মুসলিম লীগের এমএনএ) উপর ভার পড়েছে রাতে পার্ক সার্কাস ও বালিগঞ্জের মাঝে একটা মুসলমান বস্তি আছে—প্রত্যেক রাতেই হিন্দুরা সেখানে আক্রমণ করে—তাদের পাহারা দেওয়ার জন্য। কারণ, বন্দুক চালানোর লোকের নাকি অভাব। আমি ও মোয়াজ্জেম বন্দুক চালাতে পারতাম। আমার ও মোয়াজ্জেমের বাবার বন্দুক ছিল। আমরা গুলি ছুঁড়তে জানতাম।

সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় খবর এল মিল্লাত অফিস থেকে ঐ এলাকায় যাবার জন্য। আমরা রওয়ানা করে তাড়াতাড়ি ছুটতে লাগলাম, কোন গাড়ি নাই। আমাদের পায়ে হেঁটেই পৌঁছাতে হবে। কেবলমাত্র লোয়ার সার্কুলার রোড পার হয়ে আমরা ছোট রাস্তায় ঢুকেছি, অমনিই কারফিউর সময় হয়ে গেছে। কবরস্থানের পাশ দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। গাড়ির শব্দ পেলেই আমরা লুকাই, আবার হাঁটি। অনেক কষ্টে পার্ক সার্কাস ময়দানের পিছনে এলাম। ময়দান পার হই কি করে? অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টার পর ময়দানের পিছন দিয়ে 'সওগাত' প্রেসের মালিক ও সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন সাহেবের বাড়ির কাছে পৌঁছালাম। সেখান থেকে আর একটা রাস্তা পার হয়ে এক বন্ধুর বাড়িতে ঢুকলাম। কিন্তু এখন কি করি? বন্ধুর বাবা ও মা আমাদের কিছুতেই বার হতে দিতে রাজি হলেন না। কারণ, রাস্তার মোড়েই মিলিটারি পাহারা দিচ্ছে। তারা ছায়া দেখলেও গুলি করে। উপায় নাই। রাতে আমাদের সেখানেই কাটাতে হল। আমরা জায়গামত পৌঁছাতে পারলাম না। যদিও সে

রাতে কোনো গোলমাল হয় নাই। প্রায় মাইল দেড়েক পথ অতিক্রম করেছিলাম। যে কোনো সময় গুলি খেয়ে মরতে পারতাম।

পার্ক সার্কাস এরিয়ায় বিচারপতি সিদ্দিকী, জনাব আবদুর রশিদ, জনাব তোফাজ্জল আলী (ভূতপূর্ব মন্ত্রী), আরও অনেকে ডিফেন্স পার্টির নেতৃত্ব দিতেন। আমরা ছিলাম স্বেচ্ছাসেবক। শিয়ালদহ ও হাওড়া স্টেশনে হিন্দু ও মুসলমানদের ক্যাম্প করা হয়েছিল—যাতে বাইরে থেকে কেউ এসেই হিন্দু বা মুসলমান মহল্লায় না যায়। কারণ মুসলমানরা হিন্দুদের মহল্লায় এবং হিন্দুরা মুসলমান মহল্লায় গেলে আর রক্ষা নাই। কলকাতায় মহিলাদের মধ্যে জনাব সোহরাওয়ার্দীর মেয়ে মিসেস সোলায়মান, নবাবজাদা নসরুল্লাহর মেয়ে ইফফাত নসরুল্লাহ, বেগম আক্তার আতাহার আলী, সাপ্তাহিক 'বেগম' পত্রিকার সম্পাদিকা নূরজাহান বেগম, বেগম রশিদ, রোকেয়া কবীর এবং মন্নুজান হোস্টেলের ও ব্র্যাবোর্ন কলেজের মেয়েরা খুবই পরিশ্রম করেছেন। রাতদিন রিফিউজি সেন্টারে এরা কাজ করতেন মেয়েদের ভিতর, আমাদের করতে হত পুরুষদের মধ্যে। রাতে অসুবিধা হত, তবুও হাজেরা মাহমুদ আলী, হালিমা নূরুদ্দিন আরও কয়েকজনকে সারা রাত পরিশ্রম করতে দেখেছি। কলকাতার অবস্থা খুবই ভয়াবহ হয়ে গেছে। মুসলমানরা মুসলমান মহল্লায় চলে এসেছে। হিন্দুরা হিন্দু মহল্লায় চলে গিয়েছে। বন্ধুবান্ধবদের সাথে দেখা করার জায়গা ছিল একমাত্র এ্যাসপ্লানেডে, যাকে আমরা চৌরঙ্গী বলতাম। এখন অবস্থা হয়েছে আরও খারাপ। বেশ কিছুদিন কোনো গোলমাল নাই। হঠাৎ এক জায়গায় সামান্য গোলমাল আর ছোরা মারামারি শুরু হয়ে গেল। শহীদ সাহেব সমস্ত রাতদিন পরিশ্রম করছেন, শান্তি রক্ষা করবার জন্য। কলকাতায় চৌদ্দ-পনের শত পুলিশ বাহিনীর মধ্যে মাত্র পঞ্চাশ-ষাটজন মুসলমান, অফিসারদের অবস্থাও প্রায় সেই রকম। শহীদ সাহেব লীগ সরকার চালাবেন কি করে? তিনি আরও এক হাজার মুসলমানকে পুলিশ বাহিনীতে ভর্তি করতে চাইলে তদানীন্তন ইংরেজ গভর্নর আপত্তি তুলেছিলেন। শহীদ সাহেব পদত্যাগের হুমকি দিলে তিনি রাজি হন। পাঞ্জাব থেকে যুদ্ধ ফেরত মিলিটারি লোকদের এনে ভর্তি করলেন। এতে ভীষণ হৈচৈ পড়ে গেল। কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার কাগজগুলি হৈচৈ বেশি করল।



কলকাতার দাঙ্গা বন্ধ হতে না হতেই আবার দাঙ্গা শুরু হল নোয়াখালীতে। মুসলমানরা সেখানে হিন্দুদের ঘরবাড়ি লুট করল এবং আগুন লাগিয়ে দিল। ঢাকায় তো দাঙ্গা লেগেই আছে। এর প্রতিক্রিয়ায় শুরু হল বিহারে ভয়াবহ দাঙ্গা। বিহার প্রদেশের বিভিন্ন জেলায় মুসলমানদের উপর প্ল্যান করে আক্রমণ হয়েছিল। এতে অনেক লোক মারা যায়, বহু ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়। দাঙ্গা শুরু হওয়ার তিন দিন পরেই আমরা রওয়ানা করলাম পাটনায়। বহু স্বেচ্ছাসেবক রওয়ানা হয়ে গিয়েছে। অনেক ডাক্তারও কলকাতা থেকে গিয়েছিল। আমার কলকাতার এক সহকর্মী মিস্টার ইয়াকুব, খুব ভাল ফটোগ্রাফার, সে ক্যামেরা নিয়ে গিয়েছে।

ঘুরে ঘুরে অনেক ফটো তুলেছিল বিহার থেকে। জহিরুদ্দিন, নূরুদ্দিন ও আমি যেদিন যাই সেদিন জনাব ফজলুল হক সাহেবও পাটনায় রওনা দিলেন। শহীদ সাহেব পাটনায় মুসলিম লীগ নেতাদের খবর দিলেন যে কোন সাহায্য প্রয়োজন হলে বেঙ্গল সরকার দিতে রাজি আছে। বিহার সরকারকেও তিনি একথা জানিয়ে দিলেন। আমরা যখন পাটনায় নামলাম, অবস্থা দেখে রীতিমত ভয় লাগতে লাগল। কাউকেও চিনি না, কোথা থেকে কোথায় যাই! তবে জহির পাটনায় কয়েকবার গিয়েছে। আমরা মিস্টার ইউনুস, মন্ত্রী বিহার সরকারের, তাঁর একটা হোটেল আছে—'গ্রান্ড হোটেল', সেই হোটেলে গিয়ে হাজির হলাম। সেখানে মওলানা রাগীব আহসান সাহেব অফিস খুলেছেন, বেঙ্গল মুসলিম লীগের তরফ থেকে। আবদুর রব নিশতার সাহেব সেদিন পাটনায় আসলেন। আমরা একসাথে কনফারেন্স করলাম, কি করা যায়! তিন দিন পরে, নূরুদ্দিন কলকাতায় চলে গেল। জহির পাটনায় রইল। আমরা বললাম, বিহারে আমরা কি সাহায্য করতে পারি? শহীদ সাহেব বলেছেন, ট্রেন ভরে আসানসোলে রিফিউজিদের পৌঁছে দিলে বাংলা সরকার তাদের সকল দায়িত্ব নিতে রাজি আছে। জনাব আকমল (আইসিএস) আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কেমন করে শহীদ সাহেবের পক্ষ থেকে কথা বলতে পারেন?" আমার অল্প বয়স দেখে তিনি বিশ্বাস করতেই চাইলেন না যে, শহীদ সাহেব আমার সাথে এ ব্যাপারে আলাপ করতে পারেন। আমি তাঁকে বললাম, "আমি শহীদ সাহেবের মতামত জানি এবং তাঁর পক্ষ থেকে কথাও কিছু বলতে পারি।" অনেকে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। আমি শহীদ সাহেবের ফোন নাম্বার দিয়ে বললাম, "টেলিফোন করে দেখতে পারেন।"

সকালবেলা আবার বসবার কথা। আকমল সাহেব আমাকে বললেন, "আজ থেকেই আমরা আসানসোলে লোক পাঠাব।" যে সমস্ত লোক গ্রাম থেকে শহরে আসছে তাদের জায়গা দেওয়া একেবারেই অসম্ভব। আঞ্জুমানে ইসলামিয়া ও আর যে সমস্ত জায়গা করা হয়েছিল সেখানে আর জায়গা নাই। সীমান্ত থেকে পীর মানকী শরীফের দল, আলীগড় থেকে আমাদের বন্ধু মোস্তফা ও সৈয়দ আহমেদ আলীসহ বহু ছাত্র কর্মী এসেছে। কলকাতা থেকে ছাত্র, ডাক্তার, ন্যাশনাল গার্ড মিলে প্রায় হাজার লোক পাটনায় জমা হয়েছে। দূর দূর গ্রাম থেকে দুর্গতদের উদ্ধার করে আনা হচ্ছে। আমি হাজার খানেক রিফিউজি নিয়ে রওয়ানা করলাম আসানসোলের দিকে। আসানসোল মুসলিম লীগ নেতা মওলানা ইয়াসিন সাহেবকে টেলিগ্রাম করা হয়েছে। তিনি দুইখানা ট্রাক ও কিছু ভলানটিয়ার নিয়ে স্টেশনে হাজির ছিলেন। লোকগুলিকে প্লাটফর্মেই রাখা হল। অনেক লোক জখম ছিল। নূরুদ্দিন শহীদ সাহেবকে পরিস্থিতি বুঝিয়ে বলেছে। পাটনা থেকেও খবর দেওয়া হয়েছে শহীদ সাহেবকে। তিনি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও এসডিওকে হুকুম দিয়েছেন, এদের জায়গা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করতে।

নূরুদ্দিন কলকাতা থেকে আমাকে সাহায্য করবার জন্য কিছু স্বেচ্ছাসেবক ও কিছু ডাক্তার পাঠিয়েছে। এসডিও ছিলেন একজন ইউরোপিয়ান। তিনি যুবক ও খুবই ভদ্রলোক। শহীদ সাহেব হুকুম দিয়াছেন, যে সমস্ত ব্যারাক যুদ্ধের সময় করা হয়েছিল সৈন্যদের থাকবার জন্য সেগুলির মধ্যে রিফিউজিদের রাখতে। সরকার থেকে খাবার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল।

তার বিলি বণ্টনের জন্য এসডিও, আসানসোল মুসলিম লীগ নেতারা ও আমি একটা বৈঠক করলাম। প্রথমে ক্যাম্প খোলা হল 'নিগাহ' নামে একটা ছোট্ট গুদামে। সেখানে হাজার খানেক লোক ধরবে। পরে কান্দুলিয়া ক্যাম্প খোলা হল। এতে প্রায় দশ হাজার লোকের জায়গা হবে। আমি এই ক্যাম্পের নাম দিলাম, 'হিজরতগঞ্জ'। মওলানা ইয়াসিন নামটা গ্রহণ করলেন এবং খুশি হলেন। আসানসোল স্টেশনে ও পরে রাণীগঞ্জ স্টেশনে মোহাজেরদের নামানো হত, পরে ট্রাকভরে ক্যাম্পগুলিতে নিয়ে আসা হত। আমার সাথে সকল সময়ের জন্য কাজ করতেন মওলানা ওয়াহিদ সাহেব। আমরা একসাথে পড়তাম, এখন তিনি শাহজাদপুরের পীর সাহেব।

আমাদের খাওয়া-দাওয়ার কোনো বন্দোবস্ত ছিল না। মোহাজিরদের জন্য যা পাক করতাম, তার থেকেই কিছু খেয়ে নিতাম। দোকানপাট কিছুই ছিল না। শত শত লোক রোজই আসছে। দিনে একবেলার বেশি খেতে দিতে পারতাম না। একটা হাসপাতাল করেছিলাম। ময়মনসিংহের ডা. আবদুল হামিদ এবং গফরগাঁয়ের ডা. হজরত আলী এই হাসপাতালে কাজ করতেন। আসানসোলের এসডিও মিস্টার রোজ চার পাঁচ দিন পরে একজন বৃদ্ধা মেম সাহেবকে নিয়ে আসলেন। তিনি আমাদের কাজের প্ল্যান করে দিয়ে সাহায্য করবেন। কারণ, এই ভদ্রমহিলা যুদ্ধের সময় ব্রহ্মদেশ থেকে যখন লোক পালিয়ে আসছিল তখন সরকারি ক্যাম্পের সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি যে প্ল্যান দিলেন, তাতে কাজের সুবিধাই হল।

ছয়-সাত দিন পর, বাংলা সরকার জনাব সলিমুল্লাহ ফাহমীকে বিহার মোহাজেরদের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী নিয়োগ করলেন। তিনি আসানসোলে এসে আমার খোঁজ করেন। পরে ময়রা ক্যাম্পে এসে আমাকে পেলেন। তিনি ক্যাম্পগুলিকে সরকারের তত্ত্বাবধানে নিয়ে গেলেন। মুসলিম লীগ স্বেচ্ছাসেবকরাও কাজ করলেন। আমি ও সলিমুল্লাহ সাহেব পরামর্শ করে মোহাজেরদের থেকে সুপারিনটেনডেন্ট, এসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেনডেন্ট, রেশন ইনচার্জ, দারোয়ান ও অন্যান্য কর্মচারী নিযুক্ত করলাম।

এক জায়গায় খানা পাকানো সম্ভবপর হচ্ছে না। রেশন কার্ড করে প্রত্যেক ফ্যামিলিকে বিনা পয়সায় চাল, জ্বালানি কাঠ, মরিচ, পিঁয়াজ সবকিছুই সাত দিনের জন্য দিয়ে দেওয়া হবে। শুধু মাংস একদিন পর পর দেওয়া হবে। মোহাজেররা এই বন্দোবস্তে খুশি হলেন। এই সমস্ত ঠিক করতে এক মাস হয়ে গেল। এই সময় বিহার থেকে জাফর ইমাম সাহেব মোহাজেরদের বাংলাদেশের লোকেরা কেমন রেখেছে দেখবার জন্য এলেন। আমার সাথেও দেখা করলেন, আমাদের অফিসে। আমরা একটা অফিস খুলেছিলাম, তার পাশেই আমরা থাকতাম। আমাদের পাকের বন্দোবস্তও হয়েছিল ঐখানেই। আমাদের সংগঠন এবং ব্যবস্থাপনা দেখে তিনি আমাকে ও আমাদের সহকর্মীদের অনেক ধন্যবাদ দিয়েছিলেন। মোহাজেরদের সাথে দেখা করে তাদের সুবিধা ও অসুবিধার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

পরে ময়রা ও মাধাইগঞ্জে ক্যাম্প খুললাম। এই দুই ক্যাম্পে প্রায় দশ হাজার মোহাজের দেওয়া হয়েছিল। অনেক শিক্ষিত ভদ্র ফ্যামিলিও এসেছিলেন। মোহাজেরদের আর আসানসোল

এরিয়ায় জায়গা দেওয়া সম্ভব হবে না। আমরা এর পরে বিষ্ণুপুর, অন্ডাল, বর্ধমানেও কিছু কিছু মোহাজের পাঠালাম। আমার সাথে যে সমস্ত কর্মী ছিল, আহার নিদ্রার অভাব ও কাজের চাপে প্রায় সকলেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। তাই অনেককে পূর্বেই কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছি। আমারও জ্বর হয়ে গিয়েছিল। এই সময় মোহাম্মদ আলী ও এ. এফ. এম. আবদুর রহমান মন্ত্রী ছিলেন। তাঁরা বেগম সোলায়মান, ইফফাত নসরুল্লাহ ও আরও কয়েকজন কর্মচারীসহ আসানসোলে আসেন। আমাকে পূর্বেই খবর পাঠিয়েছিল। আমিও আসানসোলে তাঁদের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তাঁদের নিয়ে ক্যাম্পগুলি দেখান হয়েছিল। সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তাঁদের সাথেই কলকাতা রওয়ানা হয়ে আসতে বাধ্য হলাম। বেগম সোলায়মান আমার শরীর ও চেহারার অবস্থা দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন।



দেড় মাস পরে আমি কলকাতায় হাজির হলাম, অসুস্থ শরীর নিয়ে। বেকার হোস্টেলে এসেই আমি আরও অসুস্থ হয়ে পড়লাম। আমার জ্বর কিছুতেই ছাড়ছিল না। শহীদ সাহেব খবর পেয়ে এত কাজের ভিতরেও আমার মত সামান্য কর্মীর কথা ভোলেন নাই। ট্রপিক্যাল স্কুল অব মেডিসিনের ইউরোপিয়ান ওয়ার্ডে আমার জন্য সিট ঠিক করে খবর পাঠিয়ে দিলেন। পনের দিন হাসপাতালে ছিলাম, তিনি ফোন করে প্রিন্সিপালের কাছ থেকে খোঁজ নিতেন। সেই জন্যই প্রিন্সিপাল আমাকে দেখতে আসতেন। আমি ভাল হয়ে আবার হোস্টেলে ফিরে এলাম।

আসানসোলে ইউরোপিয়ান ভদ্রমহিলার কাছ থেকে এবং নিজ হাতে কাজ করে যে অভিজ্ঞতা পেয়েছিলাম, পরবর্তী জীবনে তা আমার অনেক উপকার করেছিল, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কাজে। এই সময় মনস্থির করলাম, আমাকে বিএ পরীক্ষা দিতে হবে। ড. জুবেরী আমাদের প্রিন্সিপাল ছিলেন, তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি বললেন, "তুমি যথেষ্ট কাজ করেছ পাকিস্তান অর্জন করার জন্য। তোমাকে আমি বাধা দিতে চাই না। তুমি যদি ওয়াদা কর যে এই কয়েক মাস লেখাপড়া করবা এবং কলকাতা ছেড়ে বাইরে কোথাও চলে যাবা এবং ফাইনাল পরীক্ষার পূর্বেই এসে পরীক্ষা দিবা, তাহলে তোমাকে আমি অনুমতি দিব।" তখন টেস্ট পরীক্ষা হয়ে গেছে। আমি ওয়াদা করলাম, প্রফেসর তাহের জামিল, প্রফেসর সাইদুর রহমান এবং প্রফেসর নাজির আহমদের সামনে। আমি অনুমতি নিয়ে আমার এক বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী—তার নাম ছিল শেখ শাহাদাত হোসেন, ১৯৪৬ সালে বিএ পাস করেছে, এখন হাওড়ার উল্টোডাঙ্গায় চাকরি করে, ওর কাছে চলে গেলাম, সমস্ত বইপত্র নিয়ে।

পরীক্ষার কিছুদিন পূর্বে কলকাতায় চলে আসি। হোস্টেল ছেড়ে দিয়েছি। আমার ছোটবোনের স্বামী বরিশালের এডভোকেট আবদুর রব সেরনিয়াবাত তখন পার্ক সার্কাসে একটা বাসা ভাড়া নিয়েছেন। আমার বোনও থাকত, তার কাছেই উঠলাম। কিছুদিন পরে

রেণুও কলকাতায় এসে হাজির। রেণুর ধারণা, পরীক্ষার সময় সে আমার কাছে থাকলে আমি নিশ্চয়ই পাস করব। বিএ পরীক্ষা দিয়ে পাস করলাম।

শেখ শাহাদাত হোসেন দুই মাসের ছুটি নিয়ে আমাকে পড়তে সাহায্য করেছিল। পরে জীবনে অনেক ক্ষতি আমার সে করেছে। এর জন্য তাকে কোনোদিনই কিছু বলি নাই। ওর বাড়ি আমার বাড়ির কাছাকাছি।



হাশিম সাহেব মুসলিম লীগের সভাপতি হতে চাইলেন। কারণ, মওলানা আকরম খাঁ সাহেব পদত্যাগ করেছিলেন। শহীদ সাহেব রাজি হন নাই। মওলানা সাহেবকে অনুরোধ করে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করিয়েছিলেন। হাশিম সাহেব রাগ করে লীগ সেক্রেটারি পদ থেকে ছুটি নিয়ে বর্ধমানে চলে গিয়েছিলেন। যখন তিনি কলকাতা আসতেন মিল্লাত প্রেসেই থাকতেন। হাশিম সাহেব এই সময় ছাত্র ও যুবকদের মধ্যে জনপ্রিয়তা অনেক হারিয়ে ফেলেছিলেন। আমাদের অনেকেরই মোহ তাঁর উপর থেকে ছুটে গিয়েছিল।

সে অনেক কথা। তিনি কলকাতা আসলেই শহীদ সাহেবের বিরুদ্ধে সমালোচনা করতেন। এর প্রধান কারণ ছিল *মিল্লাত* কাগজকে দৈনিক করতে সাহায্য না করে তিনি দৈনিক *ইত্তেহাদ* কাগজ বের করেছিলেন—নবাবজাদা হাসান আলী সাহেবের ব্যবস্থাপনা এবং আবুল মনসুর আহমদ সাহেবের সম্পাদনায়। মওলানা আকরম খাঁ সাহেবের দৈনিক *আজাদ*ও ক্ষেপে গিয়েছিল শহীদ সাহেবের উপর। কারণ, পূর্বে একমাত্র *আজাদ* ছিল মুসলমানদের দৈনিক। এখন আর একটা কাগজ বের হওয়াতে মওলানা সাহেব যতটা নন তাঁর দলবল খুব বেশি রাগ করেছিল।

১৯৪৬ সালের শেষের দিকে ভারতের রাজনীতিতে এক জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকার বদ্ধপরিকর, যে কোনোমতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে। ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব মুসলিম লীগ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু কংগ্রেস প্রথমে গ্রহণ করে পরে পিছিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও কংগ্রেসকে নিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করতে বড়লাট লর্ড ওয়েভেল ঘোষণা করলেন। লর্ড ওয়েভেল মুসলিম লীগের সাথে ভাল ব্যবহার না করায়, মুসলিম লীগ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগদান করতে অস্বীকার করে। কংগ্রেস পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে সরকারে যোগদান করবে। যদিও লর্ড ওয়েভেল ঘোষণা করেছিলেন, মুসলিম লীগের জন্য পাঁচটা মন্ত্রিত্বের পদ খালি রইল, ইচ্ছা করলে তারা যে কোন মুহূর্তে যোগদান করতে পারে। সরকারে যোগদান না করে একটু অসুবিধায় পড়েছিল মুসলিম লীগ। শেষ পর্যন্ত জনাব সোহরাওয়ার্দী লর্ড ওয়েভেলের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং মুসলিম লীগ যাতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগদান করতে পারে সেই সম্বন্ধে আলোচনা করেন। মি. জিন্নাহ তাঁকে অনুমতি দিয়েছিলেন আলোচনা চালাতে। শেষ পর্যন্ত জিন্নাহ-ওয়েভেল আলোচনা করে মুসলিম লীগ সরকারে যোগদান করতে রাজি হয়। অক্টোবর মাসের শেষের দিকে লিয়াকত আলী

খান, আই আই চুন্দ্রিগড়, আবদুর রব নিশতার, রাজা গজনফর আলী খান এবং যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল মুসলিম লীগের তরফ থেকে অন্তর্বর্তীকালীন ভারত সরকারে যোগদান করেন। মুসলিম লীগ যদি কেন্দ্রীয় সরকারে যোগদান না করত তবে কংগ্রেস কিছুতেই পাকিস্তান দাবি মানতে চাইত না।

১৯৪৭ সালের জুন মাসে ঘোষণা করা হল ভারতবর্ষ ভাগ হবে। কংগ্রেস ভারতবর্ষকে ভাগ করতে রাজি হয়েছে এই জন্য যে, বাংলাদেশ ও পাঞ্জাব ভাগ হবে। আসামের সিলেট জেলা ছাড়া আর কিছুই পাকিস্তানে আসবে না। বাংলাদেশের কলকাতা এবং তার আশপাশের জেলাগুলিও ভারতবর্ষে থাকবে। মওলানা আকরম খাঁ সাহেব ও মুসলিম লীগ নেতারা বাংলাদেশ ভাগ করার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করলেন। বর্ধমান ডিভিশন আমরা না-ও পেতে পারি। কলকাতা কেন পাব না? কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা বাংলাদেশ ভাগ করতে হবে বলে জনমত সৃষ্টি করতে শুরু করল। আমরাও বাংলাদেশ ভাগ হতে দেব না, এর জন্য সভা করতে শুরু করলাম। আমরা কর্মীরা কি জানতাম যে, কেন্দ্রীয় কংগ্রেস ও কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ মেনে নিয়েছে এই ভাগের ফর্মুলা? বাংলাদেশ যে ভাগ হবে, বাংলাদেশের নেতারা তা জানতেন না। সমস্ত বাংলা ও আসাম পাকিস্তানে আসবে এটাই ছিল তাদের ধারণা। আজ দেখা যাচ্ছে, মাত্র আসামের এক জেলা, তাও যদি গণভোটে জয়লাভ করতে পারি। আর বাংলাদেশে মুসলিম সংখ্যাগুরু জেলাগুলি কেটে হিন্দুস্থানে দেওয়া হবে। আমরা হতাশ হয়ে পড়লাম। কলকাতার কর্মীরা ও পশ্চিমবঙ্গের কর্মীরা এসে আমাদের বলত, তোমরা আমাদের ছেড়ে চলে যাবে, আমাদের কপালে কি হবে খোদাই জানে! সত্যিই দুঃখ হতে লাগল ওদের জন্য। গোপনে গোপনে কলকাতার মুসলমানরা প্রস্তুত ছিল, যা হয় হবে, কলকাতা ছাড়া হবে না। শহীদ সাহেবের পক্ষ থেকে বাংলা সরকারের অর্থমন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ আলী ঘোষণা করেছিলেন, কলকাতা আমাদের রাজধানী থাকবে। দিল্লি বসে অনেক পূর্বেই যে কলকাতাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে একথা তো আমরা জানতামও না, আর বুঝতামও না।

এই সময় শহীদ সাহেব ও হাশিম সাহেব মুসলিম লীগের তরফ থেকে এবং শরৎ বসু ও কিরণশংকর রায় কংগ্রেসের তরফ থেকে এক আলোচনা সভা করেন। তাঁদের আলোচনায় এই সিদ্ধান্ত হয় যে, বাংলাদেশ ভাগ না করে অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করা যায় কি না? শহীদ সাহেব দিল্লিতে জিন্নাহর সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তাঁর অনুমতি নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। বাংলাদেশের কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতারা একটা ফর্মুলা ঠিক করেন। বেঙ্গল মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি এক ফর্মুলা সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করে। যতদূর আমার মনে আছে, তাতে বলা হয়েছিল, বাংলাদেশ একটা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হবে। জনসাধারণের ভোটে একটা গণপরিষদ হবে। সেই গণপরিষদ ঠিক করবে বাংলাদেশ হিন্দুস্থান না পাকিস্তানে যোগদান করবে, নাকি স্বাধীন থাকবে। যদি দেখা যায় যে, গণপরিষদের বেশি সংখ্যক প্রতিনিধি পাকিস্তানে যোগদানে পক্ষপাতী, তবে বাংলাদেশ পুরাপুরিভাবে পাকিস্তানে যোগদান করবে। আর যদি দেখা যায় বেশি সংখ্যক লোক ভারতবর্ষে

থাকতে চায়, তবে বাংলাদেশ ভারতবর্ষে যোগ দেবে। যদি স্বাধীন থাকতে চায়, তাও থাকতে পারবে। এই ফর্মুলা নিয়ে জনাব সোহরাওয়ার্দী ও শরৎ বসু দিল্লিতে জিন্নাহ ও গান্ধীর সাথে দেখা করতে যান। শরৎ বসু নিজে লিখে গেছেন যে জিন্নাহ তাঁকে বলেছিলেন, মুসলিম লীগের কোনো আপত্তি নাই, যদি কংগ্রেস রাজি হয়। ব্রিটিশ সরকার বলে দিয়েছে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ একমত না হলে তারা নতুন কোনো ফর্মুলা মানতে পারবেন না। শরৎ বাবু কংগ্রেসের নেতাদের সাথে দেখা করতে যেয়ে অপমানিত হয়ে ফিরে এসেছিলেন। কারণ, সরদার বল্লভ ভাই প্যাটেল তাঁকে বলেছিলেন, "শরৎ বাবু পাগলামি ছাড়েন, কলকাতা আমাদের চাই।" মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত নেহেরু কোন কিছুই না বলে শরৎ বাবুকে সরদার প্যাটেলের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আর মিস্টার প্যাটেল শরৎ বাবুকে খুব কঠিন কথা বলে বিদায় দিয়েছিলেন। কলকাতা ফিরে এসে শরৎ বসু খবরের কাগজে বিবৃতির মাধ্যমে একথা বলেছিলেন এবং জিন্নাহ যে রাজি হয়েছিলেন একথা স্বীকার করেছিলেন।

যুক্ত বাংলার সমর্থক বলে শহীদ সাহেব ও আমাদের অনেককে বদনাম দেবার চেষ্টা করেছেন অনেক নেতা। যদিও এই সমস্ত নেতারা অনেকেই তখন বেঙ্গল মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছিলেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে এই ফর্মুলা গ্রহণ করেছিলেন। জিন্নাহর জীবদ্দশায় তিনি কোনোদিন শহীদ সাহেবকে দোষারোপ করেন নাই। কারণ, তাঁর বিনা সম্মতিতে কোনো কিছুই তখন করা হয় নাই। যখন বাংলা ও আসাম দুইটা প্রদেশই পাকিস্তানে যোগদান করুক, এর জন্যই আমাদের আন্দোলন ছিল, তখন সমস্ত বাংলা পাকিস্তানে আসলে ক্ষতি কি হত তা আজও বুঝতে কষ্ট হয়! যখন বাংলাদেশ ভাগ হবে এবং যতটুকু পাকিস্তানে আছে তাই গ্রহণ করা হবে এটা মেনে নেওয়া হয়েছে— তখন সে প্রশ্ন আজ রাজনৈতিক কারণে মিথ্যা বদনাম দেয়ার জন্যই ব্যবহার করা হয়। বেশি চাইতে বা বেশি পেতে চেষ্টা করায় কোন অন্যায় হতে পারে না। যা পেয়েছি তা নিয়েই আমরা খুশি হতে পারি। খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেব ১৯৪৭ সালের ২২শে এপ্রিল ঘোষণা করেছিলেন, 'যুক্ত বাংলা হলে হিন্দু মুসলমানের মঙ্গলই হবে'। মওলানা আকরম খাঁ সাহেব মুসলিম লীগের সভাপতি হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন, "আমার রক্তের উপর দিয়ে বাংলাদেশ ভাগ হবে। আমার জীবন থাকতে বাংলাদেশ ভাগ করতে দেব না। সমস্ত বাংলাদেশই পাকিস্তানে যাবে।" এই ভাষা না হলেও কথাগুলির অর্থ এই ছিল। *আজাদ* কাগজ আজও আছে। ১৯৪৭ সালের কাগজ বের করলেই দেখা যাবে।

এই সময় বড়লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেন তলে তলে কংগ্রেসকে সাহায্য করছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল তিনি ভারত ও পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল একসাথেই থাকবেন। জিন্নাহ রাজি হলেন না, নিজেই পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল হয়ে বসলেন। মাউন্টব্যাটেন সম্বন্ধে বোধহয় তাঁর ধারণা ভাল ছিল না। মাউন্টব্যাটেন ক্ষেপে গিয়ে পাকিস্তানের সর্বনাশ করার চেষ্টা করলেন। যদিও র‍্যাডক্লিফকে ভার দেওয়া হল সীমানা নির্ধারণ করতে, তথাপি তিনি নিজেই গোপনে কংগ্রেসের সাথে পরামর্শ করে একটা ম্যাপ রেখা তৈরি করেছিলেন বলে অনেকের ধারণা। জিন্নাহ গভর্নর জেনারেল হোক, এটা আমরা যুবকরা মোটেও

চাই নাই। তিনি প্রথমে প্রধানমন্ত্রী হবেন, পরে প্রেসিডেন্ট হবেন, এটাই আমরা আশা করেছিলাম। লর্ড মাউন্টব্যাটেন পাকিস্তানের বড়লাট থাকলে এতখানি অন্যায় করতে পারতেন কি না সন্দেহ ছিল! এটা আমার ব্যক্তিগত মত। জিন্নাহ অনেক বুদ্ধিমান ছিলেন আমাদের চেয়ে, কি উদ্দেশ্যে নিজেই গভর্নর হয়েছিলেন তা তিনিই জানতেন।



পাকিস্তান হওয়ার সাথে সাথেই ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু হয়েছিল। বিশেষ করে জনাব সোহরাওয়ার্দীর বিরুদ্ধে দিল্লিতে এক ষড়যন্ত্র শুরু হয়। কারণ, বাংলাদেশ ভাগ হলেও যতটুকু আমরা পাই, তাতেই সিন্ধু, পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানের মিলিতভাবে লোকসংখ্যার চেয়ে পূর্ব পাকিস্তানের লোকসংখ্যা বেশি। সোহরাওয়ার্দীর ব্যক্তিত্ব, অসাধারণ রাজনৈতিক জ্ঞান, বিচক্ষণতা ও কর্মক্ষমতা অনেককেই বিচলিত করে তুলেছিল। কারণ, ভবিষ্যতে তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে চাইবেন এবং বাধা দেওয়ার ক্ষমতা কারও থাকবে না। জিন্নাহ সোহরাওয়ার্দীকে ভালবাসতেন। তাই তাঁকে প্রথমেই আঘাত করতে হবে। এদিকে সাম্প্রদায়িক গোলমাল লেগেই আছে কলকাতায়। অন্যদিকে পার্টিশন কাউন্সিলের সভা। কংগ্রেস কলকাতায় ছায়া মন্ত্রিসভা গঠন করেছে। আর একদিকে গোপনে শহীদ সাহেবকে নেতৃত্ব থেকে নামিয়ে নাজিমুদ্দীনকে বসাবার ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে কলকাতা ও দিল্লিতে। পাঞ্জাব ভাগ হল, সেখানে নির্বাচনের প্রশ্ন আসল না। নবাব মামদোত পূর্ব পাঞ্জাবের লোক হয়েও পশ্চিম পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী হলেন। লিয়াকত আলী খান ভারতবর্ষের লোক হয়েও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হলেন। আর সোহরাওয়ার্দী পশ্চিমবঙ্গের লোক হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে হলে আবার তাঁকে নির্বাচন করতে হবে বলা হল। যেখানে সমগ্র বাংলাদেশের মুসলিম লীগ এমএলএরা সর্বসম্মতিক্রমে শহীদ সাহেবকে নেতা বানিয়েছিলেন এবং তিনি প্রধানমন্ত্রী আছেন—এই অবস্থার মধ্যে দিল্লি থেকে হুকুম আসল আবার নেতা নির্বাচন হবে। শহীদ সাহেব শাসন চালাবেন, মুসলমানদের রক্ষা করবেন, না ইলেকশন নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন! সিলেটের গণভোটেও শহীদ সাহেবকে যেতে হল। আমাদের মত হাজার হাজার কর্মীকে সিলেটে তিনি পাঠালেন। টাকা বন্দোবস্ত করতে হয়েছিল তাঁকেই বেশি। এস. এম. ইস্পাহানী সাহেব বেঙ্গল মুসলিম লীগের কোষাধ্যক্ষ হিসাবে বহু টাকা দিয়েছিলেন, আমার জানা আছে। কারণ, শহীদ সাহেব তাঁর সাথে যখন আলোচনা করেন ৪০ নম্বর থিয়েটার রোডে, তখন আমি উপস্থিত ছিলাম। আমরা যখন সিলেটে পৌঁছালাম এবং কাজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লাম, তখন শহীদ সাহেব সিলেটে আসেন। আমার সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয় করিমগঞ্জ মহকুমায় এক বিরাট জনসভায়। আমিও সেই সভায় বক্তৃতা করেছিলাম।

মওলানা তর্কবাগীশ, মানিক ভাই (*ইত্তেফাকের* সম্পাদক), ফজলুল হক ও আমি পাঁচশত কর্মী নিয়ে একদিন সিলেটে পৌঁছি। আমাদের জন্য সিলেটের গণভোট কমিটির

কিছুই করতে হয় নাই—শুধু কোন এলাকায় কাজ করতে হবে, আমাদের সেখানে পৌঁছিয়ে দিতে হয়েছে। যাবতীয় খরচপত্রের ব্যবস্থা শহীদ সাহেব করে দিয়েছিলেন। কারো মুখাপেক্ষী আমাদের হতে হবে না। শামসুল হক সাহেব ঢাকা থেকেও বহু কর্মী নিয়ে সেখানে পৌঁছে ছিলেন। শহীদ সাহেবের অনুরোধে দানবীর রায়বাহাদুর আর. পি. সাহা হিন্দু হয়েও কয়েকখানা লঞ্চ সিলেটে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এই লঞ্চগুলি ব্যবহার করা হয়েছিল মুসলিম লীগ কর্মী এবং পাকিস্তানের পক্ষে। কারণ, যানবাহন খুবই প্রয়োজন ছিল। শহীদ সাহেবের বন্ধু ছিলেন রায়বাহাদুর, তাঁর কথা তিনি ফেলতে পারেন নাই। রায়বাহাদুর আজও পাকিস্তানী। মির্জাপুর হাসপাতাল, তারতেশ্বরী হোমস গার্লস হাইস্কুল, কুমুদিনী কলেজ তাঁরই দানে টিকে আছে।



সিলেটে গণভোটে জয়লাভ করে আমরা কলকাতায় ফিরে এলাম। দেখি, মুসলিম লীগের এক দল ঠিক করেছেন নাজিমুদ্দীন সাহেবকে শহীদ সাহেবের সাথে নেতা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করাবেন। কেন্দ্রীয় লীগ দিল্লি থেকে হুকুম দিয়েছেন ইলেকশন করতে। জনাব আই আই চুন্দ্রিগড় কেন্দ্রীয় লীগের পক্ষ থেকে এই নির্বাচনে সভাপতিত্ব করবেন। এদিকে দু'দেশের সম্পদের ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে যে গোলমাল চলেছে, সেদিকে কারো খেয়াল নাই। নেতা নির্বাচন নিয়ে সকলেই ব্যস্ত। নাজিমুদ্দীন সাহেব নির্বাচনের সময় নমিনেশন দিয়ে বাংলাদেশ ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন লন্ডন ও দিল্লিতে। শহীদ সাহেব সমস্ত নির্বাচনটা নিজে চালিয়েছিলেন, টাকা পয়সার বন্দোবস্ত করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী হয়ে তিনি একদিনের জন্যও বিশ্রাম পান নাই। কলকাতা, নোয়াখালী ও বিহারের দাঙ্গা বিধ্বস্তদের সহায়তা দান, মুসলিম লীগের সংগঠন, দিল্লি, কলকাতা দৌড়াদৌড়ি সকল কিছুই তাঁকে করতে হয়েছিল। আর যখন পাকিস্তান কায়েম হয়েছে তখন নেতা হবার জন্য আর একজনকে আমদানি করা যে কত বড় অন্যায় সেকথা ভবিষ্যৎ বিচার করবে। শহীদ সাহেবের বিরোধীদের প্রপাগান্ডা হল তিনি পশ্চিম বাংলার লোক; তিনি কেন পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী হবেন? শহীদ সাহেব তো কোনোদিন দুই গ্রুপ চিন্তা করেন নাই, তাই নাজিমুদ্দীন সাহেবের সমর্থকদেরও নমিনেশন দিয়েছিলেন, মন্ত্রী করেছিলেন, পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি, চিফ হুইপ, স্পিকার অনেক পদই দিয়েছিলেন। এরা সকলেই তলে তলে শহীদ সাহেবের বিরুদ্ধাচরণ করছিলেন। অন্যদিকে, পশ্চিম বাংলার মুসলিম লীগ এমএলএরা ভোট দিতে পারবেন না, কারণ তারা হিন্দুস্তানে পড়ে গিয়েছেন। তাঁর নিজের দল হাশিম সাহেবের নেতৃত্বে ঘরে বসে আছেন, শহীদ সাহেবকে সমর্থন করবেন না। হাশিম সাহেব কোনো কর্মীকে নির্দেশ দিলেন না। অনেককেই নিষেধ করে দিলেন এবং তলে তলে বলে দিলেন, শহীদ সাহেবকে সমর্থন না করতে। শহীদ সাহেবের এদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। কোন চেষ্টাই করছেন না। কাউকেই অনুরোধ করছেন না, ভোট দিতে। তাঁকে বললে, তিনি বলতেন, "ইচ্ছা হয় দিবে, না হয় না দিবে, আমি কি করব?"

শহীদ সাহেবের পক্ষে মোহাম্মদ আলী, জনাব তোফাজ্জল আলী, ডা. মালেক, মিস্টার সবুর খান, আনোয়ারা খাতুন, ফরিদপুরের বাদশা মিয়া, রংপুরের খয়রাত হোসেন কাজ করছিলেন। শহীদ সাহেবের দলের চিফ হুইপ মফিজউদ্দিন আহমেদ সাহেব গোপনে গোপনে নাজিমুদ্দীন সাহেবের দলে কাজ করছিলেন। মন্ত্রী জনাব শামসুদ্দিন আহমদ (কুষ্টিয়া) চেষ্টা করছিলেন শহীদ সাহেবের বিপক্ষে। একমাত্র ফজলুর রহমান সাহেব—তখন মন্ত্রী ছিলেন, শহীদ সাহেবকে বলেছিলেন, তার পক্ষে নাজিমুদ্দীন সাহেবকে ভোট দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। আমার কথাটা ভাল লেগেছিল। যা হোক, এর পরেও শহীদ সাহেবের পক্ষে ভোট বেশি ছিল। শেষ পর্যন্ত সিলেট জেলার সতেরজন এমএলএ কলকাতা পৌঁছাল, তারাও ভোট দিবেন। ডা. মালেক সিলেট গিয়েছিলেন, শহীদ সাহেবের পক্ষে কাজ করতে। তাকে সিলেটের এমএলএরা জিজ্ঞাসা করেছিলেন শহীদ সাহেবের প্রোগ্রাম কি?

ডা. মালেক বলেছিলেন, প্রথম কাজ হবে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করা। ফল হল উল্টা, তিনজন এমএলএ ছাড়া আর সকলেই ছিলেন সিলেটের জমিদার। তাঁরা ঘাবড়িয়ে গিয়েছিলেন। হোটেল বিল্টমোরে তাঁদের রাখা হয়েছিল। আমরা এদের শিয়ালদহ স্টেশন থেকে ধরে এনেছিলাম। শহীদ সাহেবের কাছে সিলেটের এমএলএরা দাবি করলেন, তিনটি মন্ত্রিত্ব দিতে হবে সিলেটে। শহীদ সাহেব বললেন, "আমি কোন ওয়াদা করি না। তাঁদের যা প্রাপ্য তাই পাবেন।" অন্যদিকে নাজিমুদ্দীনের পক্ষে ওয়াদা দেয়া হয়েছিল। দু'একজন ছাড়া সিলেটের এমএলএরা নাজিমুদ্দীন সাহেবকে ভোট দিলেন, তাতে শহীদ সাহেব পরাজিত হলেন। যেদিন নির্বাচন হবে, তার পূর্বের দিন রাত দুইটার সময়—আমি তখন শহীদ সাহেবের বাড়িতে, শহীদ সাহেব বারান্দায় শুয়ে আছেন। ডা. মালেক এসে বললেন, "আমাদের অবস্থা ভাল মনে হচ্ছে না, কিছু টাকা খরচ করলে বোধহয় অবস্থা পরিবর্তন করা যেত।" শহীদ সাহেব মালেক সাহেবকে বললেন, "মালেক, পাকিস্তান হয়েছে, এর পাক ভূমিকে নাপাক করতে চাই না। টাকা আমি কাউকেও দেব না, এই অসাধু পন্থা অবলম্বন করে নেতা আমি হতে চাই না। আমার কাজ আমি করেছি।" মালেক সাহেব বললেন, "ঠিক, ঠিক বলেছেন স্যার, আমারও ঘৃণা করে।" সেইদিন থেকে শহীদ সাহেবকে আমি আরও ভালবাসতে শুরু করলাম। শহীদ সাহেব ইহজগতে নাই, তবে মালেক ভাই আজও জীবিত আছেন। আমরা তিনজনই তখন ছিলাম, আর কেউ ছিল না।

আমার মনে আছে শহীদ সাহেবকে সকালবেলা আমি বলেছিলাম, "আমাদের এমএলএদের ওরা ভাগিয়ে নিয়ে শাহাবুদ্দীন সাহেবের বাড়িতে রেখেছে। আপনি কলকাতা মুসলিম লীগকে খবর দেন, আমরা ওদের কেড়ে আনব, আমাদের কাছে ওরা দাঁড়াতে পারবে না।" শহীদ সাহেব হেসে দিয়ে বললেন, "না দরকার নাই, মানুষ হাসবে। তুমি ছেলেমানুষ বুঝবা না।" কলকাতায় তখনও দাঙ্গা চলছিল। ইচ্ছা করলে কারফিউ জারি করে নির্বাচন কয়েকদিনের জন্য বন্ধ করে দিতে পারতেন। কারণ, তখনও তিনি প্রধানমন্ত্রী আছেন। পদের লোভ যে তাঁর ছিল না, এটাই তার প্রমাণ। কোনোমতে পদ আঁকড়িয়ে থাকতে হবে, এটা তিনি কোনোদিন চাইতেন না। আর ষড়যন্ত্রের রাজনীতিতে বিশ্বাস করতেন

না। পাকিস্তানের রাজনীতি শুরু হল ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে। জিন্নাহ যতদিন বেঁচেছিলেন প্রকাশ্যে কেউ সাহস পায় নাই। যেদিন মারা গেলেন ষড়যন্ত্রের রাজনীতি পুরাপুরি প্রকাশ্যে শুরু হয়েছিল।



নাজিমুদ্দীন সাহেব নেতা নির্বাচিত হয়েই ঘোষণা করলেন, ঢাকা রাজধানী হবে এবং তিনি দলবলসহ ঢাকায় চলে গেলেন। একবার চিন্তাও করলেন না, পশ্চিম বাংলার হতভাগা মুসলমানদের কথা। এমনকি আমরা যে সমস্ত জিনিসপত্র কলকাতা থেকে ভাগ করে আনব তার দিকেও ভ্রূক্ষেপ করলেন না। ফলে যা আমাদের প্রাপ্য তাও পেলাম না। সরকারি কর্মচারীরা ঝগড়া গোলমাল করে কিছু কিছু মালপত্র স্টিমার ও ট্রেনে তুলতে পেরেছিলেন, তাই সম্বল হল। কলকাতা বসে যদি ভাগ বাটোয়ারা করা হত তাহলে কোনো জিনিসের অভাব হত না। নাজিমুদ্দীন সাহেব মুসলিম লীগ বা অন্য কারোর সাথে পরামর্শ না করেই ঘোষণা করলেন ঢাকাকে রাজধানী করা হবে। তাতেই আমাদের কলকাতার উপর আর কোনো দাবি রইল না। এদিকে লর্ড মাউন্টব্যাটেন চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়েছিলেন, কলকাতা নিয়ে কি করবেন? 'মিশন উইথ মাউন্টব্যাটেন' বইটা পড়লে সেটা দেখা যাবে। ইংরেজ তখনও ঠিক করে নাই কলকাতা পাকিস্তানে আসবে, না হিন্দুস্তানে থাকবে। আর যদি কোনো উপায় না থাকে তবে 'একে ফ্রি শহর' করা যায় কি না? কারণ, কলকাতার হিন্দু-মুসলমান লড়বার জন্য প্রস্তুত। যে কোন সময় দাঙ্গাহাঙ্গামা ভীষণ রূপ নিতে পারে। কলকাতা হিন্দুস্তানে পড়লেও শিয়ালদহ স্টেশন পর্যন্ত পাকিস্তানে আসার সম্ভাবনা ছিল। হিন্দুরা কলকাতা পাবার জন্য আরও অনেক কিছু ছেড়ে দিতে বাধ্য হত।

এই বইতে আরও আছে, একজন ইংরেজ গভর্নর হয়ে ঢাকা আসতে রাজি হচ্ছিল না, কারণ ঢাকায় খুব গরম আবহাওয়া। তার উত্তরে মাউন্টব্যাটেন যে চিঠি দিয়েছিলেন তাতে লেখা ছিল, 'পূর্ব পাকিস্তানে দুনিয়ার অন্যতম পাহাড়ি শহর, থাকার কোন কষ্ট হবে না।' অর্থাৎ দার্জিলিংও আমরা পাব। তাও নাজিমুদ্দীন সাহেবের এই ঘোষণায় শেষ হয়ে গেল। যখন গোলমালের কোনো সম্ভাবনা থাকল না, মাউন্টব্যাটেন সুযোগ পেয়ে যশোর জেলায় সংখ্যাগুরু মুসলমান অধ্যুষিত বনগাঁ জংশন অঞ্চল কেটে দিলেন। নদীয়ায় মুসলমান বেশি, তবু কৃষ্ণনগর ও রানাঘাট জংশন ওদের দিয়ে দিলেন। মুর্শিদাবাদে মুসলমান বেশি কিন্তু সমস্ত জেলাই দিয়ে দিলেন। মালদহ জেলায় মুসলমান ও হিন্দু সমান সমান তার আধা অংশ কেটে দিলেন, দিনাজপুরে মুসলমান বেশি, বালুরঘাট মহকুমা কেটে দিলেন যাতে জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং হিন্দুস্তানে যায় এবং আসামের সাথে হিন্দুস্তানের সরাসরি যোগাযোগ হয়। উপরোক্ত জায়গাগুলি কিছুতেই পাকিস্তানে না এসে পারত না। এদিকে সিলেটে গণভোটে জয়লাভ করা সত্ত্বেও মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ করিমগঞ্জ মহকুমা ভারতবর্ষকে দিয়েছিল। আমরা আশা করেছিলাম, আসামের কাছাড় জেলা ও সিলেট জেলা পাকিস্তানের

ভাগে না দিয়ে পারবে না। আমার বেশি দুঃখ হয়েছিল করিমগঞ্জ নিয়ে। কারণ, করিমগঞ্জে আমি কাজ করেছিলাম গণভোটের সময়। নেতারা যদি নেতৃত্ব দিতে ভুল করে, জনগণকে তার খেসারত দিতে হয়। যে কলকাতা পূর্ব বাংলার টাকায় গড়ে উঠেছিল সেই কলকাতা আমরা স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিলাম। কেন্দ্রীয় লীগের কিছু কিছু লোক কলকাতা ভারতে চলে যাক এটা চেয়েছিল বলে আমার মনে হয়। অথবা পূর্বেই গোপনে রাজি হয়ে গিয়েছিলেন। সোহরাওয়ার্দী নেতা হলে তাদের অসুবিধা হত তাই তারা পিছনের দরজা দিয়ে কাজ হাসিল করতে চাইল। কলকাতা পাকিস্তানে থাকলে পাকিস্তানের রাজধানী কলকাতায় করতে বাধ্য হত, কারণ পূর্ব বাংলার লোকেরা দাবি করত পাকিস্তানের জনসংখ্যায়ও তারা বেশি আর শহর হিসাবে তদানীন্তন ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ শহর কলকাতা। ইংরেজের শাসনের প্রথমদিকে কলকাতা একবার সারা ভারতবর্ষের রাজধানীও ছিল।

✻

এই সময়ে আরও কয়েকটা ঘটনা ঘটে আমাদের কর্মীদের মধ্যে। আমাদের যে মিল্লাত প্রেসটা ছিল—সেটা হাশিম সাহেব পরিচালনা করতেন। কথা উঠল, প্রেসটা কি করা যায়? হাশিম সাহেব পূর্বেই দেনা হয়ে পড়েছেন বলে একটা রঙিন মেশিন বিক্রি করে দেন, তাতে দায়দেনা শোধ হয়ে যায়। তিনি শামসুল হক সাহেবকে ঢাকা থেকে ডেকে নিয়ে বললেন, "কলকাতার কর্মীরাও অনেকে ঢাকা চলেছে, আমি পাকিস্তানে যাব না। তোমরা প্রেসটা ঢাকায় নিয়ে একে কেন্দ্র করে দলটা ঠিক রাখ, আর কাজ চালিয়ে যাও।" শামসুল হক সাহেব আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করে রাজি হলেন, ঢাকার লীগ অফিস ১৫০ নম্বর মোগলটুলীতে প্রেসটা বসানো হবে। *মিল্লাত* কাগজ চলবে, আমরা এক একজন এক একটা বিভাগের ভার নেব। শামসুল হক সাহেব ঢাকায় এসে সবকিছু ঠিক করে কলকাতা গেলেন। হাশিম সাহেব আবার কলকাতার কর্মীদের বললেন, "তোমরা তো কলকাতায় থাকলে, তোমাদেরই বোধহয় প্রেসটা থাকা দরকার। কারণ, হিন্দুস্তানে তোমরা কিইবা করবা! যাদের বাড়ি পাকিস্তানে পড়েছে তাদের আর প্রয়োজন কি, পাকিস্তান তো হয়েই গেছে।" কলকাতার কর্মীরা বলে বসল, ঠিকই তো কথা। যখন হক সাহেব এই কথা শুনলেন, কিছুই না বলে ফিরে এলেন। আমি তখন হাশিম সাহেবের কাছে বেশি যাই না। কারণ, তিনি আমাকে শহীদ সাহেবের সমর্থক বলে বিশ্বাস করতেন না, আর আমিও শহীদ সাহেবের সাথে তাঁর ব্যবহার সমর্থন করি না। একে আমি বিশ্বাসঘাতকতা বলতাম।

একদিন নূরুদ্দিন, নূরুল আলম ও কাজী ইদ্রিস সাহেব আমাকে ডেকে পাঠালেন বেঙ্গল রেস্টুরেন্টে, আমার বাসার কাছে। জিজ্ঞাসা করলাম, "ব্যাপার কি?" এরা আমাকে বলল, "সর্বনাশ হয়ে গেছে, হাশিম সাহেব প্রেস বিক্রি করে ফেলতে চান, আমরা চাঁদা তুলে প্রেস করেছি, মুখ দেখাব কি করে?" আমি বললাম, "আমি কি করব?" সকলে বলল, "তোমাকে বাধা দিতে হবে।" বললাম, "আমি কেন বাধা দেব? আমি পাকিস্তানে চলে যাব।

আর কবে দেখা হবে ঠিক নাই। আমার প্রয়োজন কি? তোমরা হাশিম সাহেবের খলিফা, আমার নাম তো পূর্বেই কাটা গেছে, আর কেন?" সকলে বলল, "তুমি বললেই আর ভয়েতে বিক্রি করবে না।" বললাম, "ঠিক আছে আমি অনুরোধ করতে পারি।"

পরের দিন মিল্লাত প্রেসে গিয়ে হাশিম সাহেবের সাথে দেখা করি। পাশের ঘরে আমার সহকর্মীরা চুপ করে বসে আছে; শুনবে আমাদের কথা। আমি খুব শান্তভাবে তাঁকে বললাম, "প্রেসটা নাকি বিক্রি করবেন?" বললেন, "উপায় কি, প্রত্যেক মাসেই লোকসান যাচ্ছে, কি করি? আর চালাবে কে?" আমি বললাম, "খন্দকার নূরুল আলম তো ম্যানেজার হয়ে এতকাল চালাল। খরচ কমিয়ে ফেলল। প্রেসটা বিক্রি করে দিলে কর্মচারীদের থাকবে কি? আর আমরা মুখ দেখাতে পারব না। সমস্ত বাংলাদেশ থেকে চাঁদা তুলেছি, লোকে আমাদের গালি দিবে।" হাশিম সাহেব হঠাৎ রাগ করে ফেললেন এবং বললেন, "আমাকে বেচতেই হবে, কারণ দেনা শোধ করবে কে?" আমি বললাম, "কয়েক মাস পূর্বে যে প্রেসটা বিক্রি হল তাতে দেনা শোধ হয় নাই?" তিনি ভীষণ রেগে গেলেন, আমারও রাগ হল। উঠে আসার সময় বলে এলাম, "প্রেস বিক্রি করতে গেলে আমি বাধা দেব, দেখি কে আসে এই মিল্লাত প্রেসে?" হাশিম সাহেব খুব দুঃখ পেলেন আমার কথায়। পরের দিন ঐ সমস্ত বন্ধুরা আবার আমার কাছে এসে বলল, "হাশিম সাহেব খানা খান না। শুধু বলেন, 'মুজিব আমাকে অপমান করল!' তুই আবার দেখা কর, আর বলে দে, যা ভাল বোঝেন করেন।" আমি বললাম, "তোমরা খেলা পেয়েছ!"

আমি শহীদ সাহেবের কাছে এখন রোজই যাই। তাঁর সাথে মাঝে মাঝে সভা সমিতিতে যাই—যেখানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সৃষ্টির জন্য সভা হয়। শহীদ সাহেবকে বললাম, সকল ইতিহাস। তিনি আমার উপর রাগ করলেন, কেন আমি খারাপ ব্যবহার করলাম হাশিম সাহেবের সাথে। কত বড় উদার ছিলেন শহীদ সাহেব। আমি হাশিম সাহেবের কাছে যেয়ে বললাম, "আপনি মনে কিছু করবেন না, আমার এভাবে কথা বলা অন্যায় হয়েছে। আপনি যা ভাল বোঝেন তাই করুন। আমার কিছুই বলার নাই।" হাশিম সাহেব হিন্দুস্তানে থাকবেন, আমি চলে আসব পাকিস্তানে। আমার বাড়িও পাকিস্তানে। আমি যাওয়াতে তিনি খুশি হয়েছিলেন। তাঁর সাথে ভিন্ন মত হতে পারি, কিন্তু তাঁর কাছ থেকে যে রাজনীতির শিক্ষা পেয়েছি, সেটা তো ভোলা কষ্টকর। আমার যদি কোনো ভুল হয় বা অন্যায় করে ফেলি, তা স্বীকার করতে আমার কোনোদিন কষ্ট হয় নাই। ভুল হলে সংশোধন করে নেব, ভুল তো মানুষের হয়েই থাকে। আমার নিজেরও একটা দোষ ছিল, আমি হঠাৎ রাগ করে ফেলতাম। তবে রাগ আমার বেশি সময় থাকত না।

আমি অনেকের মধ্যে একটা জিনিস দেখেছি, কোন কাজ করতে গেলে শুধু চিন্তাই করে। চিন্তা করতে করতে সময় পার হয়ে যায়, কাজ আর হয়ে ওঠে না। অনেক সময় করব কি করব না, এইভাবে সময় নষ্ট করে এবং জীবনে কোন কাজই করতে পারে না। আমি চিন্তাভাবনা করে যে কাজটা করব ঠিক করি, তা করেই ফেলি। যদি ভুল হয়, সংশোধন করে নেই। কারণ, যারা কাজ করে তাদেরই ভুল হতে পারে, যারা কাজ করে না তাদের ভুলও হয় না।



এই সময় শহীদ সাহেবের সাথে কয়েক জায়গায় আমার যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। মহাত্মা গান্ধীর সাথে শহীদ সাহেব হিন্দু-মুসলমান শান্তি কায়েম করার জন্য কাজ করছিলেন। তখন মুসলমানদের উপর মাঝে মাঝে আক্রমণ হচ্ছিল। সেদিন রবিবার ছিল। আমি সকালবেলা শহীদ সাহেবের বাসায় যাই। তিনি আমাকে বললেন, "চল, ব্যারাকপুর যাই। সেখানে খুব গোলমাল হয়েছে। মহাত্মা গান্ধীও যাবেন।" আমি বললাম, "যাব স্যার।" তাঁর গাড়িতে উঠলাম, নারকেলডাঙ্গা এলাম। সেখান থেকে মহাত্মাজী, মনু গান্ধী, আভা গান্ধী ও তাঁর সেক্রেটারি এবং কিছু কংগ্রেস নেতাও সাথে চললেন। ব্যারাকপুরের দিকে রওয়ানা করলাম। হাজার হাজার লোক রাস্তার দু'পাশে ভিড় করেছে, তাদের শুধু এক কথা, 'বাপুজী কি জয়'। ব্যারাকপুরে পৌঁছে দেখি, এক বিরাট সভার আয়োজন হয়েছে। মহাত্মাজী রবিবার কারও সাথে কথা বলেন না, বক্তৃতা তো করবেনই না। মনু গান্ধী ও আভা গান্ধী 'আলহামদু' সূরা ও 'কুলহু' সূরা পড়লেন। তারপরে রামধুন গান গাইলেন। মহাত্মাজী লিখে দিলেন, তার বক্তৃতা সেক্রেটারি পড়ে শোনালেন। সত্যই ভদ্রলোক জাদু জানতেন। লোকে চিৎকার করে উঠল, হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই। সমস্ত আবহাওয়ার পরিবর্তন হয়ে গেল এক মুহূর্তের মধ্যে।

এর দু'দিন পরেই বোধহয় ঈদের নামাজ হল। মুসলমানরা ভয় পেয়ে গেছে ঈদের নামাজ পড়বে কি পড়বে না? মহাত্মাজী ঘোষণা করলেন, যদি দাঙ্গা হয় এবং মুসলমানদের উপর কেউ অত্যাচার করে তবে তিনি অনশন করবেন। মহল্লায় মহল্লায় বিশেষ করে হিন্দি ভাষাভাষী লোকেরা শোভাযাত্রা বের করে স্লোগান দিতে লাগল, 'মুসলমানকো মাত মারো, বাপুজী অনশন কারেগা। হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই।' ঈদের দিনটা শান্তিতেই কাটল। আমি আর ইয়াকুব নামে আমার এক ফটোগ্রাফার বন্ধু পরামর্শ করলাম, আজ মহাত্মাজীকে একটা উপহার দিব। ইয়াকুব বলল, "তোমার মনে আছে আমি আর তুমি বিহার থেকে দাঙ্গার ফটো তুলেছিলাম?" আমি বললাম, "হ্যাঁ মনে আছে।" ইয়াকুব বলল, "সমস্ত কলকাতা ঘুরে আমি ফটো তুলেছি। তুমি জান না তার কপিও করেছি। সেই ছবিগুলি থেকে কিছু ছবি বেছে একটা প্যাকেট করে মহাত্মাজীকে উপহার দিলে কেমন হয়।" আমি বললাম, "চমৎকার হবে। চল যাই, প্যাকেট করে ফেলি।" যেমন কথা, তেমন কাজ। দুইজনে বসে পড়লাম। তারপর প্যাকেটটা এমনভাবে বাঁধা হল যে, কমপক্ষে দশ মিনিট লাগবে খুলতে। আমরা তাঁকে উপহার দিয়েই ভাগব। এই ফটোর মধ্যে ছিল মুসলমান মেয়েদের স্তন কাটা, ছোট শিশুদের মাথা নাই, শুধু শরীরটা আছে, বস্তি, মসজিদে আগুনে জ্বলছে, রাস্তায় লাশ পড়ে আছে, এমনই আরও অনেক কিছু। মহাত্মাজী দেখুক, কিভাবে তাঁর লোকেরা দাঙ্গাহাঙ্গামা করেছে এবং নিরীহ লোককে হত্যা করেছে।

আমরা নারকেলডাঙ্গায় মহাত্মাজীর ওখানে পৌঁছালাম। তাঁর সাথে ঈদের মোলাকাত করব বললাম। আমাদের তখনই তাঁর কামরায় নিয়ে যাওয়া হল। মহাত্মাজী আমাদের কয়েকটা আপেল দিলেন। আমরা মহাত্মাজীকে প্যাকেটটা উপহার দিলাম। তিনি হাসিমুখে

গ্রহণ করলেন। আমরা অপরিচিত সেদিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপ নাই। তবে বুঝতে পারলাম, তাঁর নাতনী মনু গান্ধী আমার চেহারা দেখেছে ব্যারাকপুর সভায়, কারণ আমি শহীদ সাহেবের কাছে প্লাটফর্মে বসেছিলাম। আমরা উপহার দিয়ে চলে এলাম তাড়াতাড়ি হেঁটে। শহীদ সাহেব তখন ওখানে নাই। বন্ধু ইয়াকুবের এই ফটোগুলি যে মহাত্মা গান্ধীর মনে বিরাট দাগ কেটেছিল তাতে সন্দেহ নাই। আমি শহীদ সাহেবকে পরে এ বিষয়ে বলেছিলাম।

আমাদের পক্ষে কলকাতা থাকা সম্ভবপর না, কারণ অনেককে গ্রেফতার করেছে। জহিরুদ্দিনের বাড়ি তল্লাশি করেছে। আমাদেরও ধরা পড়লে ছাড়বে না। ভাগতে পারলে বাঁচি। একটা অসুবিধা ছিল, আমি ও আমার ভগ্নিপতি আবদুর রব সাহেব একটা রেস্টুরেন্ট করেছিলাম পার্ক সার্কাসে। সে বাড়ি গিয়েছে, আমার বোন ও রেণুকে পৌঁছে দিতে। আসতে দেরি করছে। আমি দেখাশোনা করি না, ম্যানেজার সব শেষ করে দিচ্ছে। তাকে টেলিগ্রাম করে দিয়ে আমি রওয়ানা করব ঠিক করলাম। শহীদ সাহেবের কাছে বিদায় নিতে গেলাম। তাঁকে রেখে চলে আসতে আমার মনে খুব কষ্ট হচ্ছিল। আমার মন বলছিল, কতদিন মহাত্মাজী শহীদ সাহেবকে রক্ষা করতে পারবেন? কয়েকবার তাঁর উপর আক্রমণ হয়েছে। তাঁকে হিন্দুরা মেরে ফেলতে চেষ্টা করছে। বিজ্ঞান কলেজের সামনে তাঁর গাড়ির উপর বোমা ফেলে গাড়িটা পুড়িয়ে দিয়েছিল। তিনি কোনোমতে রক্ষা পেয়েছিলেন। শহীদ সাহেবকে বললাম, "চলুন স্যার পাকিস্তানে, এখানে থেকে কি করবেন?" বললেন, "যেতে তো হবেই, তবে এখন এই হতভাগা মুসলমানদের জন্য কিছু একটা না করে যাই কি করে? দেখ না, সমস্ত ভারতবর্ষে কি অবস্থা হয়েছে, চারদিকে শুধু দাঙ্গা আর দাঙ্গা। সমস্ত নেতা চলে গেছে, আমি চলে গেলে এদের আর উপায় নাই। তোমরা একটা কাজ কর দেশে গিয়ে, সাম্প্রদায়িক গোলমাল যাতে না হয়, তার চেষ্টা কর। পূর্ব বাংলায় গোলমাল হলে আর উপায় থাকবে না। চেষ্টা কর, যাতে হিন্দুরা চলে না আসে। ওরা এদিকে এলেই গোলমাল করবে, তাতে মুসলমানরা বাধ্য হয়ে পূর্ব বাংলায় ছুটবে। যদি পশ্চিম বাংলা, বিহার ও আসামের মুসলমান একবার পূর্ব বাংলার দিকে রওয়ানা হয়, তবে পাকিস্তান বিশেষ করে পূর্ব বাংলা রক্ষা করা কষ্টকর হবে। এত লোকের জায়গাটা তোমরা কোথায় দিবা আমার তো জানা আছে। পাকিস্তানের মঙ্গলের জন্যই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হতে দিও না।" বললাম, "ঢাকা যেতে হবে, শামসুল হক সাহেব খবর দিয়েছেন। রাজনৈতিক কর্মীদের একটা সভা হবে। পরে আবার একবার এসে দেখা করব।" বললেন, "এস।"

নূরুদ্দিন এল না, কারণ সামনেই তার এমএ পরীক্ষা। পরীক্ষার পরই চলে আসবে। নূরুদ্দিনের নানা অসুবিধা, তার স্ত্রী তখন মেডিকেল কলেজে পড়ে। তাকেও আনতে হবে।

আমি ভাবতাম, পাকিস্তান কায়েম হয়েছে, আর চিন্তা কি? এখন ঢাকায় যেয়ে ল' ক্লাসে ভর্তি হয়ে কিছুদিন মন দিয়ে লেখাপড়া করা যাবে। চেষ্টা করব, সমস্ত লীগ কর্মীদের নিয়ে যাতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা না হয়।



আব্বা, মা ও রেণুর কাছে কয়েকদিন থেকে সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকা এলাম। পূর্বে দু'একবার এসেছি বেড়াতে। পথ ঘাট ভাল করে চিনি না। আত্মীয়স্বজন, যারা চাকরিজীবী, কে কোথায় আছেন, জানি না। ১৫০ নম্বর মোগলটুলীতে প্রথমে উঠব ঠিক করলাম। শওকত মিয়া মোগলটুলী অফিসের দেখাশোনা করে। মুসলিম লীগের পুরানা কর্মী। আমার বন্ধুও। শামসুল হক সাহেব ওখানেই থাকেন। মুসলিম লীগ ও অন্যান্য দলের কর্মীদের সভা ডেকেছেন শামসুল হক সাহেব—রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে। আমাকে খবর দিয়েছেন পূর্বেই। তাই কয়েকদিন পূর্বেই এসে হাজির হতে হল। ঘোড়ার গাড়ি ঠিক করলাম, ১৫০ নম্বর মোগলটুলীতে পৌঁছে দিতে। দেখলাম, রসিক গাড়ওয়ান মোগলটুলী লীগ অফিস চেনে। আমাকে বলল, "আপনি লীগ অফিসে যাইবেন, চলেন সাব আমি চিনি।" পয়সাও বেশি নিল বলে মনে হল না। অনেক গল্প শুনেছি এদের সম্পর্কে। কিন্তু আমার সাথে দরকষাকষিও করল না। শামসুল হক সাহেব ও শওকত সাহেব আমাকে পেয়ে খুবই খুশি। শওকত আমাকে নিয়ে কি যে করবে ভেবেই পায় না। তার একটা আলাদা রুম ছিল। আমাকে তার রুমেই জায়গা দিল। আমি তাকে শওকত ভাই বলতাম। সে আমাকে মুজিব ভাই বলত। তিন-চার দিন পরেই কনফারেন্স হবে। বহু কর্মী এসেছে বিভিন্ন জেলা থেকে। অনেকেই মোগলটুলীতে উঠেছে। শামসুল হক সাহেব বললেন, "জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না, কোথায় কনফারেন্স করব? সরকার নাকি এটাকে ভাল চোখে দেখছে না। আমাদের কনফারেন্স যাতে না হয় সেই চেষ্টা করছে এবং গোলমাল করে কনফারেন্স ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা চলেছে।" আমি বললাম, "এত তাড়াতাড়ি এরা আমাদের ভুলে গেল হক সাহেব।" হক সাহেব হেসে দিয়ে বললেন, "এই তো দুনিয়া!"

বিকালে হক সাহেব আমাদের নিয়ে বসলেন—কনফারেন্সে কি করা হবে সে সম্বন্ধে আলোচনা করতে। একটা যুব প্রতিষ্ঠান গঠন করা দরকার, যাতে তরুণ কর্মীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে না যান। আমি হক সাহেবকে বললাম, "যুব প্রতিষ্ঠান একটা করা যায়, তবে কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ করা উচিত হবে কি না চিন্তা করে দেখেন। আমরা এখনও মুসলিম লীগের সভ্য আছি।" হক সাহেব বললেন, "আমরা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ছি না।" হক সাহেব খুবই ব্যস্ত, হল ঠিক করার জন্য। শেষ পর্যন্ত ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান খান সাহেব আবুল হাসানাত সাহেবের বাড়িতে কনফারেন্স হবে ঠিক হল। বিরাট হল এবং লন আছে। তিনি রাজি হলেন, আর কেউই সাহস পেলেন না আমাদের জায়গা দিতে।

কনফারেন্স শুরু হল। জনাব আতাউর রহমান খান ও কামরুদ্দিন সাহেবও এই কনফারেন্স যাতে কামিয়াব হয় তার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। কামরুদ্দিন সাহেবের সাথে আমার পূর্বেই পরিচয় ছিল। আতাউর রহমান সাহেবের সাথে এই প্রথম পরিচয় হয়। প্রথম অধিবেশন শেষ হওয়ার পরে সাবজেক্ট কমিটি গঠন হল। আমাকেও কমিটিতে রাখা হল। আলোচনার মাধ্যমে বুঝতে পারলাম, কিছু কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন কর্মীও যোগদান করেছে। তারা তাদের

পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠার চিত্রলিপি

মতামতও প্রকাশ করতে শুরু করেছে। প্রথমে ঠিক হল, একটা যুব প্রতিষ্ঠান গঠন করা হবে, যে কোন দলের লোক এতে যোগদান করতে পারবে। তবে সক্রিয় রাজনীতি থেকে যতখানি দূরে রাখা যায় তার চেষ্টা করা হবে। এই প্রতিষ্ঠানকে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য করতে হবে। এই প্রতিষ্ঠানের নাম হবে 'গণতান্ত্রিক যুবলীগ।' আমি বললাম, এর একমাত্র কর্মসূচি হবে সাম্প্রদায়িক মিলনের চেষ্টা, যাতে কোনো দাঙ্গাহাঙ্গামা না হয়, হিন্দুরা দেশ ত্যাগ না করে—যাকে ইংরেজিতে বলে 'কমিউনাল হারমনি,' তার জন্য চেষ্টা করা। অনেকেই এই মত সমর্থন করল, কিন্তু কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন দলটা বলল, আরও প্রোগ্রাম নেওয়া উচিত, যেমন অর্থনৈতিক প্রোগ্রাম। আমরা বললাম, তাহলে তো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হয়ে যাবে। অনেক আলোচনার পরে ঠিক হল, একটা সাব-কমিটি করা হবে, তাঁরা কর্মসূচি প্রণয়ন করবেন এবং গণতান্ত্রিক যুবলীগের কার্যনির্বাহী কমিটির কাছে তা পেশ করবেন। সে কর্মসূচি তাঁরাই গ্রহণ করা বা না করার অধিকারী থাকবেন। সতেরজন সদস্য নিয়ে কমিটি করা হল এবং কো-অপ্ট করার ক্ষমতা দেওয়া হল। হিসাব করে দেখা গেল আমাদের মতাবলম্বী লোকই সংখ্যাগরিষ্ঠ। কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন লোকও কয়েকজন কমিটির সভ্য হলেন। কয়েকদিন পরে কার্যকরী কমিটির এক সভায় ড্রাফট কার্যসূচি পেশ করা হল, যাকে পরিপূর্ণ একটা পার্টির ম্যানিফেস্টো বলা যেতে পারে। আমি ভীষণভাবে বাধা দিলাম এবং বললাম কোনো ব্যাপক কর্মসূচি এখন গ্রহণ করা হবে না। একমাত্র 'কমিউনাল হারমনি'র জন্য কর্মীদের ঝাঁপিয়ে পড়া ছাড়া আর কোনো কাজই আমাদের নাই। দুই মাস হল দেশ স্বাধীন হয়েছে। এখন কোন দাবি করা উচিত হবে না। মিছামিছি আমরা জনগণ থেকে দূরে সরে যাব। কমিউনিস্ট নেতারা তখন ভারতবর্ষে স্লোগান দিয়েছে, 'স্বাধীনতা আসে নাই, সংগ্রাম করে স্বাধীনতা আনতে হবে।' আমাদের দেশের কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন সহকর্মীরা সেই আদর্শই কর্মসূচির মধ্যে গ্রহণ করতে চায়। এই সকল কর্মসূচি নিয়ে এখনই জনগণের কাছে গেলে আমাদের উপর থেকে আস্থা হারিয়ে ফেলবে এবং যে কাজ এখন বিশেষ প্রয়োজন, সাম্প্রদায়িক মিলনের কথা বললেও লোকে আমাদের কথা শুনতে চাইবে না। প্রথম সভায় পাস করতে পারল না, আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলাম। তবে হক সাহেব মধ্যপন্থা অবলম্বন করায় আমাদের অসুবিধা হতে লাগল।



এই সময় আমি কিছুদিনের জন্য কলকাতায় যাই। আমাদের রেস্টুরেন্টটা বিক্রি হয়েছে কি না, না হলে ঢাকায় কোনো দোকানের সাথে বদল করা যায় কি না সে বিষয়টা দেখতে। কলকাতায় যেয়ে দেখি, রব সাহেব রেস্টুরেন্ট বিক্রি করে দিয়েছে। যাক বাঁচা গেল। শহীদ সাহেব পূর্ব পাঞ্জাব, দিল্লি, জয়পুর, আলোয়ার ঘুরে কলকাতায় এসেছেন; তিনি খুবই চিন্তিত, এই সমস্ত জায়গায় ভয়াবহ দাঙ্গা হয়েছে। ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানে তিনিই একমাত্র মুসলিম নেতা যিনি সাহস করে এই সমস্ত জায়গায় গিয়ে সচক্ষে সকল অবস্থা

দেখে এসেছেন। আমাকে দেখে খুবই খুশি হলেন এবং বললেন, "সত্যিই পূর্ব বাংলার মুসলমানরা কত সভ্য ও ভাল, কোনো দাঙ্গাহাঙ্গামা হচ্ছে না। তবে হিন্দুরা চলে আসছে, এরাই বিপদ ঘটাবে। আমি শীঘ্রই পূর্ব বাংলায় যাব এবং কয়েকটা সভা করব, যাতে হিন্দুরা না আসে।" শহীদ সাহেব ঢাকা হয়ে খাজা নাজিমুদ্দীনের সাথে পরামর্শ করে বরিশালে সভা করতে যাবেন ঠিক হল।

আমি চলে এলাম ঢাকায়। বরিশালে এক বিরাট সভার আয়োজন হল। শহীদ সাহেব ঢাকায় এসে নাজিমুদ্দীন সাহেবের কাছেই থাকবেন। আমরা স্টিমারে বরিশাল রওয়ানা করলাম। কলকাতা থেকে প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষও এসেছেন। বরিশালে বিকালে সভা শুরু হল, কয়েকজন বক্তৃতা করেছেন। আমাকেও বক্তৃতা করতে হবে, রাত তখন আট ঘটিকা হবে, এমন সময় একটা টুকরা কাগজ আমার হাতে দিল। আমি শহীদ সাহেবের পাশে বসেছিলাম। তাতে রব সাহেব (আমার ভগ্নিপতি) লিখেছে, "মিয়া ভাই, আব্বার অবস্থা খুবই খারাপ, ভীষণ অসুস্থ। তোমার জন্য বিভিন্ন জায়গায় টেলিফোন করা হয়েছে, যদি দেখতে হয় রাতেই রওয়ানা করতে হবে। হেলেন [লেখকের ছোটবোন] চলে গিয়াছে তোমাদের বাড়িতে।" আমি শহীদ সাহেবকে চিঠিটা পড়ে শোনালাম। তিনি আমাকে রওয়ানা করতে হুকুম দিলেন। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে প্লাটফর্ম থেকে নেমে রব সাহেবকে দেখলাম, দাঁড়িয়ে আছে। জিজ্ঞাসা করলাম, "কখন খবর পেয়েছ?" বলল, "গতকাল খবর পেয়েছি। হেলেন রওয়ানা হয়েছে, আমি তোমার জন্য দেরি করছি। কারণ, জানি শহীদ সাহেব যখন আসছেন, তুমিও আসবে।" আমি সোজা মালপত্র নিয়ে রওয়ানা করলাম স্টেশনে আর আধা ঘণ্টা সময় আছে স্টিমার ছাড়তে। স্টিমার ধরতে না পারলে আবার আগামীকল রাতে স্টিমার ছাড়বে।

আমি স্টিমারে চড়ে বসলাম, সমস্ত রাত বসে রইলাম। নানা চিন্তা আমার মনে উঠতে লাগল। আমি তো আমার আব্বার বড় ছেলে। আমি তো কিছুই বুঝি না, কিছুই জানি না সংসারের। কত কথা মনে পড়ল, কত আঘাত আব্বাকে দিয়েছি, তবু কোনোদিন কিছুই বলেন নাই। সকলের পিতাই সকল ছেলেকে ভালবাসে এবং ছেলেরাও পিতাকে ভালবাসে ও ভক্তি করে। কিন্তু আমার পিতার যে স্নেহ আমি পেয়েছি, আর আমি তাঁকে কত যে ভালবাসি সে কথা প্রকাশ করতে পারব না।

ভোরবেলা পাটগাতি স্টেশনে স্টিমার এসে পৌঁছাল। আমার বাড়ি থেকে প্রায় আড়াই মাইল হবে। স্টেশন মাস্টারকে ও অন্যান্য লোকদের জিজ্ঞাসা করলাম, তারা কিছু জানে কি না আমার আব্বার কথা? সকলেই এক কথা বলে, "আপনার আব্বার খুব অসুখ শুনেছি।" নৌকায় গেলে অনেক সময় লাগে। মালপত্র স্টেশন মাস্টারের কাছে রেখে হেঁটে রওয়ানা করলাম। মধুমতী নদী পার হতে হল। সোজা মাঠ দিয়ে বাড়ির দিকে রওয়ানা করলাম। পথঘাটের বালাই নাই। সোজা চষা জমির মধ্য দিয়ে হাঁটলাম। বাড়ি পৌঁছে দেখি আব্বার কলেরা হয়েছে। অবস্থা ভাল না, ডাক্তার আশা ছেড়ে দিয়ে বসে আছে। আমি পৌঁছেই 'আব্বা' বলে ডাক দিতেই চেয়ে ফেললেন। চক্ষু দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ল কয়েক ফোঁটা।

আমি আব্বার বুকের উপর মাথা রেখে কেঁদে ফেললাম; আব্বার হঠাৎ যেন পরিবর্তন হল কিছুটা। ডাক্তার বলল, নাড়ির অবস্থা ভাল মনে হয়। কয়েক মুহূর্তের পরেই আব্বা ভালর দিকে। ডাক্তার বললেন, ভয় নাই। আব্বার প্রস্রাব বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। একটু পরেই প্রস্রাব হল। বিপদ কেটে যাচ্ছে। আমি আব্বার কাছে বসে রইলাম। এক ঘণ্টার মধ্যেই ডাক্তার বললেন, আর ভয় নাই। প্রস্রাব হয়ে গেছে। চেহারাও পরিবর্তন হচ্ছে। দুই তিন ঘণ্টা পরে ডাক্তার বাবু বললেন, আমি এখন যাই, সমস্ত রাত ছিলাম। কোনো ভয় নাই বিকালে আবার দেখতে আসব।

আমি বাড়িতে রইলাম কিছুদিন। আব্বা আস্তে আস্তে আরোগ্য লাভ করলেন। যে ছেলেমেয়েরা তাদের বাবা মায়ের স্নেহ থেকে বঞ্চিত তাদের মত হতভাগা দুনিয়াতে আর কেউ নাই। আর যারা বাবা মায়ের স্নেহ আর আশীর্বাদ পায় তাদের মত সৌভাগ্যবান কয়জন!

※

আমি ঢাকায় এলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছি, আইন পড়ব। বই পুস্তক কিছু কিনলাম। ঢাকায় এসে শুনলাম গণতান্ত্রিক যুবলীগের এক সভা হয়ে গেছে। কার্যকরী কমিটির নতুন সভ্য কো-অপ্ট করা হয়েছে। পূর্বে ছিলাম সতেরজন এখন হয়েছি চৌত্রিশজন। কারণ, আমাদের সংখ্যালঘু করার ষড়যন্ত্র। আমাদের অনেকে নোটিশও পায় নাই। অন্য কোনো কাগজ না ছাপলেও কলকাতার *ইত্তেহাদ* কাগজ আমাদের সংবাদ ছাপত। *ইত্তেহাদেও* নোটিশ ছাপানো হয় নাই। আমি আপত্তি তুললাম এবং বললাম, সতেরজন সদস্য, কেমন করে আরও সতেরজন কো-অপ্ট করতে পারে? সভা ডাকা হোক। কিছুদিন পরে খবর পেলাম, ময়মনসিংহে সভা ডাকা হয়েছে। সকলে নোটিশ পেয়েছে, আমাকে দেওয়া হয় নাই। নোয়াখালীর আজিজ মোহাম্মদ ঢাকা সিটি মুসলিম লীগের সেক্রেটারি ছিলেন, তিনি নোটিশ পেয়ে আমাকে বললেন, আগামী দিনই সভা হবে সকাল নয়টায়। দেখলাম আমরা তিনজন সভ্য ঢাকায় আছি। আজিজ সাহেব, ঢাকার শামসুল হুদা সাহেব (এখন কনভেনশন মুসলিম লীগ করেন) ও আমি। ঠিক করলাম তিনজনই যাব এবং বাধা দিব। অন্য কোনো জেলায় খবর দেওয়ার সময় হবে না। রাতেই আমাদের রওয়ানা করতে হবে। কারণ একটা মাত্র ট্রেন ছাড়ে রাত দশটায়, ভোর তিনটায় পৌঁছায় ময়মনসিংহ। ভোর পর্যন্ত আমরা স্টেশনেই ছিলাম। হক সাহেবের কোনো খবর নাই। তিনি সভায় আসেন নাই। আমরা সভায় উপস্থিত হলাম এবং বৈধতার প্রশ্ন তুললাম। আমাকে ও অনেককে নোটিশ দেওয়া হল না কেন? তারা একটা ম্যানিফেস্টো করে এনেছেন। আমরা বললাম, নোটিশ দিয়ে সভা ডাকা হোক ঢাকায় এবং সেখানে ম্যানিফেস্টো গ্রহণ করা হবে কি হবে না ঠিক করা হবে। এত তাড়াহুড়া করা উচিত হবে না। আর আমরা কোনো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে যোগদান করতে পারি না। কারণ মুসলিম লীগের এখনও কাউন্সিল

সদস্য আমরা। অনেক তর্কবিতর্ক হল, তারপর যখন দেখলাম যে, কিছুতেই শুনছে না, সকলেই প্রায় কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন বা তাদের সমর্থকরা উপস্থিত হয়েছে তখন বাধ্য হয়ে আমরা সভা ত্যাগ করলাম। আর বলে এলাম, মুসলিম লীগের কোনো কর্মী আপনাদের এই ষড়যন্ত্রে থাকবে না। যুবলীগও আজ থেকে শেষ। আপনাদের ক্ষমতা ও জনপ্রিয়তা আমাদের জানা আছে। আমাদের নাম কোথাও রাখবেন না।

মোগলটুলীতে যুবলীগের অফিস ছিল। আমরা বোর্ডটা নামিয়ে দিলাম। এর মধ্যেই তারা ম্যানিফেস্টো ছাপিয়ে ফেলেছে। অফিসেও নিয়ে এসেছে। শওকত মিয়াই এই অফিসের কর্তা। তিনি হুকুম দিলেন, যুবলীগের সকল কিছু এখান থেকে নিয়ে যেতে। কে নিবে? কাউকেও দেখা গেল না। পুলিশ অফিসে তল্লাশি দিল। আমাদের নামও আইবি খাতায় উঠল। ১৫০ নম্বর মোগলটুলী থেকে পাকিস্তানের আন্দোলন হয়েছে, সেই লীগ অফিসেই এখন গোয়েন্দা বিভাগের কর্মচারীরা পাহারা দিতে শুরু করল গোপনে গোপনে। আমরা সকলে শহীদ সাহেবের ভক্ত ছিলাম। এটাই আমাদের দোষ। আমরা সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্য যাতে বজায় থাকে তার চেষ্টাই করতে থাকলাম।

মানিক ভাই তখন কলকাতায় *ইত্তেহাদ* কাগজের সেক্রেটারি ছিলেন। আমাদের টাকা পয়সার খুবই প্রয়োজন। কে দিবে? বাড়ি থেকে নিজেদের লেখাপড়ার খরচটা কোনোমতে আনতে পারি, কিন্তু রাজনীতি করার টাকা কোথায় পাওয়া যাবে? আমার একটু স্বচ্ছল অবস্থা ছিল, কারণ আমি *ইত্তেহাদ* কাগজের পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধি ছিলাম। মাসে প্রায় তিনশত টাকা পেতাম। আমার কাজ ছিল এজেন্সিগুলোর কাছ থেকে টাকা পয়সা আদায় করা, আর *ইত্তেহাদ* কাগজ যাতে চলে এবং নতুন এজেন্ট বিভিন্ন জায়গায় নিয়োগ করা যায় সেটা দেখা। বেশি দিন ছিলাম না। তবু অসুবিধা হওয়ার কথা না, কারণ কাগজে নাম আছে, টাকা বাড়ি থেকেও কিছু পাওয়া যাবে।

'নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগে'র নাম বদলিয়ে 'নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ' করা হয়েছে। শাহ আজিজুর রহমান সাহেবই জেনারেল সেক্রেটারি রইলেন। ঢাকায় কাউন্সিল সভা না করে অন্য কোথাও তাঁরা করলেন গোপনে। কার্যকরী কমিটির সদস্য প্রায় অধিকাংশই ছাত্র নয়, ছাত্র রাজনীতি ছেড়ে দিয়েছেন। ১৯৪৪ সালে সংগঠনের নির্বাচন হয়েছিল, আর হয় নাই। আমরা ঐ কমিটি মানতে চাইলাম না। কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ ও জেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে বহু ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। তারা এই প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত নয়। আমি ছাত্রলীগ কর্মীদের সাথে আলাপ-আলোচনা শুরু করলাম। আজিজ আহমেদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, আবদুল হামিদ চৌধুরী, দবিরুল ইসলাম, নইমউদ্দিন, মোল্লা জালালউদ্দিন, আবদুর রহমান চৌধুরী, আবদুল মতিন খান চৌধুরী, সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং আরও অনেক ছাত্রনেতা একমত হলেন, আমাদের একটা প্রতিষ্ঠান করা দরকার। ১৯৪৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারি তারিখে ফজলুল হক মুসলিম হলের এ্যাসেম্বলি হলে এক সভা ডাকা হল, সেখানে স্থির হল একটা ছাত্র প্রতিষ্ঠান করা হবে। যার নাম হবে 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ'। নইমউদ্দিনকে কনভেনর করা হল। অলি

আহাদ এর সভ্য হতে আপত্তি করল। কারণ সে আর সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান করবে না। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ নাম দিলে সে থাকতে রাজি আছে। আমরা তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম এবং বললাম, "এখনও সময় আসে নাই। রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও দেশের আবহাওয়া চিন্তা করতে হবে। নামে কিছুই আসে যায় না। আদর্শ যদি ঠিক থাকে, তবে নাম পরিবর্তন করতে বেশি সময় লাগবে না। কয়েক মাস হল পাকিস্তান পেয়েছি। যে আন্দোলনের মাধ্যমে পাকিস্তান পেয়েছি, সেই মানসিক অবস্থা থেকে জনগণ ও শিক্ষিত সমাজের মত পরিবর্তন করতে সময় লাগবে।"

প্রতিষ্ঠানের অফিস করলাম ১৫০ নম্বর মোগলটুলী। মুসলিম লীগ নেতারা কয়েকবার চেষ্টা করেছেন এই অফিসটা দখল করতে, কিন্তু শওকত মিয়ার জন্য পারেন নাই। আমরা 'মুসলিম লীগ ওয়ার্কার্স ক্যাম্প' নাম দিয়ে সাইন বোর্ড লাগিয়ে দিয়েছিলাম। এখন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের অফিসও করা হল। শওকত মিয়া টেবিল, চেয়ার, আলমারি সকল কিছুই বন্দোবস্ত করল। তাকে না হলে আমাদের কোন কাজই হত না তখন। আমরা যে কয়েকজন তার সাথে মোগলটুলীতে থাকতাম, আমাদের খাওয়া থাকার ভার তার উপরই ছিল। মাসে যে যা পারতাম, তার কাছে পৌঁছে দিতাম। সেই দেখাশোনা করত।

ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠান গঠন করার সাথে সাথে বিরাট সাড়া পাওয়া গেল ছাত্রদের মধ্যে। এক মাসের ভিতর আমি প্রায় সকল জেলায়ই কমিটি করতে সক্ষম হলাম। যদিও নইমউদ্দিন কনভেনর ছিল, কিন্তু সকল কিছুই প্রায় আমাকেই করতে হত। একদল সহকর্মী পেয়েছিলাম, যারা সত্যিকারের নিঃস্বার্থ কর্মী। পূর্ব পাকিস্তান সরকার প্রকাশ্যে নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগকে সাহায্য করছে, আর আমাদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দা লাগিয়ে দিত। অন্যদিকে খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেব মুসলিম লীগ ন্যাশনাল গার্ড ভেঙে দিতে হুকুম দিলেন। জহিরুদ্দিন, মির্জা গোলাম হাফিজ এবং আরও কয়েকজন আপত্তি করল। কারণ, পাকিস্তানের জন্য এবং পাকিস্তান হওয়ার পরে এই প্রতিষ্ঠান রীতিমত কাজ করে গিয়েছে। রেলগাড়িতে কর্মচারীর অভাব, আইনশৃঙ্খলা ও সকল বিষয়ই এই প্রতিষ্ঠান কাজ করেছে। হাজার হাজার ন্যাশনাল গার্ড ছিল। এদের দেশের কাজে না লাগিয়ে ভেঙে দেওয়ার হুকুমে কর্মীদের মধ্যে একটা ভীষণ বিদ্বেষ ভাব দেখা গেল। ন্যাশনাল গার্ডের নেতারা সম্মেলন করে ঠিক করলেন তারা প্রতিষ্ঠান চালাবেন। জহিরুদ্দিনকে সালারে-সুবা করা হল। জহিরুদ্দিন ঢাকায় আসার কিছুদিন পরেই তাকে নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করা হল মোগলটুলী অফিস থেকে। মোগলটুলীতেই ন্যাশনাল গার্ডের অফিস করা হয়েছিল। তিনতলা বাড়ি, অনেক জায়গা ছিল। দেড় মাস কি দুই মাস পরে জহিরুদ্দিন মুক্তি পেল। অনেক নেতা ভয় পেয়ে গেল। মিস্টার মোহাজের, যিনি বাংলার ন্যাশনাল গার্ডের সালারে-সুবা ছিলেন তাকে নাজিমুদ্দীন সাহেব কি বললেন, জানি না। তিনি খবরের কাগজে ঘোষণা করলেন, দেশ স্বাধীন হয়েছে, ন্যাশনাল গার্ডের আর দরকার নাই। এই রকম একটা সুপ্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান জাতীয় সরকার দেশের উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহার না করে দেশেরই

ক্ষতি করলেন। এই সংগঠনের কর্মীরা যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করেছেন, অনেক নেতার চেয়েও বেশি। অনেকে আমাদের বললেন, এদের দিয়ে যে কাজ করাব, টাকা পাব কোথায়? এরা টাকা চায় নাই। সামান্য খরচ পেলেই বৎসরের পর বৎসর কাজ করতে পারত। আস্তে আস্তে এদের আনসার বাহিনীতে নিয়োগও করতে পারতেন। এদের অনেক দিন পর্যন্ত ট্রেনিংও দেওয়া হয়েছিল। আমাদের এই সমস্ত নেতাদের লীলাখেলা বুঝতে কষ্ট হয়েছিল। ন্যাশনাল গার্ডদের বেতনও দেওয়া হত না। ন্যাশনাল গার্ড ও মুসলিম লীগ কর্মীদের মধ্যে যে প্রেরণা ছিল পাকিস্তানকে গড়বার জন্য তা ব্যবহার করতে নেতারা পারলেন না।

জনগণ ও সরকারি কর্মচারীরা রাতদিন পরিশ্রম করত। অনেক জায়গায় দেখেছি একজন কর্মচারী একটা অফিস চালাচ্ছে। একজন জমাদার ও একজন সিপাহি সমস্ত থানায় লীগ কর্মীদের সাহায্যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করছে। জনসাধারণ রেলগাড়িতে যাবে টিকিট নাই, টাকা জমা দিয়ে গাড়িতে উঠেছে। ম্যাজিকের মত দুর্নীতি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

আস্তে আস্তে সকল কিছুতেই ভাটি লাগল, শুধু সরকারের নীতির জন্য। তারা জানত না, কি করে একটা জাগ্রত জাতিকে দেশের কাজে ব্যবহার করতে হয় এবং জাতিকে গঠনমূলক কাজে লাগান যায়। হাজার হাজার কর্মী এদিক ওদিক ছিটকে পড়ল। কাজও ছিল এবং কর্মীও ছিল কিন্তু তাদের ব্যবহার করা হল না। এর একটা বিশেষ কারণ হল, যাদের কাছে ক্ষমতা এল তারা জনসাধারণের ওপর আস্থা রাখতে পারেন নাই। কারণ, জনসাধারণের সাথে এদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। যে কয়েকজন লোক প্রদেশের শাসন ক্ষমতা হাতে পেলেন, তারা সকলেই প্রায় ইংরেজ ঘেঁষা নেতা ছিলেন। ইংরেজকে তেল দিয়ে স্যার, খান বাহাদুর, খান সাহেব উপাধি নিয়েছেন। এরা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করতে শুরু করলেন ইংরেজ আমলেরই আমলাতন্ত্রের উপর। আমলাতন্ত্রের কর্ণধাররা যা বলতেন তাই শুনতেন। এই সকল কর্মচারীরা অনেকেই ইংরেজকে খুশি করার জন্য গায়ে পড়ে প্রমোশনের লোভে স্বাধীনতার জন্য যে সমস্ত নিঃস্বার্থ কর্মী সংগ্রাম করেছে তাদের উপর অকথ্য অত্যাচার করেছেন, যার ভূরি ভূরি প্রমাণ আজও আছে।

স্বাধীনতা পাওয়ার সাথে সাথে এরা অনেকেই দুই তিন ধাপ প্রমোশন পেলেন এবং এতে মাথা অনেকের খারাপ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। আর স্যার ও খান বাহাদুরের দল এদের হাতের পুতুলে পরিণত হল। স্বাধীন দেশের স্বাধীন জনগণকে গড়তে হলে এবং তাদের আস্থা অর্জন করতে হলে যে নতুন মনোভাবের প্রয়োজন ছিল তা এই নেতৃবৃন্দ গ্রহণ করতে পারলেন না। এদিকে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগকে তাদের হাতের মুঠায় নেবার জন্য এক নতুন পন্থা অবলম্বন করলেন। পাকিস্তান কায়েম হওয়ার পরে মুসলিম লীগও দুই ভাগ হল। এক ভাগ রইল ভারতবর্ষে নাম হল 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ', আরেক ভাগের নাম হল 'পাকিস্তান মুসলিম লীগ'।

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বড়লাট হওয়ার ফলে আর মুসলিম লীগের সভাপতি থাকতে পারেন নাই। তাই চৌধুরী খালিকুজ্জামান সাহেবকে পাকিস্তান মুসলিম লীগের ভার দেওয়া হল। তিনি পাকিস্তান মুসলিম লীগ এবং পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠান ভেঙে দিয়ে

একটা এডহক কমিটি গঠন করলেন। পাঞ্জাবও ভাগ হয়েছিল, কিন্তু পাঞ্জাব মুসলিম লীগ ভাঙলেন না। সিন্ধুও না, সীমান্তও না, একমাত্র বাংলাদেশ। কারণ, এখানে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সমর্থক বেশি। তাই নতুন করে লীগ গঠন করতে হবে নাজিমুদ্দীন সাহেবের সমর্থকদের নিয়ে। মওলানা আকরম খাঁ সাহেবকে চিফ অর্গানাইজার করলেন। আমরা তাড়াতাড়ি একশত বারজন কাউন্সিল সদস্যের দস্তখত নিয়ে একটা রিক্যুইজিশন সভা আহ্বান করার দাবি করলাম। মোহাম্মদ আলী, তোফাজ্জল আলী, ডাক্তার মালেক, আবদুস সালাম খান, এম. এ. সবুর, আতাউর রহমান খান, কামরুদ্দিন, শামসুল হক, আনোয়ারা খাতুন, খয়রাত হোসেন ও অনেকে এতে দস্তখত করলেন। আমি ঘুরে ঘুরে দস্তখত জোগাড় করলাম। দু'একটা জেলায়ও আমাকে যেতে হয়েছিল। রিক্যুইজিশন সভার জন্য যে কয়েকজন সদস্যের দরকার তাদের দস্তখত নিয়ে নোটিশ তৈরি করা হল। মওলানা আকরম খাঁ সাহেবের কাছে পৌঁছাতে হবে এই নোটিশটা। কেউই যেতে রাজি হল না। শেষ পর্যন্ত আমার উপরই ভার পড়ল। এই সময় আমাদের আলোচনা সভা জনাব তোফাজ্জল আলী সাহেবের বাড়িতেই হত। কি করি আমারও লজ্জা করতে লাগল তাঁর সামনে যেয়ে নোটিশটা দিতে। আমি শেষ পর্যন্ত তাঁর কলতাবাজার আজাদ অফিসে হাজির হলাম। খবর দিলে তিনি আমাকে কামরায় ডেকে পাঠালেন। আমি তাঁকে সালাম করে তাঁর হাতে নোটিশ দিলাম এবং তিনি যে নোটিশটা পেলেন তা লিখে দিলে খুশি হব বললাম। মওলানা সাহেব লিখে দিলেন। তিনি আমার সাথে খুব ভাল ব্যবহার করলেন এবং কেমন আছি জিজ্ঞাসা করলেন। আমি তাঁর কাছ থেকে ভাগতে পারলে বাঁচি, তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে ছুটলাম।

পরের দিন *আজাদ* কাগজে তিনি নোটিশটা এবং যারা দস্তখত করেছে তাদের নাম ছেপে দিলেন এবং এক বিবৃতির মারফত ঘোষণা করলেন যে, রিক্যুইজিশন সভা আহ্বান করার ক্ষমতা কারও নাই, কারণ পুরানা প্রতিষ্ঠান ভেঙে দেওয়া হয়েছে। এখন তিনি পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের এডহক কমিটির সভাপতি। অর্থাৎ আমরা কেউই আর মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সভ্য নই। এভাবে মুসলিম লীগ থেকেও আমরা বিতাড়িত হলাম। অনেকেই চুপ করে গেল, আমরা রাজি হলাম না। শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে দেখব।



ফেব্রুয়ারি ৮ই হবে, ১৯৪৮ সাল। করাচিতে পাকিস্তান সংবিধান সভার (কন্সটিটিউয়েন্ট এ্যাসেম্বলি) বৈঠক হচ্ছিল। সেখানে রাষ্ট্রভাষা কি হবে সেই বিষয়ও আলোচনা চলছিল। মুসলিম লীগ নেতারা উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষপাতী। পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ লীগ সদস্যেরও সেই মত। কুমিল্লার কংগ্রেস সদস্য বাবু ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত দাবি করলেন বাংলা ভাষাকেও রাষ্ট্রভাষা করা হোক। কারণ, পাকিস্তানের সংখ্যাগুরুর ভাষা হল বাংলা। মুসলিম লীগ সদস্যরা কিছুতেই রাজি হচ্ছিলেন না। আমরা দেখলাম, বিরাট ষড়যন্ত্র চলছে বাংলাকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্রভাষা উর্দু করার। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ও তমদ্দুন

মজলিস[17] এর প্রতিবাদ করল এবং দাবি করল, বাংলা ও উর্দু দুই ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা করতে হবে। আমরা সভা করে প্রতিবাদ শুরু করলাম। এই সময় পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ও তমদ্দুন মজলিস যুক্তভাবে সর্বদলীয় সভা আহ্বান করে একটা 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করল। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের কিছু শাখা জেলায় ও মহকুমায় করা হয়েছে। তমদ্দুন মজলিস একটা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান যার নেতা ছিলেন অধ্যাপক আবুল কাশেম সাহেব; এদিকে পুরানা লীগ কর্মীদের পক্ষ থেকে জনাব কামরুদ্দিন সাহেব, শামসুল হক সাহেব ও অনেকে সংগ্রাম পরিষদে যোগদান করলেন। সভায় ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চকে 'বাংলা ভাষা দাবি' দিবস ঘোষণা করা হল। জেলায় জেলায় আমরা বের হয়ে পড়লাম। আমি ফরিদপুর, যশোর হয়ে দৌলতপুর, খুলনা ও বরিশালে ছাত্রসভা করে ঐ তারিখের তিন দিন পূর্বে ঢাকায় ফিরে এলাম। দৌলতপুরে মুসলিম লীগ সমর্থক ছাত্ররা আমার সভায় গোলমাল করার চেষ্টা করলে খুব মারপিট হয়, কয়েকজন জখমও হয়। এরা সভা ভাঙতে পারে নাই, আমি শেষ পর্যন্ত বক্তৃতা করলাম। এ সময় জনাব আবদুস সবুর খান আমাদের সমর্থন করছিলেন। বরিশালের জনাব মহিউদ্দিন আহমদ তখন নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের সদস্য, মুসলিম লীগ ও সরকারের পুরা সমর্থক। কাজী বাহাউদ্দিন আহমদ আমাদের দলের নেতা ছিলেন। আমি কলেজেই সভা করেছিলাম। মহিউদ্দিন সাহেব বাধা দিতে চেষ্টা করেন নাই। ঢাকায় ফিরে এলাম। রাতে কাজ ভাগ হল—কে কোথায় থাকব এবং কে কোথায় পিকেটিং করার ভার নেব। সামান্য কিছু সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাড়া শতকরা নব্বই ভাগ ছাত্র এই আন্দোলনে যোগদান করল। জগন্নাথ কলেজ, মিটফোর্ড, মেডিকেল স্কুল, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বিশেষ করে সক্রিয় অংশগ্রহণ করল। মুসলিম লীগ ভাড়াটিয়া গুণ্ডা লেলিয়ে দিল আমাদের উপর। অধিকাংশ লোককে আমাদের বিরুদ্ধে করে ফেলল। পুরান ঢাকার কয়েক জায়গায় ছাত্রদের মারপিটও করল। আর আমরা পাকিস্তান ধ্বংস করতে চাই এই কথা বুঝাবার চেষ্টা করল।

১১ই মার্চ ভোরবেলা শত শত ছাত্রকর্মী ইডেন বিল্ডিং, জেনারেল পোস্ট অফিস ও অন্যান্য জায়গায় পিকেটিং শুরু করল। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে কোনো পিকেটিংয়ের দরকার হয় নাই। সমস্ত ঢাকা শহর পোস্টারে ভরে ফেলা হল। অনেক দোকানপাট বন্ধ ছিল, কিছু খোলাও ছিল। পুরান ঢাকা শহরে পুরাপুরি হরতাল পালন করে নাই। সকাল আটটায় জেনারেল পোস্ট অফিসের সামনে ছাত্রদের উপর ভীষণভাবে লাঠিচার্জ হল। একদল মার খেয়ে স্থান ত্যাগ করার পর আরেকদল হাজির হতে লাগল। ফজলুল হক হলে আমাদের রিজার্ভ কর্মী ছিল। এইভাবে গোলমাল, মারপিট চলল অনেকক্ষণ। নয়টায় ইডেন বিল্ডিংয়ের সামনের দরজায় লাঠিচার্জ হল। খালেক নেওয়াজ খান, বখতিয়ার (এখন নওগাঁর এডভোকেট), শহর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক এম. এ. ওয়াদুদ গুরুতররূপে আহত হল। তোপখানা রোডে কাজী গোলাম মাহাবুব, শওকত মিয়া ও আরও অনেক ছাত্র আহত হল। আবদুল গনি রোডের দরজায় তখন আর ছাত্ররা অত্যাচার ও লাঠির আঘাত সহ্য করতে পারছে না। অনেক কর্মী আহত হয়ে গেছে এবং সরে পড়ছে। আমি জেনারেল পোস্ট অফিসের দিক থেকে

নতুন কর্মী নিয়ে ইডেন বিল্ডিংয়ের দিকে ছুটেছি, এর মধ্যে শামসুল হক সাহেবকে ইডেন বিল্ডিংয়ের সামনে পুলিশ ঘিরে ফেলেছে। গেট খালি হয়ে গেছে। তখন আমার কাছে সাইকেল। আমাকে গ্রেফতার করার জন্য সিটি এসপি জিপ নিয়ে বার বার তাড়া করছে, ধরতে পারছে না। এবার দেখলাম উপায় নাই। একজন সহকর্মী দাঁড়ান ছিল তার কাছে সাইকেল দিয়ে চার পাঁচজন ছাত্র নিয়ে আবার ইডেন বিল্ডিংয়ের দরজায় আমরা বসে পড়লাম এবং সাইকেল যাকে দিলাম তাকে বললাম, শীঘ্রই আরও কিছু ছাত্র পাঠাতে। আমরা খুব অল্প, টিকতে পারব না। আমাদের দেখাদেখি আরও কিছু ছাত্র ছুটে এসে আমাদের পাশে বসে পড়ল। আমাদের উপর কিছু উত্তম মধ্যম পড়ল এবং ধরে নিয়ে জিপে তুলল। হক সাহেবকে পূর্বেই জিপে তুলে ফেলেছে। বহু ছাত্র গ্রেফতার ও জখম হল। কিছু সংখ্যক ছাত্রকে গাড়ি করে ত্রিশ-চল্লিশ মাইল দূরে জঙ্গলের মধ্যে ফেলে আসল। কয়েকজন ছাত্রীও মার খেয়েছিল। অলি আহাদও গ্রেফতার হয়ে গেছে। তাজউদ্দীন, তোয়াহা ও অনেককে গ্রেফতার করতে পারে নাই। আমাদের প্রায় সত্তর-পঁচাত্তরজনকে বেঁধে নিয়ে জেলে পাঠিয়ে দিল সন্ধ্যার সময়। ফলে আন্দোলন দানা বেঁধে উঠল। ঢাকার জনগণের সমর্থনও আমরা পেলাম।

তখন পূর্ব পাকিস্তান আইনসভার অধিবেশন চলছিল। শোভাযাত্রা রোজই বের হচ্ছিল। নাজিমুদ্দীন সাহেব বেগতিক দেখলেন। আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছে। ওয়াদুদ ও বখতিয়ার দু'জনই ছাত্রলীগ কর্মী, তাদের ভীষণভাবে আহত করে জেল হাসপাতালে রাখা হয়েছে। এই সময় শেরে বাংলা, বগুড়ার মোহাম্মদ আলী, তোফাজ্জল আলী, ডা. মালেক, সবুর সাহেব, খয়রাত হোসেন, আনোয়ারা খাতুন ও আরও অনেকে মুসলিম লীগ পার্টির বিরুদ্ধে ভীষণভাবে প্রতিবাদ করলেন। আবার শহীদ সাহেবের দল এক হয়ে গেছে। নাজিমুদ্দীন সাহেব ঘাবড়িয়ে গেলেন এবং সংগ্রাম পরিষদের সাথে আলাপ করতে রাজি হলেন।

আমরা জেলে, কি আলাপ হয়েছিল জানি না। তবে সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে কামরুদ্দিন সাহেব জেলে আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং বললেন, নাজিমুদ্দীন সাহেব এই দাবিগুলি মানতে রাজি হয়েছেন: এখনই পূর্ব পাকিস্তানের অফিসিয়াল ভাষা বাংলা করে ফেলবে। পূর্ব পাকিস্তান আইনসভা থেকে সুপারিশ করবেন, যাতে কেন্দ্রে বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হয়। সমস্ত মামলা উঠিয়ে নিবেন, বন্দিদের মুক্তি দিবেন এবং পুলিশ যে জুলুম করেছে সেই জন্য তিনি নিজেই তদন্ত করবেন। আর কি কি ছিল আমার মনে নাই। তিনি নিজেই হোম মিনিস্টার, আবার নিজেই তদন্ত করবেন এ যেন এক প্রহসন।

আমাদের এক জায়গায় রাখা হয়েছিল জেলের ভিতর। যে ওয়ার্ডে আমাদের রাখা হয়েছিল, তার নাম চার নম্বর ওয়ার্ড। তিনতলা দালান। দেওয়ালের বাইরেই মুসলিম গার্লস স্কুল। যে পাঁচ দিন আমরা জেলে ছিলাম সকাল দশটায় মেয়েরা স্কুলের ছাদে উঠে স্লোগান দিতে শুরু করত, আর চারটায় শেষ করত। ছোট্ট ছোট্ট মেয়েরা একটু ক্লান্তও হত না। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই,' 'বন্দি ভাইদের মুক্তি চাই,' 'পুলিশি জুলুম চলবে না'—নানা ধরনের স্লোগান। এই সময় শামসুল হক সাহেবকে আমি বললাম, "হক সাহেব ঐ দেখুন, আমাদের

পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠার চিত্রলিপি

বোনেরা বেরিয়ে এসেছে! আর বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা না করে পারবে না।" হক সাহেব আমাকে বললেন, "তুমি ঠিকই বলেছ, মুজিব।"

আমাদের ১১ তারিখে জেলে নেওয়া হয়েছিল, আর ১৫ তারিখ সন্ধ্যায় মুক্তি দেওয়া হয়। জেলগেট থেকে শোভাযাত্রা করে আমাদের সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে নিয়ে যাওয়া হল। ১৩ তারিখ সন্ধ্যায় কারাগারের ভিতর একটা গোলমাল হয়। একজন অবাঙালি জমাদার আমাদের ওয়ার্ডে তালা বন্ধ করতে এসেছেন। আমরা আমাদের জায়গায় এই সময় বসে থাকতাম। জমাদার সাহেব এক দুই গণনা করে দেখতেন, আমরা সংখ্যায় ঠিক আছি কি না। হিসাব মিললে বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে দিতেন। সন্ধ্যার সময় জেলখানার সমস্ত কয়েদিদের গণনা করে বাইরে থেকে বিভিন্ন ওয়ার্ডে বন্ধ করা হয়। জমাদার কয়েকবার গণনা করলেন, কিন্তু হিসাব ঠিক হচ্ছে না। পাশের আরেকটা রুমেও আমাদের কিছু ছাত্র ছিল, তাদের গণনা ঠিক হয়েছে। ছোট ছোট কয়েকজন ছাত্র ছিল, তারা কারও কথা শুনতে চাইত না। গণনার সময় এক জায়গা ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে যেত। আমি ও শামসুল হক সাহেব সকলকে ধমকিয়ে বসিয়ে রাখতাম। আমরা দুইজন ও আবদুল মান্নান (এখন নবকুমার হাইস্কুলের হেডমাস্টার) এই তিনজনই একটু বয়সে বড় ছিলাম। খাওয়ার ভাগ বাটোয়ারার ভার মান্নান সাহেবের উপরই ছিল। হিসাব যখন মিলছে না তখন জমাদার সাহেব রাগ করে ফেললেন এবং কড়া কথা বললেন। এতে ছাত্ররা ক্ষেপে জায়গা ছেড়ে উঠে পড়ল এবং হৈচৈ শুরু করল। আমি ও হক সাহেব আবার সকলকে এক জায়গায় বসিয়ে দিলাম। জমাদার সাহেব গণনা করলেন এবং হিসাব মিলল। কিন্তু দরজার বাইরে যেয়ে তিনি হঠাৎ বাঁশি বাজিয়ে দিলেন এবং পাগলা ঘণ্টা বেজে গেল। পাগলা ঘণ্টার অর্থ বিপদ সংকেত। এ অবস্থায় জেল সিপাহিরা যে যে অবস্থায় থাকুক না কেন, বন্দুক লাঠিসোটা নিয়ে ভিতরে আসে এবং দরকার হলে মারপিট শুরু করে। এই সময় আইন বলে কিছুই থাকে না। সিপাহিরা যা ইচ্ছা তাই করতে পারে, যদিও সুবেদার হাওলাদার তাদের সাথে থাকে। জেলার ও ডেপুটি জেলার সাহেবরাও ভিতরের দিকে ছুটতে থাকেন।

আমরা কিছুই বুঝতে পারলাম না, কি হয়েছে। যে বাঙালি সিপাহি আমাদের ওখানে ডিউটিতে ছিল সে তালা বন্ধ করে ফেলেছে। জমাদার তার কাছে চাবি চাইল। সে চাবি দিতে আপত্তি করল। এ নিয়ে দুইজনের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি হল, আমরা দেখতে পেলাম। সিপাহি চাবি নিয়ে এক দৌড়ে দোতলা থেকে নিচে নেমে গেল। জমাদারের ইচ্ছা ছিল দরজা খুলে সিপাহিদের নিয়ে ভিতরে ঢুকে আমাদের মারপিট করবে। জেলার, ডেপুটি জেলার বা সুপারিনটেনডেন্ট সাহেব ভিতরে আসবার পূর্বেই আমরা বুঝতে পেরে সকলকে তাড়াতাড়ি যার যার জায়গায় বসতে বলে শামসুল হক সাহেব ও আমি দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমাদের না মেরে ভিতরে যেন কেউ না আসতে পারে এই উদ্দেশ্যে। এ কথাও সকলকে বলে দিলাম যে, আমরা মার না খাওয়া পর্যন্ত কেউ হাত তুলবে না। যদি আমাদের আক্রমণ করে এবং মারপিট করে তখন টেবিল, চেয়ার, থালা, বাটি যা আছে তাই দিয়ে প্রতিরোধ করতে হবে। হক সাহেব ও আমি দুইজনই একগুঁয়ে ছিলাম।

দরকার হলে সমানে হাতও চালাতে পারতাম, আর এটা আমার ছোটকাল থেকে বদ অভ্যাসও ছিল। সিপাহি যদি চাবি না নিয়ে ভাগত তবে আমাদের মার খেতে হত, সে সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল না, কারণ, আমরা তো একটা রুমে বন্ধ। এর মধ্যে বহু সিপাহি চলে এসেছে, তারা অসভ্য ভাষায় গালাগালি করছিল। এমন সময় জেলার সাহেব ও ডেপুটি জেলার জনাব মোখলেসুর রহমান আমাদের গেটে এসে দাঁড়িয়ে সিপাহিদের নিচে যেতে হুকুম দিলেন। কিছু সময়ের মধ্যে জেল সুপারিনটেনডেন্ট মি. বিলও এসে হাজির হলেন এবং ঘটনা শুনে সিপাহিদের যেতে বললেন। সুপারিনটেনডেন্ট সাহেবকে শামসুল হক সাহেব সমস্ত ঘটনা বললেন। এই বিল সাহেবই ১৯৫০ সালে রাজশাহী জেলের খাপড়া ওয়ার্ডে রাজবন্দিদের উপর গুলি করে কয়েকজন দেশপ্রেমিককে হত্যা করেছিলেন। পরে আমরা বুঝতে পারলাম একটা ষড়যন্ত্র হয়েছিল, আমাদের মারপিট করার জন্য। পরের দিন ডেপুটি জেলার মোখলেসুর রহমান সাহেব আমাদের জেলের আইনকানুন ও নিয়ম সম্বন্ধে অনেক কিছু বললেন। আমি যদিও কয়েকদিন হাজত খেটেছিলাম ছোটবেলায়, তবু জেলের আইনকানুন কিছুই বুঝতাম না, আর জানতামও না। দু'একখানা বই পড়ে যা কিছু সামান্য জ্ঞান হয়েছিল জেল সম্বন্ধে। একথা সত্য, আইনকানুন ছাত্ররা একটু কমই মানত জেলখানায়। শামসুল হক সাহেব, মান্নান সাহেব ও আমি—এই তিনজনই সকলকে বুঝিয়ে রাখতাম। এদের মধ্যে অনেকে স্কুলের ছাত্রও ছিল। নয় কি দশ বছরের একটা ছেলেও ছিল আমাদের সাথে। তার বাবা তার সাথে জেলগেটে দেখা করতে এসেছিল এবং তাকে বলেছিল, "তোকে আজই বের করে নিব।" ছেলেটা তার বাবাকে বলেছিল, "অন্যান্য ছাত্রদের না ছাড়লে আমি যাব না।" সে যখন এই কথা ফিরে এসে আমাদের বলল, তখন সকলে তাকে আদর করতে লাগল এবং তার নামে 'জিন্দাবাদ' দিল। তার নাম আজ আর আমার মনে নাই, তবে কথাগুলো মনে আছে। ভীষণ শক্ত ছেলে ছিল। গ্রেফতারকৃত একজন ছাত্রেরও মনোবল নষ্ট হয় নাই। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য যে কোনো ত্যাগ তারা স্বীকারে প্রস্তুত ছিল।



১৬ তারিখ সকাল দশটায় বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ ছাত্রসভায় আমরা সকলেই যোগদান করলাম। হঠাৎ কে যেন আমার নাম প্রস্তাব করে বসল সভাপতির আসন গ্রহণ করার জন্য। সকলেই সমর্থন করল। বিখ্যাত আমতলায় এই আমার প্রথম সভাপতিত্ব করতে হল। অনেকেই বক্তৃতা করল। সংগ্রাম পরিষদের সাথে যেসব শর্তের ভিত্তিতে আপোস হয়েছে তার সকলগুলিই সভায় অনুমোদন করা হল। তবে সভা খাজা নাজিমুদ্দীন যে পুলিশি জুলুমের তদন্ত করবেন, তা গ্রহণ করল না; কারণ খাজা সাহেব নিজেই প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। আমি বক্তৃতায় বললাম, "যা সংগ্রাম পরিষদ গ্রহণ করেছে, আমাদেরও তা গ্রহণ করা উচিত। শুধু আমরা ঐ সরকারি প্রস্তাবটা পরিবর্তন করতে অনুরোধ করতে

পারি, এর বেশি কিছু না।" ছাত্ররা দাবি করল, শোভাযাত্রা করে আইন পরিষদের কাছে গিয়ে খাজা সাহেবের কাছে এই দাবিটা পেশ করবে এবং চলে আসবে। আমি বক্তৃতায় বললাম, তাঁর কাছে পৌঁছে দিয়েই আপনারা আইনসভার এরিয়া ছেড়ে চলে আসবেন। কেউ সেখানে থাকতে পারবেন না; কারণ সংগ্রাম পরিষদ বলে দিয়েছে, আমাদের আন্দোলন বন্ধ করতে কিছুদিনের জন্য। সকলেই রাজি হলেন।

এক শোভাযাত্রা করে আমরা হাজির হয়ে কাগজটা ভিতরে পাঠিয়ে দিলাম খাজা সাহেবের কাছে। আমি আবার বক্তৃতা করে সকলকে চলে যেতে বললাম এবং নিজেও সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে চলে আসবার জন্য রওয়ানা করলাম। কিছু দূর এসে দেখি, অনেক ছাত্র চলে গিয়েছে। কিছু ছাত্র ও জনসাধারণ তখনও দাঁড়িয়ে আছে আর মাঝে মাঝে স্লোগান দিচ্ছে। আবার ফিরে গিয়ে বক্তৃতা করলাম। এবার অনেক ছাত্রও চলে গেল। আমি হলে চলে আসলাম। প্রায় চারটায় খবর পেলাম, আবার বহু লোক জমা হয়েছে, তারা বেশিরভাগ সরকারি কর্মচারী ও জনসাধারণ, ছাত্র মাত্র কয়েকজন ছিল। শামসুল হক সাহেব চেষ্টা করছেন লোকদের ফেরাতে। মাঝে মাঝে হলের ছাত্ররা দু'একজন এমএলএকে ধরে আনতে শুরু করেছে মুসলিম হলে। তাদের কাছ থেকে লিখিয়ে নিচ্ছে, যদি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করতে না পারেন, তবে পদত্যাগ করবেন। মন্ত্রীরাও বের হতে পারছেন না। খাজা সাহেব মিলিটারির সাহায্যে পেছন দরজা দিয়ে ভেগে গিয়েছিলেন। বহু লোক আবার জড়ো হয়েছে। আমি ছুটলাম এ্যাসেম্বলির দিকে। ঠিক কাছাকাছি যখন পৌঁছে গেছি তখন লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করতে শুরু করেছে পুলিশ। আমার চক্ষু জ্বলতে শুরু করেছে। পানি পড়ছে, কিছুই চোখে দেখি না। কয়েকজন ছাত্র ও পাবলিক আহত হয়েছে। আমাকে কয়েকজন পলাশী ব্যারাকের পুকুরে নিয়ে চোখে মুখে পানি দিতে শুরু করেছে। কিছুক্ষণ পরে একটু আরাম পেলাম। দেখি মুসলিম হলে হৈচৈ। বাগেরহাটের ডা. মোজাম্মেল হক সাহেবকে ধরে নিয়ে এসেছে। তিনি এমএলএ। তাঁকে ছাত্ররা জোর করছে লিখতে যে, তিনি পদত্যাগ করবেন। আমাকে তিনি চিনতেন, আমিও তাঁকে চিনতাম। আমি ছাত্রদের অনুরোধ করলাম, তাঁকে ছেড়ে দিতে। তিনি লোক ভাল এবং শহীদ সাহেবের সমর্থক ছিলেন। অনেক কষ্টে, অনেক বুঝিয়ে তাঁকে মুক্ত করে বাইরে নিয়ে এলাম। একটা রিকশা ভাড়া করে তাঁকে উঠিয়ে দিলাম। হঠাৎ খবর এল, শওকত মিয়া আহত হয়ে হাসপাতালে আছে। তাড়াতাড়ি ছুটলাম তাকে দেখতে। সত্যই সে হাতে, পিঠে আঘাত পেয়েছে। পুলিশ লাঠি দিয়ে তাকে মেরেছে। আরও কয়েকজন সামান্য আহত হয়েছে। সকলকে বলে আসলাম, একটু ভাল হলেই হাসপাতাল ত্যাগ করতে। কারণ, পুলিশ আবার গ্রেফতার করতে পারে।

সন্ধ্যার পরে খবর এল ফজলুল হক হলে সংগ্রাম পরিষদের সভা হবে। ছাত্ররাও উপস্থিত থাকবে। আমার যেতে একটু দেরি হয়েছিল। তখন একজন বক্তৃতা করছে আমাকে আক্রমণ করে। আমি দাঁড়িয়ে শুনলাম এবং সামনের দিকে এগিয়ে গেলাম। তার বক্তৃতা শেষ হলে আমার বক্তব্য বললাম। আমি যে আমতলার ছাত্রসভায় বলেছিলাম, কাগজ

দিয়েই চলে আসতে এবং এ্যাসেম্বলি হাউসের সামনে দাঁড়িয়ে সকলকে চলে যেতে অনুরোধ করেছিলাম এবং বক্তৃতাও করেছিলাম, একথা কেউ জানেন কি না? যা হোক, এখানেই শেষ হয়ে গেল, আর বেশি আলোচনা হল না এবং সিদ্ধান্ত হল আপাতত আমাদের আন্দোলন বন্ধ রাখা হল। কারণ, কয়েকদিনের মধ্যে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ প্রথম ঢাকায় আসবেন পাকিস্তান হওয়ার পরে। তাঁকে সম্বর্ধনা জানাতে হবে। আমরা ছাত্ররাও সম্বর্ধনা জানাব। প্রত্যেক ছাত্র যাতে এয়ারপোর্টে একসাথে শোভাযাত্রা করে যেতে পারে তার বন্দোবস্ত করা হবে।

রাষ্ট্রভাষা বাংলার আন্দোলন শুধু ঢাকায়ই সীমাবদ্ধ ছিল না। ফরিদপুর ও যশোরে কয়েক শত ছাত্র গ্রেফতার হয়েছিল। রাজশাহী, খুলনা, দিনাজপুর ও আরও অনেক জেলায় আন্দোলন হয়েছিল। নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ চেষ্টা করেছিল এই আন্দোলনকে বানচাল করতে, কিন্তু পারে নাই। এই আন্দোলন ছাত্ররাই শুরু করেছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু এই আন্দোলনের পরে দেখা গেল জনসাধারণও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করতে বদ্ধপরিকর—বিশেষ করে সরকারি কর্মচারীরাও এতে সমর্থন দিয়েছিল। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে একদল গুণ্ডা আক্রমণ করলে পলাশী ব্যারাক থেকে সরকারি কর্মচারীরা এসে তাদের বাধা দিয়েছিল। যার ফলে গুণ্ডারা মার খেয়ে ভাগতে বাধ্য হয়েছিল। পরে দেখা গেল, ঢাকা শহরের জনসাধারণের মনোভাবেরও অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। সরকার থেকে প্রপাগান্ডা করা হয়েছিল যে, কলকাতা থেকে হিন্দু ছাত্ররা পায়জামা পরে এসে এই আন্দোলন করছে। যে সত্তর-পঁচাত্তরজন ছাত্র বন্দি হয়েছিল তার মধ্যে একজনও হিন্দু ছাত্র ছিল না। এমনকি যারা আহত হয়েছিল তার মধ্যেও একজন হিন্দু ছিল না। তবু তখন থেকেই 'যুক্ত বাংলা ও ভারতবর্ষের দালাল, কমিউনিস্ট ও রাষ্ট্রদ্রোহী'—এই কথাগুলি বলা শুরু হয়, আমাদের বিরুদ্ধে জনগণকে বিভ্রান্ত করতে। এমনকি সরকারি প্রেসনোটেও আমাদের এইভাবে দোষারোপ করা হত।

বাংলা পাকিস্তানের শতকরা ছাপ্পান্ন ভাগ লোকের মাতৃভাষা। তাই বাংলাই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। তবুও আমরা বাংলা ও উর্দু দুইটা রাষ্ট্রভাষা করার দাবি করেছিলাম। পাঞ্জাবের লোকেরা পাঞ্জাবি ভাষা বলে, সিন্ধুর লোকেরা সিন্ধি ভাষায় কথা বলে, সীমান্ত প্রদেশের লোকেরা পশতু ভাষায় কথা বলে, বেলুচরা বেলুচি ভাষায় কথা বলে। উর্দু পাকিস্তানের কোনো প্রদেশের ভাষা নয়, তবুও যদি পশ্চিম পাকিস্তানের ভায়েরা উর্দু ভাষার জন্য দাবি করে, আমরা আপত্তি করব কেন? যারা উর্দু ভাষা সমর্থন করে তাদের একমাত্র যুক্তি হল উর্দু 'ইসলামিক ভাষা'। উর্দু কি করে যে ইসলামিক ভাষা হল আমরা বুঝতে পারলাম না।

দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের মুসলমানরা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে। আরব দেশের লোকেরা আরবি বলে। পারস্যের লোকেরা ফার্সি বলে, তুরস্কের লোকেরা তুর্কি ভাষা বলে, ইন্দোনেশিয়ার লোকেরা ইন্দোনেশিয়ান ভাষায় কথা বলে, মালয়েশিয়ার লোকেরা মালয়া ভাষায় কথা বলে, চীনের মুসলমানরা চীনা ভাষায় কথা বলে। এ সম্বন্ধে অনেক যুক্তিপূর্ণ কথা বলা চলে।

শুধু পূর্ব পাকিস্তানের ধর্মভীরু মুসলমানদের ইসলামের কথা বলে ধোঁকা দেওয়া যাবে ভেবেছিল, কিন্তু পারে নাই। যে কোনো জাতি তার মাতৃভাষাকে ভালবাসে। মাতৃভাষার অপমান কোনো জাতিই কোনো কালে সহ্য করে নাই। এই সময় সরকারদলীয় মুসলিম লীগ নেতারা উর্দুর জন্য জান মাল কোরবানি করতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু জনসমর্থন না পেয়ে একটু ঘাবড়িয়ে পড়েছিলেন। তারা শেষ 'তাবিজ' নিক্ষেপ করলেন। জিন্নাহকে ভুল বোঝালেন। এরা মনে করলেন, জিন্নাহকে দিয়ে উর্দুর পক্ষে বলাতে পারলেই আর কেউ এর বিরুদ্ধাচরণ করতে সাহস পাবে না। জিন্নাহকে দলমত নির্বিশেষে সকলেই শ্রদ্ধা করতেন; তাঁর যে কোন ন্যায়সঙ্গত কথা মানতে সকলেই বাধ্য ছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের জনমত কোন পথে, তাঁকে কেউই তা বলেন নাই বা বলতে সাহস পান নাই।

১৯ মার্চ জিন্নাহ ঢাকা আসলে হাজার হাজার লোক তাঁকে অভিনন্দন জানাতে তেজগাঁ হাওয়াই জাহাজের আড্ডায় হাজির হয়েছিল। আমার মনে আছে, ভীষণ বৃষ্টি হচ্ছিল। সেদিন আমরা সকলেই ভিজে গিয়েছিলাম, তবুও ভিজে কাপড় নিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করেছিলাম। জিন্নাহ পূর্ব পাকিস্তানে এসে ঘোড় দৌড় মাঠে বিরাট সভায় ঘোষণা করলেন, "উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে।" আমরা প্রায় চার পাঁচ শত ছাত্র এক জায়গায় ছিলাম সেই সভায়। অনেকে হাত তুলে দাঁড়িয়ে জানিয়ে দিল, 'মানি না'। তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে বক্তৃতা করতে উঠে তিনি যখন আবার বললেন, "উর্দুই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে"—তখন ছাত্ররা তাঁর সামনেই বসে চিৎকার করে বলল, 'না, না, না'। জিন্নাহ প্রায় পাঁচ মিনিট চুপ করেছিলেন, তারপর বক্তৃতা করেছিলেন। আমার মনে হয়, এই প্রথম তাঁর মুখের উপরে তাঁর কথার প্রতিবাদ করল বাংলার ছাত্ররা। এরপর জিন্নাহ যতদিন বেঁচেছিলেন আর কোনোদিন বলেন নাই, উর্দুই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে।

ঢাকায় জিন্নাহ দুই দলের ছাত্রনেতাদের ডাকলেন। বোধহয় বাংলা ভাষা সংগ্রাম পরিষদের নেতাদেরও ডেকেছিলেন। তবে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ও নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের দুইজন করে প্রতিনিধির সাথে দেখা করলেন। কারণ, তিনি পছন্দ করেন নাই, দুইটা প্রতিষ্ঠান কেন হবে এই মুহূর্তে! আমাদের পক্ষ থেকে মিস্টার তোয়াহা আর শামসুল হক সাহেব ছিলেন, তবে আমি ছিলাম না। জিন্নাহ আমাদের প্রতিষ্ঠানের নামটা পছন্দ করেছিলেন। নিখিল পূর্ব পাকিস্তানের কর্মকর্তাদের নাম যখন আমাদের প্রতিনিধি পেশ করেন, তখন তাঁরা দেখিয়ে দিলেন যে, এদের অধিকাংশ এখন চাকরি করে, অথবা লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে। তখন জিন্নাহ তাদের উপর রাগই করেছিলেন। শামসুল হক সাহেবের সাথে জিন্নাহর একটু তর্ক হয়েছিল, যখন তিনি দেখা করতে যান বাংলা রাষ্ট্রভাষা করার বিষয় নিয়ে—শামসুল হক সাহেব আমাকে এসে বলেছিলেন। শামসুল হক সাহেবের সৎ সাহস ছিল, সত্য কথা বলতে কাউকেও ভয় পেতেন না।

জিন্নাহ চলে যাওয়ার কয়েকদিন পরে ফজলুল হক হলের সামনে এক ছাত্রসভা হয়। তাতে একজন ছাত্র বক্তৃতা করেছিল, তার নাম আমার মনে নাই। তবে সে বলেছিল "জিন্নাহ

যা বলবেন, তাই আমাদের মানতে হবে। তিনি যখন উর্দুই রাষ্ট্রভাষা বলেছেন তখন উর্দুই হবে।" আমি তার প্রতিবাদ করে বক্তৃতা করেছিলাম, আজও আমার এই একটা কথা মনে আছে। আমি বলেছিলাম, "কোন নেতা যদি অন্যায় কাজ করতে বলেন, তার প্রতিবাদ করা এবং তাকে বুঝিয়ে বলার অধিকার জনগণের আছে। যেমন হযরত ওমরকে (রা.) সাধারণ নাগরিকরা প্রশ্ন করেছিলেন, তিনি বড় জামা পরেছিলেন বলে।[১৮] বাংলা ভাষা শতকরা ছাপ্পান্নজন লোকের মাতৃভাষা, পাকিস্তান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, সংখ্যাগুরুদের দাবি মানতেই হবে। রাষ্ট্রভাষা বাংলা না হওয়া পর্যন্ত আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাব। তাতে যাই হোক না কেন, আমরা প্রস্তুত আছি।" সাধারণ ছাত্ররা আমাকে সমর্থন করল। এরপর পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র ও যুবকরা ভাষার দাবি নিয়ে সভা ও শোভাযাত্রা করে চলল। দিন দিন জনমত সৃষ্টি হতে লাগল। কয়েক মাসের মধ্যে দেখা গেল, নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের কোনো সমর্থক রইল না। কিছু নেতা রইল, যাদের মন্ত্রীদের বাড়ি ঘোরাফেরা করা আর সরকারের সকল কিছুই সমর্থন করা ছাড়া কাজ ছিল না।

*

ভাষা আন্দোলনের পূর্বে মোহাম্মদ আলী, তোফাজ্জল আলী এবং ডা. মালেক সাহেবের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ এমএলএদের মধ্যে এক গ্রুপ সৃষ্টি হয়েছিল। কারণ, খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেব শহীদ সাহেবের কোনো সমর্থককে মন্ত্রিত্ব দেন নাই। এমনকি পার্লামেন্টারি সেক্রেটারিও করেন নাই। এদের সংখ্যাও কম ছিল না। প্রায়ই তোফাজ্জল আলী সাহেবের বাড়িতে এদের সভা হত। দেখা গিয়েছিল, এদের সমর্থক সংখ্যা এমন পর্যায়ে এসে পড়েছে যে, ইচ্ছা করলে নাজিমুদ্দীন সাহেবের বিরুদ্ধে অনাস্থা দিলে পাস হয়ে যেতে পারে। এদের পক্ষ থেকে দুই একজন এমএলএ কলকাতায়ও গিয়েছিল, শহীদ সাহেবকে আনতে। শহীদ সাহেব ঢাকায় পৌঁছালেই অনাস্থা প্রস্তাব এরা পেশ করবে বলে কথাবার্তা চলেছিল। কিন্তু শহীদ সাহেব রাজি হন নাই। তিনি এদের বলেছিলেন, "আমি এখন গোলমাল সৃষ্টি করতে চাই না। নাজিমুদ্দীন সাহেবই কাজ করুক।" আরও বলেছিলেন, "সেই পুরানা এমএলএদের কথা বলছ? কিছুদিন পূর্বে আমার বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে। আজ আবার নাজিমুদ্দীন সাহেবের বিরুদ্ধে ভোট দিবে, কাল আবার আমার বিরুদ্ধে দিতে পারে। এ সমস্তের দরকার নাই, আমার অনেক কাজ এবং সে কাজ আমি না করলে মুসলমানদের ভারত ত্যাগ করতে হবে এবং লক্ষ লক্ষ লোক মারা যাবে। আমার একমাত্র চেষ্টা ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে এবং পাকিস্তানে মুসলমান-হিন্দুদের মধ্যে স্থায়ী একটা শান্তি কায়েম করতে পারি কি না?"

এদিকে জিন্নাহ সাহেব মোহাম্মদ আলী সাহেবকে ডেকে এক ধমক দিলেন, দল সৃষ্টি করার জন্য। আর বললেন, রাষ্ট্রদূত হয়ে বার্মায় যেতে। মোহাম্মদ আলী, তোফাজ্জল

আলী সাহেবের বাড়িতে এসে আমাদের সমস্ত ঘটনা বললেন এবং তিনি যে বার্মা যেতে রাজি হয়েছেন, সেকথাও জানালেন। কিছুদিন পরে ডা. মালেকও মন্ত্রিত্ব পাবেন বলে ঠিক হল। শেষ পর্যন্ত তোফাজ্জল আলী সাহেব বাকি ছিলেন। তিনি একদিন আমাকে বললেন, "মুজিব দেখলে তো, মোহাম্মদ আলী সাহেব চলে গেলেন, ডা. মালেকও মন্ত্রী হয়ে যাচ্ছে, আমাকেও ডেকেছে মন্ত্রিত্ব নিতে। কি করি বল তো? একলা তো আর বাইরে থেকে কিছু করা যাবে না। তোমার মত আমার নেওয়া দরকার।" আমি দেখলাম, তাঁকে বাধা দিয়ে আর কি হবে? সকলেই তো নাজিমুদ্দীন সাহেবের দলে মিলে গেছে। আমি তাঁকে বললাম, "তবুও তো আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এজন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আর কেউ তো জিজ্ঞাসাও করল না। কি আর আপনি একলা করতে পারবেন, মন্ত্রিত্ব নিয়ে নেন, আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাব। যে আদর্শ ও পাকিস্তানের জন্য সংগ্রাম করেছি, সে আদর্শ কায়েম না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালাব।" তিনি যে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এই ভদ্রতার জন্য তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করেছি এবং তাঁর সাথে আমার সম্বন্ধ কোনোদিন নষ্ট হয় নাই। তিনিও আমাকে সকল সময়ই ছোট ভাইয়ের মত দেখেছেন। যদিও পরে আমরা দুইজন দুই রাজনৈতিক দলে ছিলাম।

মওলানা আকরম খাঁ সাহেবের বিবৃতির পরে আর আমরা মুসলিম লীগের সদস্য থাকলাম না। অর্থাৎ আমাদের মুসলিম লীগ থেকে খেদিয়ে দেওয়া হল। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল, মুসলিম লীগকে একটা প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা। টাঙ্গাইলে দুইটা আইনসভার আসন খালি হয়েছিল। আমাদের ইচ্ছা ছিল, নাজিমুদ্দীন সাহেবের বিরুদ্ধে লোক দেওয়া যায় কি না? মওলানা ভাসানী সাহেব আসাম থেকে চলে এসে টাঙ্গাইলের কাগমারীতে বাস করছিলেন। তাঁর শরণাপন্ন হলাম। কিন্তু মওলানা সাহেব এক সিট নিজে এবং এক সিট নাজিমুদ্দীন সাহেবকে দিয়ে নির্বাচন করে এমএলএ হলেন। পরে নির্বাচনী হিসাব দাখিল না করার জন্য মওলানা সাহেবের নির্বাচন বেআইনি ঘোষণা হয়েছিল।

আমাদের ভাষা আন্দোলনের সময় মওলানা সাহেব সমর্থন করেছিলেন। টাঙ্গাইলে মুসলিম লীগ কর্মীদের এক সভা ডাকা হল, কি করা যায় ভবিষ্যতে! আলোচনা হবার পরে ঠিক হল, আরেকটা সভা করা হবে নারায়ণগঞ্জে। সেখানে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করা হবে। মওলানা ভাসানী, আবদুস সালাম খান, আতাউর রহমান খান, শামসুল হক সাহেব আরও অনেক মুসলিম লীগ কর্মী ও নেতা যোগদান করবেন বলে ঠিক হল। সভার আয়োজন করেছিল সালমান আলী, আবদুল আউয়াল, শামসুজ্জোহা ও আরও অনেকে। খান সাহেব ওসমান আলী এমএলএও সমর্থন দিয়েছিলেন। সভার পূর্বে ১৪৪ ধারা জারি করা হল। আমরা পাইকপাড়া ক্লাবে সভা করলাম। বিভিন্ন জেলার অনেক নেতাকর্মী উপস্থিত হয়েছিলেন। এই সময় শামসুজ্জোহার উপর মুসলিম লীগের ভাড়াটিয়া গুণ্ডারা আক্রমণ করেছিল। দুঃখের বিষয়, এই কর্মীরাই নারায়ণগঞ্জে মুসলিম লীগ গঠন করেছিল এবং পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিল। এখন যারা এদের উপর আক্রমণ করেছিল তাদের প্রায় সকলেই পাকিস্তান ও মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে ছিল। প্রত্যেক জেলা

ও মহকুমায় মুসলিম লীগ ভেঙে দিয়ে এডহক কমিটি গঠন করেছিল। প্রায় সমস্ত জায়গায় মুসলিম লীগ কমিটিতে শহীদ সাহেবের সমর্থক বেশি ছিল বলে অনেক লীগ ও পাকিস্তানবিরোধী লোকদের এডহক কমিটিতে নিতে হয়েছিল। কিন্তু জনসাধারণ মুসলিম লীগ বলতে শুধু পুরানা লীগ কর্মীদেরই বুঝত।

মওলানা ভাসানী সাহেবের সভাপতিত্বে এই সভা হল। সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, প্রথমে দুইজন প্রতিনিধি করাচিতে জনাব খালিকুজ্জামান সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করবেন এবং আমাদের দাবি পেশ করবেন। আমাদের দাবি ছিল, পুরানা মুসলিম লীগকে কাজ করতে দেওয়া হোক। যদি না শোনেন, তবে আমাদের রসিদ বই দেওয়া হোক এবং যাতে নিরপেক্ষ নির্বাচন হয় তার বন্দোবস্ত করা হোক। দেখা যাবে, জনসাধারণ কাদের চায়? তখনকার দিনে করাচি যাওয়া এত সোজা ছিল না। কলকাতা-দিল্লি হয়ে করাচি যেতে হত। ঠিক হল, জনাব আতাউর রহমান খান এবং বেগম আনোয়ারা খাতুন এমএলএ যাবেন করাচিতে। তাঁরা করাচিতে গেলেন এবং চৌধুরী খালিকুজ্জামানের সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং আমাদের দাবিদাওয়া পেশ করলেন। খালিকুজ্জামান সাহেব বলে দিলেন, "পুরানা কথা ভুলে যান, যারা খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেবকে সমর্থন করবেন, তারাই মুসলিম লীগের সদস্য থাকবেন।" রসিদ বইয়ের কথায় বললেন, "কাগজ পাওয়া যায় না, তাই রসিদ বই পাওয়া কষ্টকর। আকরম খাঁ সাহেব ও পূর্ব পাকিস্তান এডহক কমিটিকে বলবেন, তারা যদি ভাল মনে করেন তবে পাবেন।" দুইজনই ফিরে এলেন এবং আমাদের কাছে বললেন, মিছামিছি কতগুলি টাকা খরচ করা হল, কোনো কাজ হল না। খালিকুজ্জামান সাহেব ভাল করে কথা বলতেও চান নাই।

শহীদ সাহেবও এই সময় ঢাকা আসলেন এবং মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ ও আরও কয়েক জায়গায় সভা করলেন, তাতে ফল খুব ভাল হল। হিন্দুদের দেশত্যাগ করার যে একটা হিড়িক পড়েছিল তা অনেকটা বন্ধ হল এবং পশ্চিম বাংলা ও বিহার থেকেও মুসলমানরা অনেক কম আসতে লাগল। এই সমস্ত সভায় এত বেশি জনসমাগম হত এবং শহীদ সাহেবকে অভ্যর্থনা করার জন্য এত লোক উপস্থিত হত যে তা কল্পনা করাও কষ্টকর। এতে নাজিমুদ্দীন সাহেবের সরকার ঘাবড়িয়ে গিয়েছিলেন। এবার শহীদ সাহেব নবাবজাদা নসরুল্লাহ সাহেবের বাড়িতে উঠেছিলেন। নবাবজাদা শহীদ সাহেবকে সমর্থনও করতেন এবং শ্রদ্ধাও করতেন। শহীদ সাহেবকে বিদায় দিলাম গোপালগঞ্জ থেকে। সবুর সাহেব খুলনায় শহীদ সাহেবকে অভ্যর্থনা করলেন। কারণ, সবুর সাহেব তখনও শহীদ সাহেবের কথা ভুলতে পারেন নাই। তাঁকে সমর্থন করতেন এবং আমাদেরও সাহায্য করতেন। শহীদ সাহেব খুলনায় হিন্দু-মুসলমান নেতাদের নিয়ে এক ঘরোয়া বৈঠক করলেন এবং সাম্প্রদায়িক শান্তি যাতে বজায় থাকে সে সম্বন্ধে সকলকে চেষ্টা করতে বললেন। গোপালগঞ্জে বিরাট সভায় শহীদ সাহেব ও আমাকে খালি গলায়ই বক্তৃতা করতে হয়েছিল। কারণ মাইক্রোফোন জোগাড় করতে পারি নাই। খুলনা থেকে যে আনব সে সময়ও আমাদের হাতে ছিল না, কারণ তিনি হঠাৎ প্রোগ্রাম করেছিলেন।

এইবার যখন শহীদ সাহেব পূর্ব পাকিস্তানে এলেন, আমরা দেখলাম সরকার ভাল চোখে দেখছে না। পূর্বে সরকারি কর্মচারীরা শহীদ সাহেবের থাকবার বন্দোবস্ত যাতে ভালভাবে হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতেন। কিন্তু এবার তারা দূরে দূরে থাকতে চায়। দু'একজন গোপনে বলেই ফেলেছিল, "উপরের হুকুম, যাতে তারা সহযোগিতা না করে।" গোয়েন্দা বিভাগের তৎপরতাও বেড়ে গেছে বলে মনে হচ্ছিল। সত্যই পাকিস্তানের মঙ্গলের জন্যই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা উচিত, তা না হলে যদি একবার মোহাজের আসতে শুরু করত, তাহলে অবস্থা কি শোচনীয় হত যারা চিন্তাবিদ তারা তা অনুধাবন করতে পারবেন। সংকীর্ণ মন নিয়ে যারা রাজনীতি করেন তাদের কথা আলাদা। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার ও অন্যান্য প্রদেশগুলোতে এখনও লক্ষ লক্ষ মুসলমান রয়েছে—যাদের দান পাকিস্তান আন্দোলনে কারও চেয়ে কম ছিল না। তাদের কথা চিন্তা করে আমাদের শান্তি বজায় রাখা উচিত বলে আমরা মনে করতাম। সত্য কথা বলতে কি, পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমান শহীদ সাহেবের উপদেশ গ্রহণ করেছিল। ফলে কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা হয় নাই। এমনকি মুসলমানরা হিন্দুদের অনুরোধ করেছিল, যাতে তারা দেশ ত্যাগ না করে। আমি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য অনেক জায়গায় ঘুরেছি। আমার জানা আছে এ রকম অনেক ঘটনা। দুঃখের বিষয়, পশ্চিমবঙ্গের প্রগতিশীল হিন্দু ভাইরাও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে পারেন নাই। মাঝে মাঝে গোলমাল হয়েছে, নিরীহ মুসলমানদের ঘরবাড়ি, জানমাল ধ্বংস করেছে অনেক জায়গায়।

এই সময় খাদ্য সমস্যা দেখা দিয়েছিল কয়েকটা জেলায়। বিশেষ করে ফরিদপুর, কুমিল্লা ও ঢাকা জেলার জনসাধারণ এক মহাবিপদের সম্মুখীন হয়েছিল। সরকার কর্ডন প্রথা চালু করেছিল। এক জেলা থেকে অন্য জেলায় কোনো খাদ্য যেতে দেওয়া হত না। ফরিদপুর ও ঢাকা জেলার লোক, খুলনা ও বরিশালে ধান কাটবার মরশুমে দল বেঁধে দিনমজুর হিসাবে যেত। এরা ধান কেটে ঘরে উঠিয়ে দিত। পরিবর্তে একটা অংশ পেত। এদের 'দাওয়াল' বলা হত। হাজার হাজার লোক নৌকা করে যেত। আসবার সময় তাদের অংশের ধান নিজেদের নৌকা করে বাড়িতে নিয়ে আসত। এমনিভাবে কুমিল্লা জেলার দাওয়ালরা সিলেট জেলায় যেত। এরা প্রায় সকলেই গরিব ও দিনমজুর। প্রায় দুই মাসের জন্য ঘরবাড়ি ছেড়ে এদের যেত হত। যাবার বেলায় মহাজনদের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে সংসার খরচের জন্য দিয়ে যেত। ফিরে এসে ধার শোধ করত। দাওয়ালদের নৌকা খুবই কম ছিল। যাদের কাছ থেকে নৌকা নিত তাদেরও একটা অংশ দিতে হত। যখন এবার দাওয়ালরা ধান কাটতে গেল, কেউ তাদের বাধা দিল না। এরা না গেলে আবার জমির ধান তুলবার উপায় ছিল না। একসাথেই প্রায় সব ধান পেকে যায়, তাই তাড়াতাড়ি কেটে আনতে হয়। স্থানীয়ভাবে এত কৃষাণ একসাথে পাওয়া কষ্টকর ছিল। বহু বৎসর যাবৎ এই পদ্ধতি চলে আসছিল।

ফরিদপুর, ঢাকা ও কুমিল্লা জেলার হাজার হাজার লোক এই ধানের উপর নির্ভর করত। দাওয়ালরা যখন ধান কাটতে যায়, তখন সরকার কোনো বাধা দিল না। যখন তারা দুই মাস পর্যন্ত ধান কেটে তাদের ভাগ নৌকায় তুলে রওয়ানা করল বাড়ির দিকে তাদের বুভুক্ষ মা-বোন, স্ত্রী ও সন্তানদের খাওয়াবার জন্য, যারা পথ চেয়ে আছে, আর কোনো মতে ধার করে সংসার চালাচ্ছে—কখন তাদের, স্বামী, ভাই, বাবা ফিরে আসবে ধান নিয়ে, পেট ভরে কিছুদিন ভাত খাবে, এই আশায়—তখন নৌকায় রওয়ানা করার সাথে সাথে তাদের পথ রোধ করা হল। 'ধান নিতে পারবে না, সরকারের হুকুম', ধান জমা দিয়ে যেতে হবে, নতুবা নৌকাসমেত আটক ও বাজেয়াপ্ত করা হবে। সহজে কি ধান দিতে চায়? শেষ পর্যন্ত সমস্ত ধান নামিয়ে রেখে লোকগুলিকে ছেড়ে দেওয়া হল। এ খবর পেয়ে আমার পক্ষে চুপ করে থাকা সম্ভব হল না। আমি এর তীব্র প্রতিবাদ করলাম। সভা করলাম, সরকারি কর্মচারীদের সাথে সাক্ষাৎও করলাম কিন্তু কোনো ফল হল না। এদিকে খোন্দকার মোশতাক আহমদ এই কর্ডনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা শুরু করেছে বলে আমি খবর পেলাম। অনেক সভা-সমিতি, অনেক প্রস্তাব করলাম কোনো ফল হল না। এই লোকগুলি দিনমজুর। দুই মাস পর্যন্ত যে শ্রম দিল, তার মজুরি তাদের মিলল না। আর মহাজনদের কাছ থেকে যে টাকা ধার করে এনেছিল এই দুই মাসের খরচের জন্য, খালি হাতে ফিরে যাওয়ার পরে দেনার দায়ে ভিটাবাড়িও ছাড়তে হল।

এ রকমের শত শত ঘটনা আমার জানা আছে। এদিকে ফরিদপুর, ঢাকা ও কুমিল্লা জেলার অনেক নৌকার ব্যবসায়ী ছিল যারা বড় নৌকায় করে ধান-চাউল ঐ সমস্ত জেলা থেকে এনে বিক্রি করত, তাদের ব্যবসাও বন্ধ হল এবং অনেক লোক নৌকায় খেটে খেত তারাও বেকার হয়ে পড়ল। এদের মধ্যে অনেকেই আজ রিকশা চালায়। একমাত্র গোপালগঞ্জ মহকুমার কয়েক হাজার লোক খুলনা, যশোর ও অন্যান্য জায়গায় রিকশা চালিয়ে এবং কুলির কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করার চেষ্টা করতে লাগল। আমরা যখন ভীষণভাবে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করলাম, সরকার হুকুম দিল ধান কাটতে যেতে আপত্তি নাই। তবে ধান আনতে পারবে না। নিকটতম সরকারি গুদামে জমা দিতে হবে এবং সেই গুদাম থেকে কর্মচারীরা একটা রসিদ দেবে, দাওয়ালরা দেশে ফিরে এসে সেই পরিমাণ ধান নিজের জেলার নিকটতম গুদাম থেকে পাবে। দাওয়ালরা ধান কাটতে না গেলে একমাত্র খুলনা জেলায়ই অর্ধেক জমির ধান পড়ে থাকবে, একথা সরকার জানত। ১৯৪৮ সালের শেষে অথবা ১৯৪৯ সালের প্রথম দিকে এই হুকুম সরকার দিল। দুঃখের বিষয়, ধান গুদামে নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু অধিকাংশ দাওয়াল ফিরে এসে ধান পায় নাই। কোন রকম পাকা রসিদ ছিল না, সাদা কাগজে লিখে দিয়েই ধান নামিয়ে রাখত। সেই রসিদ নিয়ে দেশের গুদামে গেলে গালাগালি করে তাড়িয়ে দিত। অথবা সামান্য কিছু ব্যয় করলে কিছু ধান পাওয়া যেত। এতে দাওয়ালরা সর্বস্বান্ত হয়ে গেল।

এই সময় একটা ঘটনা ঘটে গেল খুলনায়। ফরিদপুর জেলার দাওয়ালদের প্রায় দুইশত নৌকা আটক করল ধানসমেত। তারা রাতের অন্ধকারে সরকারি হুকুম না মেনে 'আল্লাহু

আকবর', 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিয়ে নৌকা ছেড়ে দিল ধান নিয়ে। দশ-পনের মাইল চলার পরে পুলিশ বাহিনী লঞ্চ নিয়ে তাদের ধাওয়া করে বাধা দিল, শেষ পর্যন্ত গুলি করে তাদের থামান হল। দাওয়ালরাও বাধা দিয়েছিল, কিন্তু পারে নাই। জোর করে নদীর পাড়ে এক মাঠের ভিতর সমস্ত ধান নামান হয়েছিল এবং লোকদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। যদিও সরকারি গুদামে সে ধান ওঠে নাই; পরের দিন ভীষণভাবে বৃষ্টি হয়ে সে ধান ভেসে যায়। আমি খবর পেয়ে খুলনা এলাম, তখনও অনেক নৌকা আটক রয়েছে ধানসহ। এই সময় দাওয়ালদের নিয়ে সভা করে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাড়িতে শোভাযাত্রা সহকারে উপস্থিত হলাম। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন প্রফেসর মুনীর চৌধুরীর বাবা জনাব আবদুল হালিম চৌধুরী। তিনি আমার সাথে আলাপ করলেন এবং বললেন, তাঁর কিছুই করার নাই, সরকারের হুকুম। তবে তিনি ওয়াদা করলেন, সরকারের কাছে টেলিগ্রাম করবেন সমস্ত অবস্থা জানিয়ে। আমি দাওয়ালদের নিয়ে ফিরে আসলাম। আমি নিজেও টেলিগ্রাম করলাম। দাওয়ালদের বললাম, ভবিষ্যতে যেন তারা এভাবে আর ধান কাটতে না আসে, একটা বোঝাপড়া না হওয়া পর্যন্ত। খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেব তখন বড়লাট। কারণ, জিন্নাহ মারা যাবার পরে তাঁকে গভর্নর জেনারেল করা হয়েছিল।

*

এই সময় আরেকটা অত্যাচার মহামারীর রূপে শুরু হয়েছিল। 'জিন্নাহ ফান্ড' নামে সরকার একটা ফান্ড খোলে। যে যা পারে চাঁদা দান করবে এই হল হুকুম। 'জিন্নাহ ফান্ডে' টাকা দিতে কেউই আপত্তি করেছে বলে আমার জানা নাই। যাদের অর্থ আছে তারা খুশি হয়েই দান করেছে। অনেক গরিবও 'জিন্নাহ ফান্ডে' টাকা দিয়াছে। কিন্তু কিছু সংখ্যক অফিসার সরকারকে খুশি করার জন্য জোরজুলুম করে টাকা তুলতে শুরু করেছিল। যে মহকুমা অফিসার বেশি তুলতে পারবেন, তিনি ভেবেছেন তাড়াতাড়ি প্রমোশন পাবেন।

আমার মহকুমায় এটা ভীষণ রূপ ধারণ করেছিল। খাজা সাহেব গোপালগঞ্জ আসবেন ঠিক হয়েছে। তখনকার মহকুমা হাকিম সভা করে এক অভ্যর্থনা কমিটি গঠন করেছেন। যেখানে ঠিক করেছে যে গোপালগঞ্জ মহকুমায় প্রায় ছয় লক্ষ লোকের বাস, মাথাপ্রতি এক টাকা করে দিতে হবে, তাতে ছয় লক্ষ টাকা উঠবে। আর যাদের বন্দুক আছে, তাদের আলাদাভাবে দিতে হবে। ব্যবসায়ীদের তো কথাই নাই। বড় নৌকাপ্রতিও প্রত্যেককে দিতে হবে। তিনি সমস্ত ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টদের হুকুম দিয়েছেন, যে না দিবে তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। চারিদিকে জোরজুলুম শুরু হয়েছে। চৌকিদার, দফাদার নেমে পড়েছে। কারও গরু, কারও বদনা, থালা, ঘটিবাটি কেড়ে আনা হচ্ছে। এক ত্রাসের রাজত্ব। জনাব ওয়াহিদুজ্জামান সাহেবই নাজিমুদ্দীন সাহেবকে দাওয়াত করে এনেছেন। এখন তিনি মুসলিম লীগে আছেন। গোপালগঞ্জ মুসলিম লীগ যারা ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত করেছেন, এখন আর তারা নাই। এডহক কমিটি করা হয়েছে। মহকুমা হাকিম সাহেবের সাথে যোগসাজশে তারা কাজ করেছে।

আমি খুলনা থেকে গোপালগঞ্জ পৌঁছালাম। গোপালগঞ্জ শহরে স্টিমার যায় না। দুই মাইল দূরে হরিদাসপুর নামে একটা ছোট্ট স্টেশন পর্যন্ত আসে। হরিদাসপুর থেকে নৌকায় গোপালগঞ্জ যেতে হয়। আমি একটা নৌকায় উঠলাম। মাঝি আমাকে চিনতে পেরেছে। নৌকা ছেড়ে দিয়ে আমাকে বলে, "ভাইজান, আপনি এখন এসেছেন, আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে। পাঁচজন লোক আমরা, হুকুম এসেছে পাঁচ টাকা দিতে হবে। দিনভর কোনোদিন দুই টাকা, কোনোদিন আরও কম টাকা উপার্জন করি, বলেন তো পাঁচ টাকা কোথায় পাই? গতকাল আমার বাবার আমলের একটা পিতলা বদনা ছিল, তা চৌকিদার টাকার দায়ে কেড়ে নিয়ে গেছে।" এই কথা বলে কেঁদে ফেলল। সমস্ত ঘটনা আমাকে আস্তে আস্তে বলল। মাঝির বাড়ি টাউনের কাছেই। সে চালাক চতুরও আছে। শেষে বলে, "পাকিস্তানের কথা তো আপনার কাছ থেকেই শুনেছিলাম, এই পাকিস্তান আনলেন!" আমি শুধু বললাম, "এটা পাকিস্তানের দোষ না।"

গোপালগঞ্জ নেমে আমার বাসায় পৌঁছার সাথে সাথে অনেক লোক এসে জমা হতে লাগল, আর সকলের মুখে একই কথা। ব্যবসায়ীরা এল বিকেলে কয়েকজন, পুরানা মুসলিম লীগের নেতারা এলেন। আমি বিকেলেই সমস্ত মহকুমায় আমার পুরানা সহকর্মীদের খবর দিলাম, পরের দিন প্রায় সকলে এসে হাজির হল। এক আলোচনা সভা করলাম। আমি বললাম, "আমাদের বাধা দিতে হবে। এটা সরকারের ট্যাক্স না। লোকে ট্যাক্স দিতে বাধ্য, কিন্তু কোন আইনে চাঁদা জোর করে তুলতে পারে?" আমি পৌঁছাবার পূর্বেই বোধহয় তিন লাখ টাকার মত তুলে ফেলেছে। সঠিক হিসাব দিতে পারব না। মহকুমা হাকিম ও মুসলিম লীগ এডহক কমিটি ঠিক করেছে যে টাকা অভ্যর্থনায় খরচ হবে তা বাদ দিয়ে বাকি সমস্ত টাকা খাজা সাহেবকে তোড়ায় করে দেওয়া হবে 'জিন্নাহ ফান্ডে'র জন্য। যদি সম্ভব হয় কিছু টাকা মসজিদের জন্য রাখা হবে। গোপালগঞ্জে একটা ভাল মসজিদ করা হচ্ছিল।

আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, এ টাকা নিতে দেওয়া হবে না। তাঁর অভ্যর্থনায় যা ব্যয় হয়, তা বাদে বাকি টাকা মসজিদ আর গোপালগঞ্জে কলেজ করার জন্য রেখে দিতে হবে। এর ব্যতিক্রম হলে, আমরা বাধা দেব। দরকার হয় সভায় গোলমাল হবে। এ খবর চলে গেল সমস্ত মহকুমায়। টাকা তোলা প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। আমার পৌঁছার সাথে সাথে জনসাধারণের সাহস বেড়ে গেল। গোপালগঞ্জের জনসাধারণ আমাকেই দেখেছে পাকিস্তান আন্দোলন করতে। এরা আমাকে ভালবাসে। আমার সাথে এক যুবক কর্মীবাহিনী ছিল, যারা আমার হুকুম পেলে আগুনেও ঝাঁপ দিতে পারত।

খাজা সাহেব পৌঁছাবার দুই দিন পূর্বে মহকুমা হাকিম জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সাথে পরামর্শ করলেন এবং আমাকে গ্রেফতার করা যায় কি না অনুমতি চাইলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নিষেধ করে বলে দিলেন, তিনি একদিন পূর্বেই উপস্থিত হবেন এবং আমার সাথে আলাপ করবেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন মি. গোলাম কবির। তিনি খুবই বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ছিলেন, কলকাতা থেকে আমাকে চিনতেন। আমাকে 'তুমি' বলে কথা বলতেন,

আর আমিও 'কবির ভাই' বলতাম। তিনি গোপালগঞ্জে এসেই আমাকে খবর দিলেন। তাঁর সাথে দেখা করতে যেয়ে দেখি, জেলার পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টও উপস্থিত আছেন। আমি তাঁকে সকল বিষয় বললাম এবং আমাদের দাবিগুলি পেশ করলাম। তিনি আমাকে বললেন, "গভর্নর জেনারেল রাজনীতিবিদ নন, তিনি রাষ্ট্রপ্রধান। কোনো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সাথেও জড়িত নন। তিনি তো অতিথি, তাঁকে অসম্মান করা কি উচিত হবে?" আমি বললাম, "কে বলেছে আপনাকে, যে তাঁকে অসম্মান করতে চাই! তাঁকে সকলেই অভ্যর্থনা করবে, শুধু এটুকু কথা তাঁর সাথে আলোচনা করে আমাকে জানিয়ে দেন যে, তিনি হুকুম দিবেন এই অত্যাচার করে টাকা তোলার ব্যাপারে তদন্ত করবেন এবং দোষীকে শাস্তি দিবেন। দ্বিতীয়ত, টাকা তাঁকেই দেওয়া হবে, আমরা কোনো দাবি করব না; শুধু তিনি টাকাটা কলেজ করতে দিয়ে দেবেন। তিনিই আমাদের কলেজ করে দিবেন।" কবির সাহেব আমাকে বললেন, "তুমি কথা দাও, কোনো গোলমাল হবে না।" আমি বললাম, "কবির ভাই, আপনি পাগল হয়েছেন! আমি জানি না যে, তিনি প্রধানমন্ত্রী নন, এখন বড়লাট হয়েছেন। কোনো গোলমাল হবে না, আমাদের পক্ষ থেকে। আপনি তাঁর সাথে পরামর্শ করে আমাকে জানিয়ে দিবেন সকাল দশটার মধ্যে, যাতে সকলে মিলে ভালভাবে তাঁকে অভ্যর্থনা করতে পারা যায়।"

পরের দিন সকালবেলা খাজা সাহেবের বজরা গোপালগঞ্জ এল এগারটার সময়। আমাকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হল তাঁর বজরায়। খাজা সাহেব পাশের রুমে বসেছিলেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কবির সাহেব তাঁর পক্ষ থেকে আমাকে বললেন, আমার দাবিগুলি ন্যায়সঙ্গত। তিনি নিশ্চয়ই বিবেচনা করে দেখবেন। গোপালগঞ্জ শহরে কলেজ নাই। একটা কলেজ হওয়া দরকার, তিনি স্বীকার করলেন।

এর মধ্যে আর একটা ঘটনা হয়ে গেল। জনসাধারণ মনে করেছে আমাকে গ্রেফতার করে নিয়া গিয়েছে, কারণ পুলিশ কর্মচারী তার সরকারি কাপড় পরে আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। কর্মীরা স্লোগান দিতে শুরু করে এবং পুলিশ কর্ডন ভেঙে অগ্রসর হতে থাকে। পুলিশ লাঠিচার্জ করে বসেছে, ভীষণ গোলমাল শুরু হয়েছে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে খবর দিল, আমাকে ঘটনাস্থলে পাঠাতে। আমি দৌড়াতে দৌড়াতে সেখানে উপস্থিত হলাম এবং সকলকে বললাম, "আমাকে গ্রেফতার করে নাই। খাজা সাহেব আমাদের দাবিগুলি বিশেষভাবে বিবেচনা করে দেখবেন।" আমি খাজা সাহেবকে দাওয়ালদের অসুবিধার কথা বলবার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটকে অনুরোধ করেছিলাম। কবির সাহেব নিজেও খুব চিন্তিত ছিলেন দাওয়ালদের ব্যাপার নিয়ে। কারণ ফরিদপুরে যে দুর্ভিক্ষ হবে সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ ছিল না।

বিরাট সভা হল, সকলেই গভর্নর জেনারেলকে অভ্যর্থনা করলেন। তিনি মসজিদটার দ্বার উদ্‌ঘাটনও করেছিলেন। খাজা সাহেব তদন্ত করেছেন কি না জানি না, তবে টাকা তিনি নেন নাই। কলেজ করার জন্য দিয়ে গিয়েছিলেন। 'জিন্নাহ ফান্ডে'র নামে টাকা তোলা হয়েছিল বলে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর নামেই কলেজ করা হয়েছিল। আজও কলেজটা আছে, ভালভাবে চলছে।



দিনটা আমার ঠিক মনে নাই। তবে ঘটনাটা মনে আছে ১৯৪৮ সালের ভিতর হবে। সোহরাওয়ার্দী সাহেব ঢাকায় এসেছিলেন এবং সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে এক ছাত্রসভায় বক্তৃতা করেছিলেন। তখন ময়মনসিংহের সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেব সহ-সভাপতি ছিলেন হলের (এখন সৈয়দ নজরুল সাহেব পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি। আমি জেলে থাকার জন্য ভারপ্রাপ্ত সভাপতি।)। শহীদ সাহেবের বক্তৃতা এত ভাল হয়েছিল যে, যারা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতেন তারাও ভক্ত হয়ে পড়লেন। এদিকে মন্ত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয় বা হলের কাছেও যেতে পারতেন না। শহীদ সাহেব যখন পরে আবার ঢাকায় আসলেন, তখন কতগুলি সভার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল যাতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি কায়েম থাকে। প্রথম সভার জায়গা ঠিক হল টাঙ্গাইল। স্টিমারে মানিকগঞ্জ হয়ে যেতে হবে, পথে আরও একটা সভা হবে। শামসুল হক সাহেব সভার বন্দোবস্ত করেছিলেন। শহীদ সাহেব প্লেন থেকে ঢাকায় নেমে সোজা বেগম আনোয়ারা খাতুন এমএলএ ছিলেন, তাঁর বাড়িতে আসলেন। সেখানেই দুপুরবেলা খেলেন। সন্ধ্যায় বাদামতলী ঘাট থেকে জাহাজ ছাড়বে। মওলানা ভাসানী ও আমি সাথে যাব। আমরা শহীদ সাহেবকে নিয়ে জাহাজে উঠলাম। মওলানা সাহেবও উঠেছিলেন। জাহাজ ছয়টায় ছাড়বার কথা, ছাড়ছে না। খবর নিয়ে জানলাম, সরকার হুকুম দিয়েছে না ছাড়তে। প্রায় দুই ঘণ্টা জাহাজ ঘাটে বসে রইল। কাদের সর্দার, জনাব কামরুদ্দিন সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। রাত আটটায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও ডিআইজি পুলিশ শহীদ সাহেবের হাতে একটা কাগজ দিলেন, তাতে লেখা, 'তিনি ঢাকা ত্যাগ করতে পারবেন না।' তবে যদি কলকাতা ফিরে যান, সরকারের আপত্তি নাই। তিনি ঢাকায় যে কোনো জায়গায় থাকতে পারেন তাতেও আপত্তি নাই। শহীদ সাহেব জাহাজ ছেড়ে নেমে আসলেন, আমিও তাঁর মালপত্র নিয়ে সাথে সাথে এলাম। কোথায় থাকবেন? আর কেইবা জায়গা দেবেন? কোন হোটেলও নাই। বেগম আনোয়ারার সাহস আছে, কিন্তু তাঁদের বাড়িটায় জায়গা নাই। আতাউর রহমান, কামরুদ্দিন সাহেবের বাড়িরও সেই অবস্থা। কামরুদ্দিন সাহেব ক্যাপ্টেন শাহজাহান ও তাঁর স্ত্রী বেগম নূরজাহানের সাথে সাক্ষাৎ করলেন, কারণ তাঁদের বাড়িটা সুন্দর এবং থাকার মত ব্যবস্থাও আছে। বেগম নূরজাহান (এখন প্রফেসর) বললেন "এ তো আমাদের সৌভাগ্য। শহীদ সাহেবকে আমি বাবার মত ভক্তি করি। আমাদের বাড়িতেই থাকবেন তিনি, নিয়ে আসুন।" সেইদিন এই উপকার বেগম নূরজাহান না করলে সত্যিই দুঃখের কারণ হত। পাকিস্তান সত্যিকারের যিনি সৃষ্টি করেছিলেন, সেই লোকের থাকার জায়গা হল না। দুই দিন শহীদ সাহেব ছিলেন তাঁর বাসায়, কি সেবাই না ভদ্রমহিলা করেছিলেন, তা প্রকাশ করা কষ্টকর। মেয়েও বোধহয় বাবাকে এত সেবা করতে পারে না। ক্যাপ্টেন শাহজাহানও যথেষ্ট করেছেন। দুই দিন পরে শহীদ সাহেবকে নিয়ে নারায়ণগঞ্জে জাহাজে তুলে দিলাম। আমি সাথে যেতে চেয়েছিলাম এগিয়ে দিতে। তিনি রাজি হলেন না। বললেন, "দরকার নাই। আর লোকজনও আছে আমার অসুবিধা হবে না।" আমি বিছানা করে সকল কিছু গুছিয়ে দিয়ে বিদায় নিতে

গেলে বললেন, "তোমার উপরও অত্যাচার আসছে। এরা পাগল হয়ে গেছে। শাসন যদি এইভাবে চলে বলা যায় না, কি হবে!" আমি বললাম, "স্যার, চিন্তা করবেন না, অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার শক্তি খোদা আমাকে দিয়েছেন। আর সে শিক্ষা আপনার কাছ থেকেই পেয়েছি।"

এই অত্যাচারের প্রতিবাদ করার মত ক্ষমতা তখন আমাদের ছিল না। আর আমরা প্রস্তুতও ছিলাম না। ছাত্ররা সামান্য প্রতিবাদ করেছিল। নেতৃত্ব দেওয়ার মত কেউ আমাদের ছিল না। আমরা যদি ঝাঁপিয়ে পড়তে পারতাম, নিশ্চয়ই সাড়া পেতাম। জনসাধারণ শহীদ সাহেবকে ভালবাসতেন। আমরা কয়েকজন প্রস্তাব করলে ঢাকার পুরানা নেতারা নিষেধ করলেন। আমরা ঢাকায় নতুন এসেছি, পরিচিত হতেও পারি নাই ভালভাবে। মওলানা ভাসানী ঐ জাহাজেই চলে গেলেন এবং সভায় যোগদান করেছিলেন। ঐদিন যদি শামসুল হক সাহেব ঢাকায় থাকতেন তবে আন্দোলন আমরা করতে পারতাম বলে আমার বিশ্বাস ছিল।

১৯৪৮ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মৃত্যুবরণ করেন এবং খাজা নাজিমুদ্দীনকে গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হলেন জনাব নূরুল আমিন সাহেব। এই সময়ও কিছু সংখ্যক এমএলএ শহীদ সাহেবকে পূর্ব বাংলায় এসে প্রধানমন্ত্রী হতে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি রাজি হন নাই। গণপরিষদে একটা নতুন আইন পাস করে শহীদ সাহেবকে গণপরিষদ থেকে বের করে দেওয়া হল।

আমি পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ সংগঠনের দিকে নজর দিলাম। প্রায় সকল কলেজ ও স্কুলে প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল। বিভিন্ন জেলায়ও শক্তিশালী সংগঠন গড়ে উঠতে লাগল। সরকারি ছাত্র প্রতিষ্ঠানটি শুধু খবরের কাগজের মধ্যে বেঁচে রইল। ছাত্রলীগই সরকারের অন্যায় কাজের প্রতিবাদ ও সমালোচনা করেছিল। কোন বিরুদ্ধ দল পাকিস্তানে না থাকায় সরকার গণতন্ত্রের পথ ছেড়ে একনায়কত্বের দিকে চলছিল। প্রধানমন্ত্রী জনাব লিয়াকত আলী খান সর্বময় ক্ষমতার মালিক হলেন। তিনি কোনো সমালোচনাই সহ্য করতে পারছিলেন না।

দুই চারজন কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন ছাত্র ছিল যারা সরকারকে পছন্দ করত না। কিন্তু তারা এমন সমস্ত আদর্শ প্রচার করতে চেষ্টা করত যা তখনকার সাধারণ ছাত্র ও জনসাধারণ শুনলে ক্ষেপে যেত। এদের আমি বলতাম, "জনসাধারণ চলেছে পায়ে হেঁটে, আর আপনারা আদর্শ নিয়ে উড়োজাহাজে চলছেন। জনসাধারণ আপনাদের কথা বুঝতেও পারবে না, আর সাথেও চলবে না। যতটুকু হজম করতে পারে ততটুকু জনসাধারণের কাছে পেশ করা উচিত।" তারা তলে তলে আমার বিরুদ্ধাচরণও করত, কিন্তু ছাত্রসমাজকে দলে ভেড়াতে পারত না।

এই সময় রাজশাহী সরকারি কলেজে ছাত্রদের উপর খুব অত্যাচার হল। এরা প্রায় সকলেই ছাত্রলীগের সভ্য ছিল। একুশজন ছাত্রকে কলেজ থেকে বের করে দিল এবং রাজশাহী

জেলা ত্যাগ করার জন্য সরকার হুকুম দিল। অনেক জেলায় ছাত্রদের উপর অত্যাচার শুরু হয়েছিল এবং গ্রেফতারও করা হয়েছিল। ১৯৪৯ সালে জানুয়ারি অথবা ফেব্রুয়ারি মাসে দিনাজপুরেও ছাত্রদের গ্রেফতার করা হয়েছিল। জেলের ভিতর দবিরুল ইসলামকে ভীষণভাবে মারপিট করেছিল—যার ফলে জীবনের তরে তার স্বাস্থ্য নষ্ট হয়েছিল। ছাত্ররা আমাকে কনভেনর করে 'জুলুম প্রতিরোধ দিবস' পালন করার জন্য একটা কমিটি করেছিল। একটা দিবসও ঘোষণা করা হয়েছিল। পূর্ব বাংলার সমস্ত জেলায় জেলায় এই দিবসটি উদ্‌যাপন করা হয়। কমিটির পক্ষ থেকে ছাত্রবন্দিদের ও অন্যান্য বন্দিদের মুক্তি দাবি করা হয় এবং ছাত্রদের উপর হতে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার করতে অনুরোধ করা হয়।

এই প্রথম পাকিস্তানে রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তির আন্দোলন এবং জুলুমের প্রতিবাদ। এর পূর্বে আর কেউ সাহস পায় নাই। তখনকার দিনে আমরা কোনো সভা বা শোভাযাত্রা করতে গেলে একদল গুণ্ডা ভাড়া করে আমাদের মারপিট করা হত এবং সভা ভাঙার চেষ্টা করা হত। 'জুলুম প্রতিরোধ দিবসে' বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়ও কিছু গুণ্ডা আমদানি করা হয়েছিল। আমি খবর পেয়ে রাতেই সভা করি এবং বলে দেই, গুণ্ডামির প্রশ্রয় দেওয়া হলে এবার বাধা দিতে হবে। আমাদের বিখ্যাত আমতলায় সভা করার কথা ছিল; কর্তৃপক্ষ বাধা দিলে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনের মাঠে মিটিং করব। একদল ভাল কর্মী প্রস্তুত করে বিশ্ববিদ্যালয় গেটে রেখেছিলাম, যদি গুণ্ডারা আক্রমণ করে তারা বাধা দিবে এবং তিন দিক থেকে তাদের আক্রমণ করা হবে যাতে জীবনে আর রমনা এলাকায় গুণ্ডামি করতে না আসে—এই শিক্ষা দিতে হবে। আশ্চর্যের বিষয় সরকারি দল প্রকাশ্যে গুণ্ডাদের সাহায্য করত ও প্রশ্রয় দিত। মাঝে মাঝে জগন্নাথ কলেজ, মিটফোর্ড ও মেডিকেল স্কুলের ছাত্ররা শোভাযাত্রা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে রওয়ানা করলেই হঠাৎ আক্রমণ করে মারপিট করত। মুসলিম লীগ নেতারা একটা ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করতে চেষ্টা করছিল যাতে কেউ সরকারের সমালোচনা করতে না পারে। মুসলিম লীগ নেতারা বুঝতে পারছিলেন না, যে পন্থা তারা অবলম্বন করেছিলেন সেই পন্থাই তাদের উপর একদিন ফিরে আসতে বাধ্য। ওনারা ভেবেছিলেন গুণ্ডা দিয়ে মারপিট করেই জনমত দাবাতে পারবেন। এ পন্থা যে কোনোদিন সফল হয় নাই, আর হতে পারে না—এ শিক্ষা তারা ইতিহাস পড়ে শিখতে চেষ্টা করেন নাই।



এই সময় ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার নবীনগর থানার কৃষ্ণনগরে জনাব রফিকুল হোসেন এক সভার আয়োজন করেন—কৃষ্ণনগর হাইস্কুলের দ্বারোদঘাটন করার জন্য। আর্থিক সাহায্য পাওয়ার জন্য জনাব এন. এম. খান সিএসপি তখনকার ফুড ডিপার্টমেন্টের ডাইরেক্টর জেনারেল ছিলেন, তাঁকেই নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল, তিনি রাজিও হয়েছিলেন। সেখানে বিখ্যাত গায়ক আব্বাসউদ্দিন আহম্মদ, সোহরাব হোসেন ও বেদারউদ্দিন আহম্মদ গান গাইবেন। আমাকেও নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। জনাব এন. এম. খান পাকিস্তান হওয়ার পূর্বে

এই মহকুমায় এসডিও হিসাবে অনেক ভাল কাজ করার জন্য জনপ্রিয় ছিলেন। আমরা উপস্থিত হয়ে দেখলাম এন. এম. খান ও আব্বাসউদ্দিন সাহেবকে দেখবার জন্য হাজার হাজার লোক সমাগম হয়েছে। বাংলার গ্রামে গ্রামে আব্বাসউদ্দিন সাহেব জনপ্রিয় ছিলেন। জনসাধারণ তাঁর গান শুনবার জন্য পাগল হয়ে যেত। তাঁর গান ছিল বাংলার জনগণের প্রাণের গান। বাংলার মাটির সাথে ছিল তাঁর নাড়ির সম্বন্ধ। দুঃখের বিষয়, সরকারের প্রচার দপ্তরে তাঁর মত গুণী লোকের চাকরি করে জীবিকা অর্জন করতে হয়েছিল। সভা শুরু হল, রফিকুল হোসেন সাহেবের অনুরোধে আমাকেও বক্তৃতা করতে হল। আমি জনাব এন. এম. খানকে সম্বোধন করে বক্তৃতায় বলেছিলাম, "আপনি এদেশের অবস্থা জানেন। বহুদিন বাংলাদেশে কাজ করেছেন, আজ ফুড ডিপার্টমেন্টের ডিরেক্টর জেনারেল আপনি, একবার বিবেচনা করে দেখেন এই দাওয়ালদের অবস্থা এবং কি করে এরা বাঁচবে! সরকার তো খাবার দিতে পারবে না—যখন পারবে না, তখন এদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিতেছে কেন?" দাওয়ালদের নানা অসুবিধার কথা বললাম, জনসাধারণকে অনুরোধ করলাম, স্কুলকে সাহায্য করতে। জনাব খান আশ্বাস দিলেন তিনি দেখবেন, কিছু করতে চেষ্টা করবেন। তিনি সন্ধ্যায় চলে যাবার পর গানের আসর বসল। আব্বাসউদ্দিন সাহেব, সোহরাব হোসেন ও বেদারউদ্দিন সাহেব গান গাইলেন। অধিক রাত পর্যন্ত আসর চলল। আব্বাসউদ্দিন সাহেব ও আমরা রাতে রফিক সাহেবের বাড়িতে রইলাম। রফিক সাহেবের ভাইরাও সকলেই ভাল গায়ক। হাসনাত, বরকতও ভাল গান গাইত। এরা আমার ছোট ভাইয়ের মত ছিল। আমার সাথে জেলও খেটেছে। পরের দিন নৌকায় আমরা রওয়ানা করলাম, আশুগঞ্জ স্টেশনে ট্রেন ধরতে। পথে পথে গান চলল। নদীতে বসে আব্বাসউদ্দিন সাহেবের ভাটিয়ালি গান তাঁর নিজের গলায় না শুনলে জীবনের একটা দিক অপূর্ণ থেকে যেত। তিনি যখন আস্তে আস্তে গাইতেছিলেন তখন মনে হচ্ছিল, নদীর ঢেউগুলিও যেন তাঁর গান শুনছে। তাঁরই শিষ্য সোহরাব হোসেন ও বেদারউদ্দিন তাঁর নাম কিছুটা রেখেছিলেন। আমি আব্বাসউদ্দিন সাহেবের একজন ভক্ত হয়ে পড়েছিলাম। তিনি আমাকে বলেছিলেন, "মুজিব, বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে বিরাট ষড়যন্ত্র চলছে। বাংলা রাষ্ট্রভাষা না হলে বাংলার কৃষ্টি, সভ্যতা সব শেষ হয়ে যাবে। আজ যে গানকে তুমি ভালবাস, এর মাধুর্য ও মর্যাদাও নষ্ট হয়ে যাবে। যা কিছু হোক, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করতেই হবে।" আমি কথা দিয়েছিলাম এবং কথা রাখতে চেষ্টা করেছিলাম।



আমরা রাতে ঢাকা এসে পৌঁছালাম। ১৫০ নম্বর মোগলটুলীতে যেয়ে শুনলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্ন বেতনভোগী কর্মচারীরা ধর্মঘট শুরু করেছে এবং ছাত্ররা তার সমর্থনে ধর্মঘট করছে। নিম্ন বেতনভোগী কর্মচারীরা বহুদিন পর্যন্ত তাদের দাবি পূরণের জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন-নিবেদন করেছে একথা আমার জানা ছিল। এরা আমার কাছেও এসেছিল।

পাকিস্তান হওয়ার পূর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রেসিডেন্সিয়াল বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। এখন এটাই পূর্ব বাংলার একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়। ছাত্র অনেক বেড়ে গিয়েছিল। কর্মচারীদের সংখ্যা বাড়ে নাই। তাদের সারা দিন ডিউটি করতে হয়। পূর্বে বাসা ছিল, এখন তাদের বাসা প্রায়ই নিয়ে যাওয়া হয়েছে, কারণ নতুন রাজধানী হয়েছে, ঘরবাড়ির অভাব। এরা পোশাক পেত, পাকিস্তান হওয়ার পরে কাউকেও পোশাক দেওয়া হয় নাই। চাউলের দাম ও অন্যান্য জিনিসের দাম বেড়ে গেছে। চাকরির কোনো নিশ্চয়তাও ছিল না। ইচ্ছামত তাড়িয়ে দিত, ইচ্ছামত চাকরি দিত।

আমি তাদের বলেছিলাম, প্রথমে সংঘবদ্ধ হোন, তারপর দাবিদাওয়া পেশ করেন, তা নাহলে কর্তৃপক্ষ মানবে না। তারা একটা ইউনিয়ন করেছিল, একজন ছাত্র তাদের সভাপতি হয়েছিল। আমি আর কিছুই জানতাম না। জেলায় জেলায় ঘুরছিলাম। ঢাকায় এসে যখন শুনলাম, এরা ধর্মঘট করেছে তখন বুঝতে বাকি থাকল না, কর্তৃপক্ষ এদের দাবি মানতে অস্বীকার করেছে। তবু এত তাড়াতাড়ি ধর্মঘটে যাওয়া উচিত হয় নাই। কারণ, এদের কোনো ফান্ড নাই। মাত্র কয়েকদিন হল প্রতিষ্ঠান করেছে। কিন্তু কি করব, এখন আর উপায় নাই। সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম, ছাত্ররা এদের প্রতি সহানুভূতিতে ধর্মঘট শুরু করে দিয়েছে। কর্মচারীরা শোভাযাত্রা বের করেছিল। ছাত্ররাও করেছিল। আমি কয়েকজন ছাত্রনেতাকে নিয়ে ভাইস-চ্যান্সেলর সাহেবের কাছে দেখা করতে যেয়ে তাঁকে সব বুঝিয়ে বললাম। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সকল কর্মচারীকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে দেবেন ঠিক করেছেন। বিকেলে আবার ফজলুল হক হল, সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ভিপিদের নিয়ে সাক্ষাৎ করলাম এবং তাঁকে অনুরোধ করলাম, এই কথা বলে যে, "আপনি আশ্বাস দেন, ওদের ন্যায্য দাবি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আদায় করে দিতে চেষ্টা করবেন এবং কাউকেও চাকরি থেকে বরখাস্ত করবেন না এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থা কারও বিরুদ্ধে গ্রহণ করবেন না।" অনেক আলোচনা হয়েছিল, পরের দিন তিনি রাজি হলেন। আমাদের বললেন, "আগামীকাল ধর্মঘট প্রত্যাহার করে চাকরিতে যোগদান করলে কাউকেও কিছু বলা হবে না এবং আমি কর্তৃপক্ষের কাছে ওদের ন্যায্য দাবি মানাতে চেষ্টা করব।"

আমরা তাঁর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে এলাম, তখন বিকাল তিনটা বেজে গিয়েছে। আমরা ওদের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করে ঘোষণা করলাম, কাল থেকে ছাত্ররা ধর্মঘট প্রত্যাহার করবে। কারণ বহু কর্মচারীও ধর্মঘট প্রত্যাহার করবে; ভাইস-চ্যান্সেলরের আশ্বাস পেয়ে তারা রাজি হয়েছে। অনেক কর্মচারী দূরে দূরে থাকে, সকলকে খবর দিতে বললাম, যতদূর সম্ভব। পরের দিন ছাত্ররাও ক্লাসে যোগদান করেছে; কর্মচারীরাও অনেকেই যোগদান করেছে। যারা বারটার মধ্যে এসে পৌঁছাতে পেরেছে তাদের কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেছে। আর যারা বারটার পরে এসেছে তাদের যোগদান করতে দেওয়া হয় নাই। অনেককে খবর পেয়ে নারায়ণগঞ্জ থেকেও আসতে হয়েছিল। শতকরা পঞ্চাশজন কর্মচারী দেরি করে আসতে বাধ্য হয়েছিল, কারণ বিভিন্ন জায়গা থেকে খবর দিয়ে তাদের আনাতে হয়েছিল। আমাকে ও আমার সহকর্মীদের কাছে কর্মচারীরা এসে

সব কথা খুলে বলল। একে একে আবার সকলে জড়ো হল। আমরা মিথ্যেবাদী হয়ে যাবার উপক্রম হলাম। সকলকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রেখে আবার আমরা ভাইস-চ্যান্সেলারের বাড়িতে উপস্থিত হলাম এবং বললাম, "কি ব্যাপার?" তিনি বললেন, "আমি যখন আগামীকাল কাজে যোগদান করতে বলেছি, তার অর্থ এগারটায় যোগদান করতে হবে, এক মিনিট দেরি হয়ে গেলে তাকে নেওয়া হবে না।" আমরা তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম, তিনি বুঝেও বুঝলেন না। এর কারণ ছিল সরকারের চাপ। আমরা বললাম, সামান্য দু'এক ঘণ্টার জন্য কেন গোলমাল সৃষ্টি করলেন? তিনি কিছুতেই রাজি হলেন না, আমরা তাঁকে আরও বললাম, "আপনি পূর্বেই তো বলতে পারতেন, এগারটার মধ্যেই যোগদান করতে হবে। আপনি তো বলেছিলেন, আগামীকালের মধ্যে যোগদান করলে চলবে।" তিনি আর আলোচনা করতে চাইলেন না। আমরা বলে এলাম, তাহলে ধর্মঘটও চলবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে ছাত্র-কর্মচারীদের যুক্ত সভা হল। সভায় আমি সমস্ত ঘটনা বললাম এবং আগামীকাল থেকে ছাত্র-কর্মচারীদের ধর্মঘট চলবে, যে পর্যন্ত না এদের ন্যায্য দাবি মানে। শোভাযাত্রা হল, আবার পরের দিন সকাল এগারটায় শোভাযাত্রা শুরু হবে বলে ঘোষণা করা হল। এবার আমাকে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে হল। একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার ও শিক্ষাবিদ সরকারের চাপে এই রকম একটা কথার মারপ্যাচ করতে পারে এটা আমার ভাবতেও কষ্ট হয়েছিল। রাতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সভার পরে ঘোষণা করল, "বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করা হল। হল থেকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চলে যেতে হবে। আর যে সমস্ত কর্মচারী ধর্মঘটে যোগদান করেছে তাদের বরখাস্ত করা হল।" আমি সলিমুল্লাহ হলে ছিলাম। সেই মুহূর্তেই সভা ডাকা হল এবং সভায় ঘোষণা করা হল, হল ত্যাগ করা হবে না। ফজলুল হক হলেও সভায় এই ঘোষণা করা হয়। একটা কমিটি করা হয়েছিল, কর্মচারীদের জন্য একটা ফাণ্ড করা হবে। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে টাকা তুলে সাহায্য করা হবে। কারণ, এদের প্রায় সকলেই বিশ-ত্রিশ টাকার বেশি বেতন পেত না। সংসার চালাবে কি করে? এদের মধ্যে কয়েকজনকে টাকা তোলার তার দেওয়া হয়েছিল।

পরদিন দেখা গেল শতকরা পঞ্চাশজন ছাত্র রাতে হল ত্যাগ করে চলে গিয়েছে। তার পরদিন আরও অনেকে চলে গেল। তিন দিন পর দেখা গেল আমরা ত্রিশ-পঁয়ত্রিশজন সলিমুল্লাহ হলে আছি আর বিশ-পঁচিশজন ফজলুল হক হলে আছে। পুলিশ হল ঘেরাও করে রেখেছে। এক কামরায় আলোচনা সভায় বসলাম। আমাদের পক্ষে আর পুলিশকে বাধা দেওয়া সম্ভব হবে না। সকলে একমত হয়ে ঠিক হল, হল ত্যাগ করার এবং নিম্ন কর্মচারীদের জন্য টাকা তুলে সাহায্য করা, তা না হলে তারাও ধর্মঘট চালাতে পারবে না। চার দিন পরে আমরাও হল ত্যাগ করতে বাধ্য হলাম এবং চাঁদা তুলে এদের সাহায্য করতে লাগলাম। দশ-পনের দিন পর দেখা গেল এক একজন করে কর্মচারী বন্ড দিয়ে কাজে যোগদান করতে শুরু করেছে। এক মাসের মধ্যে প্রায় সকলেই যোগদান করল। ধর্মঘট শেষ হয়ে গেল। এই সময় আমি ও কয়েকজন কর্মী দিনাজপুর যাই। কারণ, কয়েকজন ছাত্রকে গ্রেফতার করে জেলে রেখেছে এবং দবিরুল ইসলামকে জেলের ভিতর মারপিট করেছে। ১৪৪ ধারা

জারি ছিল। বাইরে সভা করতে পারলাম না। ঘরের ভিতর সভা করলাম। আমরা হোস্টেলেই ছিলাম। আবদুর রহমান চৌধুরী তখন ছাত্রলীগের সেক্রেটারি ছিল। আমরা যখন ঢাকা ফিরে আসছিলাম বোধহয় আবদুল হামিদ চৌধুরী আমার সাথে ছিল। ট্রেনের মধ্যে খবরের কাগজে দেখলাম, আমাদেরসহ সাতাশজন ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করেছে। এর মধ্যে দিনাজপুরের দবিরুল ইসলাম, অলি আহাদ, মোল্লা জালালউদ্দিন (এখন এডভোকেট), আবদুল হামিদ চৌধুরীকে চার বৎসরের জন্য আর অন্য সকলকে বিভিন্ন মেয়াদে। তবে এই চারজন ছাড়া আর সকলে বন্ড ও জরিমানা দিলে লেখাপড়া করতে পারবে। মেয়েদের মধ্যে একমাত্র লুলু বিলকিস বানুকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। তিনি ছাত্রলীগের মহিলা শাখার কনভেনর ছিলেন। এক মাসের মধ্যে প্রায় সকল কর্মচারীই গোপনে গোপনে কাজে যোগদান করল। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ, ছাত্ররা নাই। এই সুযোগে কর্তৃপক্ষ নিম্ন বেতনভোগী কর্মচারীদের মনোবল ভাঙতে সক্ষম হয়েছিল।

*

এই সময় বাইরে পুরানা লীগ কর্মী ও নেতারা আলাপ-আলোচনা শুরু করেছে কি করা যাবে? একটা নতুন দল গঠন করা উচিত হবে কি না? আমার মত সকলকে বললাম, শুধুমাত্র ছাত্র প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর করে রাজনীতি করা যায় না। সরকারি মুসলিম লীগ ছাড়া কংগ্রেসেরও একটা প্রতিষ্ঠান ছিল। তবে গণপরিষদে ও পূর্ব বাংলার আইনসভায় এদের কয়েকজন সভ্য ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এদের সকলেই হিন্দু, এরা বেশি কিছু বললেই 'রাষ্ট্রদ্রোহী' আখ্যা দেওয়া হত। ফলে এদের মনোবল একেবারে ভেঙে গিয়েছিল। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামারও ভয় ছিল। কংগ্রেসকে মুসলমান সমাজ সন্দেহের চোখে দেখত। একজন মুসলমান সভ্যও তাদের ছিল না। এদিকে মুসলিম লীগের পুরানা নামকরা নেতারা সকলেই সরকার সমর্থক হয়ে গিয়েছিলেন। মন্ত্রিত্ব, পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি কিছু না কিছু অনেকের কপালেই জুটেছিল। নামকরা কোনো নেতাই আর ছিল না, যাদের সামনে গিয়ে দাঁড়ানো যায়।

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী তখন সদ্য আসাম থেকে চলে এসেছেন। তাঁকে পূর্ব বাংলার জনসাধারণ তেমন জানত না। শুধু ময়মনসিংহ, পাবনা ও রংপুরের কিছু কিছু লোক তাঁর নাম জানত। কারণ তিনি আসামেই কাটিয়েছেন। তবে শিক্ষিত সমাজের কাছে কিছুটা পরিচিত ছিলেন। একজন মুসলিম লীগের নেতা হিসাবে তিনি আসামের 'বাঙ্গাল খেদা' আন্দোলনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন এবং জেলও খেটেছিলেন। টাঙ্গাইলের লোকেরা তাঁকে খুব ভালবাসত। শামসুল হক সাহেব তাঁকে ভালভাবে জানতেন। কারণ, হক সাহেবের বাড়িও সেখানে। তিনি মওলানা সাহেবের সাথে পাকাপাকি আলোচনা করবেন ঠিক হল। পূর্বেও তিনি পুরানা মুসলিম লীগ কর্মীদের সভায় যোগদান করেছিলেন। কিছুদিনের জন্য তিনি আসাম গিয়েছিলেন। ফিরে আসলেই আমরা কর্মিসভা করে একটা

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করব ঠিক হল। সীমান্ত প্রদেশের পীর মানকী শরীফ একটা প্রতিষ্ঠান গড়েছেন। তার নাম দিয়েছেন, 'আওয়ামী মুসলিম লীগ।' সীমান্ত প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী খান আবদুল কাইয়ুম খান মুসলিম লীগ থেকে পুরানা কর্মীদের বাদ দিয়েছেন এবং অত্যাচারের স্টিমরোলার চালিয়ে দিয়েছেন। অনেক লীগ কর্মীকে জেলে দিতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই। এখন তিনি 'সীমান্ত শার্দূল' বনে গিয়েছেন। পাকিস্তান আন্দোলনে সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গাফফার খান ও ডাক্তার খান সাহেবের মোকাবেলা করতে পারেন নাই। ফলে সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেস সরকার গঠন হয়। একমাত্র পীর মানকী শরীফই লাল কোর্তাদের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগকে দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তবু পীর সাহেবের জায়গাও মুসলিম লীগে হয় নাই। পীর মানকী শরীফ সভাপতি এবং খান গোলাম মোহাম্মদ খান লুন্দখোর সাধারণ সম্পাদক হয়ে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করেন।



১৯৪৯ সালের মার্চ মাসের শেষের দিকে অথবা এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে টাঙ্গাইলে উপনির্বাচন হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। আমরা ঠিক করলাম, শামসুল হক সাহেবকে অনুরোধ করব মুসলিম লীগের প্রার্থীর বিরুদ্ধে নির্বাচনে লড়তে। শামসুল হক সাহেব শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন, কিন্তু টাকা পাওয়া যাবে কোথায়? হক সাহেবেরও টাকা নাই, আর আমাদেরও টাকা নাই। তবু যেই কথা সেই কাজ। শামসুল হক সাহেব টাঙ্গাইল চলে গেলেন, আমরা যে যা পারি জোগাড় করতে চেষ্টা করলাম। কয়েক শত টাকার বেশি জোগাড় করা সম্ভব হয়ে উঠল না। ছাত্র ও কর্মীরা ঘড়ি, কলম বিক্রি করেও কিছু টাকা দিয়েছিল।

এদিকে ছাত্রনেতাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এর প্রতিবাদ করা প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা করেছে, ১৭ই এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয় খুলবে। ছাত্রলীগ ও অন্যান্য ছাত্র কর্মী—যারা ঢাকায় ছিল, ১৫০ নম্বর মোগলটুলীতে বসে এক সভা করে ঠিক করল যে, ১৭ তারিখ থেকে প্রতিবাদ দিবস পালন করা হবে। ছাত্ররা ধর্মঘট করবে যে পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ তাদের উপর থেকে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার না করে। কিছু সংখ্যক কর্মী টাঙ্গাইল রওয়ানা হয়ে গেল। বেশিরভাগ পুরানা লীগ কর্মী। মুসলিম লীগের মন্ত্রীরা ও এমএলএরা টাকা-পয়সা, গাড়ি, সকল কিছু নিয়েই টাঙ্গাইলে উপস্থিত হয়েছিল। মুসলিম লীগ প্রার্থী করটিয়ার বিখ্যাত জমিদার খুররম খান পন্নী—যাঁর প্রজাই হল অধিকাংশ ভোটার। তাঁর সাথে আছে সরকারি ক্ষমতা এবং অর্থবল। আমাদের প্রার্থী গরিব, কিন্তু নিঃস্বার্থ, ত্যাগী কর্মী; আর আছে আদর্শ ও কর্মক্ষমতা। তখন কোনো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানও আমাদের পিছনে নাই। কর্মীরা পায়ে হেঁটে, না খেয়ে নির্বাচন শুরু করল। ঢাকায় ছাত্ররা ব্যস্ত ধর্মঘট নিয়ে। ঠিক হল সকলেই টাঙ্গাইল চলে যাবে, আমি ১৯ এপ্রিল টাঙ্গাইল পৌঁছাব।

১৬ এপ্রিল খবর পেলাম, ছাত্রলীগের কনভেনর নইমউদ্দিন আহমেদ, ছাত্রলীগের আরেক নেতা আবদুর রহমান চৌধুরী (এখন এডভোকেট)—ভিপি সলিমুল্লাহ হল, দেওয়ান

মাহবুব আলী (এখন এডভোকেট) আরও অনেকে গোপনে বিশ্ববিদ্যালয়ে যেয়ে বন্ড দিয়েছেন ; যারা ছাত্রলীগের সভ্যও না, আবার নিজেদের প্রগতিবাদী বলে ঘোষণা করতেন, তাঁরাও অনেকে বন্ড দিয়েছেন। সাতাশজনের মধ্যে প্রায় অর্ধেকই বন্ড দিয়ে দিয়েছে। কারণ ১৭ তারিখের মধ্যে বন্ড না দিলে আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকবে না।

ছাত্রলীগের কনভেনর ও সলিমুল্লাহ হলের ভিপি বন্ড দিয়েছে খবর রটে যাওয়ার সাথে সাথে ছাত্রদের মনোবল একদম ভেঙে গিয়েছিল। আমি তাড়াতাড়ি কয়েকজনকে নিয়ে নইমউদ্দিনকে ধরতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু তাকে পাওয়া কষ্টকর, সে পালিয়ে গিয়েছিল। সে এক বাড়িতে লজিং থাকত। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে তাকে ধরতে পারলাম। সে স্বীকার করল আর বলল, 'কি করব, উপায় নাই। আমার অনেক অসুবিধা।' তার সাথে আমি অনেক রাগারাগি করলাম এবং ফিরে এসে নিজেই ছাত্রলীগের সভ্যদের খবর দিলাম, রাতে সভা করলাম। অনেকে উপস্থিত হল। সভা করে এদের বহিষ্কার করা হল এবং রাতের মধ্যে প্যামপ্লেট ছাপিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিলি করার বন্দোবস্ত করলাম। কাজী গোলাম মাহাবুবকে (এখন এডভোকেট) জয়েন্ট কনভেনর করা হয়েছিল। সে নিঃস্বার্থভাবে কাজ চালিয়েছিল।

তখন ভোরবেলায় আইন ক্লাস হত। আইন ক্লাসের ছাত্ররা ধর্মঘট করল। দশটায় পিকেটিং শুরু হল। ছাত্রকর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজায় শুয়ে পড়ল। একজন মাত্র ছাত্রী সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিল। তার নাম নাদেরা বেগম। প্রফেসর মুনীর চৌধুরীর ভগ্নি। নাদেরা একাই ছেলেদের সাথে দরজায় বসেছিল। মাত্র দশ-পনেরজন ছাত্র নিখিল পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সমর্থক এবং কয়েকজন বার বার ছাত্রদের উপর দিয়ে একবার ভিতরে একবার বাইরে যাওয়া-আসা করতে লাগল এবং এর মধ্যে একজন নাদেরাকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিয়েছিল। সাধারণ ছাত্ররা এদের ওপর ক্ষেপে গেল। আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম এবং সকলকে নিষেধ করলাম গোলমাল না করতে। আমি তাদের বললাম, "আপনারা ক্লাস করতে চান, ভিতরে যান, আমাদের আপত্তি নাই। তবে বার বার যাওয়া-আসা করবেন না। আর আজেবাজে কথা বলবেন না।"

তারা আমার কথা না শুনে আবার বের হয়ে এল এবং ভিতরে ফিরে যেতে লাগল যারা পিকেটিং করছিল, তাদের উপর পা দিয়ে। আর আমি কিছু করতে পারলাম না, সাধারণ ছাত্র তখন অনেক জমা হয়েছে। তারা এদের আক্রমণ করে বসল। এরা পালিয়ে দোতলায় আশ্রয় নিল, যে যেখানে পারে। আমি দরজায় দাঁড়িয়ে ক্রুদ্ধ ছাত্রদের বাধা দিলাম। যাহোক, ধর্মঘট হয়ে গেল। সভা হল, ধর্মঘট চলবে ঠিক হল। এ সময় ড. ওসমান গনি সাহেব সলিমুল্লাহ হলের প্রভোস্ট ছিলেন। তিনি এক্সিকিউটিভ কমিটি সভায় আমাদের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করতে অনুরোধ করলেন। তাঁকে সমর্থন করলেন, প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ, কিন্তু কমিটির অন্যান্য সদস্য রাজি হলেন না। ১৮ তারিখে ধর্মঘট হয়েছিল, আবার ১৯ তারিখে ধর্মঘট হবে ঘোষণা করা হল। ছাত্রদের মধ্যে উৎসাহ কমে গেছে বলে আমার মনে হল। ১৮ তারিখ বিকালে ঠিক করলাম, ধর্মঘট করে বোধহয় কিছু করা

যাবে না। তাই ১৮ তারিখে ছাত্র শোভাযাত্রা করে ভাইস চ্যান্সেলরের বাড়িতে গেলাম এবং ঘোষণা করলাম, 'আমরা এখানেই থাকব, যে পর্যন্ত শাস্তিমূলক আদেশ প্রত্যাহার না করা হয়।' একশজন করে ছাত্র রাতদিন ভাইস চ্যান্সেলরের বাড়িতে বসে থাকবে। তাঁর বাড়ির নিচের ঘরগুলিও দখল করে নেওয়া হল। একদল যায়, আর একদল থাকে। ১৮ তারিখ রাত কেটে গেল, শুধু আমি জায়গা ত্যাগ করতে পারছিলাম না। কারণ শুনলাম, তিনি পুলিশ ডাকবেন। ১৯ তারিখ বিকাল তিনটায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, এসপি বিরাট একদল পুলিশ বাহিনী নিয়ে হাজির হলেন। আমি তাড়াতাড়ি সভা ডেকে একটা সংগ্রাম পরিষদ করতে বলে দিলাম। সকলের মত আমাকেও দরকার হলে গ্রেফতার হতে হবে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পাঁচ মিনিট সময় দিলেন আমাদের স্থান ত্যাগ করে যেতে। আমি আটজন ছাত্রকে বললাম, তোমরা এই আটজন থাক, আর সকলেই চলে যাও। আমি ও এই আটজন স্থান ত্যাগ করব না। ছাত্র প্রতিনিধিদের ধারণা, আমি গ্রেফতার হলে আন্দোলন চলবে, কারণ আন্দোলন ঝিমিয়ে আসছিল। একে চাঙ্গা করতে হলে, আমার গ্রেফতার হওয়া দরকার। আমি তাদের কথা মেনে নিলাম। পাঁচ মিনিট পরে এসে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আমাদের গ্রেফতারের হুকুম দিলেন। তাজউদ্দীন আহমদ (এখন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক) আটকা পড়েছে। তাকে নিষেধ করা হয়েছে গ্রেফতার না হতে। তাজউদ্দীন বুদ্ধিমানের মত কাজ করল। বলে দিল, "আমি প্রেস রিপোর্টার।" একটা কাগজ বের করে কে কে গ্রেফতার হল, তাদের নাম লিখতে শুরু করল। আমি তাকে চোখ টিপ মারলাম। আমাদের গাড়িতে তুলে একদম জেলগেটে নিয়ে আসল।



পরের দিন থেকেই জনগণের মধ্যে আন্দোলনও দানা বেঁধে উঠল। পূর্ণ ধর্মঘট পালিত হল। যাদের আমি নিষেধ করেছিলাম, তারাও প্রায়ই তিন দিনের মধ্যে গ্রেফতার হয়ে গেল। খালেক নেওয়াজ খান, কাজী গোলাম মাহাবুব, আজিজ আহমেদ, অলি আহাদ, আবুল হাসানাত, আবুল বরকত, কে. জি. মোস্তফা, বাহাউদ্দিন চৌধুরী ও আরও অনেকে। এরাই ছিল প্রথম শ্রেণীর কর্মী। বুঝতে আর বাকি রইল না যে, আন্দোলন আর চলবে না। কর্মীরা গ্রেফতার হওয়ার পরে আর আন্দোলন চলল না। ক্লাস শুরু হয়ে গেল, আমরা জেলে রইলাম। বোধহয় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশজন ছাত্রনেতা গ্রেফতার হয়েছিল। আমাদের ঢাকা জেলের পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের দোতালায় রাখা হয়েছিল। কয়েকজনকে উচ্চ শ্রেণীর মর্যাদা দিয়েছিল। আর কয়েকজনকে দেওয়া হয় নাই। তাতে আমাদের খুব অসুবিধা হতে লাগল। খাওয়া-দাওয়ার কষ্টও হয়েছিল। তবুও আমরা ঠিক করলাম, এক জায়গায় থাকব এবং যা কিছু পাই ভাগ করে খাব।

জেলে যারা আছে, তাদের মধ্যেও দুইটা গ্রুপ ছিল। তিনজন ছিল উগ্রপন্থী। এদের অন্য ছাত্র বন্দিরা কমিউনিস্ট বলত। এই তিনজনের মধ্যে একজন ছাত্রলীগের সভ্য ছিল

না। আর সকলেই ছাত্রলীগের সভ্য। আমাদের খেলাধুলা করে সময় কেটে যেত। আমার কাছে বরকত থাকত। রাতে বরকত গান গাইত, চমৎকার গাইতে পারত। বইপত্রও কিছু আনা হয়েছিল, জেল লাইব্রেরিতেও বই কিছু ছিল। কিছু সময় সকলেই লেখাপড়া করত। সকলেই ছাত্র, খুব দুষ্টামি করত। আমি ও আজিজ আহমেদ ছিলাম এদের মধ্যে বয়সে বড়। ডাক্তার সাহেবরা জেলে মেডিকেল ডায়েট দিতে পারতেন। এরা দল বেঁধে ডাক্তার সাহেবের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলত। বরকত ছিল দুষ্ট বেশি। ডাক্তার সাহেব আসলেই বলত, "আমার পায়ে ব্যথা, কিছু দুধ ও ডিম পাস করে দেন।" সকলেই হেসে ফেলত তার কথায়। রাজনীতি নিয়ে চলত ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা।

একমাত্র বাহাউদ্দিন চৌধুরীর বাবা-মা ঢাকায় ছিলেন। সকলের চেয়ে বয়সে ছোট ছিল সে, আমি খুব স্নেহ করতাম। বাহাউদ্দিনের মা অনেক খাবার দিতেন। সকলকে দিয়েই সে খেত। তবু রাতে সে যখন ঘুমাত তখন দলবল বেঁধে ওর খাবারগুলো খেয়ে ফেলত, না হয় সরিয়ে রাখত। বাহাউদ্দিন কিছু না বলে চুপ করে আমাকে বলত। আমি সকলের সঙ্গে রাগ করতাম। কিন্তু কেউই স্বীকার করত না। রাতে যারা তাস খেলত তারাই এই কাজ করত। বরকত আমার কাছে মিছা কথা বলত না, সব বলে দিত।

খালেক নেওয়াজকে নিয়ে আর এক মহাবিপদ ছিল। ওর গায়ে বড় বড় লোম ছিল। সমস্ত গা লোমে ভরা। ছাত্ররা ছারপোকা ধরে চুপি চুপি ওর শরীরে ছেড়ে দিত। ওর মুখও খুব খারাপ ছিল, অকথ্য ভাষায় গালাগালি করত। আমরা বিকালে ভলিবল খেলতাম। তখন সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন আমীর হোসেন সাহেব। আমাদের খুবই স্নেহ করতেন। যা প্রয়োজন, চাইলেই তিনি আমাদের দিতেন এবং সকলকে হুকুম দিয়েছিলেন আমাদের যেন কোন অসুবিধা না হয়।[৮]

একদিন আমার হাতের কব্জি সরে গিয়েছিল, পড়ে যেয়ে। ভীষণ যন্ত্রণা, সহ্য করা কষ্টকর হয়ে পড়েছিল। আমাকে বোধহয় মেডিকেল কলেজে পাঠানোর ব্যবস্থা হচ্ছিল। একজন নতুন ডাক্তার ছিল জেলে। আমার হাতটা ঠিকমত বসিয়ে দিল। ব্যথা সাথে সাথে কম হয়ে গেল। আর যাওয়া লাগল না। বাড়িতে আমার আব্বা ও মা ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। রেণু তখন হাচিনাকে নিয়ে বাড়িতেই থাকে। হাচিনা তখন একটু হাঁটতে শিখছে। রেণুর চিঠি জেলেই পেয়েছিলাম। কিছু টাকাও আব্বা পাঠিয়ে ছিলেন। রেণু জানত, আমি সিগারেট খাই। টাকা পয়সা নাও থাকতে পারে। টাকার দরকার হলে লিখতে বলেছিল।

জুন মাসের প্রথম দিক থেকে দু'একজন করে ছাড়তে শুরু করে। এখন আর বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো গোলমাল নাই। শামসুল হক সাহেব মুসলিম লীগ প্রার্থী খুররম খান পন্নীকে পরাজিত করে এমএলএ হয়েছেন। মুসলিম লীগের প্রথম পরাজয় পাকিস্তানে। মুসলিম লীগকে কোটারি করার ফল তাদের পেতে হল। আমরা জেলের মধ্যে খুবই চিন্তিত ছিলাম। হক সাহেব আমার উপর অসন্তুষ্টও হয়েছিলেন; কেন আমি গ্রেফতার হয়েছিলাম, টাঙ্গাইল না যেয়ে! পরে যখন সমস্ত খবর পেলেন তখন দেখতে পেলেন, আমার কোনো উপায় ছিল না।

১৯৪৭ সালে যে মুসলিম লীগকে লোকে পাগলের মত সমর্থন করছিল, সেই মুসলিম লীগ প্রার্থীর পরাজয়বরণ করতে হল কি জন্য? কোটারি, কুশাসন, জুলুম, অত্যাচার এবং অর্থনৈতিক কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ না করার ফলে। ইংরেজ আমলের সেই বাঁধাধরা নিয়মে দেশ শাসন চলল। স্বাধীন দেশ, জনগণ নতুন কিছু আশা করেছিল, ইংরেজ চলে গেলে তাদের অনেক উন্নতি হবে এবং শোষণ থাকবে না। আজ দেখছে ঠিক তার উল্টা। জনগণের মধ্যে হতাশা দেখা দিয়েছিল। এদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই আমাদের শাসকগোষ্ঠীর। জিন্নাহর মৃত্যুর পর থেকেই কোটারি ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু হয়েছে। লিয়াকত আলী খান এখন সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী। তিনি কাউকেও সহ্য করতে চাইছিলেন না। যদিও তিনি গণতন্ত্রের কথা মুখে বলতেন, কাজে তার উল্টা করছিলেন। জিন্নাহকে পূর্ব বাংলার জনগণ ভালবাসত এবং শ্রদ্ধা করত। ঘরে ঘরে জনসাধারণ তাঁর নাম জানত। লিয়াকত আলী খান প্রধানমন্ত্রী। এইটুকু শিক্ষিত সমাজ জানত এবং আশা করেছিল জিন্নাহ সাহেবের এক নম্বর শিষ্য নিশ্চয়ই ভাল কাজ করবেন এবং শাসনতন্ত্র তাড়াতাড়ি দিবেন। জিন্নাহ সাহেব শাসনতন্ত্র দিয়ে গেলে কোনো গোলমাল হওয়া বা ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা থাকত কি না সন্দেহ ছিল। যাই তিনি করতেন জনগণ মেনে নিতে বাধ্য হত। জিন্নাহ সাহেব বড়লাট হয়ে প্রচণ্ড ক্ষমতা ব্যবহার করতেন। খাজা সাহেব কোন ক্ষমতাই ব্যবহার করতেন না। তিনি অমায়িক ও দুর্বল প্রকৃতির লোক ছিলেন। ব্যক্তিত্ব বলে তাঁর কিছুই ছিল না।

লিয়াকত আলী আমাদের এই আন্দোলন ভাল চোখে দেখছিলেন না। পূর্ব বাংলার নেতারা তাঁকে ভুল বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন। পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমিন সাহেব সরকারি কর্মচারীদের উপর নির্ভর করতেন এবং তাদের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে অত্যাচার করতে শুরু করলেন। টাঙ্গাইল উপনির্বাচনে পরাজিত হয়েও তাদের চক্ষু খুলল না। সরকারি দল তাদের সভায় ঘোষণা করল, 'যা কিছু হোক, শামসুল হক সাহেবকে আইনসভায় বসতে দেওয়া হবে না।' তারা নির্বাচনী মামলা দায়ের করল। শামসুল হক সাহেব ইলেকশনে জয়লাভ করে ঢাকা আসলে ঢাকার জনসাধারণ ও ছাত্রসমাজ তাঁকে বিরাট সম্বর্ধনা জানাল। বিরাট শোভাযাত্রা করে তাঁকে নিয়ে ঢাকা শহর প্রদক্ষিণ করল। আমরা জেলে বসে বিজয়ের আনন্দ উপভোগ করলাম। শামসুল হক সাহেব ফিরে আসার পরেই পুরানা লীগ কর্মীরা মিলে এক কর্মী সম্মেলন ডাকল ঢাকায়—ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ঠিক করার জন্য। ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন সে সভা আহ্বান করা হয়েছিল।



আমাদের মধ্যে অনেককেই মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত শুধু আমি ও বাহাউদ্দিন চৌধুরী রইলাম। বাহাউদ্দিন চৌধুরীর বয়স খুব অল্প। তাকে না ছাড়বার কারণ হল, সন্দেহ করছিল সে কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন হয়ে পড়ছিল। এই সময় অনেককেই কমিউনিস্ট বলে

জেলে ধরে আনতে শুরু করেছিল, নিরাপত্তা আইনে; যাকে আমরা বিনা বিচারে বন্দি বলি। এদের মধ্যে অনেকেই ইংরেজ আমলে বহুদিন জেল খেটেছে।

কারাগারের যন্ত্রণা কি এইবারই বুঝতে পারলাম। সন্ধ্যায় বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে দিলেই আমার খারাপ লাগত। সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথে সমস্ত কয়েদির কামরায় কামরায় বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে দেওয়া হয় গণনা করার পর। আমি কয়েদিদের কাছে বসে তাদের জীবনের ইতিহাস ও সুখ দুঃখের কথা শুনতে ভালবাসতাম। তখন কয়েদিদের বিড়ি তামাক খাওয়া আইনে নিষেধ ছিল। তবে রাজনৈতিক বন্দিদের নিষেধ ছিল না। নিজের টাকা দিয়ে কিনে এনে খেতে পারত। একটা বিড়ির জন্য কয়েদিরা পাগল হয়ে যেত। কিন্তু কর্তৃপক্ষ যদি কাউকেও বিড়ি খেতে দেখত তাহলে তাদের বিচার হত এবং শাস্তি পেত। সিপাহিরা যদি কোনো সময় দয়াপরবশ হয়ে একটা বিড়ি বা সিগারেট দিত কতই না খুশি হত! আমি বিড়ি এনে এদের কিছু কিছু দিতাম। পালিয়ে পালিয়ে খেত কয়েদিরা।

কর্মী সম্মেলনের জন্য খুব তোড়জোড় চলছিল। আমরা জেলে বসেই সে খবর পাই। ১৫০ নম্বর মোগলটুলীতে অফিস হয়েছে। শওকত মিয়া সকলের খাওয়া ও থাকার বন্দোবস্ত করত। সে ছাড়া ঢাকা শহরে কেইবা করবে? আর একজন ঢাকার পুরানা লীগকর্মী ইয়ার মোহাম্মদ খান সহযোগিতা করছিলেন। ইয়ার মোহাম্মদ খানের অর্থবল ও জনবল দুইই ছিল। এডভোকেট আতাউর রহমান খান, আলী আমজাদ খান এবং আনোয়ারা খাতুন এমএলএ সহযোগিতা করছিলেন। আমরা সম্মেলনের ফলাফল সম্বন্ধে খুবই চিন্তায় দিন কাটাচ্ছিলাম। আমার সাথে যোগাযোগ করা হয়েছিল, আমার মত নেওয়ার জন্য। আমি খবর দিয়েছিলাম, "আর মুসলিম লীগের পিছনে ঘুরে লাভ নাই, এ প্রতিষ্ঠান এখন গণবিচ্ছিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এরা আমাদের মুসলিম লীগে নিতে চাইলেও যাওয়া উচিত হবে না। কারণ এরা কোটারি করে ফেলেছে। একে আর জনগণের প্রতিষ্ঠান বলা চলে না। এদের কোনো কর্মপন্থাও নাই।" আমাকে আরও জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আমি ছাত্র প্রতিষ্ঠান করব, না রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন হলে তাতে যোগদান করব? আমি উত্তর পাঠিয়েছিলাম, ছাত্র রাজনীতি আমি আর করব না, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানই করব। কারণ বিরোধী দল সৃষ্টি করতে না পারলে এ দেশে একনায়কত্ব চলবে।

কিছুদিন পূর্বে জনাব কামরুদ্দিন সাহেব 'গণআজাদী লীগ' নাম দিয়ে একটা প্রতিষ্ঠান করেছিলেন, কিন্তু তা কাগজপত্রেই শেষ। যাহোক, কোথায়ও হল বা জায়গা না পেয়ে শেষ পর্যন্ত হুমায়ুন সাহেবের রোজ গার্ডেন বাড়িতে সম্মেলনের কাজ শুরু হয়েছিল। শুধু কর্মীরা না, অনেক রাজনৈতিক নেতাও সেই সম্মেলনে যোগদান করেন। শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, আল্লামা মওলানা রাগীব আহসান, এমএলএদের ভিতর থেকে জনাব খয়রাত হোসেন, বেগম আনোয়ারা খাতুন, আলী আহমদ খান ও হাবিবুর রহমান চৌধুরী ওরফে ধনু মিয়া এবং বিভিন্ন জেলার অনেক প্রবীণ নেতাও যোগদান করেছিলেন। সকলেই একমত হয়ে নতুন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করলেন; তার নাম

দেওয়া হল, 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ।' মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী সভাপতি, জনাব শামসুল হক সাধারণ সম্পাদক এবং আমাকে করা হল জয়েন্ট সেক্রেটারি। খবরের কাগজে দেখলাম, আমার নামের পাশে লেখা আছে 'নিরাপত্তা বন্দি'। আমি মনে করেছিলাম, পাকিস্তান হয়ে গেছে সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের দরকার নাই। একটা অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হবে, যার একটা সুষ্ঠু ম্যানিফেস্টো থাকবে। ভাবলাম, সময় এখনও আসে নাই, তাই যারা বাইরে আছেন তারা চিন্তাভাবনা করেই করেছেন।

আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন হওয়ার কয়েকদিন পরেই আমার ও বাহাউদ্দিনের মুক্তির আদেশ এল। বাইরে থেকে আমার সহকর্মীরা নিশ্চয়ই খবর পেয়েছিল। জেলগেটে গিয়ে দেখি বিরাট জনতা আমাদের অভ্যর্থনা করার জন্য এসেছে মওলানা ভাসানী সাহেবের নেতৃত্বে। বাহাউদ্দিন আমাকে চুপি চুপি বলে, "মুজিব ভাই, পূর্বে মুক্তি পেলে একটা মালাও কেউ দিত না, আপনার সাথে মুক্তি পাচ্ছি, একটা মালা তো পাব।" আমি হেসে দিয়ে বললাম, "আর কেউ না দিলে তোমাকে আমি মালা পরিয়ে দিতাম।" জেলগেট থেকে বের হয়ে দেখি, আমার আব্বাও উপস্থিত। তিনি আমাকে দেখবার জন্য বাড়ি থেকে এসেছেন। আমি আব্বাকে সালাম করে তাসানী সাহেবের দিকে এগিয়ে গিয়ে তাঁকেও সালাম করলাম। সাথে সাথে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ জিন্দাবাদ, ছাত্রলীগ জিন্দাবাদ' ধ্বনি উঠল। জেলগেটে এই প্রথম 'আওয়ামী লীগ জিন্দাবাদ' হল। শামসুল হক সাহেবকে কাছে পেয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানালাম এবং বললাম, "হক সাহেব, আপনার জয়, আজ জনগণের জয়।" হক সাহেব আমাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন, "চল, এবার শুরু করা যাক।" পরে আওয়ামী মুসলিম লীগ, আওয়ামী লীগ নামে পরিচিত হয়।

আওয়ামী লীগের কয়েকজনকে সহ-সতাপতি করা হয়েছিল। জনাব আতাউর রহমান খান, আবদুস সালাম খান, আলী আহমদ খান, আলী আমজাদ খান ও আরও একজন কে ছিলেন আমার মনে নাই। আওয়ামী লীগের প্রথম ওয়ার্কিং কমিটির সতা হয় ১৫০ নম্বর মোগলটুলীতে। শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক সাহেব তাতে যোগদান করেছিলেন। একটা গঠনতন্ত্র সাব-কমিটি ও একটা কর্মপন্থা সাব-কমিটি করা হল। আমরা কাজ করা শুরু করলাম। শওকত মিয়া বিরাট সাইনবোর্ড লাগিয়ে দিল। টেবিল, চেয়ার সকল কিছুই বন্দোবস্ত করল। আমি জেল থেকে বের হওয়ার পূর্বে একটা জনসভা আওয়ামী লীগ আরমানিটোলা ময়দানে ডেকেছিল। মওলানা তাসানী সেই প্রথম ঢাকায় বক্তৃতা করবেন। শামসুল হক সাহেবকে ঢাকার জনগণ জানত। তিনি বক্তৃতাও তাল করতেন। আওয়ামী মুসলিম লীগ যাতে জনসভা না করতে পারে সে জন্য মুসলিম লীগ গুণ্ডামির আশ্রয় গ্রহণ করে। যথেষ্ট জনসমাগম হয়েছিল, সভা যখন আরম্ভ হবে ঠিক সেই মুহূর্তে একদল তাড়াটিয়া লোক মাইক্রোফোন নষ্ট করে দিয়েছিল এবং প্যান্ডেল ভেঙে ফেলেছিল। অনেক কর্মীকে মারপিটও করেছিল। ঢাকার নামকরা ভীষণ প্রকৃতির লোক বড় বাদশা বাবুবাজারে (বাদামতলী ঘাট) থাকে। বড় বাদশার লোকবল ছিল, তার নামে দোহাই দিয়ে ফিরত এই সমস্ত

এলাকায়। তাকে বোঝান হয়েছিল, আওয়ামী লীগ যারা করেছে এবং আওয়ামী লীগের সভা করছে তারা সবাই 'পাকিস্তান ধ্বংস করতে চায়'—এদের সভা করতে দেওয়া চলবে না। বাদশা মিয়াকে লোকজন জোগাড় করে সভা ভাঙবার জন্য পাঁচশত টাকা দেওয়া হয়েছিল।

বাদশা মিয়া খুব ভাল বংশের থেকে এসেছে, কিন্তু দলে পড়ে এবং ঢাকার হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় শরিক হয়ে খারাপ রাস্তায় চলে গিয়েছিল। দাঙ্গা করে অনেক মামলার আসামিও হয়েছিল। সভায় গোলমাল করে সে চলে গেলে ঐ মহল্লার বাসিন্দা জনাব আরিফুর রহমান চৌধুরী তার কাছে গিয়ে বললেন, "বাদশা মিয়া, আমাদের সভা একবার ভেঙে দিয়েছেন। আমরা আবার সব কিছু ঠিক করে সভা আরম্ভ করছি। আপনি আমাদের কথা প্রথমে শুনুন, যদি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বলি বা দেশের বিরুদ্ধে বলি তারপরে সভা ভাঙতে পারবেন।" চৌধুরী সাহেবের ব্যবহার ছিল অমায়িক। খেলাফত আন্দোলন থেকে রাজনীতি করছেন। দেশের রাজনীতি করতে সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছেন। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন বরিশালের উলানিয়ার জমিদারি বংশে। বাদশা মিয়া তার দলবল নিয়ে এসে রাস্তায় দাঁড়িয়ে সভার বক্তৃতা শুনতে লাগল। কয়েকজন বক্তৃতা করার পরে বাদশা মিয়া প্লাটফর্মের কাছে এসে বলল, "আমার কথা আছে, আমাকে বলতে দিতে হবে।" কে তাকে বাধা দেয়, বলতে গেলে আরমানিটোলা ময়দান তার রাজত্বের মধ্যে। বাদশা মিয়া মাইকের কাছে যেয়ে বলল, "আমাকে মুসলিম লীগ নেতারা ভুল বুঝিয়েছিল আপনাদের বিরুদ্ধে। আপনাদের সভা ভাঙতে আমাকে পাঁচশত টাকা দিয়েছিল, এ টাকা এখনও আমার পকেটে আছে। আমার পক্ষে এ টাকা গ্রহণ করা হারাম। আমি এ টাকা আপনাদের সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছি।" এ কথা বলে টাকাগুলি (পাঁচ টাকার নোট) ছুঁড়ে দিল। সভার মধ্যে টাকাগুলি উড়তে লাগল। অনেকে কুড়িয়ে নিল এবং অনেক ছিঁড়ে ফেলল। বাদশা মিয়া আরও বলল, "আজ থেকে আমি আওয়ামী লীগের সভ্য হলাম, দেখি আরমানিটোলায় কে আপনাদের সভা ভাঙতে পারে?" জনসাধারণ ফুলের মালা বাদশা মিয়ার গলায় পরিয়ে দিল। জনগণের মধ্যে এক নতুন আলোড়নের সৃষ্টি হল। মুসলিম লীগ গুণ্ডামির প্রশ্রয় নিয়েছিল একথা ফাঁস হয়ে পড়ল। আওয়ামী লীগের সভা ভাঙতে টাকাও দিয়েছিল একথাও জনগণ জানতে পারল। যদিও এতে তাদের লজ্জা হয় নাই। এই গুণ্ডামির পথ অনেক দিন তারা অনুসরণ করেছে যে পর্যন্ত না আমরা বাধ্য করতে পেরেছি তাদের তা বন্ধ করতে। তারা ঠিক করেছিল, বিরুদ্ধ দল গঠন করতে দেওয়া হবে না। তারা যে জনসমর্থন হারাচ্ছে, কেন তার সংশোধন না করে তারা বিরুদ্ধ দলের উপর নির্যাতন শুরু করল এবং গুণ্ডামির আশ্রয় নিল?



আমি জেল থেকে বের হয়েছি, আব্বা আমার জন্য ঢাকায় এসেছেন, আমাকে বাড়ি নিয়ে যাবেন। আমি আব্বাকে বললাম, "আপনি বাড়ি যান, আমি সাত-আট দিনের মধ্যে আসছি।"

আমার টাকার দরকার, বাড়ি না গেলে টাকা পাওয়া যাবে না। বৃদ্ধা মা, আর স্ত্রী ও মেয়েটিকে দেখতে ইচ্ছা করছিল। আমি ফরিদপুরের সালাম সাহেবকেও খবর দিলাম গোপালগঞ্জে একটা সভা করব, তিনি যেন উপস্থিত থাকেন। গোপালগঞ্জে আওয়ামী মুসলিম লীগ সংগঠন হয়ে গেছে। পুরানা মুসলিম লীগ কমিটিকেই আওয়ামী লীগ কমিটিতে পরিণত করে ফেলা হয়েছিল। কারণ, পাকিস্তান সরকার আমাদের বিরোধীদের দিয়ে একটা মহকুমা মুসলিম লীগ অর্গানাইজিং কমিটি গঠন করেছিল।

গোপালগঞ্জে খবর দিয়ে আমি বাড়িতে রওয়ানা করলাম। বোধহয় জুলাই মাসের মাঝামাঝি হবে, জনসভা ডাকা হয়েছিল। সালাম খান সাহেব উপস্থিত হলেন, আমিও বাড়ি থেকে আসলাম। সভায় হাজার হাজার জনসমাগম হয়েছিল। হঠাৎ সকালবেলা ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। আমরা সভা মসজিদ প্রাঙ্গণে করব ঠিক করলাম। তাতে যদি ১৪৪ ধারা ভাঙতে হয়, হবে। বিরাট মসজিদ এবং সামনে কয়েক হাজার লোক ধরবে। সালাম সাহেবও রাজি হলেন। আমরা যখন সভা শুরু করলাম, তখন এসডিও মসজিদে ঢুকে মসজিদের ভিতর ১৪৪ ধারা জারি করলেন। আমরা মানতে আপত্তি করলাম, পুলিশ মসজিদে ঢুকলে মারপিট শুরু হল। পুলিশ লাঠিচার্জ করলে এবং দুই পক্ষেই কিছু আহত হল। আমি ও সালাম সাহেব সভাস্থান ত্যাগ করতে আপত্তি করলাম। আমাদের গ্রেফতার করা হল। জনসাধারণও মসজিদ ঘিরে রাখল। গুলি করা ছাড়া আমাদের কোর্টে বা থানায় নেওয়া সম্ভবপর হবে না, পুলিশ অফিসার বুঝতে পারল। যতদূর জানা গিয়েছিল, পুলিশ কর্মচারীরা মসজিদের ভিতর ১৪৪ ধারা জারি করতে রাজি ছিল না। এসডিও সাহেব জোর করেই করেছিলেন। মহকুমা পুলিশ অফিসার যখন বুঝতে পারলেন অবস্থা খুবই খারাপ, গোলমাল হবেই, জনসাধারণ রাস্তা বন্ধ করে রেখেছে, তখন আমার ও সালাম সাহেবের কাছে এসে অনুরোধ করলেন, "গোলমাল হলে অনেক লোক মারা যাবে। আপনারা তো এখনই জামিন পেয়ে যাবেন, এদের বলে দেন চলে যেতে এবং রাস্তা ছেড়ে দিতে। আমরা আপনাদের কোর্টে নিয়ে যাব এবং এখনই জামিন দিয়ে দেব।"

সন্ধ্যা হয়ে গেছে, বহুদূর থেকে লোকজন এসেছে। বৃষ্টি হচ্ছে, সন্ধ্যার অন্ধকারে কি হয় বলা যায় না। জনসাধারণের হাতেও অনেক লাঠি ও নৌকার বৈঠা আছে। মহকুমা প্রশাসনের কর্মকর্তারা বিশেষ করে আমাকে বক্তৃতা করে লোকজনকে বোঝাতে বললেন। সালাম সাহেব ও গোপালগঞ্জ মহকুমার নেতাদের সাথে আলাপ-আলোচনা করে ঠিক হল আমি বক্তৃতা করে লোকদের চলে যেতে বলব। আমি বক্তৃতা করলাম, বলার যা ছিল সবই বললাম এবং রাস্তা ছেড়ে দিতে অনুরোধ করলাম। মসজিদ থেকে কোর্ট তিন মিনিটের রাস্তা মাত্র। পুলিশ ও আমরা কয়েক ঘণ্টা আটক আছি। জনসাধারণ শেষ পর্যন্ত আমাদের রাস্তা দিল। আমাদের সাথেই জিন্দাবাদ দিতে দিতে কোর্টে এল। রাত আট ঘটিকার সময় আমাদের জামিন দিয়ে ছেড়ে দেয়া হল। তারপর জনগণ চলে গেল। এটা আমাদের আওয়ামী লীগের মফস্বলের প্রথম সভা এবং সে উপলক্ষে ১৪৪ ধারা জারি।

পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠার চিত্রলিপি

পরের দিন আওয়ামী লীগের অফিস করা হল। গোপালগঞ্জ মহকুমা আওয়ামী মুসলিম লীগের কনভেনর করা হয়েছিল কাজী আলতাফ হোসেন এবং চেয়ারম্যান করা হয়েছিল মুসলিম লীগের সভাপতি কাজী মোজাফফর হোসেন এডভোকেটকে। এই সময়ের একটা সামান্য ঘটনা মনে হচ্ছে। আমি ও কাজী আলতাফ হোসেন সাহেব ঠিক করলাম, মওলানা শামসুল হক সাহেবের (যিনি এখন লালবাগ মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল) সাথে দেখা করব। মওলানা সাহেবের বাড়িও আমার ইউনিয়নে। জনসাধারণ তাঁকে আলেম হিসাবে খুবই শ্রদ্ধা করত। আমরা দুইজন রাত দশটায় একটা এক মাঝির নৌকায় রওয়ানা করলাম। নৌকা ছোট্ট, একজন মাঝি। মধুমতী দিয়ে রওয়ানা করলাম। কারণ, তাঁর বাড়ি মধুমতীর পাড়ে। মধুমতীর একদিকে ফরিদপুর, অন্যদিকে যশোর ও খুলনা জেলা। নদীটা এক জায়গায় খুব চওড়া। মাঝে মাঝে, সেই জায়গায় ডাকাতি হয়, আমাদের জানা ছিল। ঠিক যখন আমাদের নৌকা সেই জায়গায় এসে হাজির হয়েছিল আমি তখন ক্লান্ত ছিলাম বলে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। পানির দেশের মানুষ নৌকায় ঘুমাতে কোনো কষ্ট হয় না। কাজী সাহেব তখনও ঘুমান নাই। এই সময় একটা ছিপ নৌকা আমাদের নৌকার কাছে এসে হাজির হল। চারজন লোক নৌকার মাঝিকে জিজ্ঞাসা করল, আগুন আছে কি না? আগুন চেয়েই এই ডাকাতরা নৌকার কাছে আসে, এই তাদের পন্থা। আমাদের নৌকার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, "নৌকা যাবে কোথায়?" মাঝি বলল, টুঙ্গিপাড়া, আমার গ্রামের নাম। নৌকায় কে? মাঝি আমার নাম বলল। ডাকাতরা মাঝিকে বৈঠা দিয়ে ভীষণভাবে একটা আঘাত করে বলল, "শালা আগে বলতে পার নাই শেখ সাহেব নৌকায়।" এই কথা বলে নৌকা ছেড়ে দিয়ে তারা চলে গেল। মাঝি মার খেয়ে চিৎকার করে নৌকার হাল ছেড়ে দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল। মাঝির চিৎকারে আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। কাজী সাহেব জেগে ছিলেন, তার ঘড়ি টাকা আংটি সব কিছু লুকিয়ে ফেলেছিলেন ভয়ে। কাজী সাহেব শৌখিন লোক ছিলেন, ব্যবসায়ী মানুষ, টাকা পয়সাও ছিল অনেক। আমি জেগে উঠে জিজ্ঞাসা করলাম, ব্যাপার কি? কাজী সাহেব ও মাঝি আমাকে এই গল্প করল। কাজী সাহেব বললেন, "ডাকাতরা আপনাকে শ্রদ্ধা করে, আপনার নাম করেই বেঁচে গেলাম, না হলে উপায় ছিল না।" আমি বললাম "বোধহয় ডাকাতরা আমাকে ওদের দলের একজন বলে ধরে নিয়েছে।" দুইজনে খুব হাসাহাসি করলাম, কিন্তু বিপদ হল মাঝিকে নিয়ে। কারণ, যে আঘাত তাকে করেছে তাতে তার পিঠে খুবই ব্যথা হয়েছে। বাধ্য হয়ে কিছুদূর এসে আমাদের এক গ্রামের পাশে নৌকা রাখতে হল। যেখানে খুব ভোরে পৌঁছাব সেখানে প্রায় সকাল দশটায় পৌঁছালাম। মওলানা সাহেব মাদ্রাসায়, তাঁর সাথে আলাপ করে আমাদের বাড়িতে এলাম।

আমি কয়েকদিন বাড়িতে ছিলাম। আব্বা খুবই দুঃখ পেয়েছেন। আমি আইন পড়ব না শুনে বললেন, "যদি ঢাকায় না পড়তে চাও, তবে বিলাত যাও। সেখান থেকে বার এট ল' ডিগ্রি নিয়ে এস। যদি দরকার হয় আমি জমি বিক্রি করে তোমাকে টাকা দিব।" আমি বললাম, "এখন বিলাত গিয়ে কি হবে, অর্থ উপার্জন করতে আমি পারব না।" আমার ভীষণ জেদ হয়েছে মুসলিম লীগ নেতাদের বিরুদ্ধে। যে পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখেছিলাম,

এখন দেখি তার উল্টা হয়েছে। এর একটা পরিবর্তন করা দরকার। জনগণ আমাদের জানত এবং আমাদের কাছেই প্রশ্ন করত। স্বাধীন হয়েছে দেশ, তবু মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূর হবে না কেন? দুর্নীতি বেড়ে গেছে, খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে। বিনা বিচারে রাজনৈতিক কর্মীদের জেলে বন্ধ করে রাখা হচ্ছে। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে মুসলিম লীগ নেতারা মানবে না। পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্প কারখানা গড়া শুরু হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে না। রাজধানী করাচি। সব কিছুই পশ্চিম পাকিস্তানে। পূর্ব বাংলায় কিছু নাই। আব্বাকে সকল কিছুই বললাম। আব্বা বললেন, "আমাদের জন্য কিছু করতে হবে না। তুমি বিবাহ করেছ, তোমার মেয়ে হয়েছে, তাদের জন্য তো কিছু একটা করা দরকার।" আমি আব্বাকে বললাম, "আপনি তো আমাদের জন্য জমিজমা যথেষ্ট করেছেন, যদি কিছু না করতে পারি, বাড়ি চলে আসব। তবে অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া চলতে পারে না।" আমাকে আর কিছুই বললেন না। রেণু বলল, "এভাবে তোমার কতকাল চলবে।" আমি বুঝতে পারলাম, যখন আমি ওর কাছে এলাম। রেণু আড়াল থেকে সব কথা শুনছিল। রেণু খুব কষ্ট করত, কিন্তু কিছুই বলত না। নিজে কষ্ট করে আমার জন্যে টাকা পয়সা জোগাড় করে রাখত যাতে আমার কষ্ট না হয়।

আমি ঢাকায় রওয়ানা হয়ে আসলাম। রেণুর শরীর খুব খারাপ দেখে এসেছিলাম। *ইত্তেহাদের* কাজটা আমার ছিল। মাঝে মাঝে কিছু টাকা পেতাম, যদিও দৈনিক *ইত্তেহাদের* অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়েছিল। পূর্ব বাংলা সরকার প্রায়ই ব্যান্ড করে দিয়েছিল। এজেন্টরা টাকা দেয় না। পূর্ব বাংলায় কাগজটা যদিও বেশি চলত।



ঢাকায় এসে ছাত্রলীগের বার্ষিক সম্মেলন যাতে তাড়াতাড়ি হয় তার ব্যবস্থা করলাম। এর পূর্বে আর কাউন্সিল সভা হয় নাই। নির্বাচন হওয়া দরকার, আর আমিও বিদায় নিতে চাই। ঢাকার তাজমহল সিনেমা হলে কনফারেন্স হল আমার সভাপতিত্বে। আমি আমার বক্তৃতায় বললাম, "আজ থেকে আমি আর আপনাদের প্রতিষ্ঠানের সভ্য থাকব না। ছাত্র প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত থাকার আর আমার কোনো অধিকার নাই। আমি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। কারণ আমি আর ছাত্র নই। তবে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ যে নেতৃত্ব দিয়েছে, পূর্ব বাংলার লোক কোনোদিন তা ভুলতে পারবে না। বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য যে ত্যাগ স্বীকার আপনারা করেছেন এদেশের মানুষ চিরজীবন তা ভুলতে পারবে না। আপনারাই এদেশে বিরোধী দল সৃষ্টি করেছেন। শক্তিশালী বিরোধী দল না থাকলে গণতন্ত্র চলতে পারে না।" এটাই ছিল বক্তৃতার সারাংশ। একটা লিখিত ভাষণ আমি দিয়েছিলাম, আমার কাছে তার কপি নাই। নির্বাচন হয়েছিল, দবিরুল ইসলাম তখন জেলে ছিল। তাকে সভাপতি ও খালেক নেওয়াজ খানকে সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছিল। দবিরুল সম্বন্ধে কারও আপত্তি ছিল না, তবে খালেক নেওয়াজ খান সম্বন্ধে অনেকের আপত্তি

ছিল। কারণ সে কথা একটু বেশি বলত। শেষ পর্যন্ত আমি সকলকে বুঝিয়ে রাজি করলাম। আমার বিদায়ের সময়ের অনুরোধ কেউই ফেলল না। আমি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি, আমার মনোনীত প্রার্থী খালেক নেওয়াজ প্রতিষ্ঠানের মঙ্গলের চেয়ে অমঙ্গলই বেশি করেছিল। সে চেষ্টা করত সত্য, কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষমতা তার ছিল না। আর অন্যের কথা শুনত, নিজে ভাল কি মন্দ বিবেচনা করত না, বা করার ক্ষমতা ছিল না। একমাত্র ঢাকা সিটি ছাত্রলীগের সম্পাদক আবদুল ওয়াদুদের জন্য প্রতিষ্ঠানের সমূহ ক্ষতি হতে পারে নাই। পরে ওয়াদুদ পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সম্পাদক হয়েছিল। যদিও আমি সদস্য ছিলাম না, তবু ছাত্রনেতারা আমার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেছেন। প্রয়োজন মত বুদ্ধি পরামর্শ দিতে কার্পণ্য করি নাই। এরাই আমাকে ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে শ্রদ্ধা করেছে।

শামসুল হক সাহেব অনেক পরিশ্রম করে একটা ড্রাফট ম্যানিফেস্টো ও গঠনতন্ত্রের খসড়া করেছেন। আমাদের নিয়ে তিনি অনেক আলোচনা করেছিলেন। আমরা একমত হয়ে ওয়ার্কিং কমিটির সভায় ম্যানিফেস্টো ও গঠনতন্ত্র নিয়ে আলোচনা শুরু করলাম। কয়েকদিন পর্যন্ত সভা হল। দুই একবার শামসুল হক সাহেবের সাথে ভাসানী সাহেবের একটু গরম গরম আলোচনা হয়েছিল। একদিন শামসুল হক সাহেব ক্ষেপে গিয়ে মওলানা সাহেবকে বলে বসলেন, "এ সমস্ত আপনি বুঝবেন না। কারণ, এ সমস্ত জানতে হলে অনেক শিক্ষার প্রয়োজন, তা আপনার নাই।" মওলানা সাহেব ক্ষেপে মিটিং স্থান ত্যাগ করলেন। আমি শামসুল হক সাহেবকে বুঝিয়ে বললে তিনি বুঝতে পারলেন, কথাটা সত্য হলেও বলা উচিত হয় নাই। ফলে হক সাহেব নিজে গিয়ে মওলানা সাহেবকে অনুরোধ করে নিয়ে আসলেন। শামসুল হক সাহেবের রাগ বেশি সময় থাকত না।

মওলানা ভাসানী সাহেবকে ভার দেওয়া হয়েছিল ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের নমিনেশন দিতে। তিনি যে সমস্ত লোককে নমিনেশন দিয়েছিলেন তা আমার মোটেই পছন্দ ছিল না। তাঁকে আমি বললাম, "আপনি এ সমস্ত লোক কোথায় পেলেন, আর ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য করলেন; এরা তো সুযোগ পেলেই চলে যাবে।" মওলানা সাহেব বললেন, "আমি কি করব? কাউকেই তো ভাল করে জানিও না, চিনিও না। তোমার ছাত্ররা যাদের নাম দিয়েছে, তাদেরই আমি সদস্য করেছি।" আমি বললাম, "দেখবেন বিপদের সময় এরা কি করে!" ওয়ার্কিং কমিটি ড্রাফট ম্যানিফেস্টো গ্রহণ করল এবং কাউন্সিল সভা ডেকে একে অনুমোদন করা হবে ঠিক হল। ড্রাফট ম্যানিফেস্টো ছাপিয়ে দেওয়া হবে, কারও কোন প্রস্তাব থাকলে তাও পেশ করা হবে। জনমত যাচাই করার জন্য আমরা ড্রাফট রাখলাম। তাতে পূর্ব পাকিস্তানকে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দিবার প্রস্তাব করা হল। কেবলমাত্র দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি ও মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকবে। বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করতে হবে এ কথাও বলা হল। আরও অনেক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রোগ্রাম নেওয়া হয়েছিল।

আমরা প্রতিষ্ঠানের কাজে আত্মনিয়োগ করলাম। মওলানা সাহেব, শামসুল হক সাহেব ও আমি ময়মনসিংহ জেলার জামালপুর মহকুমায় প্রথম সভা করতে যাই। জামালপুরের উকিল হায়দার আলী মল্লিক সাহেব আওয়ামী লীগ গঠন করেছেন। ছাত্রনেতা হাতেম

আলী তালুকদার যথেষ্ট পরিশ্রম করেছিল এই সভা কামিয়াব করার জন্য। আমরা যখন সভায় উপস্থিত হলাম তখন বিরাট জনসমাগম হয়েছে দেখতে পারলাম। যখনই সভা আরম্ভ হবে, দশ-পনেরজন লোককে চিৎকার করতে দেখলাম। আমরা ওদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সভা আরম্ভ করলাম। জামালপুরের নেতারা ঠিক করেছিল শামসুল হক সাহেব সভাপতিত্ব করবেন আর মওলানা সাহেব প্রধান বক্তা হবেন। সভা আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথেই ১৪৪ ধারা জারি করা হল। পুলিশ এসে মওলানা সাহেবকে একটা কাগজ দিল। আমি বললাম, "মানি না ১৪৪ ধারা, আমি বক্তৃতা করব।" মওলানা সাহেব দাঁড়িয়ে বললেন, "১৪৪ ধারা জারি হয়েছে। আমাদের সভা করতে দেবে না। আমি বক্তৃতা করতে চাই না, তবে আসুন আপনারা মোনাজাত করুন, আল্লাহু আমিন।" মওলানা সাহেব মোনাজাত শুরু করলেন। মাইক্রোফোন সামনেই আছে। আধ ঘণ্টা পর্যন্ত চিৎকার করে মোনাজাত করলেন, কিছুই বাকি রাখলেন না, যা বলার সবই বলে ফেললেন। পুলিশ অফিসার ও সেপাইরা হাত তুলে মোনাজাত করতে লাগল। আধা ঘণ্টা মোনাজাতে পুরা বক্তৃতা করে মওলানা সাহেব সভা শেষ করলেন। পুলিশ ও মুসলিম লীগ ওয়ালারা বেয়াকুফ হয়ে গেল।

রাতে এক বাড়িতে খেতে গেলেন মওলানা সাহেব। রাগ, খাবেন না। তিনি থাকতে কেন শামসুল হক সাহেবের নাম প্রস্তাব করা হল সভাপতিত্ব করার জন্য। এক মহাবিপদে পড়ে গেলাম। মওলানা সাহেবকে আমি বুঝাতে চেষ্টা করলাম, লোকে কি বলবে? তিনি কি আর বুঝতে চান? তাঁকে নাকি অপমান করা হয়েছে! শামসুল হক সাহেবও রাগ হয়ে বলেছেন, মওলানা সাহেব সকলের সামনে একথা বলছেন কেন? এই দিন আমি বুঝতে পারলাম মওলানা ভাসানীর উদারতার অভাব, তবুও তাঁকে আমি শ্রদ্ধা ও ভক্তি করতাম। কারণ, তিনি জনগণের জন্য ত্যাগ করতে প্রস্তুত। যে কোন মহৎ কাজ করতে হলে ত্যাগ ও সাধনার প্রয়োজন। যারা ত্যাগ করতে প্রস্তুত নয় তারা জীবনে কোন ভাল কাজ করতে পারে নাই— এ বিশ্বাস আমার ছিল। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, এদেশে রাজনীতি করতে হলে ত্যাগের প্রয়োজন আছে এবং ত্যাগ আমাদের করতে হবে পাকিস্তানের জনগণকে সুখী করতে হলে। মুসলিম লীগ সরকার নির্যাতন চালাবে এবং নির্যাতন ও জুলুম করেই ক্ষমতায় থাকতে চেষ্টা করবে। নির্যাতনের ভয় পেলে বেশি নির্যাতন ভোগ করতে হয়। এখনও মুসলিম লীগের নামে মানুষকে ধোঁকা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে কিছুটা; কিন্তু বেশি দিন ধোঁকা দেওয়া চলবে না। মুসলিম লীগের নামের যে মোহ এখনও আছে, জনগণকে বুঝাতে পারলে এবং শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তুলতে পারলে মুসলিম লীগ সরকার অত্যাচার করতে সাহস পাবে না।



আমরা ঢাকায় ফিরে এলাম এবং আরমানিটোলা ময়দানে এক জনসভা ডাকলাম। কারণ তখন খাদ্য পরিস্থিতি খুবই খারাপ। লোকের দুরবস্থার সীমা নাই। মওলানা সাহেব সভাপতিত্ব করলেন। আতাউর রহমান খান, শামসুল হক সাহেব ও আমি বক্তৃতা করলাম।

মুসলিম লীগ চেষ্টা করেছিল গোলমাল সৃষ্টি করতে। বাদশা মিয়া আমাদের দলে চলে আসায় এবং জনগণের সমর্থন থাকায় তারা সাহস পেল না। এতবড় সভা এর পূর্বে আর হয় নাই। বিরাট জনসমাগম হয়েছে। জনসাধারণ ও ঢাকার লোকের ভুল ভাঙতে শুরু করেছে। আর আমরা যারা বক্তৃতা করলাম সকলেই পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলাম। আমাদের 'রাষ্ট্রের দুশমন' বললে জনগণ মানতে রাজি ছিল না। কারণ আমরাই প্রথম কাতারের কর্মী ছিলাম।

মওলানা ভাসানী এই সভায় ঘোষণা করলেন, "জনাব লিয়াকত আলী খান ঢাকায় আসছেন অক্টোবর মাসে, আমরা তাঁর সাথে খাদ্য সমস্যা ও রাজবন্দিদের মুক্তির ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে চাই। যদি তিনি দেখা না করেন আমাদের সাথে, তাহলে আমরা আবার সভা করব এবং শোভাযাত্রা করে তাঁর কাছে যাব।" কয়েকদিন পরেই আমরা কাগজে দেখলাম, লিয়াকত আলী খান ১১ই অক্টোবর ঢাকায় আসবেন। মওলানা সাহেব আমাকে টেলিগ্রাম করতে বললেন, যাতে তিনি ঢাকায় এসে আমাদের একটা ডেপুটেশনের সাথে সাক্ষাৎ করেন। মওলানা সাহেবের নামেই টেলিগ্রামটা পাঠানো হয়েছিল। জনাব শামসুল হক সাহেব একটু ব্যস্ত ছিলেন, কারণ তাঁর বিবাহের দিন ঘনিয়ে এসেছে। আমাকেই পার্টির সমস্ত কাজ দেখতে হত। যদিও তাঁর সাথে পরামর্শ করেই করতাম। তিনি আমাকে বললেন, "প্রতিষ্ঠানের কাজ তুমি চালিয়ে যাও।" আমাদের মধ্যে এত মিল ছিল যে কোন ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনাই ছিল না। আমি বুঝতে পারতাম মওলানা সাহেব, হক সাহেবকে অপছন্দ করতে শুরু করেছেন। সুযোগ পেলেই তাঁর বিরুদ্ধে বলতেন। আমি চেষ্টা করতাম, যাতে ভুল বোঝাবুঝি না হয়। যদিও মওলানা সাহেব প্রকাশ্যে কিছু বলতে সাহস পেতেন না। এই সময় একজনের অবদান অস্বীকার করলে অন্যায় করা হবে। বেগম আনোয়ারা খাতুন এমএলএ প্রতিষ্ঠানের জন্য যথেষ্ট কাজ করতেন। দরকার হলে টাকা পয়সা দিয়েও সাহায্য করতেন। আতাউর রহমান সাহেবকে ডাকলেই পাওয়া যেত। তিনি পূর্বে রাজনীতি করেন নাই এবং রাজনৈতিক জ্ঞানও তত ছিল না। লেখাপড়া জানতেন, কাজ করার আগ্রহ এবং আন্তরিকতা ছিল। আমার সাথে তাঁর একটা সম্বন্ধ গড়ে উঠতে লাগল। জেলায় জেলায় সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সমর্থকরা আওয়ামী লীগে যোগদান করতে শুরু করল। এই সময় কলকাতায় *ইত্তেহাদ* কাগজ বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। সোহরাওয়ার্দী সাহেব কলকাতা ত্যাগ করে করাচি চলে গিয়েছেন। মানিক ভাই ঢাকা এসে পৌঁছেছেন প্রায় নিঃস্ব অবস্থায়। তিনিও এসে মোগলটুলীতে উঠেছেন। সোহরাওয়ার্দী সাহেব সামান্য কিছু কাপড় ছাড়া আর কিছু নিয়ে আসতে পারেন নাই। ভারত সরকার তাঁর সর্বস্ব ক্রোক করে রেখেছে। অনেকে শুনে আশ্চর্য হবেন, শহীদ সাহেবের কলকাতায় নিজের বাড়ি ছিল না। ৪০ নম্বর থিয়েটার রোডের বাড়ি, ভাড়া করা বাড়ি। তিনি করাচিতে তাঁর ভাইয়ের কাছে উঠলেন, কারণ তাঁর খাবার পয়সাও ছিল না।

ঢাকার পুরানা নেতাদের মধ্যে কামরুদ্দিন সাহেব যোগদান করেন নাই পার্টিতে। তবে আবদুল কাদের সর্দার আমাদের অর্থ দিয়েও সাহায্য করছিলেন। তাঁর অর্থবল ও জনবল

দুইই ছিল। ঢাকার খাজা বংশের সাথে জীবনভর মোকাবেলা করেছেন। গরিবদের সাহায্য করতেন, তাই জনসাধারণ তাঁকে ভালবাসত। আমরা এখনও জেলা কমিটিগুলি গঠন করতে পারি নাই। তবে দু'একটা জেলায় কমিটি হয়েছিল। চট্টগ্রামে এম. এ. আজিজ ও জহুর আহমদ চৌধুরীর নেতৃত্বে এবং যশোরে খড়কীর পীর সাহেব ও হাবিবুর রহমান এডভোকেটের নেতৃত্বে। মশিয়ুর রহমান সাহেব ও খালেক সাহেব সাহায্য করেছিলেন, কিন্তু প্রকাশ্যে তখনও যোগদান করেন নাই। ফরিদপুরে সালাম খান সাহেবের নেতৃত্বে অর্গানাইজিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। ১৯৪৯ সালের ভিতরেই আমরা সমস্ত জেলায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলব ঠিক করেছি। ছুটি থাকলেই আমরা সমস্ত জেলায় বের হব। সাড়া যা পাচ্ছি তাতে আমাদের মধ্যে একটা নতুন মনোবলের সৃষ্টি হয়েছিল।

নবাবজাদা লিয়াকত আলী খান মওলানা সাহেবের টেলিগ্রামের উত্তর দেওয়ারও দরকার মনে করলেন না। আমরা জানতে পারলাম তিনি ১১ই অক্টোবর ঢাকায় আসবেন। তিনি প্রেস রিপোর্টারদের কাছে বললেন, "আওয়ামী লীগ কি তিনি জানেন না।"

আমরা ১১ই অক্টোবর আরমানিটোলা ময়দানে সভা আহ্বান করলাম। আমাদের একটা মাইক্রোফোন ছিল, যখন আমাদের কর্মীরা সভার প্রচার করছিল ঘোড়ার গাড়ি করে নবাবপুর রাস্তায়, তখন বেলা তিনটা কি চারটা হবে, একদল মুসলিম লীগ কর্মী—গুণ্ডাও বলতে পারা যায়, আমাদের কর্মীদের মেরে মাইক্রোফোনটা কেড়ে নিয়ে যায়। একটা ঘোড়ার গাড়িতে মাত্র তিনজন কর্মী ছিল। কোন আইনশৃঙ্খলা দেশে নাই বলে মনে হচ্ছিল। কর্মীরা এসে আমাকে খবর দিল মোগলটুলী আওয়ামী লীগ অফিসে। আমি আট-দশজন কর্মী নিয়ে আলোচনা করছিলাম। আমাদের কর্মীরা কয়েকজনের মুখ চিনতে পেরেছে, কারণ পূর্বে একসাথেই কাজ করেছে। আমি বললাম "এ তো বড় অন্যায়। চল, আমি এদের কাছে জিজ্ঞাসা করে আসি আর অনুরোধ করি মাইক্রোফোনটা ফেরত দিতে। যদি দেয় ভাল, না দেয় কি করা যাবে! থানায় একটা এজাহার করে রাখা যাবে।" আমার সাথে ছাত্রলীগের নূরুল ইসলাম (পরে *ইত্তেফাকে* কাজ করত), আর চকবাজারের নাজির মিয়া এবং আবদুল হালিম (এখন ন্যাপের যুগ্ম সম্পাদক। তখন সিটি আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক ছিল) আমরা ভিক্টোরিয়া পার্কের কাছে ওদের অফিসে রওয়ানা হলাম। কারণ, আমি খবর নিলাম ওরা ওখানেই আছে। কো-অপারেটিভ ব্যাংকের উপর তলায়ই তারা ওঠাবসা করে। আমি সেখানে পৌঁছে দেখলাম, ওদের কয়েকজন দাঁড়িয়ে আলাপ করছে। আমি ইব্রাহিম ও আলাউদ্দিনকে চিনতাম, তারাও মুসলিম লীগের কর্মী ছিল আমাদের সাথে। বললাম, "আমাদের মাইক্রোফোনটা নিয়েছ কেন? এ তো বড় অন্যায় কথা! মাইক্রোফোনটা দিয়ে দাও।" আমাকে বলল, "আমরা নেই নাই, কে নিয়েছে জানি না"। নূরুল ইসলামের কাছ থেকেই কেড়ে নেবার সময় এরা উপস্থিত ছিল। নূরুল ইসলাম বলল, "আপনি তো দাঁড়ান ছিলেন, তখন কথা কাটাকাটি চলছিল।"

এই সময় ইয়ার মোহাম্মদ খান, হাফিজুদ্দিন নামে আরেকজন আওয়ামী লীগ কর্মীকে নিয়ে রিকশায় যাচ্ছিলেন। আমি ইয়ার মোহাম্মদ সাহেবকে ডাক দিলাম এবং বললাম ঘটনাটা।

ইয়ার মোহাম্মদ খান সাহেব ঢাকার পুরানা লোক। বংশমর্যাদা, অর্থ বল, লোকবল সকল কিছুই তাঁর আছে। তিনি বললেন, "কেন তোমরা মাইক্রোফোনটা কেড়ে নিয়েছ, এটা কি মগের মুল্লুক"। এর মধ্যে একজন বলে বসল, "নিয়েছি তো কি হয়েছে?" ইয়ার মোহাম্মদ হাত উঠিয়ে ওর মুখে এক চড় মেরে দিলেন। হালিমও এক ঘুষি মেরে দিল। পিছনে ওদের অনেক লোক লুকিয়ে ছিল, তারা আমাদের আক্রমণ করল। হালিম ওদের কাছ থেকে ছুটে ওর মহল্লার দিকে দৌড় দিল লোক আনতে। প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরীর মালিক হুমায়ুন সাহেব বের হয়ে ইয়ার মোহাম্মদ খানকে তাঁর লাইব্রেরীর ভিতরে নিয়ে গেলেন। এরা বাইরে বসে গালাগালি শুরু করল। আমিও রিকশা নিয়ে ছুটলাম আওয়ামী লীগ অফিসে, সেখানেও আমাদের দশ-বারজন কর্মী আছে। ওরা ঠিক পায় নাই—আমি যখন চলে আসি, না হলে আমাকেও আক্রমণ করত। হাফিজুদ্দিন রিকশা নিয়ে ইয়ার মোহাম্মদ খান সাহেবের মহল্লায় খবর দিল। সাথে সাথে তার ভাই, আত্মীয়স্বজন মহল্লার লোক যে যে অবস্থায় ছিল এসে হাজির হল। ভিক্টোরিয়া পার্কে হালিমও তার মহল্লা থেকে লোক নিয়ে হাজির হল। যারা এতক্ষণ ইয়ার মোহাম্মদ খানকে গালাগালি করছিল কে কোথা দিয়ে পালাল খুঁজে পাওয়া গেল না।

খাজা বাড়ির অনেক লোক এদের সাথে ছিল। একজন মন্ত্রীও উপরের তলায় বসে সব কিছু দেখছিলেন, তাঁর দলের কীর্তিকলাপ। আমি এসে দেখলাম, পুলিশ এসে গেছে। ইয়ার মোহাম্মদকে নিয়ে এরা শোভাযাত্রা করে মহল্লায় যেয়ে মুসলিম লীগ অফিস আক্রমণ করল। কারণ লীগ অফিস রায় সাহেবের বাজারেই ছিল। কয়েকজন গুণ্ডা প্রকৃতির লোক এই মহল্লায় ছিল। গুণ্ডামি করত, ছাত্রদের মারত টাকা খেয়ে। তাদের ধরে নিয়ে মহল্লায় বিচার বসল। ঢাকার মহল্লার বিচার ছিল, মসজিদে নিয়ে হাজির করত এবং বিচারে দোষী সাব্যস্ত হলে মারা হত—এদিই হল এদের কোর্টকাচারী। রায় সাহেবের বাজার দিয়ে কোন ছাত্র শোভাযাত্রা বা আমাদের কর্মীদের দেখলে আক্রমণ এবং মারপিট করা হত। অনেক কর্মী ও ছাত্রকে মার খেতে হয়েছে। এই দিনের পর থেকে আর কোনোদিন এই এলাকায় কেউ আমাদের মারপিট করতে সাহস পায় নাই।



ইয়ার মোহাম্মদ খানও এর পর থেকে সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে শুরু করলেন। তাতে আমাদের শক্তিও ঢাকা শহরে বেড়ে গেল। আমিও মহল্লায় মহল্লায় ঘুরে একদল যুবক কর্মী সৃষ্টি করলাম। এই সময় সমসাবাদ ও বংশালের একদল যুবক কর্মী আওয়ামী লীগে যোগদান করল। সমসাবাদও আরমানিটোলা ময়দানের পাশেই ছিল। আরমানিটোলার সভার বন্দোবস্ত এখন এরাই করতে শুরু করে। ফলে মুসলিম লীগ শত চেষ্টা করেও আর গোলমাল সৃষ্টি করতে পারছিল না আমাদের সভায়।

১১ই অক্টোবর আরমানিটোলায় বিরাট সভা হল। সমস্ত ময়দান ও আশপাশের রাস্তা লোকে ভরে গেল। শামসুল হক সাহেব বক্তৃতা করার পর আমি বক্তৃতা করলাম। মওলানা পূর্বেই বক্তৃতা করেছেন। আমি শেষ বক্তা। সভায় গোলমাল হবার ভয় ছিল বলে ভাসানী সাহেব প্রথমে বক্তৃতা করেছেন। ভাসানী সাহেব আমাকে বললেন, শোভাযাত্রা করতে হবে সেইভাবে বক্তৃতা কর। আমি বক্তৃতা করতে উঠে যা বলার বলে জনগণকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলাম, "যদি কোন লোককে কেউ হত্যা করে, তার বিচার কি হবে?" জনগণ উত্তর দিল, "ফাঁসি হবে।" আমি আবার প্রশ্ন করলাম, "যারা হাজার হাজার লোকের মৃত্যুর কারণ, তাদের কি হবে?" জনগণ উত্তর দিল, "তাদেরও ফাঁসি হওয়া উচিত।" আমি বললাম, "না, তাদের গুলি করে হত্যা করা উচিত।" কথাগুলি আজও আমার পরিষ্কার মনে আছে। তারপর বক্তৃতা শেষ করে বললাম, "চলুন আমরা মিছিল করি এবং লিয়াকত আলী খান দেখুক পূর্ব বাংলার লোক কি চায়!"

শোভাযাত্রা বের হল। মওলানা সাহেব, হক সাহেব ও আমি সামনে চলেছি। যখন নবাবপুর রেলক্রসিংয়ে উপস্থিত হলাম, তখন দেখলাম পুলিশ রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে বন্দুক উঁচা করে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা আইন ভাঙবার কোনো প্রোগ্রাম করি নাই। আর পুলিশের সাথে গোলমাল করারও আমাদের ইচ্ছা নাই। আমরা রেল স্টেশনের দিকে মোড় নিলাম শোভাযাত্রা নিয়ে। আমাদের প্ল্যান হল নাজিরাবাজার রেললাইন পার হয়ে নিমতলিতে ঢাকা মিউজিয়ামের পাশ দিয়ে নাজিমুদ্দীন রোড হয়ে আবার আরমানিটোলা ফিরে আসব। নাজিরাবাজারে এসেও দেখি পুলিশ রাস্তা আটক করেছে, আমাদের যেতে দেবে না। তখন নামাজের সময় হয়ে গেছে। মওলানা সাহেব রাস্তার উপরই নামাজে দাঁড়িয়ে পড়লেন। শামসুল হক সাহেবও সাথে সাথে দাঁড়ালেন। এর মধ্যেই পুলিশ টিয়ার গ্যাস ছেড়ে দিল। আর জনসাধারণও ইট ছুঁড়তে শুরু করল। প্রায় পাঁচ মিনিট এইভাবে চলল। পুলিশ লাঠিচার্জ করতে করতে এগিয়ে আসছে। একদল কর্মী মওলানা সাহেবকে কোলে করে নিয়ে এক হোটেলের ভিতরে রাখল। কয়েকজন কর্মী ভীষণভাবে আহত হল এবং গ্রেফতার হল। শামসুল হক সাহেবকেও গ্রেফতার করল। আমার উপরও অনেক আঘাত পড়ল। একসময় প্রায় বেহুঁশ হয়ে একপাশের নর্দমায় পড়ে গেলাম। কাজী গোলাম মাহাবুবও আহত হয়েছিল, তবে ওর হুঁশ ছিল। আমাকে কয়েকজন লোক ধরে রিকশায় উঠিয়ে মোগলটুলী নিয়ে আসল। আমার পা দিয়ে খুব রক্ত পড়ছিল। কেউ বলে, গুলি লেগেছে, কেউ বলে গ্যাসের ডাইরেক্ট আঘাত, কেউ বলে কেটে গেছে পড়ে যেয়ে। ডাক্তার এল, ক্ষতস্থান পরিষ্কার করল। ইনজেকশন দিয়ে আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিল, কারণ বেদনায় খুব কষ্ট পাচ্ছিলাম। প্রায় ত্রিশজন লোক গ্রেফতার হয়েছিল। চট্টগ্রামের ফজলুল হক বিএসসি, আবদুর রব ও রসুল নামে আরেকজন কর্মী মাথায় খুব আঘাত পেয়েছিল। তারাও গ্রেফতার হয়ে গিয়েছিল। আমার আত্মীয়, ফরিদপুরের দত্তপাড়ার জমিদার বংশের সাইফুদ্দিন চৌধুরী ওরফে সূর্য মিয়া আমার কাছেই ছিল এবং আমাকে খুব সেবা করল। সে রাত দুইটা পর্যন্ত জেগে ছিল। এমন সময় মোগলটুলীর আমাদের অফিস, যেখানে আমি আছি, পুলিশ

ঘিরে ফেলল এবং দরজা খুলতে বলছিল। লোহার দরজা, ভিতরে তালা—খোলা ও ভাঙা এত সহজ ছিল না। সাইফুদ্দিন চৌধুরী আমাকে, কাজী গোলাম মাহাবুব ও মফিজকে ডেকে উঠাল এবং বলল, "পুলিশ এসেছে তোমাদের গ্রেফতার করতে।"

আমি যখন ঘুমিয়ে ছিলাম, ইনজেকশন নিয়ে, তখন ভাসানী সাহেব খবর দিয়েছিলেন, আমি যেন গ্রেফতার না হই। আমার শরীরে ভীষণ বেদনা, জ্বর উঠেছে, নড়তে পারছি না। কি করি, তবুও উঠতে হল এবং কি করে ভাগব তাই ভাবছিলাম। শওকত মিয়া আগেই সরে গেছে। রাস্তাঘাট তারই জানা। তিনতলায় আমরা থাকি, পাশেই একটা দোতলা বাড়ি ছিল। তিনতলা থেকে দোতলায় লাফিয়ে পড়তে হবে। দুই দালানের ভিতরে ফারাকও আছে। নিচে পড়লে শেষ হয়ে যাব। তবুও লাফ দিয়ে পড়লাম। কাজী গোলাম মাহাবুব ও মফিজও আমাকে অনুসরণ করল। সাইফুদ্দিন রাজনীতি করে না, তাকে কেউ চিনে না। সে একলাই থাকল। আমরা যখন ছাদ থেকে নামছি তখন পাশের বাড়ির সিঁড়ির উপর একটা বালতি ছিল। পায়ে লেগে সেটা নিচে পড়ে গেল। আর বাড়িওয়ালা চিৎকার করে উঠল। আমরা চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়লাম। পুলিশ দরজা ভাঙতে ব্যস্ত, এদিকে নজর নাই। আমরা বস্তি পার হয়ে বড় রাস্তায় পড়ব এমন সময় পুলিশও দরজা ভেঙে ঢুকে পড়েছে। আমাদের মৌলভীবাজারের ভিতর ঢুকতে হবে। তিনজন পুলিশ এই রাস্তা পাহারা দিচ্ছিল। একবার তিনজন হেঁটে এপাশে আসে, আবার অন্যদিকে যায়। আমরা যখন দেখলাম, তিনজন হেঁটে সামনে অগ্রসর হচ্ছে তখন পিছন থেকে রাস্তা পার হয়ে গেলাম। ওরা বুঝতে পারল না। মৌলভীবাজার পার হয়ে আমরা এগিয়ে এসে এক বন্ধুর বাড়িতে আশ্রয় নিলাম। রাতটা সেখানেই কাটালাম। ভোরে ওদের দুইজনকে বিদায় দিলাম। কারণ, ওদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা নাই। সামনে পেলে গ্রেফতার করতে পারে। আমি আবদুল মালেক সর্দারের মাহুতটুলির বাড়িতে রইলাম। সেখান থেকে আমি পরের দিন সকালে ক্যাপ্টেন শাহজাহানের বাড়িতে উপস্থিত হলাম। তার স্ত্রী বেগম নূরজাহান আমাকে ভাইয়ের মত স্নেহ করতেন। তিনি রাজনীতি করতেন না। আমি আহত ও অসুস্থ, কোথায় যাই—আর কেইবা জায়গা দেয় তখন ঢাকায়! ভদ্রমহিলা আমার যথেষ্ট সেবা করলেন, ডাক্তারের কাছ থেকে ঔষধ আনালেন।

দুই দিন ওখানে ছিলাম। আইবির লোকেরা সন্দেহ করল, আমি এ বাড়িতে থাকতে পারি, কারণ প্রায়ই আমি এ বাড়িতে বেড়াতে আসতাম। দুইজন আইবি অফিসার এদের এখানে এসেছে রাত আটটায়। ঠিক এই সময় একজন কর্মী সেখানে উপস্থিত হয়ে বেগম নূরজাহানকে জিজ্ঞাসা করতে যাবে আমি কোথায়—আইবি অফিসারদের দেখে তার মুখের ভাব এমন হয়ে গেল যে, তাদের আর বুঝতে বাকি রইল না, আমি কোথায় আছি! আমি কিন্তু পাশের ঘরেই শুয়ে আছি আর এদের আলাপ শুনছি। বেগম নূরজাহান খুবই চালাক ও বিচক্ষণ। তিনি ওদের চা খেতে দিয়ে আমাকে ডেকে দোতলা থেকে নিচে নিয়ে গেলেন এবং বললেন অবস্থাটা। আমি বললাম, "একটা চাদর দেন।" কারণ, আমার একটা পাঞ্জাবি ও লুঙ্গি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ভাগ্য ভাল, ভদ্রমহিলা নিজেই দিনে এই দুইটাকে ধুয়ে

দিয়েছিলেন। চাদর এনে আমাকে নিয়ে রাস্তা দেখিয়ে দিলেন। আমি বেরিয়ে আসলাম, আইবিরা তখনও বাড়িতেই বসে আছে। এই অফিসারদের দুইজন গার্ডও বাইরে পাহারা দিচ্ছিল, আমি বুঝতে পারলাম। তাদের চোখকেও আমার ফাঁকি দিতে হল।

তখন মওলানা ভাসানী ইয়ার মোহাম্মদ খানের বাড়িতে থাকতেন। তাঁর সাথে আমার দেখা করা দরকার; কারণ তাঁকে এখনও গ্রেফতার করা হয় নাই। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা দরকার, তিনি কেন আমাকে গ্রেফতার হতে নিষেধ করেছেন? আমি পালিয়ে থাকার রাজনীতিতে বিশ্বাস করি না। কারণ, আমি গোপন রাজনীতি পছন্দ করি না, আর বিশ্বাসও করি না। রিকশা করে এক সহকর্মীর বাড়িতে যেয়ে তাঁকে সাথে নিলাম এবং ইয়ার মোহাম্মদের বাড়ির উদ্দেশে রওয়ানা করলাম। পিছন দিক থেকে ঢুকবার একটা রাস্তা আছে, সেই রাস্তায় ছদ্মবেশে বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়লাম। পাহারায় থাকা গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরা আমাকে চিনতে পারল না। মওলানা সাহেব ও ইয়ার মোহাম্মদ আমাকে দেখে খুব খুশি হন। আমি অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছি। মওলানা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি ব্যাপার, কেন পালিয়ে বেড়াব?"

নবাবজাদা লিয়াকত আলী খান লীগ সভায় ঘোষণা করলেন, "যো আওয়ামী লীগ করেগা, উসকো শের হাম কুচাল দে গা।" তিনি যদিও বলতেন, গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন, কিন্তু কোনো বিরুদ্ধ দল সৃষ্টি হোক তা তিনি চাইতেন না। তাঁর সরকারের নীতির কোন সমালোচনা কেউ করে তাও তিনি পছন্দ করতেন না। নিজের দলের মধ্যে কেউ বিরুদ্ধাচরণ করলে তাকেও বিপদে ফেলতে চেষ্টা করেছেন, যেমন নবাব মামদোত। পশ্চিম পাঞ্জাব সরকারেব প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মামদোত। জিন্নাহর বিশ্বস্ত একজন ভক্ত ছিলেন। জিন্নাহর হুকুমে নবাবি ছেড়ে দিয়ে তিনি বিরাট সম্পত্তি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। লিয়াকত আলী খান যে মুসলিম লীগ ছাড়া অন্য কোন বিরোধী দল সৃষ্টি হোক চান না, তার প্রমাণ পরে তাঁর বক্তৃতার মধ্য থেকে ফুটে উঠেছিল। ১৯৫০ সালে মুসলিম লীগ কাউন্সিল সভায় তিনি ঘোষণা করেছিলেন:

> I have always said, rather it has always been my firm belief, that the existence of the league not only the existence of the league, but its strength is equal to the existence and strength of Pakistan. So far, as I am concerned, I had decided in the very beginning, and I reaffirm it today, that I have always considered myself as the Prime Minister of the League. I never regarded myself as the Prime Minister chosen by the members of the Constituent Assembly.

তিনি জনগণের প্রধানমন্ত্রী হতে চান নাই, একটা দলের প্রধানমন্ত্রী হতে চেয়েছেন। রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক দল যে এক হতে পারে না, একথাও তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অনেকগুলি রাজনৈতিক দল থাকতে পারে এবং আইনে এটা থাকাই স্বাভাবিক। দুঃখের বিষয়, লিয়াকত আলী খানের উদ্দেশ্য ছিল যাতে অন্য কোনো রাজনৈতিক দল

পাকিস্তানে সৃষ্টি হতে না পারে। "যো আওয়ামী লীগ করেগা উসকো শের কুচাল দে গা"— একথা একমাত্র ডিকটেটর ছাড়া কোনো গণতন্ত্রে বিশ্বাসী লোক বলতে পারে না। জিন্নাহর মৃত্যুর পরে সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে তিনি ধরাকে সরা জ্ঞান করতে শুরু করেছিলেন।

মওলানা সাহেব আমাকে বললেন, "তুমি লাহোর যাও, কারণ সোহরাওয়ার্দী সাহেব লাহোরে আছেন। তাঁর এবং মিয়া ইফতিখারউদ্দিনের সাথে সাক্ষাৎ কর। তাঁদের বল পূর্ব বাংলার অবস্থা। একটা নিখিল পাকিস্তান পার্টি হওয়া দরকার। পীর মানকী শরীফের সাথে আলোচনা করে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগকে সারা পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে পারলে ভাল হয়। সোহরাওয়ার্দী সাহেব ছাড়া আর কেউ এর নেতৃত্ব দিতে পারবেন না।"

করাচি থেকে লিয়াকত আলী খান সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে অকথ্য ভাষায় গাল দিয়ে বলেছেন, "ভারত কুকুর লেলিয়ে দিয়েছে।" অথচ জিন্নাহ সাহেব সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে একদিনের জন্যেও মন্দ বলেন নাই। একেই বলে অদৃষ্টের পরিহাস! লিয়াকত আলী খানকে নির্বাচনে পাস করাতে সমগ্র আলিগড়ে মুসলিম ছাত্রদের নামতে হয়েছিল। রফি আহমেদ কিদোয়াই প্রায়ই তাঁকে পরাজিত করে দিয়েছিলেন, যদি মুসলিম ছাত্ররা আলিগড় থেকে না যেত। জিন্নাহর ছায়ায় বসে দিল্লি থেকে বিবৃতি দেওয়া ছাড়া তিনি কি যে করেছেন পাকিস্তান আন্দোলনে, আমার জানা নাই। সোহরাওয়ার্দী সাহেব বাংলার প্রধানমন্ত্রী না হলে আর মুসলিম লীগ গড়ে না তুললে কি যে হত তা বলা কষ্টকর। জিন্নাহ সাহেব সেটা জানতেন, তাই তিনি কিছুই বলেন নাই।

সোহরাওয়ার্দী সাহেব লাহোরে নবাব মামদোতের মামলা নিয়েছেন।[১৯] এটাও লিয়াকত আলী সাহেবের কীর্তি! নবাব মামদোতকে বিপদে ফেলার জন্য আর একজনকে সাহায্য করা। কারণ নবাব মামদোত একটু কমই গ্রাহ্য করতেন লিয়াকত আলী খানকে। আমি ভাসানী সাহেবকে বললাম, "কি ভাবে যাব? ভারতবর্ষ হয়ে যেতে হবে। আমি যে পাকিস্তানী, তার প্রমাণ লাগবে, তাহলেই পশ্চিম পাকিস্তানে ঢুকতে দিবে। তখনও পাসপোর্ট ভিসা চালু হয় নাই। গরম কাপড়ও বাড়িতে রয়েছে। টাকা পয়সাও হাতে নাই। ওদিকে আবার পূর্ব পাঞ্জাবে মুসলমান পেলেই হত্যা করে। কি করে লাহোর যাব বুঝতে পারছি না। আমার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা ঝুলছে। খুঁজে বেড়াচ্ছে পুলিশ।" ভাসানী সাহেব বললেন, "তা আমি কি জানি! যেভাবে পার লাহোর যাও। সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সাথে দেখা কর এবং তাঁকে সকল কিছু বল।" ১৯৪৯ সালের প্রথম দিকে ঢাকায় মওলানা ভাসানী, মিয়া ইফতিখারউদ্দিন, আরও অনেকে সোহরাওয়ার্দীর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং সিদ্ধান্ত নেন যদি মুসলিম লীগে কোটারি করা হয়, তবে নতুন পার্টি করা হবে। সোহরাওয়ার্দী সাহেব মত দেন। এখন শহীদ সাহেব ও মিয়া সাহেবের সাহায্য প্রয়োজন। তাঁদের সম্পর্ক ভাল।

আমি তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসলাম। আমার একটা গরম আচকান ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আমার মামা জাফর সাদেকের কাছ থেকে সামান্য কিছু টাকা ধার নিলাম। আর *ইত্তেহাদে* আমার কিছু টাকা পাওনা ছিল সেখান থেকে সামান্য কিছু

পেলাম। তাই নিয়ে রওয়ানা করলাম। লাহোর পর্যন্ত কোনোমতে পৌঁছাতে পারলে হয়, সোহরাওয়ার্দী সাহেব আছেন কোন অসুবিধা হবে না। আমি অনেক কষ্টে লাহোর পৌঁছালাম। পূর্ব বাংলার পুলিশকে আমার অনেক কষ্টে ফাঁকি দিতে হয়েছিল। আমার জন্য অনেক বাড়ি খানা তল্লাশি হচ্ছিল। বাড়িতেও পুলিশ গিয়ে খবর এনেছে আমি বাড়ি যাই নাই।



লাহোরে তখন ভীষণ শীত। আমার তা সহ্য করা কষ্টকর হচ্ছিল। কোনোদিন লাহোর যাই নাই। মিয়া ইফতিখারউদ্দিন সাহেব ছাড়া কেউ আমাকে চিনত না। সোহরাওয়ার্দী সাহেব নবাব মামদোতের বাড়িতে থাকতেন, একথা আমি জানি। এক দোকানের সামনে মালপত্র রেখে আমি নবাব সাহেবের বাড়িতে ফোন করলাম। সেখান থেকে উত্তর এল, সোহরাওয়ার্দী সাহেব লাহোরে নাই, বাইরে গেছেন, দুই দিন পরে ফিরবেন। আমার কাছে মাত্র দুই টাকা আছে, কি করব? কোথায় যাব ভাবছিলাম, মালপত্রই বা কোথায় রাখি? বেলা তখন একটা, ক্ষিধেও লেগেছে, সকাল থেকে কিছুই পেটে পড়ে নাই। দুইটা টাকা মাত্র, কিছু খেলেই তো শেষ হয়ে যাবে। অনেক চিন্তা করে মিয়া সাহেবের বাড়িতে ফোন করলাম। মিয়া সাহেব লাহোরে আছেন, কিন্তু বাড়িতে নাই। আমি একটা টাঙ্গা ভাড়া করে মিয়া সাহেবের বাড়ির দিকে রওয়ানা করলাম। ঠিকানা লেখা ছিল। আমি যখন সুটকেস ও সামান্য বিছানা নিয়ে তাঁর বাড়ির সামনে নামলাম, দারোয়ান বলল, সাহেব বাড়িতে নাই। একটা বাইরের ঘরে বসতে দিল। সুটকেসটা বাইরেই একপাশে রেখে দিলাম। আমার নাম ও ঠিকানা কাগজে লিখে দিলাম, মিয়া সাহেব আসলে তাঁকে দিতে। মিয়া সাহেব এসে কাগজটা দেখেই বের হয়ে এলেন, আমাকে চিনলেন এবং খুব আদর করলেন। আমার অবস্থা দেখে তাড়াতাড়ি একটা রুম ঠিক করে দিয়ে গোসল করে নিতে বললেন। একসাথে খানা খাবেন এবং পূর্ব বাংলার অবস্থা শুনবেন। বরিশালের এস. এ. সালেহ মিয়া সাহেবকে ও শহীদ সাহেবকে চিঠি পাঠিয়েছিলেন এবং আমি যে লাহোর যেতে পারি একথাও জানিয়েছিলেন। সালেহ আমার বাল্যবন্ধু ও নূরুদ্দিন সাহেবের চাচাতো ভাই। পাকিস্তান আন্দোলনে একসাথে অনেক দিন কাজ করেছি। মিয়া সাহেব, বেগম সাহেবা ও আমি একসাথে খানা খেয়ে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা করলাম। পূর্ব বাংলার সকল খবর দিলাম। মওলানা ভাসানীর কথাও বললাম, সরকারের অত্যাচারের কাহিনীও জানালাম। মিয়া সাহেব মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেছেন, আমাকে বললেন, "দেখ, কিছুদিনের জন্য রাজনীতি আমি ছেড়ে দিয়েছি। সক্রিয় অংশগ্রহণ করব না, আমার নিজের কিছু কাজ আছে।"

তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মুসলিম লীগের অবস্থা কি?" আমি বললাম, "নির্বাচন হলেই মুসলিম লীগকে আমরা পরাজিত করতে পারব এবং সে পরাজয় হবে শোচনীয়।" মিয়া সাহেব বিশ্বাস করতে চাইলেন না। বেগম ইফতিখারউদ্দিন বললেন, "হলে হতেও পারে, কারণ কিছুদিন পূর্বেও তো এক আন্দোলন পূর্ব বাংলায় হয়ে গেল।" বেগম সাহেবা

রাজনীতি বুঝতেন এবং দেশ-বিদেশের খবরও রাখেন, যথেষ্ট লেখাপড়াও তিনি করেছেন বলে মনে হল।

রাতে আমার ভীষণ জ্বর হল! মিয়া সাহেব ব্যস্ত হয়ে ডাক্তার ডাকলেন। ঔষধ কিনে দিলেন, দুই দিনেই আমার জ্বর পড়ে গেল। মিয়া সাহেবের বাড়িতে এই একটাই অতিথিদের থাকবার ঘর ছিল। সোহরাওয়ার্দী সাহেবের ভাই প্রফেসর শাহেদ সোহরাওয়ার্দী লাহোরে আসবেন এবং মিয়া সাহেবের বাড়িতে থাকবেন। তাই দুই দিনের মধ্যেই আমার ছেড়ে যাওয়া উচিত হবে। আলাপ-আলোচনার মধ্যেই সেটা বুঝতে পারলাম।

মিয়া সাহেব আমার জন্য অন্য বন্দোবস্ত করতে রাজি আছেন জানালেন। সোহরাওয়ার্দী সাহেব ফিরে এসেছেন, ফোন করে জানলাম। আজ আর জ্বর নাই। ভীষণ শীত। বেলা এগারটার সময় নবাব সাহেবের বাড়িতে পৌঁছালাম। শহীদ সাহেব লনে বসে কয়েকজন এডভোকেটের সাথে মামলা সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন। আমি কাছে যেয়ে সালাম করতেই তিনি উঠে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে আদর করলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, "কিভাবে এসেছ? তোমার শরীর তো খুব খারাপ, কোথায় আছ?" আমাকে সকলের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। সকলকে বিদায় দিয়ে আমাকে নিয়ে বসলেন। আমি সকল ইতিহাস তাঁকে বললাম। প্রত্যেক কর্মী ও নেতাদের কথা জিজ্ঞেস করলেন। পূর্ব বাংলার অবস্থা কি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাও জিজ্ঞাসা করলেন। বাংলাকে তিনি যে কতটা ভালবাসতেন তাঁর সাথে না মিশলে কেউ বুঝতে পারত না। শহীদ সাহেব বললেন, তাঁর আর্থিক অবস্থার কথা। মামলাটা না পেলে খুবই অসুবিধা হত। তিনি আমাকে যেতে দিলেন না মিয়া সাহেবের বাসায়। একসাথে খানা খেলাম, নবাব মামদোত উপস্থিত ছিলেন। তাঁকেও আমাদের অবস্থার কথা বললেন। তিনিও পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা এক এক করে জিজ্ঞাসা করলেন।

বিকালবেলা খান গোলাম মোহাম্মদ খান লুন্দখোর ও পীর সালাহউদ্দিন (তখন ছাত্র) শহীদ সাহেবের সাথে দেখা করতে এলেন। গোলাম মোহাম্মদ খান লুন্দখোরকে সীমান্ত প্রদেশ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। তাঁর সীমান্ত প্রদেশে যাওয়া নিষেধ। তিনি সীমান্ত আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক। আমাকে পেয়ে তিনি খুব খুশি হলেন। শহীদ সাহেব তাঁকে বললেন, একটা হোটেল ঠিক করে দিতে, যেখানে আমি থাকব। অল্প খরচের হোটেল হলেই ভাল হয়। পীর সালাহউদ্দিন তখন পাঞ্জাবের ছাত্রনেতা। কর্মী হিসাবে তার নাম ছিল।

আমি রাতেই মিয়া সাহেবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হোটেলে চলে এলাম। মিয়া সাহেব বললেন, জায়গা থাকলে তোমাকে হোটেলে যেতে দিতাম না। আমি বললাম, অসুবিধা হবে না।

শহীদ সাহেব আমাকে নিয়ে দোকানে গেলেন এবং বললেন, "কিছু কাপড় আমার বানাতে হবে, কারণ দুইটা মাত্র স্যুট আছে, এতে চলে না। তিনি নিজের কাপড় বানানোর হুকুম দিয়ে একটা ভাল কম্বল, একটা গরম সোয়েটার, কিছু মোজা ও মাফলার কিনে নিলেন এবং বললেন, কোনো কাপড় লাগবে কি না! আমি জানি শহীদ সাহেবের অবস্থা।

বললাম, না আমার কিছু লাগবে না। তিনি আমাকে যখন গাড়িতে নিয়ে হোটেলে পৌঁছাতে আসলেন, জিনিসগুলি দিয়ে বললেন, "এগুলি তোমার জন্য কিনেছি। আরও কিছু দরকার হলে আমাকে বোলো।" গরম ফুলহাতার সোয়েটার ও কম্বলটা পেয়ে আমার জানটা বাঁচল। কারণ, শীতে আমার অবস্থা কাহিল হতে চলেছিল।



সকালেই শহীদ সাহেবের কাছে যেতাম আর রাতে ফিরে আসতাম। তাঁর সাথেই কোর্টে যেতাম। নবাব সাহেবের ভাইদের সাথেও আমার বন্ধুত্ব হয়ে উঠেছিল। এর তিন দিন পরে লুন্দখোর সাহেব আমাকে এসে বললেন, "চল, আমরা ক্যাম্বেলপুর যাই। সেখানে সীমান্ত আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটির সভা হবে। তুমি পীর মানকী শরীফ ও অন্যান্য নেতাদের সাথে আলোচনা করতে পারবে। আমিও তোমার সাথে একমত। আমাদের দুই প্রদেশের আওয়ামী লীগ নিয়ে একটা নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ গঠন করা উচিত—সোহরাওয়ার্দী সাহেবের নেতৃত্বে।" আমরা দুইজন শহীদ সাহেবের কাছে এলাম। শহীদ সাহেব বললেন, "যাও, আলাপ করে এস। হলে তো ভালই হয়, আমিও পাঞ্জাবে নবাব সাহেবের সাথে আলাপ করেছি।"

শহীদ সাহেব আমাকে কিছু টাকা দিলেন। আমরা দুইজন একসাথে লুন্দখোর সাহেবের মোটর গাড়িতে চড়ে ক্যাম্বেলপুর রওয়ানা হলাম রাত দশটায়। লুন্দখোর সাহেব নিজেই গাড়ি চালান। তিনি গাড়ি চালিয়ে রাওয়ালপিন্ডি পৌঁছালেন ভোর রাতের দিকে। আমরা বিশ্রাম করলাম, সকালে নাশতা করে আবার রওয়ানা করলাম ক্যাম্বেলপুরের দিকে। এগার-বারটার মধ্যে সেখানে পৌঁছালাম। এই আমার জীবনের প্রথম পাঞ্জাব প্রদেশের ভিতরে বেড়ান। আমার ভালই লাগল পঞ্চনদীর এই দেশটাকে।

পূর্ব পাঞ্জাব ও পশ্চিম পাঞ্জাবের ভয়াবহ দাঙ্গার স্মৃতি আজও মানুষ ভোলে নাই। লক্ষ লক্ষ মোহাজের এসেছে পশ্চিম পাঞ্জাবে, তবে বেশি অসুবিধা হয় নাই। কারণ পশ্চিম পাঞ্জাব থেকেও লক্ষ লক্ষ হিন্দু এবং শিখ চলে গিয়েছে। মুসলমানরা তা দখল করে নিয়েছে। ক্যাম্বেলপুর যাওয়ার পূর্বে আমি একটা বিবৃতি দিয়েছিলাম, পূর্ব বাংলায় কি হচ্ছে তার উপরে; মওলানা ভাসানী, শামসুল হক সাহেবের কারাগারে বন্দিত্ব, রাজনৈতিক কর্মীদের উপর নির্যাতন ও খাদ্য সমস্যা নিয়ে। *পাকিস্তান টাইমস, ইমরোজ* ভালভাবেই ছাপিয়ে ছিল। কারণ, মিয়া সাহেব তখন এই কাগজ দুইটির মালিক ছিলেন। এই সময় সম্পাদক ও বিখ্যাত কবি ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ ও তাঁর সহকর্মী জনাব মাজহারের সাথে আমার পরিচয় হয়। এই দুইজনকে বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী বললে ভুল হবে না। বাংলা ভাষা অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত—মিয়া সাহেব ও ঐ দুইজনই তখন তা সমর্থন করেছিলেন। আমাদের দাবি যে ন্যায্য একথাও স্বীকার করেছিলেন। আমি বিবৃতি লিখে শহীদ সাহেবকে দেখিয়েছিলাম। তিনি দেখে দিয়েছিলেন।

আমরা ক্যাম্বেলপুর পৌঁছালাম। ডাকবাংলো পীর সাহেবের জন্য রিজার্ভ ছিল। কিছু সময়ের মধ্যে পেশোয়ার, মর্দান ও অন্যান্য জায়গা থেকে সীমান্ত আওয়ামী লীগের কর্মকর্তা ও সদস্যরা এসে পৌঁছালেন। এখানে সভা করার উদ্দেশ্য হল জনাব লুন্দখোর পাঞ্জাব ছেড়ে সীমান্ত প্রদেশে যেতে পারেন না। এইখানেই আমার প্রথম পরিচয় হয় পীর মানকী শরীফ, সর্দার আবদুল গফুর, সর্দার সেকেন্দার, ভূতপূর্ব মন্ত্রী শামীম জং ও আরও অনেক নেতার সাথে। তাঁদের সভা অনেকক্ষণ চলল। আমাকে তাঁদের সভায় যোগদান করতে অনুমতি দিয়েছিলেন। ডাকবাংলোয়ই সভা হল। বন্দুকধারী দুইজন পাহারাদার ডাকবাংলো পাহারা দিয়েছিল, যাতে গোয়েন্দা বিভাগের কেউ কাছে আসতে না পারে। রাত পর্যন্ত সভা চলল, আমি সভায় বক্তৃতা করলাম ইংরেজিতে। এক ভদ্রলোক—নাম মনে নাই, পশতুতে সকলকে বুঝিয়ে দিলেন। আমি যে নিখিল পাকিস্তানভিত্তিক প্রতিষ্ঠান গড়া উচিত বলে প্রস্তাব দিলাম এই নিয়ে আলোচনা শুরু হল। আমি বুঝতে পারলাম, প্রায় সকলেই শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন। গোলাম মোহাম্মদ লুন্দখোরের বক্তৃতার পরে তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনজন প্রতিনিধি শহীদ সাহেবের সাথে আলোচনা করবেন এবং তাঁকে নেতৃত্ব নিতে অনুরোধ করবেন। রাতে সভা শেষ হল। আটক ব্রিজ পার হতে হলে বিশেষ অনুমতি প্রয়োজন হত। পীর সাহেবের অনুমতিপত্র ছিল, তিনি দলবল নিয়ে রাতেই চলে গেলেন। কয়েকজন ডাকবাংলোয় থাকল। লুন্দখোর সাহেব আমাকে নিয়ে একটা ছোট্ট হোটেলে আসলেন। সেখানে খাওয়া-দাওয়া করে রাত কাটালাম। পাঞ্জাবের শীত যে কি ভয়ানক এই রাতে তা একটু বেশি বুঝলাম।

আমি পূর্ব বাংলার মানুষ, একটা গরম চাদর গায়ে দিয়েই শীতকাল কাটিয়ে দিতে পারি। এখানে তো গরম কাপড়ের ওপর গরম কাপড়, কম্বলের ওপর কম্বল তারপর ঘরের মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে ঘুমাবার চেষ্টা করতে হয়; তবুও ঘুম হবে কি না বলা কষ্টকর! পীর সাহেব পূর্ব বাংলার অবস্থা শুনে খুবই দুঃখিত হলেন এবং আমাকে সীমান্ত প্রদেশে কাইয়ুম খান কি কি অত্যাচার করছে তাও বললেন। অনেক নেতা ও কর্মীকে জেলে দিয়েছে। কোন সভা করতে গেলেই ১৪৪ ধারা জারি করছে, লাঠিচার্জ ও গুলি করতে একটুও দ্বিধাবোধ করছে না। অত্যাচার চরম পর্যায়ে চলে গেছে। পূর্ব বাংলার অত্যাচার সীমান্তের অত্যাচারের কাছে কিছুই না বলতে হবে। লুন্দখোরকে জেলে দিয়েছিল। মুক্তি দিয়ে সীমান্ত প্রদেশের সীমানা পার করে দিয়েছে। এখন তিনি লাহোরে আছেন।

পরের দিন সকালে আমরা রওয়ানা করলাম। আমি অনুরোধ করলাম, এত কাছে এসে আটক ব্রিজ ও আটক ফোর্ট না দেখে যাই কি করে! মাত্র কয়েক মাইল। লুন্দখোর সাহেব রাজি হলেন, আমাকে আটক ব্রিজে নিয়ে গেলেন। আমি ব্রিজ পার হয়ে সীমান্ত প্রদেশে ঢুকলাম। লুন্দখোর সাহেব একজন লোক সাথে দিয়েছিলেন। ছোট্ট ছোট্ট কয়েকটা ফলের দোকান। ফল কিনে নিয়ে ফিরলাম। আটক ফোর্টের ভিতরে যাওয়ার অনুমতি লাগে, কারণ কিছু যুদ্ধবন্দি সেখানে আছে। কয়েকজন শিখকে কাজ করতে দেখলাম দূর থেকে। আমি ফিরে আসার পরে আবার লুন্দখোর সাহেব গাড়ি ছাড়লেন লাহোরের দিকে। আবার

রাওয়ালপিন্ডি ফিরে এলাম। এখানেই বিশ্রাম করলাম কিছু সময়। লুন্দখোর সাহেবকে অনেক লোকে জানে দেখলাম। তিনি মাঝে মাঝে গাড়ি রেখে হুক্কা খান। যেখানেই তিনি গাড়ি থামান—কোনো হোটেল বা রেস্টুরেন্টে ঢুকলে প্রথমেই হুক্কা এনে সামনে দেয় খান সাহেবের। এরা প্রায় সকলেই সীমান্ত প্রদেশের লোক বলে মনে হল। আমরা ঝিলাম, গুজরাট ও গুজরানওয়ালায় থেমে চা খেয়েছি। রাত প্রায় দশটায় লাহোরে পৌঁছালাম। আমাকে হোটেলে দিয়ে তিনি চলে গেলেন এবং বললেন, আগামীকাল সকালে আমাকে নিয়ে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের কাছে যাবেন এবং কি সিদ্ধান্ত হয়েছে রিপোর্ট দিবেন।

এই সময় পাঞ্জাবের নবাব মামদোতের দলের মুসলিম লীগে স্থান হয় নাই। তিনি তখনও কোন দল করেন নাই। তবে করবেন ভাবছেন, তাঁর প্রোডা[২০] মামলা শেষ হবার পরে। অনেক ভাল ভাল কর্মী ও নেতা শহীদ সাহেবের কাছে আসা যাওয়া শুরু করেছেন, তাঁরা সকলেই প্রায় পুরানা লীগ কর্মী। শহীদ সাহেব একটা জনসভায় যোগদান করবেন বলে মত দিয়েছেন। আমরা মোটরে গিয়েছিলাম। সারগোদা জেলায় এই সভা হবে। আমাকে বললেন সাথে যেতে। আমার কাজ কি! রাজি হলাম। সারগোদায় অনেক মোহাজের এসেছে, তাদের দুরবস্থার সীমা নাই। শহীদ সাহেব বক্তৃতা করলেন। আমাকে বক্তৃতা করতে অনেকে অনুরোধ করলেন, আমি বললাম, "স্যার, না জানি উর্দু, না জানি পাঞ্জাবি; ইংরেজিতে কেউ বুঝবে না, কি বক্তৃতা করব!" তিনি বললেন, থাক, প্রয়োজন নাই। আমাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল। আমি সালাম জানিয়ে বসে পড়লাম। সুদূর সারগোদা জেলায়ও শহীদ সাহেব জনপ্রিয় ছিলেন এইবার প্রথম বুঝলাম।

লাহোরে যে হোটেলে আমি থাকতাম তার দুইটা রুম ভাড়া নিয়ে মিস্টার আজিজ বেগ ও মিস্টার খুরশিদ (যিনি আজাদ কাশ্মীরের প্রেসিডেন্ট ছিলেন) সাপ্তাহিক *গার্ডিয়ান* কাগজ বের করতেন। এরা *পাকিস্তান টাইমসে* আমার বিবৃতি দেখেছিলেন এবং বিবৃতির কিছু কিছু অংশ *গার্ডিয়ান* কাগজে প্রকাশ করেছিলেন। আমি তাঁদের সাথে দেখা করলাম এবং সকল বিষয় আলোচনা করলাম। *গার্ডিয়ান* প্রতিনিধি আমার সাথে দেখা করে একটা সাক্ষাতের রিপোর্ট বের করলেন। আস্তে আস্তে লাহোরের রাজনীতিবিদরাও জানতে পারলেন, আমি লাহোরে আছি। গোয়েন্দা বিভাগও যে আমার পিছু লেগেছে সে খবরও হোটেলের ম্যানেজার আমাকে বলে দিলেন এবং আরও বললেন, সকল সময়ের জন্য একজন লোক আপনাকে অনুসরণ করছে। আমি তো টাঙ্গায় বা হেঁটে চলতাম, ওরা আমাকে সাইকেলে অনুসরণ করত। পীর সালাহউদ্দিনের মারফতে আমি পাঞ্জাব মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের এক প্রতিনিধির সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং অল পাকিস্তান ছাত্র প্রতিষ্ঠান হওয়া দরকার এ বিষয়ও আলোচনা করলাম। মিস্টার ফাহমী, মিস্টার নূর মোহাম্মদ (দিল্লি থেকে এসেছেন) এবং আরও কয়েকজন ছাত্রনেতা তখন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ছিলেন, তাঁরাও আমার সাথে একমত হলেন। আমি কয়েকদিন তাঁদের ল'কলেজ হোস্টেলে গিয়েও আলাপ করলাম। আমি তাঁদের বললাম, "যদিও আমি এখন আর ছাত্র প্রতিষ্ঠানে নাই, তবুও আপনারা

যদি রাজি হন অল পাকিস্তান ছাত্র প্রতিষ্ঠান করতে, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগকে রাজি করাতে পারব।" তাঁরা রাজি হলেন এবং কিভাবে তা গঠন হবে সে পন্থাও ঠিক হল। তাঁরা একটা গঠনতন্ত্র লিখে আমাকে দিলেন। আমি তাঁদের কথা দিলাম ঢাকা যেয়েই ছাত্রলীগ নেতাদের মাঝে আমি পৌঁছে দিব আপনাদের মতামত। তারা আপনাদের কাছে চিঠি লিখবে এবং একসাথে পাঞ্জাব ও বাংলা থেকে ঘোষণা বের হবে।



এ সময় একটা দুঃখজনক ঘটনা ঘটে গেল। আমি একদিন মিয়া সাহেবের সাথে দেখা করতে *পাকিস্তান টাইমসের* অফিসে যাই। তখন প্রায় সকাল এগারটা। মিয়া সাহেব সেখানে নাই। আমি কিছু সময় দেরি করলাম। মিয়া সাহেব আসলেন না। আমার কাজ ছিল শহীদ সাহেবের সাথে। হাইকোর্টে যাব তাঁর সাথে দেখা করতে। যখন আমি বের হয়ে কিছুদূর এসেছি, তিন চারজন লোক আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, আমার বাড়ি কোথায়? আমি বললাম, "পূর্ব পাকিস্তানে।" হঠাৎ একজন আমার হাত, আর একজন আমার জামা ধরে বলল, "তোম পাকিস্তান কা দুশমন হ্যায়"। আরেকজন একটা হান্টার, অন্যজন একটা ছোরা বের করল। আমি হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম, "আপনারা আমাকে জানেন, আমি কে?" তারা বলল, "হ্যাঁ, জানতা হ্যায়।" আমি বললাম, "কথা শোনেন, কি হয়েছে বলুন, আর যদি লড়তে হয় তবে একজন করে আসুন।" একজন আমাকে ঘুষি মারল, আমি হাত দিয়ে ঘুষিটা ফিরালাম। অনেক লোক জমা হয়ে আছে। কয়েকজন ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে? আমি বললাম, "কিছুই তো জানি না। এদের কাউকেও চিনিও না। আমি পূর্ব বাংলা থেকে এসেছি। *পাকিস্তান টাইমস* অফিসে এসেছিলাম মিয়া সাহেবের সাথে দেখা করতে। এরা কেন আমাকে মারতে চায় বুঝতে পারলাম না।" কয়েকজন ভদ্রলোক ও কয়েকজন ছাত্রও ছিল। তারা ওদের কি যেন বলল, আর একজন ওদের ওপর রাগ দেখাল, ওরা সরে পড়ল। আমি ল'কলেজ হোস্টেলে গেলাম, কাজমীকে খবর দিতে। কাজমী ছিল না হোস্টেলে। একটা টাঙ্গা নিয়ে হাইকোর্টে আসলাম সোহরাওয়ার্দী সাহেবের কাছে। কিছুই খেলাম না, ভীষণ রাগ হয়েছে। বিকালে তাঁর সাথে নবাব সাহেবের বাড়িতে যেয়ে সকল ঘটনা বললাম। শহীদ সাহেব নবাব সাহেবকে জানালেন। সন্ধ্যার পূর্বেই হোটেলে চলে এলাম। কাজমী সন্ধ্যার পরে হোটেলে এসে সবকিছু শুনে নিজেই সেই জায়গায় চলে গেল কয়েকজন ছাত্র নিয়ে এবং দোকানদারদের কাছে জিজ্ঞাসা করল। তারা বলেছিল যে, যারা আমাকে আক্রমণ করেছিল তারা ঐ জায়গার কেউ নয়। বাইরের কোথাও থেকে এসেছিল। বোঝা গেল মুসলিম লীগ ওয়ালাদের কাজ। এখানেও গুণ্ডা লেলিয়ে দিয়েছে। লুন্দখোর আমাকে বলল, "সাবধানে থেকো।"

আমি এই ঘটনা আর কাউকে বললাম না। নবাব সাহেবকে পাঞ্জাবের বড় বড় সরকারি কর্মচারীরা সম্মান করত। আমার উপর আক্রমণের কথাটা সেখানেও পৌঁছে ছিল। আমার

অসুবিধা ছিল ভাল উর্দু বলতে পারতাম না। আর সাধারণ পাঞ্জাবিরাও ভাল উর্দু বলতে পারে না। পাঞ্জাবি ও উর্দু মিলিয়ে একটা খিচুড়ি বলে। যেমন আমি বাংলা ও উর্দু মিলিয়ে খিচুড়ি বলতাম। এই সময় পাঞ্জাবে প্রগতিশীল লেখকদের একটা কনফারেন্স হয়। মিয়া সাহেব আমাকে যোগদান করতে অনুরোধ করলেন। আমি যোগদান করলাম। লেখক আমি নই, একজন অতিথি হিসাবে যোগদান করলাম। কনফারেন্স দুই দিন চলল। লুন্দখোর সাহেবও যোগদান করেছিলেন, বেচারার গাড়িটি বাইরে রেখে সভায় যোগদান করেছিলেন; কে বা কারা গাড়িটায় আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। লুন্দখোর সাহেবের বাহনটাও নষ্ট হয়ে গেল। ইংরেজরা ১৯৪২ সালের আন্দোলনে তাঁর বাড়িটি পুড়িয়ে দিয়েছিল। কারণ, তখন তিনি সীমান্ত কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। জেল থেকে বের হয়ে মুসলিম লীগে যোগদান করেছিলেন। লুন্দখোর আমাকে বললেন, "লাহোরে এ সকল ঘটনা হয়ে থাকে, তবে আমি পাঠান, আমাকে এরা ভয় করে। সামনে কিছুই বলতে বা করতে সাহস পাবে না, তাই পিছন থেকে আঘাত করার চেষ্টা করছে।"

প্রায় এক মাস হয়ে গেল, আর কতদিন আমি এখানে থাকব? "ঢাকায় মওলানা সাহেব, শামসুল হক সাহেব এবং সহকর্মীরা জেলে আছেন। সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে বললাম। তিনি বললেন, "ঢাকায় পৌঁছার সাথে সাথেই তারা তোমাকে গ্রেফতার করবে। লাহোরে গ্রেফতার নাও করতে পারে।" আমি বললাম, "এখান থেকে গ্রেফতার করেও আমাকে ঢাকায় পাঠাতে পারে। কারণ লিয়াকত আলী সাহেবও ক্ষেপে আছেন। পূর্ব বাংলার সরকার নিশ্চয়ই চুপ করে বসে নাই। তারা কেন্দ্রীয় সরকারকে খবর পাঠিয়েছে পাঞ্জাব সরকারকে হুকুম দিতে। সে খবর এসে পৌঁছাতেও পারে। এখানেও আমি তো চুপ করে নাই। তাই যা হবার পূর্ব বাংলায় হোক, পূর্ব বাংলার জেলে ভাত পাওয়া যাবে, পাঞ্জাবের রুটি খেলে আমি বাঁচতে পারব না। রুটি আর মাংস খেতে খেতে আমার আর সহ্য হচ্ছে না। আর জেলে যদি যেতেই হবে, তাহলে আমার সহকর্মীদের সাথেই থাকব।" শহীদ সাহেব বললেন, তবে যাবার বন্দোবস্ত কর। কি করে কোন পথে যাবা, তিনি জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম, "রাস্তা তো একটাই, পূর্ব পাঞ্জাব দিয়ে আমি যাব না। প্লেনে লাহোর থেকে দিল্লি যাব, সেখান থেকে ট্রেনে যাব। ভারতবর্ষ হয়ে যেতে হলে একটা পারমিটও লাগবে। ভারতের ডেপুটি হাইকমিশনার পারমিট দেওয়ার মালিক। লাহোরে তাদের অফিস আছে।" আমি আরও বললাম, "মিয়া সাহেবকে বলেছি, তিনি ডেপুটি হাইকমিশনারকে বলে দেবেন। কারণ, তাঁকে তিনি জানেন।" শহীদ সাহেব আমাকে প্রস্তুত হতে বললেন। এই সময় পূর্ব বাংলার সিএসএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কয়েকজন বন্ধু লাহোরের সিভিল সার্ভিস একাডেমিতে ছিলেন। তাঁদের সাথে দেখা করতে গেলাম। অনেকের সাথে দেখা হল। একজন সরকারি দলের ছাত্রনেতা ছিলেন, তিনি বাংলা ভাষা আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন। আমার

সাথে তাঁর পরিচয় ছিল। আমাকে বললেন, "আপনি আমার কাছে চা খাবেন। কারণ আমি বুঝতে পেরেছি লাহোরে এসে, যে বাংলা ভাষার দাবি আপনারা করেছিলেন তা ঠিক ছিল, আমিই ভুল করেছিলাম। বাঙালিদের এরা অনেকেই ঘৃণা করে।" আমি কোন আলোচনা করলাম না সেখানে বসে, কারণ সেটা উচিত না। এরা এখন সকলেই সরকারি কর্মচারী, কেউ কিছু মনে করতে পারেন।

আমি পারমিট পেলাম, দেরি হল না, কারণ মিয়া সাহেব বলে দিয়েছেন। পারমিটে ছিল, তিন দিনের মধ্যে ভারতবর্ষ ত্যাগ করতে হবে। তিন দিনের বেশি ভারতবর্ষে থাকতে পারব না। আমি হিসাব করে দেখলাম, তিন দিনের মধ্যেই পূর্ব বাংলায় ঢুকতে পারব। শহীদ সাহেব আমার হোটেলের টাকা শোধ করে দিলেন, দিল্লি পর্যন্ত প্লেনের টিকিট কিনে দিলেন। তখন ওরিয়েন্ট এয়ারওয়েজ ছিল পাকিস্তানে। আর সামান্য কিছু টাকা দিলেন, যাতে বাড়িতে পৌঁছাতে পারি। পাকিস্তানের টাকা বেশি নেওয়ার হুকুম নাই। বোধহয় তখন ছিল পঞ্চাশ টাকা পাকিস্তানী এবং পঞ্চাশ টাকা ভারতবর্ষের। ভারতবর্ষের টাকা পাওয়া কষ্টকর। সোহরাওয়ার্দী সাহেব নবাবজাদা জুলফিকারকে (নবাব সাহেবের ছোট ভাই) বললেন, আমাকে প্লেনে তুলে দিতে। কারণ, একটা খবর পেয়েছিলেন আমাকে গ্রেফতার করতে পারে এয়ারপোর্টে। আমাকে গ্রেফতার করলে যাতে শহীদ সাহেব তাড়াতাড়ি খবর পেতে পারেন, সেজন্যেই তাকে সঙ্গে দেওয়া হয়। আমাকে নিয়ে তিনি এয়ারপোর্ট পৌঁছালেন। আমার মালপত্র আলাদা করে রাখতে দেখলাম। আমাকে একজন কর্মচারী উপরের একটা ঘরে নিয়ে গেলেন। আমার পারমিট দেখলেন। মালপত্র ভালভাবে তল্লাশি করলেন এবং বললেন, "আপনি এখানে বসুন, কোথাও যাবেন না।" নবাবজাদা জুলফিকার সাহেব আমার কাছে আসলেন এবং বললেন, "মনে হয় কিছু একটা করবে। প্লেন ছাড়ার সময় হয়ে গেছে কিন্তু প্লেন ছাড়ছে না।" প্যাসেঞ্জারদের একবার চড়তে দিল, আবার নামিয়ে নিয়ে আসল। বোধহয় উপরের হুকুমের প্রতীক্ষায় রয়েছে। নবাবজাদা খবর আনলেন এবং বললেন, আপনার ব্যাপার নিয়েই প্লেন দেরি হচ্ছে। এক ঘণ্টা পর প্লেন ছাড়ার অনুমতি পেল এবং আমাকে বলল, "আপনি যেতে পারেন।" আমি নবাবজাদার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে প্লেনে উঠলাম এবং তাঁকে অনুরোধ করলাম, শহীদ সাহেবকে ঘটনাটা বলতে। আমি বুঝতে পারলাম, আমাকে যেতে দিবে, না আটক করবে, এই নিয়ে দেরি করছে। বোধহয় শেষ পর্যন্ত দেখল, বাংলার ঝঞ্ঝাট পাঞ্জাবে কেন? তিন দিনের মধ্যেই ভারত ত্যাগ করতে হবে। পূর্ব বাংলা সরকারকে খবর দিলেই আমাকে হয় দর্শনায়, না হয় বেনাপোলে গ্রেফতার করতে পারবে। আমি যে ভারতবর্ষে থাকতে পারব না একথা পারমিটে লেখা আছে। কলকাতার সরকারি কর্মচারীরা খবর পেলে আমাকে কলকাতার জেলের ভাতও খাওয়াতে দ্বিধাবোধ করবে না, কারণ আমি শহীদ সাহেবের দলের মানুষ।

সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে ছেড়ে আসতে আমার খুব কষ্টই হচ্ছিল, কারণ জীবনের বহুদিন তাঁর সাথে সাথে ঘুরেছি। তাঁর স্নেহ পেয়েছি এবং তাঁর নেতৃত্বে কাজ করেছি। বাংলাদেশে শহীদ সাহেবের নাম শুনলে লোকে শ্রদ্ধা করত, তাঁর নেতৃত্বে বাংলার লোক

পাকিস্তান আন্দোলনে শরিক হয়েছিল। যাঁর একটা ইঙ্গিতে হাজার হাজার লোক জীবন দিতে দ্বিধাবোধ করত না, আজ তাঁর কিছুই নাই। মামলা না করলে তাঁর খাওয়ার পয়সা জুটছে না। কত অসহায় তিনি! তাঁর সহকর্মীরা—যারা তাঁকে নিয়ে গর্ববোধ করত, তারা আজ তাঁকে শত্রু ভাবছে। কতদিনে আবার দেখা হয় কি করে বলব? তবে একটা ভরসা নিয়ে চলেছি, নেতার নেতৃত্ব আবার পাব। তিনি নীরবে অত্যাচার সহ্য করবেন না, নিশ্চয়ই প্রতিবাদ করবেন। পূর্ব বাংলায় আমরা রাজনৈতিক দল সৃষ্টি করতে পারব এবং মুসলিম লীগের স্থান পূর্ব বাংলায় থাকবে না, যদি একবার তিনি আমাদের সাহায্য করেন। তাঁর সাংগঠনিক শক্তি ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব জাতি আবার পাবে।



দিল্লি পৌঁছালাম এবং সোজা রেলস্টেশনে হাজির হয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর ওয়েটিংরুমে মালপত্র রাখলাম। গোসল করে কিছু খেয়ে নিয়ে মালপত্র দারোয়ানের কাছে বুঝিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। টিকিট কিনে নিয়েছি। রাতে ট্রেন ছাড়বে, অনেক সময় হাতে আছে। আমি একটা টাঙ্গা ভাড়া করে জামে মসজিদের কাছে পৌঁছালাম। গোপনে গোপনে দেখতে চাই মুসলমানদের অবস্থা। পার্টিশনের সময় কি ভয়াবহ দাঙ্গা হয়েছিল এই দিল্লিতে। দেখলাম, মুসলমানদের কিছু কিছু দোকান আছে। কারও সাথে আলাপ করতে সাহস হচ্ছিল না। হাঁটতে হাঁটতে লালকেল্লায় গেলাম। পূর্বেও গিয়েছি, হিন্দুস্তানের পতাকা উড়ছে। ভিতরে কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে, মুসলমানদের অনেক দোকান ছিল পূর্বে, এখন দু'একটা ছাড়া নাই। বেশি সময় থাকতে ইচ্ছা হল না। বেরিয়ে আসলাম, আর একটা টাঙ্গা নিয়ে চললাম এ্যাংলো এ্যারাবিয়ান কলেজের দিকে, যেখানে ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগ কনভেনশনে যোগদান করেছিলাম।

নতুন দিল্লিও ঘুরে দেখলাম। নতুন দিল্লি এখন আরও নতুন রূপ ধারণ করেছে। ভারতবর্ষের রাজধানী। শত শত বৎসর মুসলমানরা শাসন করেছে এই দিল্লি থেকে, আজ আর তারা কেউই নাই। শুধু ইতিহাসের পাতায় স্বাক্ষর রয়ে গেছে। জানি না যে স্মৃতিটুকু আজও আছে, কতদিন থাকবে! যে উগ্র হিন্দু গোষ্ঠী মহাত্মা গান্ধীর মত নেতাকে হত্যা করতে পারে, তারা অন্য সম্প্রদায়কে সহ্য করতে পারবে কি না? এই দিল্লিতেই মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত নেহেরু ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র হয়েছিল। খোদা শহীদ সাহেবকে রক্ষা করেছিলেন। নাথুরাম গডসের সহকর্মী মহাত্মা গান্ধী হত্যা মামলার সাক্ষী হিসাবে জবানবন্দিতে এই কথা স্বীকার করেছিল।

আমি রাতের ট্রেনে চড়ে বসলাম। আমার সিট রিজার্ভ ছিল। দ্বিতীয় শ্রেণীতে আরও তিনজন ভদ্রলোক ছিলেন। কারও সাথে আলাপ করতে সাহস হল না। একটা কাগজ নিয়ে পড়তে লাগলাম। তখনও ভারতবর্ষে মাঝে মাঝে গোলমাল চলছিল। তবে মহাত্মাকে হত্যা করার পর কংগ্রেস সরকার বাধ্য হয়েছিল সাম্প্রদায়িক আরএসএস[২১] ও হিন্দু মহাসভার

কর্মীদের উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। মহাত্মা গান্ধী যে মুসলমানদের রক্ষা করবার জন্য জীবন দিলেন তাঁর জন্য তাঁর ভক্তদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল : তারা মুসলমানদের সাথে ভাল ব্যবহার করতে শুরু করেছিল। ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে দেখি দুইজন প্যাসেঞ্জার নেমে গেছেন, একজন আছেন। তিনি পশ্চিম বাংলার লোক। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কোথা থেকে এসেছি? কোথায় যাব? আমি সত্য কথাই বললাম। লাহোর থেকে এসেছি, পূর্ব বাংলায় যাব। আমার বাড়ি ফরিদপুর জেলায়। ভদ্রলোক বললেন, "আমার বাড়িও বরিশাল জেলায় ছিল। এখন চাকরি করি দিল্লিতে।" অনেক আলাপ হল, পূর্ব বাংলার মাছ ও তরকারি, পূর্ব বাংলার আলো-বাতাস। আর জীবনে যেতে পারবেন না বলে আফসোস করলেন, কেউই নাই তাঁর এখন বরিশালে। ভদ্রলোক আমাকে হাওড়ায় নেমে যেতে বললেন, "আপনি আমার বাড়িতে রাতে থাকতে পারেন, কোনো অসুবিধা হবে না।" আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে বললাম, "কাল সকালে চলে যেতে হবে, সেজন্য রাতটা এক বন্ধুর বাড়িতে থাকব।"

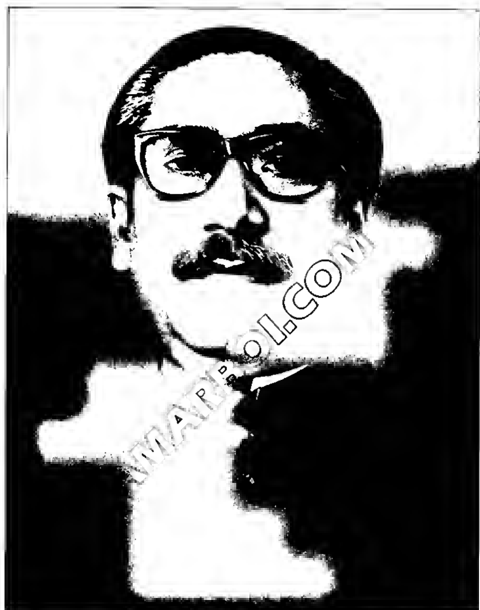
কোথায় যাব ভাবলাম? হোটেলে থাকব না। বন্ধু খন্দকার নূরুল আলমের বাসা চিনি, তার কাছেই যাব। নূরুল আলমের বাড়ি পার্ক সার্কাসে আসলাম। ওর ভাই বাসায় আছে, আলম নাই, বাইরে গেছে। আমাকে খুব যত্ন করে গ্রহণ করল। কিছু সময়ের মধ্যে নূরুল আলম এল। আমাকে পেয়ে কত খুশি। একসাথে খেলাম, তারপর বেড়ালাম। আলম বলল, "কি করি একেবারে একা পড়ে গেছি। বন্ধুবান্ধবও নাই, ঢাকা যেয়েই বা কি হবে? টাকা নাই যে ব্যবসা করব? চাকরি তো নূরুল আমিন সাহেবরা দিবে না, কারণ আমি তো শহীদ সাহেব ও হাশিম সাহেবের দলের লোক ছিলাম।" আমি তাকে কিছুই বলতে পারলাম না, কারণ আমি তাকে আশ্বাস বলব কি অধিকারে। আমারই তো কোনো ঠিক নাই, আগামীকালই জেলের ভাত কপালে থাকতে পারে। তবে নূরুল আলম বলল যে, সে পাকিস্তান ডেপুটি হাইকমিশনার অফিসে একটা চাকরির জন্য দরখাস্ত করেছে।

টেলিফোন করে জানলাম সকাল এগারটায় খুলনার ট্রেন ছাড়ে, প্রায় সন্ধ্যায় বেনাপোলে পৌঁছে এবং রাত দশটায় খুলনা পৌঁছে। ইন্টারক্লাস টিকিট কাটলাম। কারণ বেনাপোলে আমাকে পুলিশের চোখে ধুলা দিতে চেষ্টা করতে হবে। পূর্ব বাংলা সরকারও খবর রাখে—আমি দু'একদিনের মধ্যে পৌঁছাব। গোয়েন্দা বিভাগ ব্যস্ত আছে, আমাকে গ্রেফতার করবার জন্য। আমিও প্রস্তুত আছি, তবে ধরা পড়ার পূর্বে একবার বাবা-মা, ভাইবোন, ছেলেমেয়েদের সাথে দেখা করতে চাই। লাহোর থেকে রেণুকে চিঠি দিয়েছিলাম, বোধহয় পেয়ে থাকবে। বাড়ির সকলেই আমার জন্য ব্যস্ত। ঢাকায়ও যাওয়া দরকার, সহকর্মীদের সাথে আলাপ করতে হবে। আমি গ্রেফতার হওয়ার পর যেন কাজ বন্ধ না হয়। কিছু অর্থের বন্দোবস্তও করতে হবে। টাকা পয়সার খুবই অভাব আমাদের। আমি কিছু টাকা তুলতে পারব বলে মনে হয়। সোহরাওয়ার্দী সাহেবের কয়েকজন ভক্ত আছে, যাদের আমি জানি, গেলে একেবারে 'না' বলতে পারবে না। রানাঘাট এসে গাড়ি থামল অনেকক্ষণ। ভারতবর্ষের কাস্টমস অফিসাররা গাড়ি ও প্যাসেঞ্জারদের মালপত্র তল্লাশি করল, কেউ কোনো নিষিদ্ধ

মালপত্র নিয়ে যায় কি না? আমার মালপত্রও দেখল। সন্ধ্যা হয় হয়, ঠিক এই সময় ট্রেন বেনাপোল এসে পৌঁছাল। ট্রেন থামবার পূর্বেই আমি নেমে পড়লাম। একজন যাত্রীর সাথে পরিচয় হল। তাকে বললাম, আমার মালগুলি পাকিস্তানের কাস্টমস আসলে দেখিয়ে দিবেন, আমার একটু কাজ আছে। আসতে দেরিও হতে পারে। অন্ধকার দেখে একটা গাছের নিচে আশ্রয় নিলাম। এখানে ট্রেন অনেকক্ষণ দেরি করল। গোয়েন্দা বিভাগের লোক ও কিছু পুলিশ কর্মচারী ঘোরাফেরা করছে, ট্রেন দেখছে তন্নতন্ন করে। আমি একদিক থেকে অন্যদিক করতে লাগলাম। একবার ওদের অবস্থা দেখে ট্রেনের অন্য পাশে গিয়ে আত্মগোপন করলাম। ফাঁকি আমাকে দিতেই হবে। মন চলে গেছে বাড়িতে। কয়েক মাস পূর্বে আমার বড় ছেলে কামালের জন্ম হয়েছে, ভাল করে দেখতেও পারি নাই ওকে। হাচিনা তো আমাকে পেলে ছাড়তেই চায় না। অনুভব করতে লাগলাম যে, আমি ছেলে মেয়ের পিতা হয়েছি। আমার আব্বা ও মাকে দেখতে মন চাইছে। তাঁরা জানেন, লাহোর থেকে ফিরে নিশ্চয়ই একবার বাড়িতে আসব। রেণু তো নিশ্চয়ই পথ চেয়ে বসে আছে। সে তো নীরবে সকল কষ্ট সহ্য করে, কিন্তু কিছু বলে না। কিছু বলে না বা বলতে চায় না, সেই জন্য আমার আরও বেশি ব্যথা লাগে।

মওলানা সাহেব, শামসুল হক সাহেব ও সহকর্মীরা জেল অত্যাচার সহ্য করছেন। তাঁদের জন্য মনটাও খারাপ। কিছু করতে না পারলেও তাঁদের কাছে যেতে পারলে কিছুটা শান্তি তো পাব। ট্রেন ছেড়ে দিল, আস্তে আস্তে ট্রেন চলছে, আমি এক দৌড় দিয়ে এসে ট্রেনে উঠে পড়লাম। আর এক মিনিট দেরি হলে উঠতে পারতাম কি না সন্দেহ ছিল। ট্রেন চলল, যশোরেও হুঁশিয়ার হয়ে থাকতে হবে। রেলস্টেশনে যে গোয়েন্দা বিভাগের লোক থাকে, আমার জানা আছে। যশোরে ট্রেন থামবার কয়েক মিনিট পূর্বেই আমি পায়খানায় চলে গেলাম। আর ট্রেন ছাড়লে বের হয়ে আসলাম। একজন ছাত্র আমার কামরায় উঠে বসে আছে। আমি পায়খানা থেকে বের হয়ে আসতেই আমাকে বলল, "আরে, মুজিব ভাই।" আমি ওকে কাছে আসতে বললাম এবং আস্তে আস্তে বললাম, "আমার নাম ধরে ডাকবা না।" সে ছাত্রলীগের সভ্য ছিল, বুঝতে পেরে চুপ করে গেল। অনেক যাত্রী ছিল, বোধহয় কেউ বুঝতে পারে নাই। আর আমাকে তখন বেশি লোক জানত না। ছাত্রটি পথে নেমে গেল।

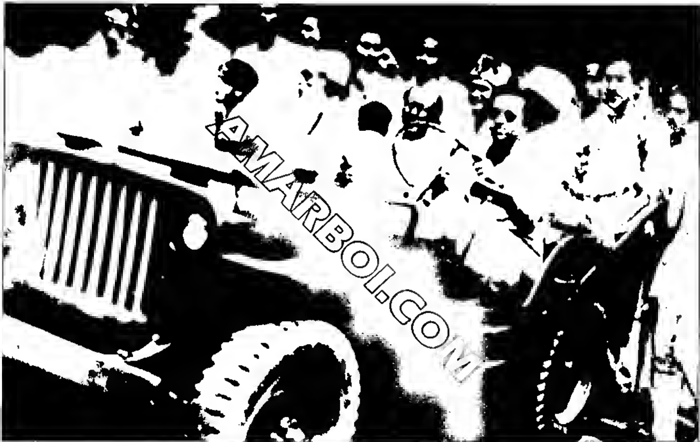
খুলনার অবস্থা আমার জানা আছে। ছোটবেলা থেকে খুলনা হয়ে আমাকে যাতায়াত করতে হয়েছে। কলকাতায় পড়তাম, খুলনা হয়ে যেতে আসতে হত। রাত দশটা বা এগারটায় হবে এমন সময় খুলনায় ট্রেন পৌঁছাল। সকল যাত্রী নেমে যাওয়ার পরে আমার পাঞ্জাবি খুলে বিছানার মধ্যে দিয়ে দিলাম। লুঙ্গি পরা ছিল, লুঙ্গিটা একটু উপরে উঠিয়ে বেঁধে নিলাম। বিছানাটা ঘাড়ে, আর সুটকেসটা হাতে নিয়ে নেমে পড়লাম। কুলিদের মত ছুটতে লাগলাম, জাহাজ ঘাটের দিকে। গোয়েন্দা বিভাগের লোক তো আছেই। চিনতে পারল না। আমি রেলরাস্তা পার হয়ে জাহাজ ঘাটে ঢুকে পড়লাম। আবার অন্য পথ দিয়ে রাস্তায় চলে এসে একটা রিকশায় মালপত্র রাখলাম। পাঞ্জাবিটা বের করে গায়ে



লেখক



মহাত্মা গান্ধী ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে লেখক (দন্ডায়মান), ১৯৪৭



কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে বের হয়ে কর্মিসভায় যাওয়ার পথে, সঙ্গে আওয়ামী লীগ
নেতা শামসুল হক, ইয়ার মোহাম্মদ খান, পিতা শেখ লুৎফর রহমান ও অন্যান্য, জুন ১৯৪৯



হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে, ১৯৪৯



সহযোদ্ধাদের সঙ্গে পরামর্শকালে



আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের সাথে, ১৯৫২



মওলানা ভাসানীসহ প্রভাতফেরিতে, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩



আরমানীটোলা ময়দানে জনসভা, মে ১৯৫৩



যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন প্রাক্কালে প্রার্থী মনোনয়ন বৈঠক, ডিসেম্বর ১৯৫৩



লেখক, ১৯৫৪



রাজশাহী সফরে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে, ১৯৫৪



জনসভায় ভাষণদানকালে, ১৯৫৪



ফুটবল জার্সি পরিহিত লেখক, ১৯৪০



স্ত্রী বেগম ফজিলাতুননেছার সঙ্গে, ১৯৪৭



লেখক, ১৯৪৯



টুঙ্গিপাড়ায় আদি পৈত্রিক বাড়ি



সপরিবারে লেখক। বামে স্ত্রী বেগম **ফজিলাতুননেছা**, শেখ জামাল ও শেখ হাসিনা।
ডানে শেখ রেহানা, শেখ **কামাল** ও কোলে শেখ রাসেল, ১৯৭২



বাবা শেখ লুৎফর রহমান ও মা সায়েরা খাতুনের সঙ্গে



ব্যক্তিগত লাইব্রেরিতে

দিলাম। রিকশাওয়ালা গোপালগঞ্জের লোক, আমাকে চিনতে পেরে বলল, "ভাইজান না, কোথা থেকে এইভাবে আসলেন।" আমি বললাম, "সে অনেক কথা, পরে বলব। রিকশা ছেড়ে দাও।" ওকে কিছুটা বলব, না বলে উপায় নাই। গোপালগঞ্জের লোক, কাউকেও বলবে না, নিষেধ করে দিলে।

আমার এক ভাই ছিল, সে খুলনায় চাকরি করত। তার বাসায় পৌঁছালাম, ঠিকানা জানতাম। রিকশাওয়ালাকে দিয়েই আমার মামাকে খবর দিলাম। মামা খুব চালু লোক। সকাল ছয়টায় জাহাজ ছাড়বে। মামাকে জাহাজ ঘাটে পাঠিয়ে দিয়ে তার নামে প্রথম শ্রেণীতে দুইটা সিট রিজার্ভ করালাম যাতে অন্য কেউ আমার কামরায় না উঠে। আমার এক বন্ধু ছিল, জাহাজ কোম্পানিতে চাকরি করত, তাকে খবর দিলাম। সে বলল যে, জাহাজ ছাড়বার ঠিক দুই মিনিট আগে যেন আমি জাহাজে উঠি। জাহাজে ওঠার সাথে সাথে সে জাহাজ ছেড়ে দেবার বন্দোবস্ত করবে। জাহাজ ঘাটেও গোয়েন্দাদের আমদানি আছে। দুঃখের বিষয় কুয়াশা পড়ায় জাহাজ আসতে দেরি হয়েছিল এবং ছাড়তেও দেরি হবে, প্রায় এক ঘণ্টা অর্থাৎ সকাল সাতটায়। মহাবিপদ! ছয়টায় তো একটু অন্ধকার থাকে, সাতটায় সূর্য উঠে যায়। মামা পূর্বেই মালপত্র নিয়ে উঠে কামরা ঠিক করে রেখেছে। আমি কাছেই এক দোকানে চুপটি করে বসেছিলাম। খুলনার গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরা আমাকে চিনে। মামার সাহায্যে আমি প্যান্ট, কোট ও মাথায় হ্যাট লাগিয়ে অন্য রূপ ধরেছি। যখন দুইটা সিঁড়ি টেনেছে আর দুইটা বাকি আছে, আমি এক দৌড় দিয়ে উঠে পড়লাম। দেখলাম আমার বন্ধু দাঁড়িয়ে আছে ঘাটে। উঠার সাথে সাথে ওই দুইটা সিঁড়িও টেনে নিল এবং জাহাজ ছেড়ে দিল। দুইজনের চোখে চোখে আলাপ হল, আমি আমার চক্ষু দিয়েই কৃতজ্ঞতা জানালাম।

এবার আশা হল, বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছাতে পারব। আমি কামরাতেই শুয়ে রইলাম। খাবার জিনিস কামরায় আনিয়ে নিলাম। আমি যে জাহাজে উঠেছি অনেকে দেখে ফেলেছে। এই জাহাজই গোপালগঞ্জ হয়ে বরিশাল ও নারায়ণগঞ্জ যায়। গোপালগঞ্জের লোক অনেক ছিল। গোপালগঞ্জ টাউনে জাহাজ যায় না, তিন মাইল দূরে মানিকদহ নামক স্থানে নতুন ঘাট হয়েছে সেখানে থামে। নদী ভরাট হয়ে গেছে। মানিকদহ ঘাটে যখন জাহাজ ভিড়েছে, তখন আমি জানালা দিয়ে চুপটি করে দেখছিলাম। ঘাট থেকে রহমত জান ও ইউনুস নামে দুইজন ছাত্র, যারা খুব ভাল কর্মী—আমার চোখ দেখেই চিনতে পেরে চিৎকার করে উঠেছে। আমি ওদের ইশারা করলাম, কারণ খবর রটে গেলে আবার পুলিশ গ্রামের বাড়িতে যেয়ে হাজির হবে। রহমত জান ও ইউনুস বরিশাল কলেজে পড়ে। এই জাহাজেই বরিশাল যাবে। ওরা সোজা আমার কাছে চলে এল। জাহাজ ছেড়ে দিয়েছে। আমি ওদের বললাম, "তোমরা চিনলা কেমন করে?" ওরা বলে, "ও চোখ আমাদের বহু পরিচিত।" আমি বললাম, "পুলিশ খবর পেলে রাস্তায় গ্রেফতার করতে চেষ্টা করতে পারে।" ওরা বলে, "ভাইজান, এটা গোপালগঞ্জ; এখান থেকে ইচ্ছা না করলে ধরে নেওয়ার ক্ষমতা কারও নাই।" গোপালগঞ্জের মানুষ বিশেষ করে ছাত্র ও যুবকরা আমাকে 'ভাইজান' বলে ডাকে। এমনও আছে, ছেলেও 'ভাইজান' বলে, আবার বাবাও 'ভাইজান' বলে ডাকে। গোপালগঞ্জ থেকে আমার বাড়ির

নিকটবর্তী জাহাজ ঘাটে যেতে প্রায় দুই ঘণ্টা সময় লাগে। সন্ধ্যার সময় আমাদের জাহাজ ঘাট পাটগাতি পৌঁছালাম। নৌকায় প্রায় এক ঘণ্টা লাগবে। বাড়িতে পৌঁছালাম, কেউ ভাবতেও পারে নাই আমি আসব। সকলেই খুব খুশি। মেয়েটা তো কোল থেকে নামতেই চায় না, আর ঘুমাতেও চায় না। আব্বাকে বললাম সকল কথা। বাড়িতে পাহারা রাখলাম। বৈঠকখানায় রাততর লোক জেগে থাকবে, যদি কেউ আসে আমাকে খবর দেবে। আমাদের বাড়ি অনেক বড় এবং অনেক লোক। এখন গ্রেফতার হতে আমার বেশি আপত্তি নাই। তবে ঢাকা যাওয়া দরকার একবার। বেশি দিন যে বাড়ি থাকা চলবে না, তা আব্বা ও রেণুকে বুঝিয়ে বললাম। বোধহয় সাত-আট দিন বাড়িতে রইলাম। বললাম, "বরিশাল হয়ে জাহাজ যায়, এ পথে যাওয়া যাবে না; আর গোপালগঞ্জ হয়েও যাওয়া সম্ভবপর নয়। পথে গ্রেফতার করে ফেলতে পারে। আমি গোপালগঞ্জের দুই ঘাট পরে জাহাজে উঠব। তারপর কবিরাজপুর থেকে নৌকায় মাদারীপুর মহকুমার শিবচর থেকে জাহাজে উঠব। দু'একদিন আমার বড়বোনের বাড়িতে বেড়িয়ে যাব।" বড়বোনের বাড়ি শিবচর থেকে মাত্র পাঁচ মাইল পথ। রেণু বলল, "কতদিন দেখা হবে না বলতে পারি না। আমিও তোমার সাথে বড়বোনের বাড়িতে যাব, সেখানেও তো দু'একদিন থাকবা। আমি ও ছেলেমেয়ে দুইটা তোমার সাথে থাকব। পরে আব্বা যেয়ে আমাকে নিয়ে আসবেন।" আমি রাজি হলাম, কারণ আমি তো জানি, এবার আমাকে বন্দি করলে সহজে ছাড়বে না। নৌকায় এতদূর যাওয়া কষ্টকর। আমরা বিদায় নিয়ে রওয়ানা করলাম। দুইজন কর্মীও আমার সাথে চলল। একজনের নাম শহীদুল ইসলাম, আরেকজনের নাম সিরাজ। ওরা স্কুলের ছাত্র ছিল, আমাকে ভীষণ ভালবাসত। এখন দুইজনই ব্যবসায়ী। শহীদ আজও আমাকে ভালবাসে এবং রাজনীতিতে আমাকে অন্ধভাবে সমর্থন করে। সিরাজ অন্য দল করলেও আমাকে শ্রদ্ধা করে। এরা কবিরাজপুর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেল এবং রাতভর পাহারা দিয়েছিল। শীতের দিন ওরা এক কাপড়ে এসেছিল। রেণু নিজের গায়ের চাদর ওদের দিয়েছিল।

আমরা বোনের বাড়িতে পৌঁছালাম, একদিন দুই দিন করে সাত দিন সেখানে রইলাম। ছেলেমেয়েদের জন্য যেন একটু বেশি মায়া হয়ে উঠেছিল। ওদের ছেড়ে যেতে মন চায় না, তবুও তো যেতে হবে। দেশ সেবায় নেমেছি, দয়া মায়া করে লাভ কি? দেশকে ও দেশের মানুষকে ভালবাসলে ত্যাগ তো করতেই হবে এবং সে ত্যাগ চরম ত্যাগও হতে পারে। আব্বা আমাকে কিছু টাকা দিয়েছিলেন। আর রেণুও কিছু টাকা নিয়ে এসেছিল আমাকে দিতে। আমি রেণুকে বললাম, "এতদিন একলা ছিলে, এখন আরও দু'জন তোমার দলে বেড়েছে। আমার দ্বারা তো কোনো আর্থিক সাহায্য পাবার আশা নাই। তোমাকেই চালাতে হবে। আব্বার কাছে তো সকল সময় তুমি চাইতে পার না, সে আমি জানি। আর আব্বাই বা কোথায় এত টাকা পাবেন? আমার টাকার বেশি দরকার নাই। শীঘ্রই গ্রেফতার করে ফেলবে। পালিয়ে বেড়াতে আমি পারব না। তোমাদের সাথে কবে আব দেখা হয় ঠিক নাই। ঢাকা এস না। ছেলেমেয়েদের কষ্ট হবে। মেজোবোনের বাসায়ও জায়গা খুব কম। কোনো আত্মীয়দের আমার জন্য কষ্ট হয়, তা আমি চাই না। চিঠি লিখ, আমিও লিখব।"



রাতে রওয়ানা করে এলাম, দিনেরবেলায় আসলে হাচিনা কাঁদবে। কামাল তো কিছু বোঝে না। শিবচরে জাহাজ আসে না, চান্দেরচর যেতে হবে, প্রায় দশ মাইল। আমার বড়বোনের দেবর, আমারও বিশিষ্ট বন্ধু ও আত্মীয় সাইফুদ্দিন চৌধুরী সাহেব আমাকে ঢাকা পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। রেণু আমাকে বিদায় দেওয়ার সময় নীরবে চোখের পানি ফেলছিল। আমি ওকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম না, একটা চুমা দিয়ে বিদায় নিলাম। বলবার তো কিছুই আমার ছিল না। সবই তো ওকে বলেছি। রাতে নৌকা ছেড়ে সকালে চান্দেরচর স্টেশনে পৌঁছালাম। জাহাজ ছাড়তে দেরি আছে। আমার এক সহকর্মীর বাড়ি নিকটেই। তাকে খবর দিলাম, তার নাম সামাদ মোড়ল। সামাদ খবর পেয়ে ছুটে এল। তাদের বাড়ি নিয়ে খাবার জন্য অনেক অনুরোধ করল, কিন্তু সময় ছিল না। ফেরি স্টিমার তারপাশা পর্যন্ত যায়; তারপর আবার তো গোয়ালন্দ-নারায়ণগঞ্জ মেল স্টিমারে উঠতে হবে। তারপাশা পৌঁছে শুনলাম, মেল কিছু সময় হল ছেড়ে গেছে। ফলে সারা দিন আমাদের থাকতে হল। অনেক রাতে আর একটা জাহাজ আসবে তাতে যেতে পারব। উপায় নাই, জাহাজ ঘাটের প্লাটফর্মে বসে থাকতে হবে।

পরের দিন সকালবেলায় মুন্সিগঞ্জ পৌঁছালাম। জাহাজে একজন ছাত্রলীগ কর্মীর সাথে দেখা হয়ে গেল। সে সবকিছু জানত, তার কাছে আমাদের দুইজনের মালপত্র দিয়ে বললাম, "১৫০ নম্বর মোগলটুলীতে শওকত মিয়ার কাছে চুপ করে পৌঁছে দিতে। নারায়ণগঞ্জ দিনেরবেলায় নামলে আর ঢাকা যেতে হবে না, সোজা জেলখানায়। পরোপকারী শওকত মিয়া যেন আমার জন্য থাকার বন্দোবস্ত করে রাখে। আর যদি পারে সন্ধ্যার সময় যেন নারায়ণগঞ্জে খান সাহেব ওসমান আলীর বাড়িতে আসে। খান সাহেবের বড় ছেলে শামসুজ্জোহাকেও খবর দিতে বোলো। সন্ধ্যায় যেন সে বাড়িতে থাকে।"

আমরা মুন্সিগঞ্জে নেমে মীরকাদিম হেঁটে আসলাম। সেখানে এক আত্মীয়ের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করে সন্ধ্যার একটু পূর্বে নৌকায় নারায়ণগঞ্জ রওয়ানা করলাম। সন্ধ্যার পরে নারায়ণগঞ্জ পৌঁছে রিকশা নিয়ে সোজা খান সাহেবের বাড়িতে পৌঁছালাম। জোহা সাহেব খবর পায় নাই, তার ছোট ভাই মোস্তফা সরোয়ার তখন স্কুলের ছাত্র। আমাকে জানত। তাড়াতাড়ি জোহা সাহেবকে খবর দিয়ে আনল। আমরা ভিতরের রুমে বসে বসে চা-নাশতা খেলাম। খান সাহেবের বাড়ি ছিল আমাদের আস্তানা। ক্লান্ত হয়ে এখানে গেলেই যে কোনো কর্মীর খাবার ও থাকার ব্যবস্থা হত। ভদ্রলোকের ব্যবসা-বাণিজ্য নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু প্রাণটা ছিল অনেক বড়। জোহা সাহেব এসেই ট্যাক্সি তাড়া করে আনল, আমাদের তুলে দিল। শওকত মিয়ার জন্য একটু দেরিও করেছিলাম। আমরা ঢাকায় রওয়ানা করার কয়েক মিনিট পরে শওকত মিয়াও নারায়ণগঞ্জ এসে পৌঁছাল এবং আমাদের চলে যাবার খবর পেয়ে আবার ঢাকায় ছুটল। আমরা পথে ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে রিকশা নিয়ে মোগলটুলী পৌঁছালাম। দেখি আমাদের মালপত্র পৌঁছে গেছে। শওকত মিয়াও এসে পৌঁছে গেছে। শওকত মিয়া আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, "মুজিব ভাই, কি করে লাহোরে

পৌঁছালেন, আর কি করে ফিরে এলেন, বলুন শুনি।" আমি বললাম, "প্রথমে বলেন, মওলানা সাহেব ও হক সাহেব কেমন আছেন? কে কে জেলে আছে। আওয়ামী লীগের খবর কি?" শওকত মিয়া যা বলল তাতে দুঃখই পেলাম, কিন্তু অখুশি হলাম না।

আওয়ামী লীগে যে ভদ্রলোকদের মওলানা সাহেব কার্যকরী কমিটির সভ্য করেছিলেন তাঁদের মধ্য থেকে প্রায় বার-তেরজন পদত্যাগ করেছেন ভয় পেয়ে। যাঁরা অনেক দিনের পুরানা নেতা ছিলেন, তাঁরা শুধু পদত্যাগই করেন নাই, বিবৃতি দিয়ে পদত্যাগ করেছেন, যাতে গ্রেফতার না হতে হয়। শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক সাহেব সদস্য হওয়ার পরপরই একদিন মওলানা সাহেব ও আমাদের সাথে আলাপ করলেন এবং বললেন, "আমি আর্থিক অসুবিধায় আছি। এডভোকেট জেনারেলের চাকরিটা নিচ্ছি। আমার পক্ষে রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা সম্ভব হবে না। আপাতত আমি সদস্য থাকব না। তবে আমার দোয়া ও সমর্থন রইল।" আমরা তাঁর অসুবিধা বুঝতে পারলাম। তিনি কষ্ট করে সভায়ও একদিন এসেছিলেন। এই সময় দেখা গেল আওয়ামী লীগে মওলানা ভাসানী, শামসুল হক সাহেব, আতাউর রহমান খান, আবদুস সালাম খান, আনোয়ারা খাতুন এমএলএ, খয়রাত হোসেন এমএলএ, আলী আহমদ খান এমএলএ, খোন্দকার মোশতাক আহমদ, ইয়ার মোহাম্মদ খান, নারায়ণগঞ্জের আবদুল আউয়াল, আলমাস আলী ও শামসুজ্জোহা এবং আমি ও আরও কয়েকজন রইলাম, যাদের নাম আমি মনে করতে পারছি না।

শওকত মিয়া আমার জন্য থাকার বন্দোবস্ত করেছে। রাতে সেখানে কাটালাম। দিনে ঘরে থাকি, রাতে সকলের সাথে দেখা করি। কি করা যায় সেই সম্বন্ধে পরামর্শ করি। মানিক ভাই মোগলটুলীতেই আছেন, কি করবেন, ঠিক করতে পারছেন না। আবদুল হালিমও আমাকে কয়েকদিন রাখল ওর বাড়িতে। কয়েকজন ভদ্রলোক ওয়াদা করেছিলেন কিছু টাকা বন্দোবস্ত করে দিবেন। একদিন রাতে হঠাৎ আমার এক বন্ধু বড় সরকারি কর্মচারীর বাড়িতে পৌঁছালাম, আমাকে দেখে তো অবাক হয়ে গেলেন। তিনি ভয় পাওয়ার লোক ছিলেন না। আমাকে খুবই ভালবাসতেন। তিনি আমাদের অবস্থা জানতেন, তাঁর সহানুভূতিও ছিল আমাদের উপরে। তাড়াতাড়ি চলে এলাম, এভাবে পালিয়ে বেড়াতে ইচ্ছা হল না, আর ভালও লাগছিল না। আমি আবদুল হামিদ চৌধুরী ও মোল্লা জালালউদ্দিনকে বললাম, তোমাদের কাছেই থাকব। তারা তখন আলী আমজাদ খান সাহেবের পুরানা বাড়ি খাজে দেওয়ানে নিচের তলায় থাকত। আমি চলে আসলাম ওদের কাছে। দিনভর বই পড়তাম, রাতে ঘুরে বেড়াতাম। ঠিক হল, আরমানিটোলা ময়দানে একটা সভা ডাকা হবে। আমি সেখানে বক্তৃতা করব এবং গ্রেফতার হব। যখন সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে, দু'একদিনের মধ্যে সভা ডাকা হবে, দুপুরবেলা বসে আছি, দেখি পুলিশ বাড়ি ঘেরাও করেছে। দুইজন গোয়েন্দা বিভাগের কর্মচারী সাদা পোশাক পরে ভিতরে আসছেন। আমি যে ঘরে থাকি, সেই ঘরে এসে দরজায় টোকা মারলেন। আমি বললাম, ভিতরে আসুন। তারা ভিতরে আসলে বললাম, "কয়েকদিন পর্যন্ত আপনাদের অপেক্ষায় আছি। বসুন, কিছু খেয়ে নিতে হবে। এখন বেলা দুইটা, কিছুই খাই নাই। খাবার আনতে গেছে।"

হামিদ খাবার আনতে গিয়েছিল হোটেল থেকে, পুলিশ দেখে খাবার নিয়ে ভেগে গেছে। ভদ্রলোকেরা কতক্ষণ দেরি করবে? হামিদ যখন আর আসছে না, জালালও বাইরে গেছে, কখন ফিরবে ঠিক নাই তাই আলী আমজাদ খান সাহেবের বড় ছেলে হেনরীকে খবর দিলাম। হেনরী ছুটে এসেছে। আমি যে কিছুই খাই নাই, একথা শুনে বাড়িতে যেয়ে খাবার নিয়ে আসল। কিছু খেয়ে নিলাম। হেনরীর ছোট ভাই শাহজাহান, বোধহয় সপ্তম শ্রেণীতে পড়ে, সেও এসেছে এবং তার মামুকে গালাগালি করতে শুরু করেছে। তার মামা এই বাড়ির দোতলায় থাকত। শাহজাহান বলতে লাগল, "আর কেউ পুলিশকে খবর দেয় নাই, মামাই দিয়েছে। বাবা বাড়িতে আসুক ওকে মজা দেখাব।" শাহজাহান আমাকে খুব ভালবাসত, সময় পেলেই আমার কাছে ছুটে আসত। আমি যখন পুলিশের গাড়িতে উঠে চলে যাই, শাহজাহান কেঁদে দিয়েছিল। আমার খুব খারাপ লেগেছিল। শাজাহানের ঐ কান্নার কথা কোনোদিন ভুলতে পারি নাই। পরে খবর পেয়েছিলাম, ওর মামাই টাকার লোভে আমাকে ধরিয়ে দিয়েছিল। আলী আমজাদ সাহেব ও আনোয়ারা বেগম ওকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

আমাকে লালবাগ থানায় নিয়ে আসল। দুইজন আইবি অফিসার আমাকে ইন্টারোগেশন করতে শুরু করল। প্রায় দুই ঘণ্টা পর্যন্ত সে পর্ব চলল। আমি বললাম, "আওয়ামী লীগ করব। আমি লাহোর গিয়েছিলাম কি না? কোথায় ছিলাম? কি কি করেছি? ঢাকায় কবে এসেছি? বাড়িতে কতদিন ছিলাম? ভবিষ্যতে কি করব? সোহরাওয়ার্দী সাহেব কি কি বলেছেন? এইসব প্রশ্নে যে কথা বলার সেটুকু বললাম, যা বলবার চাই না সে কথার উত্তর দিলাম না। আমাকে নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার দেখাল এবং সন্ধ্যার পরে কোতোয়ালি থানায় নিয়ে গেল। রাতে আমাকে থানায় রাখল। জালাল আমার সুটকেস ও বিছানা থানায় পৌঁছে দিল। সন্ধ্যার পরে আনোয়ারা খাতুন এমএলএ, আতাউর রহমান খান সাহেব, আমার বিয়াই দত্তপাড়ার জমিদার শামসুদ্দিন আহমদ চৌধুরী এমএলএ আমাকে দেখতে থানায় এসেছিলেন। রাতে জনাব সিদ্দিক দেওয়ান, বোধহয় তখন ইন্সপেক্টর ছিলেন, বাড়ির থেকে বিছানা, মশারি এনে দিলেন। আমার বিছানাও এসে গিয়েছিল, কোনো অসুবিধা হয় নাই। তিনি ও অন্যান্য পুলিশ কর্মচারী আমার সাথে খুবই ভাল ব্যবহার করেছিলেন, যাতে কোনো অসুবিধা না হয় তার দিকে সকলেই নজর দিয়েছিলেন।



পরের দিন দুপুরবেলায় আমাকে ঢাকা জেলে পাঠিয়ে দিল। আমি জেলে আসার পরে শুনলাম, আমাকে ডিটিশন দেয় নাই। সাধারণ কয়েদি হিসাবে থাকতে হবে। তখনও রাজনৈতিক বন্দিদের জন্য কোনো স্ট্যাটাস দেওয়া হয় নাই। যাকে ইচ্ছা ডিটিশন দিতে পারে সরকার, আর না দিলে সাধারণ কয়েদি হিসাবে জেল খাটতে হবে। সাধারণ কয়েদিরা যা খায় তাই খেতে হবে। দুপুরে কিছুই খেলাম না। আমাকে হাজতে রাখা হয়েছে সাধারণ কয়েদিদের সাথে। আরও দুই তিনজন রাজনৈতিক কর্মীও সেখানে ছিল। তারা আমাকে

তাদের কাছে নিয়ে রাখল। রাতে ওদের সাথেই কিছু খেলাম, কারণ খুবই ক্ষুধা পেয়েছিল। মওলানা সাহেব ও শামসুল হক সাহেব পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডে আছেন। তাঁদের ডিভিশন দেওয়া হয়েছে। আমাকে ডিভিশন দেওয়া হয় নাই বলে তাঁদের কাছে রাখা হয় নাই।

খুব ভোরে একজন জমাদার সাহেব এসে বললেন, "চলুন আপনাকে অন্য জায়গায় নিতে হবে।" আমি বললাম, "কোথায় যেতে হবে বলেন, তারপর যাব।" তিনি বললেন, "আপনার ডিভিশন অর্ডার এসে গেছে রাতেই। মওলানা সাহেবের কাছে আপনাকে নিয়ে যাওয়ার হুকুম হয়েছে। এর বেশি আমি জানি না।" আমি অন্যদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। যে দুই তিনজন রাজনৈতিক কর্মী সেখানে ছিল তাদের নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করে নাই। মামলা আছে, দুই একদিনের মধ্যে জামিন পেয়ে যাবে বলে আশা করে। আমি মওলানা সাহেব ও শামসুল হক সাহেবের কাছে এলাম। একই রুমে আমরা থাকব। শামসুল হক সাহেবের কাছে বিছানা করলাম, কারণ আমি সিগারেট খাই। মওলানা সাহেবের সামনে সিগারেট খাই না।

১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর মাসে আমি জেলে আসলাম। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান হয়েছে। আমার তিনবার জেলে আসতে হল, এইবার নিয়ে। মওলানা সাহেবের কাছে সকল কিছুই বললাম। মওলানা সাহেব এক এক করে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। সোহরাওয়ার্দী সাহেব কি বলেছেন? পীর মানকী শরীফের মতামত কি? মিয়া সাহেব রাজনীতি করবেন কি না? নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ গঠন হবে কি না? হলে, কতদিন লাগবে? লাহোরে কোথায় ছিলাম? ঢাকার খবর কি? মওলানা সাহেবের কাছে শুনলাম, আমাদের বিরুদ্ধে একটা মামলা দায়ের করা হয়েছে। মওলানা সাহেব, শামসুল হক সাহেব, আবদুর রব, ফজলুল হক বিএসসি ও আমি আসামি। আবদুর রব ও ফজলুল হককে জামিন দিয়েছে। নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করে নাই, তাই তারা বাইরে আছে। মামলা শুরু হয় নাই, কারণ আমাকে গ্রেফতার করতে পারে নাই। নাজিরা বাজারে পুলিশের সাথে ১১ই অক্টোবর তারিখে যে গোলমাল হয় তার উপর ভিত্তি করেই মামলা দায়ের করেছে।

যে কামরায় আমরা আছি সেখানে আমরা তিনজন ছাড়াও কয়েকজন ডিভিশন কয়েদি আছে। এদের কয়েকজনের বিশ বৎসর জেল, আর কয়েকজনের অল্প শাস্তি হয়েছে। এদের আর্থিক অবস্থা ভাল বলে সরকার ডিভিশন দিয়েছে এবং এরাও আমাদের মত খাট, মশারি, বিছানা, সাদা কাপড় পায়। এদের মধ্যে একজন ম্যানেজার আছে, সে আমাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা এবং দেখাশোনা করে। আমাদের দিন ভালভাবেই কাটছিল। শামসুল হক সাহেব আমার উপর খুব রাগ করেছিলেন। কারণ, কেন আমি শোভাযাত্রা করতে প্রস্তাব দিয়েছিলাম। শোভাযাত্রা না করলে তো গোলমাল হত না। আর আমাদের জেলে আসতে হত না এই সময়।

শামসুল হক সাহেব মাত্র দেড় মাস পূর্বে বিবাহ করেছিলেন। হক সাহেব ও তাঁর বেগম আফিয়া খাতুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করতেন। একে অন্যকে পছন্দ করেই বিবাহ করেছিলেন। আমাকে বেশি কিছু বললে আমি তাঁকে 'বউ পাগলা' বলতাম। তিনি

ক্ষেপে আমাকে অনেক কিছু বলতেন ; মওলানা সাহেব হাসতেন, তাতে তিনি আরও রাগ করতেন এবং মওলানা সাহেবকে কড়া কথা বলে ফেলতেন। মওলানা সাহেবের সাথে আমরা তিনজনই নামাজ পড়তাম। মওলানা সাহেব মাগরিবের নামাজের পরে কোরআন মজিদের অর্থ করে আমাদের বোঝাতেন। রোজই এটা আমাদের জন্য বাঁধা নিয়ম ছিল। শামসুল হক সাহেবকে নিয়ে বিপদ হত। এক ঘণ্টার কমে কোনো নামাজই শেষ করতে পারতেন না। এক একটা সেজদায় আট-দশ মিনিট লাগিয়ে দিতেন। মাঝে মাঝে চক্ষু বুজে বসে থাকতেন।

আমাদের মামলা শুরু হয়ে গেছে, পনের দিন পর পর কোর্টে যেতে হত। কোর্ট হাজতের বারান্দায় আমাদের চেয়ার দেওয়া হত। তাড়াতাড়ি আমাদের আবার পাঠিয়ে দিত।

অনেক সহকর্মী আমাদের সাথে দেখা করতে আসত। ছাত্রলীগ কর্মীরা প্রায় তারিখেই আসত। আতাউর রহমান সাহেব আমাদের পক্ষে মামলা পরিচালনা করতেন। যেদিন হক সাহেবের সাথে তাঁর বেগম দেখা করতে আসতেন, সেদিন হক সাহেবের সাথে কথা বলা কষ্টকর হত। সত্যই আমার দুঃখ হত। দেড় মাসও একসাথে থাকতে পারল না বেচারী! একে অন্যকে যথেষ্ট ভালবাসত বলে মনে হয়। আমি বেগম হককে ভাবী বলতাম, ভাবী আমাকেও দু'একখানা বই পাঠাতেন। হক সাহেবকে বলে দিতেন, আমার কিছু দরকার হলে যেন খবর দেই। আমি ফুলের বাগান করতাম। তাদের দেখা হবার দিনে ফুল তুলে হয় ফুলের মালা, না হয় তোড়া বানিয়ে দিতাম। হক সাহেব জেলের আবদ্ধ অবস্থা আর সহ্য করতে পারছিলেন না।

তিনি এক নতুন উৎপাত শুরু করলেন। রাতে বারটার পরে জিকির করতেন। আল্লাহু, আল্লাহু করে জোরে জিকির করতে থাকতেন। এক ঘণ্টা থেকে দুই ঘণ্টা পর্যন্ত। অনেক সময় মধ্যরাতেও শুরু করতেন। আমরা দশ-পনেরজন কেউই ঘুমাতে পারতাম না। প্রথম কয়েকদিন কেউ কিছু বলে নাই। কয়েদিরা দিনভর কাজ করে। তারা না ঘুমিয়ে পারে না। মওলানা সাহেবের কাছে গোপনে নালিশ করল এবং বলল এবাদত মনে মনে করলেও তো চলে, আমরা ঘুমাতে পারছি না। মওলানা সাহেব হক সাহেবকে বললেন, মনে মনে এবাদত করতে। হক সাহেব শুনলেন না। আমার খাট আর হক সাহেবের খাট পাশাপাশি। আমার পাশে জায়নামাজ বিছিয়ে তিনি শুরু করতেন। আধ ঘণ্টা মাত্র ঘুমিয়েছি, হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়। আর শুনতে পাই, কানের কাছে হক সাহেব জোরে জোরে জিকির করছেন। কি করব? আমার তো চুপ করে অত্যাচার সহ্য করা ছাড়া উপায় নাই। যখন আরম্ভ করেন একটানা দশ-পনের দিন পর্যন্ত চলে। একদিন দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পরে হক সাহেবকে বললাম, "এভাবে চলবে কেমন করে? রাতে ঘুমাতে না পারলে শরীরটা তো নষ্ট হয়ে যাবে।" তিনি রাগ করে বললেন, "আমার জিকির করতে হবে, যা ইচ্ছা কর। এখান থেকে অন্য কোথাও চলে যাও। আমি তখন কিছুই বললাম না, কিছু সময় পরে বললাম, রাতে যখন জিকির করবেন আমি উঠে আপনার মাথায় পানি ঢেলে দেব, যা হবার হবে। তিনি রাগ করলেন না, আস্তে আস্তে আমাকে বললেন, "বুঝতে পারছ না কিছুই, আমি সাধনা

করছি। একদিন ফল দেখবা।" কি আর করা যাবে নীরবে সহ্য করা ছাড়া! হক সাহেবের শরীর খারাপ হয়ে চলেছে।

আমরা যখন জেলে তখন এক রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হল, কলকাতা ও ঢাকায়। কলকাতায় নিরপরাধ মুসলমান এবং ঢাকায় ও বরিশালে নিরপরাধ হিন্দু মারা গেল। কে বা কারা রটিয়ে দিয়েছিল যে, শেরে বাংলা ফজলুল হক সাহেবকে কলকাতায় হত্যা করেছে। আর যায় কোথায়! মুসলমানরাও ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাদের অনেক লোককে গ্রেফতার করে আনল ঢাকা জেলে। আমরা যেখানে থাকি সেই পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডেই এদের দিনেরবেলায় রাখত। আমার মনে হয়, সাত-আটশত লোককে গ্রেফতার করেছে। আমি তাদের সাথে বসে আলাপ করতাম। সকলেই অপরাধী নয়, এর মধ্যে সামান্য কিছু লোকই দোষী। সাধারণত দোষী ব্যক্তিরা গ্রেফতার বেশি হয় না। রাস্তার নিরীহ লোকই বেশি গ্রেফতার হয়। তাদের কাছে বসে বলি, দাঙ্গা করা উচিত না; যে কোনো দোষ করে না, তাকে হত্যা করা পাপ। মুসলমানরা কোনো নিরপরাধীকে অত্যাচার করতে পারে না, আল্লাহ ও রসুল নিষেধ করে দিয়েছেন। হিন্দুদেরও আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। তারাও মানুষ। হিন্দুস্তানের হিন্দুরা অন্যায় করবে বলে আমরাও অন্যায় করব—এটা হতে পারে না। ঢাকার অনেক নামকরা গুণ্ডা প্রকৃতির লোকেদের সাথে আলাপ হল, তারা অনেকেই আমাকে কথা দিল, আর কোনোদিন দাঙ্গা করবে না। জানি না, তারা আমার কথা রেখেছে কি না? তবে কয়েকজন যে আমার খুবই ভক্ত হয়ে গিয়েছিল তার প্রমাণ আমি জেল থেকে বের হয়ে পেয়েছি। এরা আমাকে রীতিমত ভক্তি করতে শুরু করেছে। আপদে বিপদে আমার পাশেও দাঁড়িয়েছে বিপদ ঘাড়ে নিয়ে। জেল কর্তৃপক্ষ আমাদের সাথে এদের মেলামেশা পছন্দ করছিল না। একদিন সকালে আমাদের এখান থেকে নিয়ে গেল নতুন বিশ নম্বর সেলে। সেলগুলি খুবই ভাল ছিল, নিচতলায় দশটা সেল, তার উপরে দশটা সেল। মওলানা সাহেব দোতলায় একটা সেল নিলেন। আমাকে পাশের সেলে থাকতে বললেন। হক সাহেব আমার পাশের সেলে থাকবেন ঠিক করলেন এবং বললেন, "খুব ভাল হয়েছে। এখন আমি রাতভর জিকির করব, কেউ কিছু বলতে পারবে না।" আমি ভাবলাম, মহাবিপদ! তাঁকে বললাম, "হয় আপনি উপরে থাকেন, না হয় আমি উপরে থাকব। আমার পাশের সেল থেকে যদি শুরু করেন, তবে ঘুমের কাজ হয়েছে।" হক সাহেব রাগ করে নিচে চলে গেলেন এবং এক পাশের একটা সেল নিলেন। আমি তাঁকে অনেক অনুরোধ করলাম, মওলানা সাহেবও বললেন, কিছুতেই শুনলেন না। এখন থেকে তিনি আরও জোরে জোরে জিকির করতে লাগলেন। আর তার উৎপাতে আমরা ঘুমাতে পারি না।

কয়েকদিন পরে হাজী দানেশ সাহেবকে ঢাকা জেলে এনে আমাদের সাথে রেখেছে। দুই দিন পরেই আবার তাঁকে আমাদের কাছ থেকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হল। কারণ, সরকারি হুকুমে আমাদের সাথে কাউকেও রাখা চলবে না। বিশেষ করে সরকারের মতে যারা কমিউনিস্ট, তাদের সাথে তো রাখা চলবেই না। তাহলে আমরা যদি কমিউনিস্ট হয়ে যাই! জেলের মধ্যে আরও দুই-তিন জায়গায় রাজনৈতিক বন্দিদের রাখা হয়েছে,

আলাদা আলাদা করে। এই প্রথম আমি সেলে থাকি। 'জেলের মধ্যে জেল, তাকেই বলে সেল'। প্রায় দুই মাস পরে যখন দাঙ্গার আসামিরা প্রায়ই জামিন পেয়ে বাইরে গেছে, আর যে সামান্য কয়েকজন আছে তাদের পাঁচ নম্বর ওয়ার্ড থেকে চার নম্বর ওয়ার্ডে নিয়ে গিয়েছে তখন আমাদের আবার পুরানা পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া হল।

তিনতলা বিরাট দালান। তিনতলায় ছোট ছোট ছেলেদের রাখে। আর দো'তলার একপাশে আমরা থাকি, একপাশে জেলের অফিস। নিচের তলায় গুদাম। জেলে যে সমস্ত জিনিস তৈরি করে কয়েদিরা, তা এখানেই রাখে। পূর্ব বাংলার একমাত্র কম্বল ফ্যাক্টরি ঢাকা জেলের ভিতরে। কয়েদিরা সুন্দর সুন্দর কম্বল তৈরি করে। দর্জিদের একটা দল আছে। প্রায় একশত লোক কাজ করে এই দর্জি দফায়। পুলিশ, চৌকিদার ও সরকারের অন্যান্য বিভাগের ইউনিফর্ম এখানে তৈরি হয়। ঢাকা জেলের কাঠের মিস্ত্রিরা ভাল ভাল খাট, টেবিল, চেয়ার তৈরি করে। এখানে বেতের কাজও হয়। একজন ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট এই সকল কাজের দায়িত্ব নিয়ে আছেন। এই ডিপার্টমেন্টকে কয়েদিরা এক কথায় 'এএসডি' বলে থাকে। আমি নিচে বেড়াতাম এবং এই সমস্ত জিনিস দেখতাম। দোতলা থেকে নামলেই এই গুদাম। এর পাশেও একটা অফিস।

আমি একটা ফুলের বাগান শুরু করেছিলাম। এখানে কোনো ফুলের বাগান ছিল না। জমাদার সিপাহিদের দিয়ে আমি ওয়ার্ড থেকে ফুলের গাছ আনাতাম। আমার বাগানটা খুব সুন্দর হয়েছিল। এই ওয়ার্ডের দেয়ালের পাশেই সরকারি প্রেস ছিল। এটা জেলের একটা অংশ। ভিতরে দেওয়াল দিয়ে বাইরে একটা দরজা করে দেওয়া হয়েছে। প্রেসের শব্দ পেতাম, কিন্তু প্রেস দেখতে পারতাম না। সকালবেলা যখন কর্মচারীরা আসতেন এবং বিকালে ছুটির পর যখন যেতেন আমি জানালা দিয়ে তাঁদের দেখতাম। ওদের দেখলেই আমার মনে হত যে ওরা বড় জেলে, আর আমরা ছোট্ট জেলে আছি। স্বাধীন দেশের মানুষের ব্যক্তি ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা নাই, এর চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কি হতে পারে?

পাকিস্তানের নাগরিকদের বিনা বিচারে বৎসরের পর বৎসর কারাগারে বন্দি করে রাখা হয়েছে। ছয় মাস পর পর একটা করে হুকুমনামা সরকার থেকে আসে। ইংরেজ আমলেও রাজনৈতিক বন্দিদের কতগুলি সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হত, যা স্বাধীন দেশে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। রাজনৈতিক বন্দিদের খাওয়া-দাওয়া, কাপড়চোপড়, ঔষধ, খবরের কাগজ, খেলাধুলার সামগ্রী এমনকি এদের ফ্যামিলি এলাউন্সও দেওয়া হত ইংরেজ আমলে। নূরুল আমিন সাহেবের মুসলিম লীগ সরকার সেসব থেকেও বন্দিদের বঞ্চিত করেছেন। সাধারণ কয়েদি হিসাবে অনেককেই রাখা হয়েছিল। রাজনৈতিক বন্দিরা দেশের জন্য ও আদর্শের জন্য ত্যাগ স্বীকার করছে, একথা স্বীকার করতেও তাঁরা আপত্তি করছেন। এমনকি মুসলিম লীগ নেতারা বলতে শুরু করেছে, বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে জেল খাটলে সেটা হত দেশ দরদীর কাজ। এখন দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে জেল খাটছে যারা, তারা হল 'রাষ্ট্রদ্রোহী'। এদের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে না। ইংরেজের 'স্যার' ও 'খান বাহাদুর' উপাধিধারীরা সরকার গঠন করার সুযোগ পেয়ে আজ একথা বলছেন।

জনাব লিয়াকত আলী খান পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী এবং জনাব নূরুল আমিন পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। এদের আমলে যে নির্যাতন ও নিপীড়ন রাজনৈতিক বন্দিদের উপর হচ্ছে তা দুনিয়ার কোনো সভ্য দেশে কোনোদিন হয় নাই। রাজনৈতিক বন্দিরা যাতে কারাগারের মধ্যে ইংরেজ আমলের সুযোগ-সুবিধাটুকু পেতে পারে তার জন্য অনেক দরখাস্ত, অনেক দাবি করেছে কিন্তু কিছুতেই সরকার রাজি হল না। বাধ্য হয়ে তাদের অনশন ধর্মঘট করতে হয়েছিল। ১৯৪৯ সালে ৩৬৫ দিনের মধ্যে ২০০ দিন রাজনৈতিক বন্দিরা অনশন করে, যার ফলে ঢাকা জেলে শিবেন রায় মারা যান। যাঁরা বেঁচেছিলেন অনেকের স্বাস্থ্য চিরদিনের জন্য শেষ হয়ে গিয়েছিল। অনেকে পরে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হন। অনেকের মাথাও খারাপ হয়ে গিয়েছিল। খাদ্য ও চিকিৎসার অভাবে তাঁদের অবস্থা কি হয়েছিল তা ভুক্তভোগী ছাড়া কেউই বুঝতে পারবেন না।

১৯৫০ সালে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে খাপড়া ওয়ার্ডের কামরায় বন্ধ করে রাজনৈতিক বন্দিদের উপর গুলি করে সাতজনকে হত্যা করা হয়। যে কয়েকজন বেঁচেছিল তাদের এমনভাবে মারপিট করা হয়েছিল যে, জীবনের তরে তাদের স্বাস্থ্য শেষ হয়ে গিয়েছিল। বিভিন্ন জেলে অত্যাচার চলেছিল, রাজনৈতিক বন্দিরাও তাদের দাবি আদায়ের জন্য কারাগার থেকেই অনশন ধর্মঘট করছিল। রাজনৈতিক বন্দিদের অনেক পরিবারের ভিক্ষা করেও সংসার চালাতে হয়েছে। নিয়তির বলতে হবে! কারণ যাঁরা ইংরেজের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে আন্দামানে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করেছেন তাঁদের অনেকেই দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে স্বাধীন দেশের জেলে দিন কাটাতে বাধ্য হয়েছেন। লিয়াকত আলী খান তাঁর কথা রাখবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যারা আওয়ামী লীগ ও বিরোধী দল করবে তাদের 'শের কুচাল দেঙ্গে'—কথা তিনি ঠিকই রেখেছিলেন। মাথা ভাঙতে না পারলেও মাজা তেঙে দিয়েছিলেন, জেলে রেখে ও নির্যাতন করে। আমরা তিনজনই এর প্রতিবাদ করেছিলাম। মুসলিম লীগ সরকারের ইচ্ছা থাকলেও আমাদের খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট হয় নাই। কারণ, কিছু সংখ্যক সরকারি কর্মচারীর কিছুটা সহানুভূতি ছিল বলে মনে হয়েছিল। জেল কর্তৃপক্ষও আমাদের কষ্ট হোক তা চান নাই। আমীর হোসেন সাহেব সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন ঢাকা জেলে। আমাদের যাতে কোন কষ্ট না হয় তার দিকে নজর রাখতেন। মওলানা সাহেব ও আমাকে আমীর হোসেন সাহেব সপ্তাহে একদিন দেখতে আসলেই আমীর হোসেন সাহেবকে অনুরোধ করতাম যাতে অন্য রাজনৈতিক বন্দিদের কষ্ট না হয়। এদেরও অনেক অসুবিধা ছিল। কারণ, সরকার জেলের ভিতরও গোয়েন্দা রেখে খবর নিত। সেই ভয়েতে এরা কিছুই করতে চাইতেন না। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মৃত্যুর পরে লিয়াকত আলী খান সমস্ত ক্ষমতার মালিক হয়ে এক ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর হুকুম মত প্রাদেশিক সরকারের নেতারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে বিরোধী দলের নেতা ও কর্মীদের উপর। সীমান্ত প্রদেশ ও বাংলার জেল তখন রাজনৈতিক বন্দিতে প্রায় ভর্তি হয়ে গেছে।



আমরা আওয়ামী লীগ গঠন করার সাথে সাথে যে ড্রাফট পার্টি ম্যানিফেস্টো বের করেছিলাম, তাতে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের কথা থাকায় লিয়াকত আলী খান আরও ক্ষেপে গিয়েছিলেন। পূর্ব বাংলা সংখ্যাগুরু হওয়া সত্ত্বেও যে উদারতা দেখিয়েছিল দুনিয়ার কোথায়ও তাহার নজির নাই। প্রথম গণপরিষদে পূর্ব বাংলার মেম্বার সংখ্যা ছিল চুয়াল্লিশজন। আর পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত ও বেলুচিস্তান নিয়েছিল আঠাশজন। পূর্ব বাংলার কোটার চুয়াল্লিশজন থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের বাসিন্দাদের ছয়জন মেম্বার পূর্ব বাংলা নির্বাচিত করে দেয়। কেউই আপত্তি করে নাই। আমরা সংখ্যাগুরু থাকা সত্ত্বেও রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানের করাচিকে করা হয়। আমাদের সদস্যরা বা জনগণ আপত্তি করে নাই। কিন্তু যখন দেখলাম, শিল্প কারখানা যা কিছু হতে চলেছে সবই পশ্চিম পাকিস্তানেই গড়ে উঠতে শুরু করেছে, আর কয়েকজন মন্ত্রী ছাড়া পূর্ব বাংলার আর কেউ কোথায়ও নাই, বিশেষ করে বড় বড় সরকারি চাকরিতে পূর্ব বাংলাকে বঞ্চিত করা শুরু হয়ে গেছে।

লিয়াকত আলী খান বাঙালি ও পাঞ্জাবি সদস্যদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে রেখে শাসন করতে চাইছিলেন, কারণ তিনি রিফিউজি। তাঁকে বিশেষভাবে নির্ভর করতে হয়েছিল আমলাতন্ত্রের উপরে—যারা সকলেই পশ্চিম পাকিস্তানের। এই সকল বড় বড় কর্মচারী সকলেই মুসলমান ছিলেন। পূর্ব বাংলার জনগণ নিজের গ্রামের হিন্দু ও বড় কর্মচারীকে বিশ্বাস না করে মুসলমান হিসাবে পশ্চিম পাকিস্তানের কর্মচারীদের বিশ্বাস করেছিলেন। তার ফল হল, বাংলার মুসলমানকে ভাই বললে কি হবে, তারা তাদের নিজের অংশকে গড়তে সাহায্য করতে লাগল, বাঙালিদেরকে ফাঁকি দিয়ে।

১৯৫০ সালে গ্রান্ড ন্যাশনাল কনভেনশন ডাকা হয়েছিল ঢাকায়। পূর্ব বাংলার শিক্ষিত সমাজ, আওয়ামী লীগ সদস্যরা বিশেষ করে—আতাউর রহমান খান, কামরুদ্দিন আহমদ আরও অনেকে এ ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। জনাব হামিদুল হক চৌধুরী তখন মন্ত্রিত্বের পদ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনিও সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। *পাকিস্তান অবজারভার* তখন তিনি বের করেছেন। এতে অনেক সুবিধা হয়েছিল। গ্রান্ড ন্যাশনাল কনভেনশন থেকে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি করা হল। লিয়াকত আলী খান ঢাকায় আসলে এক প্রতিনিধিদল তাঁর সাথে দেখা করলেন এবং তাঁকে পূর্ব বাংলার দাবির কথা জানালেন। জনাব লিয়াকত আলী খান এই আন্দোলনকে ভাল চোখে দেখলেন না। সোহরাওয়ার্দী সাহেবও চুপ থাকার মত নেতা নন। তিনি জীবনভর সংগ্রাম করেছেন। পশ্চিম পাকিস্তানে তিনি একটা দল গঠন করতে সক্ষম হয়েছেন। করাচিতে একদল যুবক মোহাজের কর্মী তাঁর সাথে দেখা করে আওয়ামী লীগ গঠন করতে অনুরোধ করলেন। পাঞ্জাব ও সিন্ধের রাজনৈতিক কর্মীরা এগিয়ে আসলেন। নবাব মামদোতের দলও লিয়াকত আলী খানকে মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করেছিল। জনাব গোলাম মোহাম্মদ পাকিস্তান হওয়ার পূর্বে একজন সরকারি কর্মচারী ছিলেন। তাঁকে অর্থমন্ত্রী করার ফলে আমলাতন্ত্র মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মৃত্যুর সাথে সাথে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল।

চৌধুরী মোহাম্মদ আলী কেন্দ্রীয় সরকারের সেক্রেটারি জেনারেল হয়ে একটা শক্তিশালী সরকারি কর্মচারী গ্রুপ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পূর্ব বাংলায় জনাব আজিজ আহমদ চিফ সেক্রেটারি ছিলেন। সত্যিকার ক্ষমতা তিনিই ব্যবহার করতেন। জনাব নূরুল আমিন তাঁর কথা ছাড়া এক পা-ও নড়তেন না।



আমরা দিন কাটাচ্ছি জেলে। তখন আমাদের জন্য কথা বলারও কেউ ছিল বলে মনে হয় নাই। সোহরাওয়ার্দী সাহেব লাহোর থেকে একটা বিবৃতি দিলেন। আমরা খবরের কাগজে দেখলাম। আমাদের বিরুদ্ধে মামলাও চলছে। শামসুল হক সাহেবকে নিয়ে মওলানা সাহেব ও আমি খুব বিপদে পড়লাম। তাঁর স্বাস্থ্যও খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। প্রায় বাইশ পাউন্ড ওজন কম হয়ে গেছে। তারপরও রাততরই জিকির করেন। মাঝে মাঝে গরমের দিন দুপুরবেলা কম্বল দিয়ে সারা শরীর ঢেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুয়ে থাকতেন। মওলানা সাহেব ও আমি অনেক আলোচনা করলাম। আর কিছুদিন থাকলে পাগল হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। দু'একদিন আমার ওপর রাগ হয়ে বলে, "আমাকে না ছাড়লে বন্ড দিয়ে চলে যাব। তোমার ও ভাসানীর পাগলামির জন্য জেল খাটব নাকি?" একদিন সিভিল সার্জন আসলে মওলানা সাহেব ও আমি শামসুল হক সাহেবের অবস্থা বললাম। তার যেভাবে ওজন কমছে তাতে যে কোনো সময় বিপদ হতে পারে। তিনি বললেন, সরকার আমার কাছে রিপোর্ট না চাইলে তো আমি দিতে পারি না অথবা হক সাহেব দরখাস্ত করলে আমি আমার মতামত দিতে পারি। শামসুল হক সাহেব এক দরখাস্ত লিখে রেখেছিলেন, আমি ওটা দিতে নিষেধ করলাম, তিনি আমার কথা রাখলেন। তিনি আর একটা লিখলেন মুক্তি চেয়ে, স্বাস্থ্যগত কারণে। যদিও দুর্বলতা কিছুটা ধরা পড়ে, তবুও উপায় নাই। সিভিল সার্জন সাহেব সত্যিই তাঁর শরীর যে খারাপ হয়ে পড়েছিল তা লিখে দিলেন। পাঁচ-সাত দিন পরেই তার মুক্তির আদেশ আসল। তিনি মুক্তি পেয়ে চলে গেলেন। ভাসানী সাহেব ও আমি রইলাম। কোর্টে হক সাহেবের সাথে আমাদের দেখা হত। সরকার ভাবল, হক সাহেবের মত শক্ত লোক যখন নরম হয়েছে তখন ভাসানী এবং আমিও নরম হব। আমার মেজোবোন (শেখ ফজলুল হক মণির মা) ঢাকায় থাকতেন, আমাকে দেখতে আসতেন। আমি বাড়িতে সকলকে নিষেধ করে দিয়েছিলাম, তবুও আব্বা আমাকে দেখতে আসলেন একবার।

একদিন ভাসানী সাহেব ও আমি কোর্টে যেয়ে দেখি মানিক ভাই দাঁড়িয়ে আছেন, আমাদের সাথে দেখা করার জন্য। আলাপ-আলোচনা হওয়ার পরে মানিক ভাই বললেন, "নানা অসুবিধায় আছি, আমাদের দিকে খেয়াল করার কেউই নাই। আমি কি আর করতে পারব, একটা বড় চাকরি পেয়েছি করাচিতে চলে যেতে চাই, আপনারা কি বলেন।" আমি বললাম, "মানিক ভাই, আপনিও আমাদের জেলে রেখে চলে যাবেন? আমাদের দেখবারও কেউ

বোধহয় থাকবে না।" আমি জানতাম মানিক ভাই চারটা ছেলেমেয়ে নিয়ে খুবই অসুবিধায় আছেন। ছেলেমেয়েদের পিরোজপুর রেখে তিনি একলাই ঢাকায় আছেন। মানিক ভাই কিছু সময় চুপ করে থেকে আমাদের বললেন, "না, যাব না আপনাদের জেলে রেখে।"

মওলানা সাহেব সাপ্তাহিক *ইত্তেফাক* কাগজ বের করেছিলেন। কয়েক সপ্তাহ বের হওয়ার পরে বন্ধ হয়ে যায়। কারণ টাকা কোথায়? মানিক ভাইকে বললেন, কাগজটা তো বন্ধ হয়ে গেছে, যদি পার তুমিই চালাও। মানিক ভাই বললেন, কি করে চলবে, টাকা কোথায়, তবুও চেষ্টা করে দেখব। আমি মানিক ভাইকে আমার এক বন্ধু কর্মচারীর কথা বললাম, ভদ্রলোক আমাকে আপন ভাইয়ের মত ভালবাসতেন। কলকাতায় চাকরি করতেন, সোহরাওয়ার্দী সাহেবের ভক্ত ছিলেন। বাংলাদেশের বাসিন্দা নন তবুও বাংলাদেশকে ও তার জনগণকে তিনি ভালবাসতেন। আমার কথা বললে কিছু সাহায্য করতেও পারেন। মানিক ভাই পরের মামলার তারিখে বললেন যে, কাগজ তিনি চালাবেন। কাগজ বের করলেন। অনেক জায়গা থেকে টাকা জোগাড় করতে হয়েছিল। নিজেরও যা কিছু ছিল এই কাগজের জন্যই ব্যয় করতে লাগলেন। কিছুদিনের মধ্যে কাগজটা খুব জনপ্রিয় হতে লাগল। আওয়ামী লীগের সমর্থকরা তাঁকে সাহায্য করতে লাগল। এ কাগজ আমাদের জেলে দেওয়া হত না, আমি কোর্টে এসে কাগজ নিয়ে নিতাম এবং পড়তাম। সমস্ত জেলায় জেলায় কর্মীরা কাগজটা চালাতে শুরু করল। আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠানের কাগজ হিসাবে জনগণ একে ধরে নিল। মানিক ভাই ইংরেজি লিখতে ভালবাসতেন, বাংলা লিখতে চাইতেন না। সেই মানিক ভাই বাংলায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ কলামিস্টে পরিণত হলেন। চমৎকার লিখতে শুরু করলেন। নিজেই *ইত্তেফাকের* সম্পাদক ছিলেন। তাঁকে ছাত্রলীগের দুই-তিনজন কর্মী সাহায্য করত। টাকা পয়সার ব্যাপারে আমার বন্ধুই তাঁকে বেশি সাহায্য করতেন। বিজ্ঞাপন পাওয়া কষ্টকর ছিল, কারণ ব্যবসা-বাণিজ্য কোথায়? আর সরকারি বিজ্ঞাপন তো আওয়ামী লীগের কাগজে দিত না। তবুও মানিক ভাই কাগজটাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন একমাত্র তাঁর নিজের চেষ্টায়।

১৯৫০ সালের শেষের দিকে মামলার শুনানি শেষ হল। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব যে রায় দিলেন, তাতে মওলানা সাহেব ও শামসুল হক সাহেবকে মুক্তি দিলেন। আবদুর রউফ, ফজলুল হক ও আমাকে তিন মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হল। শাস্তি দিলেই বা কি আর না দিলেই বা কি? আমি তো নিরাপত্তা বন্দি আছিই। মওলানা সাহেবও জেলে ফিরে এলেন, কারণ তিনিও নিরাপত্তা বন্দি। আতাউর রহমান সাহেব, কামরুদ্দিন সাহেব ও আরও অনেকে মামলায় আমাদের পক্ষে ছিলেন। আমাকে ডিভিশন দেওয়া হয়েছিল। আপিল দায়ের করলেও আমাকে খাটতে হল। কিছুদিন পরে আমাকে গোপালগঞ্জ পাঠিয়ে দিল, কারণ গোপালগঞ্জে আরও একটা মামলা দায়ের করেছিল। মওলানা সাহেবের কাছে এতদিন থাকলাম। তাঁকে ছেড়ে যেতে খুব কষ্ট হল। কিন্তু উপায় নাই, যেতে হবে। আমি সাজাও ভোগ করছি এবং নিরাপত্তা বন্দিও আছি। ঢাকা জেলে আমাকে সুতা কাটতে দিয়েছিল। আমি যা পারতাম তাই করতাম। আমার খুব ভাল লাগত। বসে বসে খেতে

খেতে শরীর ও মন দুইটাই খারাপ হয়ে পড়ছিল। আমাকে নারায়ণগঞ্জ হয়ে খুলনা মেলে নিয়ে চলল। খুলনা মেল বরিশাল হয়ে যায়। বরিশালে আমার বোন ও অনেক আত্মীয় আছে। বেশি সময় জাহাজ বরিশালে থামে না, আর কাউকে পেলামও না। একজন রিকশাওয়ালাকে বলেছিলাম, আমার এক খালাতো ভাই, জাহাঙ্গীরকে খবর দিতে। জাহাঙ্গীরকে সকলে চিনে। জাহাজ ছাড়ার সময় দেখি ছুটে আসছে সাইকেল নিয়ে। সিঁড়ি টেনে দিয়েছে। দাঁড়িয়েই দুই মিনিট আলাপ করলাম। ও বলল, এই মাত্র খবর পেয়েছে। জাহাজ ছেড়ে দিল। আমার বাড়ির স্টেশন হয়েই যেতে হয়। আমার বাড়ি থেকে তিন স্টেশন পরেই গোপালগঞ্জ অনেক রাতে পৌঁছে। পাটগাতি স্টেশন থেকে আমরা ওঠানামা করি। আমাকে সকলেই জানে। স্টেশন মাস্টারকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমাদের বাড়ির খবর কিছু জানেন কি না? যা ভয় করেছিলাম তাই হল, পূর্বের রাতে আমার মা, আব্বা, রেণু ছেলেমেয়ে নিয়ে ঢাকায় রওয়ানা হয়ে গেছেন আমাকে দেখতে। এক জাহাজে আমি এসেছি। আর এক জাহাজে ওরা ঢাকা গিয়েছে। দুই জাহাজের দেখাও হয়েছে একই নদীতে। শুধু দেখা হল না আমাদের। এক বৎসর দেখি না ওদের। মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। বাড়িতে আর কাউকেও খবর দিলাম না। কিছুদিন পূর্বে রেণু লিখেছিল, ঢাকায় আসবে আমাকে দেখতে। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি হবে বুঝতে পারি নাই। অনেক রাতে মানিকদহ স্টেশনে পৌঁছালাম। সেখান থেকে কয়েক মাইল নৌকায় যেতে হয় গোপালগঞ্জ শহরে। আমাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল কয়েকজন বন্দুকধারী পুলিশ, একজন হাবিলদার, আর তাদের সাথে আছেন দুইজন গোয়েন্দা বিভাগের কর্মচারী, একজন দারোগা আর একজন বোধহয় তার আর্দালি বা বডিগার্ড হবে। আমরা শেষ রাতে গোপালগঞ্জ পৌঁছালাম। আমাকে পুলিশ লাইনে নিয়ে যাওয়া হল। পুলিশ লাইন থেকে আমার গোপালগঞ্জ বাড়িও খুবই কাছাকাছি। বাড়িতে কয়েকজন ছাত্র থাকে, লেখাপড়া করে। আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের অফিসও আমার বাড়িতে। আমার মনও খারাপ, আর ক্লান্তও ছিলাম। একটা খাট আমাকে ছেড়ে দিল। খুব যত্ন করল। তাড়াতাড়ি আমার বিছানাটাও করে দিল। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালবেলা উঠে হাত মুখ ধুয়ে প্রস্তুত হতে লাগলাম। খবর রটে গেছে গোপালগঞ্জ শহরে। পুলিশ লাইনের পাশেই শামসুল হক মোক্তার সাহেব থাকেন, তাঁকে সকলে বাসু মিয়া বলে জানেন। তাঁর স্ত্রীও আমাকে খুব স্নেহ করেন, তাঁকে আমি শাশুড়ি বলে ডাকতাম, আমার দূরসম্পর্কের আত্মীয়াও হতেন। ভদ্রমহিলা অমায়িক ও বুদ্ধিমতী। আমার জন্য তাড়াতাড়ি খাবার পাঠালেন। দশটার সময় আমাকে কোর্টে হাজির করল। অনেক লোক জমা হয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেট হুকুম দিলেন, আমাকে থানা এরিয়ার মধ্যে রাখতে। পরের দিন মামলার তারিখ। গোপালগঞ্জ সাবজেলে ডিটিশন কয়েদি ও নিরাপত্তা বন্দি রাখার কোনো ব্যবস্থাই নাই। কোর্ট থেকে থানা প্রায় এক মাইল, আমাকে হেঁটে যেতে হবে। অন্য কোনো ব্যবস্থা নাই। কারণ, তখন গোপালগঞ্জে রিকশাও চলত না। অনেক লোক আমার সাথে চলল। গোপালগঞ্জের প্রত্যেকটা জিনিসের সাথে আমি পরিচিত। এখানকার স্কুলে

লেখাপড়া করেছি, মাঠে খেলাধুলা করেছি, নদীতে সাঁতার কেটেছি, প্রতিটি মানুষকে আমি জানি আর তারাও আমাকে জানে। বাল্যস্মৃতি কেউ সহজে ভোলে না। এমন একটা বাড়ি হিন্দু-মুসলমানের নাই যা আমি জানতাম না। গোপালগঞ্জের প্রত্যেকটা জিনিসের সাথে আমার পরিচয়। এই শহরের আলো-বাতাসে আমি মানুষ হয়েছি। এখানেই আমার রাজনীতির হাতেখড়ি হয়েছে। নদীর পাড়েই কোর্ট ও মিশন স্কুল। এখন একটা কলেজ হয়েছে। ছাত্ররা লেখাপড়া ছেড়ে বের হয়ে পড়ল, আমাকে দেখতে। কিছুদূর পরেই দু'পাশে দোকান, প্রত্যেকটা দোকানদারের আমি নাম জানতাম। সকলকে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করতে করতেই থানার দিকে চললাম।

থানায় পৌঁছালেই দারোগা সাহেবরা আমাকে একটা ঘর দিলেন, যেখানে স্বাধীনতার পূর্বে রাজনৈতিক কর্মীদের নজরবন্দি রাখা হত। এই মহল্লায় আমি ছোট সময় ছিলাম। তখন নজরবন্দিদের সাথে আলাপ করতাম ও মিশতাম। আমি ছোট ছিলাম বলে কেউ কিছু বলত না। আজ ভাগ্যের পরিহাস আমাকেই সেই পুরানা ঘরে থাকিতে হল, স্বাধীনতা পাওয়ার পরে!

থানার পাশেই আমার এক মামার বাড়ি। তিনি নামকরা মোক্তার ছিলেন। তিনি আজ আর ইহজগতে নাই। আবদুস সালাম খান সাহেবের ভাই। আবদুর রাজ্জাক খান তাঁর নাম ছিল। অনেক লেখাপড়া করতেন, রাজনীতিও তিনি বুঝতেন। তাঁকে সকলেই ভালবাসত। এই রকম একজন নিঃস্বার্থ দেশসেবক খুব কম আমার চোখে পড়েছে। কোনোদিন কিছু চান নাই। আমি তাঁর উপর অনেক সময় অন্যায় করেছি, কিন্তু কোনোদিন রাগ করেন নাই। সালাম খান সাহেব ও তিনি আপন ভাই ছিলেন না, সৎ ভাই ছিলেন। কিন্তু কেউ বুঝতে পারত না কোনোদিন। সালাম সাহেব যখন আওয়ামী লীগ ত্যাগ করেছিলেন, তিনি দল ত্যাগ করেন নাই। একজন আদর্শবাদী লোক ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে গোপালগঞ্জ এতিম হয়ে গেছে বলতে হবে। লোকে তাঁকে খুব ভালবাসত ও বিশ্বাস করত। সরকারি কর্মচারীরাও তাঁকে শ্রদ্ধা করত। তাঁকে লোকে 'রাজা মিয়া' বলে ডাকত। আমি 'রাজা মামা' বলতাম। কোর্ট থেকে বাড়িতে খবর দিয়েছে। আমার খাবার তাঁর বাড়ি থেকেই থানায় আসবে। থানায় পৌঁছাবার পূর্বেই আমার নানী ও মামী খবব দিলেন, খাবার প্রস্তুত, গোসল হলেই খবর দিতে। আমি থানার বাইরে এসে দাঁড়িয়ে দেখি মামী ও নানী দাঁড়িয়ে আছেন। আমি সালাম দিলাম। থানার দুই পাশের রাস্তায় অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে আমাকে দেখতে। আমি বাইরে এসে সকলকে আদাব করলাম। তারপর সকলকেই শুভেচ্ছা জানিয়ে যে ঘরে থাকবার বন্দোবস্ত হয়েছে সেই ঘরে চলে যাই। বাড়ি থেকে লোক এসেছিল, সকল খবর নিলাম।

বহুদিন সূর্যাস্তের পরে বাইরে থাকতে পারি নাই। জেলের মধ্যে এক বৎসর হয়েছে, সন্ধ্যার পরে বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে দেয়। জানালা দিয়ে শুধু কিছু জ্যোৎস্না বা তারাগুলি দেখার চেষ্টা করেছি। আজ আর ঘরে যেতে ইচ্ছা হচ্ছে না। বাইরে বসে রইলাম, পুলিশ আমাকে পাহারা দিচ্ছে। পুলিশ কর্মচারী যিনি রাতে ডিউটি করছিলেন, তিনিও এসে বসলেন। অনেক আলাপ হল। বাইরে থেকে দু'একজন বন্ধুবান্ধবও এসেছিল। অনেক

রাতে শুতে যেয়ে দেখি, ঘুমাবার উপায় নাই। এক রুমে আমি আর এক রুমে ওয়্যারলেস মেশিন চলছে। খট খট শব্দ; কি আর করা যাবে! আবার বাইরে যেয়ে বসলাম। পরে যখন আর ভাল লাগছিল না, শুতে গেলাম। বাইরে শোবার ইচ্ছা করছিল, কিন্তু উপায় নাই। গোপালগঞ্জের মশা নামকরা। একটু সুযোগ পেলেই আর রক্ষা নাই। ভোর রাতের দিকে ঘুমিয়ে পড়লাম, অনেক বেলা করে উঠলাম। কোর্টে পরের দিন হাজিরা দিলাম, তারিখ পড়ে গেল। কারণ, ফরিদপুর থেকে কোর্ট ইন্সপেক্টর এসেছেন। তিনি জানালেন, সরকার পক্ষের থেকে মামলাটা পরিচালনা করবেন সরকারি উকিল রায় বাহাদুর বিনোদ ভদ্র। তিনি আসতে পারেন নাই। এক মাস পরে তারিখ পড়ল এবং আমাকে ফরিদপুর ডিস্ট্রিক্ট জেলে রাখবার হুকুম হল। আমাকে ফরিদপুর যেতে হবে, সেখান থেকেই মাসে মাসে আসতে হবে, মামলার তারিখের দিনে।

গোপালগঞ্জ মহকুমা যদিও ফরিদপুর জেলায়, কিন্তু কোন ভাল যাতায়াতের বন্দোবস্ত নাই। খুলনা থেকে গোপালগঞ্জে রোজ দুইবার জাহাজ আসে। বরিশাল থেকেও গোপালগঞ্জ সরাসরি জাহাজে যাওয়া যায়। গোপালগঞ্জ থেকে জাহাজে রওয়ানা করলাম মাদারীপুর। সিন্ধিয়াঘাট নামে একটা স্টেশনে নেমে রাতে সেখানে থাকতে হবে। পরের দিন সকালে লঞ্চে যেতে হবে তাঙ্গা নামে একটা স্থানে; সেখান থেকে ট্যাক্সিতে যেতে হবে ফরিদপুর। পুরা দেড় দিন লাগে। সন্ধ্যায় সিন্ধিয়াঘাট পৌঁছালাম, এখানে একটা ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টের ডাকবাংলো আছে। তিন নদীর মোহনায় এই ডাকবাংলোটাও তিন নদীর পাড়ে। আমি ডাকবাংলোয় রাত কাটাব ঠিক করলাম, পুলিশ ও গোয়েন্দা কর্মচারীরা রাজি হল, কারণ কোথায় রাখবে? এটা একটা বন্দর, ডাকবাংলোর চৌকিদার আমাকে জানত। একটা কামরায় একজন কর্মচারী থাকে, আর একটা কামরা আমাকে দেওয়া হল। পাশের গ্রামেও আমার কয়েকজন ভক্ত ছিল, তারা খবর পেয়ে ছুটে আসল। চৌকিদারকে খাবার বন্দোবস্ত করতে বললাম, সিপাহিরাও তাকে সাহায্য করল। কোরবান আলী ও আজহার নামে দুইজন কর্মীর বাড়ি ডাকবাংলোর কাছেই। তারা পীড়াপীড়ি করতে লাগল, তাদের ওখানে খেতে। আমি বললাম, আমার তো কোন আপত্তি নাই। তবে যাওয়া উচিত হবে না তোমাদের বাড়িতে। কারণ যারা আমাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে চলেছে সরকারের কাছে খবর গেলে তাদের চাকরি থাকবে না। বাড়ি থেকে তরকারি পাক করে দিয়েছিল। অনেক রাত পর্যন্ত বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে রইলাম নদীর দিকে মুখ করে। নৌকা যাচ্ছে আর নৌকা আসছে। পুলিশদের বললাম, "আমার জন্য চিন্তা করবেন না, ঘুমিয়ে থাকেন। আমাকে গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিলেও যাব না।" তারা সকলেই হেসে দিয়ে বলল, "আমরা তা জানি, আপনার জন্য আমরা চিন্তা করি না।"

বেশি সময় বসতে পারলাম না, কোথাও সাড়া শব্দ নাই। মাত্র এগারটা বাজে, মনে হল সারা দেশ ঘুমিয়ে পড়েছে। শুধু দু'একখানা নৌকা চলছে, তার শব্দ পাই।

ভোরবেলা উঠলাম, নয়টা-দশটার সময় মাদারীপুর থেকে লঞ্চ আসে। সেই লঞ্চেই তাঙ্গা যেতে হবে। লঞ্চ এল, আমরা উঠে পড়লাম। অনেক লোকের সাথে পরিচয় হল।

ভাঙ্গায় একটা দেওয়ানি আদালত আছে। এখানে আমার এক দূরসম্পর্কের ভাই ওকালতি করেন। ভাঙ্গার কাছেই নূরপুর গ্রাম। ওখানে আমার ফুপুর বাড়ি। আদালতের ঘাটেই লঞ্চ থামে। ভাই খবর পেয়ে এলেন, দেখা হল। ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে চললাম। ফুফাতো ভাইয়েরা খবর পায় নাই। ট্যাক্সি ঠিক করে ফরিদপুর রওয়ানা করলাম। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। রাতে জেলে আমাকে নাকি গ্রহণ করবে না। আমাকে পুলিশ লাইনে নিয়ে যাওয়া হল। তার একটা রুম—বোধহয় ক্লাবঘর হবে, সেখানে আমার থাকার বন্দোবস্ত করা হল। রিজার্ভ ইন্সপেক্টর যিনি ছিলেন, তিনি এসে আমার যাতে কোনো কষ্ট না হয় সেদিকে তাঁর লোকদের নজর রাখতে বললেন। আমি কাউকেও খবর দিলাম না। অনেকে আমাকে দেখতে আসল। যদিও ফরিদপুর শহরে আমার অনেক ঘনিষ্ঠ আত্মীয় রয়েছে। কিন্তু আমার জন্য কারও কোনো কষ্ট হয়, তা আমি কোনোদিন চাই নাই। সকালবেলা চা-নাশতার ব্যবস্থা করেছিল পুলিশ লাইনের সিপাহিরা। আমাকে খেতেই হল। মনে মনে ভাবলাম, আপনারা আমাকে ভালবাসেন। যাদের সাথে একসাথে কাজ করলাম, 'আমার মত কর্মী হয় না' এমন কত কথাই না বলেছে পাকিস্তান হওয়ার পূর্বে। তারা আজ আমাকে বিনা বিচারে জেলে তো রেখেছেই, আমার যাতে শাস্তি হয় তার জন্য চেষ্টা করতে একটুও ত্রুটি করছে না। তাদের কাছে বিদায় নিয়ে ফরিদপুর জেলে আসলাম। জেল কর্তৃপক্ষ পূর্বেই ডিআইজি থেকে খবর পেয়েছে। জেলগেটে পৌঁছালাম সকালবেলা। জেলার ও ডেপুটি জেলার সাহেব অফিসে। ডেপুটি জেলার সাহেবের কামরায় বসলাম। আমার কাগজপত্র দেখলেন। বললেন, আপনার তো সাজাও আছে তিন মাস। আবার নিরাপত্তা আইনেও আটক আছেন। বললাম, বেশি দিন সাজা নাই, এক মাসের বেশি বোধহয় হয়ে গেছে।

আমাকে কোথায় রাখা হবে তাই নিয়ে আলোচনা করলেন। বোধহয় টেলিফোনও করেছিলেন। কয়েকজন রাজনৈতিক বন্দিও একটা ওয়ার্ডে আছেন। আমাকে সেখানে রাখা হবে, না আলাদা রাখতে হবে? শেষ পর্যন্ত হাসপাতালের একটা কামরা খালি করতে হুকুম দিলেন, শুনলাম। আমার বাক্স, কাপড়, জামা তল্লাশি করে দেখা হল। আমি চুপ করে বসে আছি। একজন জমাদার এসে আমাকে বলল, আপনি এই কামরায় আসেন। আমি সেই কামরায় গেলে, সে এসে আমার পকেটে হাত দিল। আমি তাকে বললাম, "আপনি আমার গায়ে হাত দেবেন না। আপনি আমাকে তল্লাশি করতে পারেন না। আইনে নাই। জেলার সাহেব বা ডেপুটি জেলার সাহেব দরকার হলে আমাকে তল্লাশি করতে পারেন।" আমি রাগ করেই কথাটা বললাম, বেচারা ঘাবড়িয়ে গেছে। আমি বললাম, "কার হুকুমে আপনি আমার শরীরে হাত লাগালেন, আমি জানতে চাই!" একথা বলে ডেপুটি জেলারকে বললাম, "ব্যাপার কি? আপনি হুকুম দিয়েছেন?" ডেপুটি জেলার তাকে যেতে বললেন এবং আমাকে বললেন, "মনে কিছু করবেন না। ও জানে না।" ডেপুটি সাহেবকে বললাম, "দেখুন কি আছে আমার কাছে। সিগারেট, ম্যাচ ও রুমাল আছে।" তিনি লজ্জা পেয়েছিলেন। আমাকে তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিলেন।



আমি এই প্রথম ফরিদপুর জেলে আসলাম। হাসপাতালটা দোতলা। একতলার একটা রুমে আমি একাকী থাকব। অন্য রুমগুলিতে রোগীরা আছে। বারান্দা আছে, বাইরে বসতে পারব এটাই আমার ভাল লাগল। নিজের জেলা, কিছু কিছু চেনাশোনা লোক আছে। আমাকে একটা ফালতু দিয়েছিল, আমার খেদমত করার জন্য। আমার খাবার আসবে রাজনৈতিক বন্দিদের ওয়ার্ড থেকে। তাঁরা পাঁচ ছয়জন আছেন শুনলাম। বই আমার কাছে যা আছে তাই সম্বল। খবরের কাগজ দিতে বললাম। হাসপাতালের সামনে সামান্য জায়গা ছিল, একটা ফুলের বাগানও ছিল, তাকে যাতে আরও ভাল করা যায় তার তার নিলাম। সময় তো কাটাতে হবে, ভালই লাগছিল।

রাজনৈতিক বন্দিদের সাথে আমার দেখা হবার উপায় নাই। জেল বেশি বড় না হলেও তারা যেখানে থাকে সেখান থেকে দেখাশোনা হওয়ার উপায় নাই।

আমি তখন নামাজ পড়তাম এবং কোরআন তেলাওয়াত করতাম রোজ। কোরআন শরীফের বাংলা তরজমাও কয়েক খণ্ড ছিল আমার কাছে। ঢাকা জেলে শামসুল হক সাহেবের কাছ থেকে নিয়ে মওলানা মোহাম্মদ আলীর ইংরেজি তরজমাও পড়েছি।

জেলার সাহেব নিজে এসেই আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোনো অসুবিধা হলে তাঁকে বলতে। দিনেরবেলা জেলের ভিতর আমি ঘুমাতে চাই না। তবুও আজ ঘুমিয়ে পড়লাম, কারণ ক্লান্ত ছিলাম। বিকেলে ঘুম থেকে উঠে চা খেয়ে একটু হাঁটাচলা করলাম। সন্ধ্যার সময় তালা বন্ধ করে দিল। পাঁচজন কয়েদি পাহারা থাকবে আমার কামরায় এবং ফালতু থাকবে আমার কাজকর্ম করার জন্য। কয়েদি পাহারাদাররা দুই ঘণ্টা করে এক একজন পাহারা দিত, কামরার ভিতর থেকে। সিপাহি বাইরের থেকে জিজ্ঞাসা করবে, আর পাহারাদাররা চিৎকার করে বলবে, "জানালা বাতি ঠিক আছে।" কয়জন কয়েদি আছে তাও বলবে। আমি বলেছিলাম, "চিৎকার করতে পারবেন না, সিপাহিরা জিজ্ঞাসা করলে আস্তে বলবেন, আমার ঘুমের যেন অসুবিধা না হয়।" আমার এখানে চিৎকার কম করলে কি হবে, অন্যান্য ওয়ার্ডে ভীষণ চিৎকার করে। ভাগ্য ভাল ওয়ার্ডগুলি দূরে ছিল। তা না হলে উপায় থাকত না।

আমাকে একা রাখা হত শাস্তি দেওয়ার জন্য। কারাগারের অন্ধকার কামরায় একাকী থাকা যে কী কষ্টকর, ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ অনুভব করতে পারবে না। জেল কোডে আছে কোনো কয়েদিকে তিন মাসের বেশি একাকী রাখা চলবে না। কোনো কয়েদি জেল আইন ভঙ্গ করলে অনেক সময় জেল কর্মচারীরা শাস্তি দিয়ে সেলের মধ্যে একাকী রাখে। কিন্তু তিন মাসের বেশি রাখার হুকুম নাই।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে কিছু সময় হাঁটাচলা করে বারান্দায় বসে চা খাচ্ছিলাম, এমন সময় একজন আধাবুড়া কয়েদি, সেও হাসপাতালে ভর্তি আছে, আমার কাছে এল এবং মাটিতে বসে পড়ল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার বাড়ি কোথায়? বললেন, "বাড়ি গোপালগঞ্জ থানায়, তেন্নাবাড়ী গ্রামে, নাম রহিম।" আমি বললাম, আপনার নামই 'রহিম মিয়া'? রহিম মিয়া নামে তাকে সকলেই জানে। এত বড় ডাকাত গোপালগঞ্জ

মহকুমায় আর পয়দা হয় নাই। তার নাম শুনলেই লোকে ভয় পেয়ে থাকত। রহিম মিয়া চুরি বেশি করত। তবে বাধা দিলে ডাকাতি করত। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "রহিম মিয়া আপনিই না আমাদের বাড়িতে চুরি করে সর্বস্ব নিয়ে এসেছিলেন।" রহিম মিয়া কোন কথা না বলে চুপ করে রইলেন অনেকক্ষণ। ১৯৩৮-১৯৩৯ সালে আমার মা, বড়বোন এবং অন্যান্য বোনদের সোয়াশ' তরি সোনার গহনা এবং আমার মার নগদ কয়েক হাজার টাকা চুরি হয়ে যায়। আব্বা তখন গোপালগঞ্জ ছিলেন। আমাদের বাড়ির দুই চারশত বৎসরের ইতিহাসে কোনোদিন চুরি হয় নাই। এই প্রথম চুরি। রহিম মিয়া আস্তে আস্তে বললেন, "হ্যাঁ আমি চুরি করেছিলাম।" আমি বললাম, "আমাদের বাড়িতেও সাহস করে এলেন কি করে? আমাদের ঘরে বন্দুক আছে। অনেক শরিকদের বাড়িতে বন্দুক আছে। এত বড় বাড়ি, কত লোক।" সে বলল, "গ্রামের লোক এবং আপনাদের বাড়ির লোক সাথে ছিল। আমরা দুই দিন পরে খবর পেয়েছিলাম, আমাদের এক প্রজা, আমাদের গ্রামের মানুষ—অনেক দিন আমাদের বাড়িতে কাজ করেছে, সে তখন কেরায়া নৌকা চালাত, তার নিজের নৌকায় রহিম ও তার দলকে নিয়ে আসে। চুরি হওয়ার তিন দিন পরে সে আমাদের বাড়িতে এসে ঘটনার কথা স্বীকার করে। মালসহ ধরা না পড়ার জন্য মামলায় কিছু হল না। থানার এক দারোগাই কেস নষ্ট করেছিল। রহিমকে ধরতে পারলে গহনা কিছু পাওয়া যেত। অনেক দিন তাকে ধরতে পারে নাই। আব্বা লড়েছিলেন থানার দারোগার বিরুদ্ধে, সে জন্য দারোগা সাহেবের অনেক বিপদে পড়তে হয়েছিল। তখনকার পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট দারোগার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।

রহিম বলতে লাগল তার ইতিহাস। আজ অনেক দিন জেলে আছে। বলল, "আপনাদের বাড়িতে চুরি করে যখন কিছু হল না, তখন ঘোষণা করলাম, লোকে বলে চোরের বাড়িতে দালান হয় না, আমি দালান দেব। দেশের লোক বুঝতে পারল। কিছুদিন পরে আর একটা ডাকাতি করতে গেলাম বাগেরহাটে। সেখানে ধরা পড়লাম। অনেক টাকা খরচ করে জামিন নিয়ে দেশে এলাম। তারপর আরেকটা ডাকাতি করতে গেলাম, গোপালগঞ্জের উলপুর গ্রামের রায় চৌধুরীদের বাড়িতে। ডাকাতি করে ফিরবার পথে পুলিশ আমাকে গ্রেফতার করল। তাদের জানা ছিল আমি কোন পথে ফিরব। এ মামলাটায় জামিন নিলাম, তারপরে আবার ডাকাতি করতে গেলাম আর এক জায়গায়। সেখানেও ধরা পড়লাম, আর জামিন পেলাম না। সকল মামলা মিলে আমার পনের-ষোল বৎসর জেল হয়েছে। পাকিস্তান হওয়ার পূর্বে দমদম জেলে ছিলাম। সেখান থেকে রাজশাহী, তারপর ফরিদপুর জেলে এসেছি। জানেন, জীবনে ডাকাতি বা চুরি করতে গিয়ে আমি ধরা পড়ি নাই, কিন্তু আপনাদের বাড়ি চুরি করার পর যেখানেই গেছি ধরা পড়েছি। জেলে বসে চিন্তা করে দেখলাম, আপনাদের বাড়ি আমাদের পুণ্যস্থান ছিল, সেখানে হাত দিয়ে হাত জ্বলে গেছে। আপনার মা'র কাছে ক্ষমা চাইতে পারলে বোধহয় পাপমোচন হত।" আমি বললাম, "রহিম মিয়া, আমার মা ও আব্বা বড় দুঃখ পেয়েছিলেন। কারণ আমাদের সর্বস্ব গেলেও কিছু হত না কিন্তু আমার বিধবা বড়বোনের গহনাই বেশি ছিল। সে একটা ছেলে ও একটা মেয়ে নিয়ে উনিশ বছর

বয়সে বিধবা হয়েছিল।" বলল, "আর জীবনে চুরি করব না। আরও কয়েক বৎসর খাটতে হবে। শরীর ভেঙে গেছে।" আমাকে অনুরোধ করল, কিছু দরকার হলে বলতে, কারণ তার গলায় 'খোকর' আছে। তার মধ্যে সোনার গিনি রাখা আছে। আমি বললাম, কোনো প্রয়োজন নাই। মনে মনে বললাম, "হ্যাঁ, সোনার গিনি থাকবে না, তো থাকবে কি? সোয়া শত ভরির গহনা তো সোজা কথা না!" আরও বলল, ফরিদপুর জেলের অনেককে কিনে রেখেছে, কেউ তাকে কিছু বলবে না। ভাবলাম, কেন কিছু বলে না বুঝতে আর বাকি নাই। রহিম মিয়া হাসপাতালে প্রায়ই ভর্তি হয়ে থাকত। শরীর স্বাস্থ্য খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সময় পেলেই আমার কাছে আসত। সুখ-দুঃখের অনেক কথাই বলত। আমার মনে হচ্ছিল, বোধহয় একটা পরিবর্তন এসেছে ওর মনে।

জেলার ছিলেন সৈয়দ আহমেদ সাহেব। তিনি সকল সময় আমার খোঁজখবর নিতেন। কোন কিছুর অসুবিধা হলে বলতে অনুরোধ করতেন। যদিও সরকার কয়েদিদের দিয়ে ঘানি ঘুরিয়ে তেল করতে নিষেধ করেছেন, তথাপি ফরিদপুর জেলে তখনও ঘানি ঘুরিয়ে তেল করা হচ্ছিল। আমি জেলার সাহেবকে বললাম, "এখনও আপনার জেলে মানুষ দিয়ে ঘানি ঘুরান?" তিনি বললেন, "কয়েকদিনের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যাবে। গরু কিনতে দিয়েছি।" কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

ঢাকা ও ফরিদপুর জেলে অনেক বড় চোর ও দুর্ধর্ষ ডাকাতের সাথে আলাপ হয়েছে। কারও কারও গলার মধ্যে 'খোকর' (মানে গর্ত) থাকে। তার মধ্যে লুকিয়ে টাকা সোনার আংটি, গিনি রাখে। দরকার হলে সেগুলি দিয়ে জিনিসপত্র কিনে আনায়। একটু ভালভাবে থাকার জন্য কিছু কিছু খরচও করে। আমার কাছে সিগারেটের কাগজও চেয়ে নিয়েছে অনেকে। একবার ঢাকায় এক কয়েদিকে বললাম, "আমাকে খোকরের কেরামতি দেখালে কাগজ দিব, নতুবা কাগজ দিব না।" বলল, "দেখাব আপনাকে, একটু দেরি করেন।" সিপাহি একটু দূরে গেলে বমি করার ভান করল, তাতে একটা কাঁচা টাকা বের হয়ে আসল। বললাম, "হয়েছে আর দরকার নাই। বুঝতে পেরেছি।"



এক মাস পার হয়ে গেল। আবার গোপালগঞ্জ যাবার সময় হয়েছে। আমাকে সন্ধ্যার পূর্বে গোয়েন্দা বিভাগের একজন কর্মচারী আর বন্দুকধারী সিপাহিরা জেলগেট থেকে নিয়ে গেল। রাতে আমাকে পুলিশ লাইনে থাকতে হল, কারণ ভোর পাঁচটায় ট্যাক্সি ধরে তাঙ্গায় যেতে হবে। অত ভোরে জেল থেকে কয়েদি নেওয়া সম্ভবপর নয়। পুলিশ লাইনের পাশেই আমার এক বন্ধুর বাড়ি। তাকে খবর দিলে সে আসল আমার সাথে দেখা করতে। অনেকক্ষণ আলাপ করলাম, সে রাজনীতি করে না। তাই কেউ কিছু বলল না। রাতে পুলিশ লাইনের ক্লাবেই ঘুমালাম। খুব ভোরে তাঙ্গায় রওয়ানা করলাম। তাঙ্গায় যেতে কয়েক ঘণ্টা সময় লাগত। দুইটা ফেরি নৌকা পার হতে হত। রাস্তাও খুব খারাপ ছিল।

আমার দু'একজন আত্মীয়স্বজন উপস্থিত ছিল। তারাই খাবার বন্দোবস্ত করল। লঞ্চ বেশি দেরি করবে না। আমরা লঞ্চে উঠে বসলাম, সিন্ধিয়া ঘাটে বিকালে পৌঁছালাম। রাত এখানে কাটাতে হবে। আমি বললাম, কি দরকার সিন্ধিয়া ঘাটে নেমে, চলুন মাদারীপুর যাই। সেখান থেকেই তো রাত এগারটায় জাহাজ ছাড়বে। ভোররাতে সিন্ধিয়া ঘাট থেকে ওঠা বড় কষ্টকর। সিপাহিরা আপত্তি করল না। অনেকদূর উল্টা যেতে হয়। বিকালে মাদারীপুর পৌঁছালাম। জাহাজ ঘাটেই ছিল। আমি জাহাজে উঠে সকলের খাওয়ার কথা বাটলারকে বলে দিলাম। সিপাহিরা বলল, কেন এত খরচ করবেন। ঘাটেই হোটেল, জাহাজ ছাড়তে অনেক দেরি, ওখানেই খেয়ে নিব। মাদারীপুর ঘাটে পাঁচ-ছয় ঘণ্টা দেরি হবে। আমার আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবরা খবর পেল। অনেকে আসল। কিছু সময় আলাপ করলাম, কে কেমন আছে। আমাকে অনেকগুলি মিষ্টি কিনে দিল। সকলকে খেতে দিতে বাটলারকে বললাম। রাত এগারটায় জাহাজ ছাড়ল। আমি এখন স্বাধীন মানুষ—যদিও পুলিশ পাহারায়, তবু কম কিসে, বাইরের হাওয়া তো পাচ্ছি।

সকাল আটটায় হরিদাসপুর স্টেশনে নেমে নৌকায় গোপালগঞ্জ পৌঁছালাম। সঙ্গের পুলিশদের আমাকে থানায় নিয়ে যেতে বললাম। তাহলে আমাকে রেখে যেখানে হয় তারা যেতে পারবে। গোপালগঞ্জ যেয়ে দেখি থানার ঘাটে আমাদের নৌকা। আব্বা, মা, রেণু, হাচিনা ও কামালকে নিয়ে হাজির। ঘাটেই দেখা হয়ে গেল। এরাও এইমাত্র বাড়ি থেকে এসে পৌঁছেছে। গোপালগঞ্জ থেকে আমার বাড়ি চৌদ্দ মাইল দূরে। এক বৎসর পরে আজ ওদের সাথে আমার দেখা। হাচিনা আমার গলা ধরল আর ছাড়তে চায় না। কামাল আমার দিকে চেয়ে আছে, আমাকে চেনেও না আর বুঝতে পারে না, আমি কে? মা কাঁদতে লাগল। আব্বা মাকে ধমক দিলেন এবং কাঁদতে নিষেধ করলেন। আমি থানায় আসলাম, বাড়ির সকলে আমাদের গোপালগঞ্জের বাসায় উঠল। থানায় যেয়ে দেখি এক দারোগা সাহেব বদলি হয়ে গেছেন, তার বাড়িটা খালি আছে। আমাকে থাকবার অনুমতি দিল সেই বাড়িতে।

তাড়াতাড়ি কোর্টে যেতে হবে। প্রস্তুত হয়ে কোর্টে রওনা করলাম, এবার রাস্তায় অনেক ভিড়। বহু গ্রাম থেকেও অনেক সহকর্মী ও সমর্থক আমাকে দেখতে এসেছে। কোর্টে হাজির হলাম, হাকিম সাহেব বেশি দেরি না করে সাক্ষ্য নিতে শুরু করলেন। পরের দিন আবার তারিখ রাখলেন। আমি আমার আইনজীবীকে বললাম অনুমতি নিতে, যাতে আমার মা, আব্বা, ছেলেমেয়েরা আমার সাথে থানায় সাক্ষাৎ করতে পারেন। তিনি অনুমতি দিলেন। গোপালগঞ্জের গোয়েন্দা বিভাগের কর্মচারী এবং যিনি ফরিদপুর থেকে গিয়েছিলেন, তাঁরা আমাকে বললেন, বাইরের লোক দেখা করলে অসুবিধা হবে। আপনার আব্বা, মা, স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা দেখা করলে কোনো অসুবিধা হবে না। আমি আমাদের কর্মী ও অন্যান্য বন্ধুদের থানায় যেতে নিষেধ করলাম, কারণ এদের বিপদে ফেলে আমার লাভ কি? কোর্টেই তো দেখা হয়েছে সকলের সাথে। থানায় ফিরে এলাম এবং দারোগা সাহেবের বাড়িতেই আমার মালপত্র রাখা হল। আব্বা, মা, রেণু খবর পেয়ে সেখানেই আসলেন। যে সমস্ত পুলিশ গার্ড এসেছে ফরিদপুর থেকে তারাই আমাকে পাহারা দেবে এবং মামলা

শেষ হলে নিয়ে যাবে। আব্বা, মা ও ছেলেমেয়েরা কয়েক ঘণ্টা রইল। কামাল কিছুতেই আমার কাছে আসল না। দূর থেকে চেয়ে থাকে। ও বোধহয় ভাবত, এ লোকটা কে?

পরের দিন সকালবেলা আবার দেখা হল, আমি কোর্ট থেকে ফিরে আসার পরেই আমাকে রওয়ানা করতে হল। বিকালবেলা সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জাহাজে চড়ে সন্ধ্যার পরে সিন্ধিয়া ঘাট পৌঁছালাম। রাত এখানেই কাটাতে হবে। রাতে ডাকবাংলোয় রইলাম। রাতটা ভালভাবেই কেটেছিল। খাওয়া-দাওয়া ভাল ছিল না। তবে বাড়ি থেকে কিছু খাবার দিয়েছিল। খুব সকালবেলা লঞ্চ ধরলাম। সিন্ধিয়া ঘাটেও কয়েকজন কর্মী দেখা করেছিল। লঞ্চ দেরি করে নাই বলে আজ সন্ধ্যার সময়ই ফরিদপুর পৌঁছাতে পেরেছি। আমাকে রাতেই জেলে পৌঁছে দিল। জেলে শুধু তালা আর চাবি। গেটে তালা, ওয়ার্ডে তালা, কামরায় তালা। বাইরে থেকে তালা দেওয়া ঘরে রাত কাটাতে হবে। এইভাবে মামলার জন্য তিন চার মাস আমাকে যাওয়া-আসা করতে হল ফরিদপুর থেকে গোপালগঞ্জ পর্যন্ত। প্রত্যেক তারিখেই আমার বাড়ির সকলের সাথে দেখা হয়েছে। ফরিদপুর থেকে গোপালগঞ্জ যাওয়া-আসা খুবই কষ্টকর ছিল। তাই সরকারের কাছে আমি লিখলাম, আমাকে বরিশাল বা খুলনা জেলে রাখলে গোপালগঞ্জ যাওয়া-আসার সুবিধা হবে। সোজা খুলনা বা বরিশাল থেকে জাহাজে উঠলে গোপালগঞ্জ যাওয়া যায়। কোনো জায়গায় ওঠানামা করতে হয় না। সরকার সেইমত আদেশ দিল, বরিশাল বা খুলনায় আমাকে রাখতে। কর্তৃপক্ষ আমাকে খুলনা জেলে পাঠিয়ে দিলেন। রাজবাড়ী, যশোর হয়ে খুলনা যেতে হল।

খুলনা জেলে যেয়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম। কোনো জায়গাই নাই। একটা মাত্র দালান, তার মধ্যেই কয়েদি ও হাজতি সকলকে একসঙ্গে রাখা হয়েছে। আমাকে কোথায় রাখবে? একটা সেল আছে, সেখানে ভীষণ প্রকৃতির কয়েদিদের রাখা হয়। জেলার সাহেব আমাকে নিয়ে গেলেন ভিতরে, বললেন, "দেখুন অবস্থা, কোথায় রাখব আপনাকে, ছোট জেল।" আমি আবার রাজনৈতিক বন্দি হয়ে গেছি। সাজা আমার খাটা হয়ে গেছে। মাত্র তিন মাস জেল দিয়েছিল। অন্য কোনো রাজনৈতিক বন্দিও এ জেলে নাই। আশ্চর্য হয়ে গেলাম। কর্তৃপক্ষ আমাকে পাঠাল কেমন করে এখানে! বোধহয় ছয়টা সেল, সেলগুলির সামনে চৌদ্দ ফিট দেওয়াল। একদিকে ফাঁসির ঘর, অন্যদিকে বত্রিশটা পায়খানা। সমস্ত কয়েদিরা ঐখানেই পায়খানা করে। যে তিন-চার হাত জায়গা আছে সামনে সেখানেও দাঁড়াবার উপায় নাই দুর্গন্ধে। খাবারেরও কোনো আলাদা ব্যবস্থা করা যাবে না, কারণ উপায় নাই। একটা সেলে আমাকে রাখা হল আর হাসপাতাল থেকে ভাত তরকারি দিবে তাই খেতে হবে, রোগীরা যা খায়। বাড়ি থেকে কিছু চিঁড়া, মুড়ি, বিস্কুট আমাকে দিয়েছিল। তাই আমাকে খেয়ে বাঁচতে হবে। আমার জীবনটা অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। আমি জেলার সাহেবকে বললাম, "আপনি লেখেন ওপরে। এখানে জায়গা নাই। আমার এখানে থাকা চলবে না। আর যদি রাখতে হয়, থাকার ভাল ব্যবস্থা করতে হবে।"

কয়েকদিনের মধ্যে আবার মামলার তারিখ। জাহাজে উঠে ঘুমিয়ে পড়লাম। ভোরে গোপালগঞ্জ পৌঁছে দিবে। এই কয়েকদিনের মধ্যেই আমার শরীর অনেকটা খারাপ হয়ে

গেছে। একদিন আমাকে জেল অফিসে ডেকে পাঠানো হল। সিভিল সার্জনরা জেলা জেলের এক্স-অফিসিও সুপারিনটেনডেন্ট। এখন খুলনায় মোহাম্মদ হোসেন সাহেব সিভিল সার্জন। তিনি জেল পরিদর্শন করতে এসে আমার কথা শুনে আমাকে অফিসে নিয়ে যেতে বললেন। আমি যেয়ে দেখি তিনি বসে আছেন। আমাকে বসতে বললেন তাঁর কাছে। আমি বসবার সাথে সাথে জিজ্ঞাসা করলেন "আপনি কেন জেল খাটছেন।" আমিও উত্তর দিলাম, "ক্ষমতা দখল করার জন্য।" তিনি আমার মুখের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "ক্ষমতা দখল করে কি করবেন?" বললাম, "যদি পারি দেশের জনগণের জন্য কিছু করব। ক্ষমতায় না যেয়ে কি তা করা যায়?" তিনি আমাকে বললেন, "বহুদিন জেলের সাথে আমার সম্পর্ক রয়েছে। অনেক রাজবন্দির সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। অনেকের সাথে আলাপ হয়েছে, এভাবে কেউ আমাকে উত্তর দেয় নাই, যেভাবে আপনি উত্তর দিলেন। সকলের ঐ একই কথা, জনগণের উপকারের জন্য জেল খাটছি। দেশের খেদমত করছি, অত্যাচার সহ্য করতে পারছি না বলে প্রতিবাদ করেছি, তাই জেলে এসেছি। কিন্তু আপনি সোজা কথা বললেন, তাই আপনাকে ধন্যবাদ দিলাম।" তারপরে আমার সুবিধা অসুবিধার কথা আলোচনা হল। তিনি আমাকে বললেন যে, তিনিও উপরের কর্মকর্তাদের কাছে রাজবন্দিদের অসুবিধার কথা লিখেছেন। শীঘ্রই উত্তর পাবার আশা করেন। আমার অনেক কষ্ট হচ্ছে তাও বললেন। জেল অফিসের পিছনে সামান্য জায়গা ছিল। বিকালে ওখানে আমি হাঁটাচলা করতাম। জেলার সাহেব হুকুম দিয়েছিলেন। এই অন্ধকূপের মধ্যে থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। জানালা নাই, মাত্র একটা দরজা, তার সামনেও আবার দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। রাজশাহীর একজন সিপাহির ডিউটি প্রায়ই ওখানে পড়ত। চমৎকার গান গাইত। সে আসলেই তার গান শুনতাম।



আমি গোপালগঞ্জে আসলাম, মামলা চলছিল। সরকারি কর্মচারীরা সাক্ষী। সকলেই প্রায় বদলি হয়ে গেছে। আসতে হয় দূর দূর থেকে, এক একজন এক একবার আসেন। আমি জেল থেকে যাই আর সরকারি উকিল ও কোর্ট ইন্সপেক্টর ফরিদপুর থেকে আসেন। বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে এসেছে। বললাম কিছু ডিম কিনে দিতে, কারণ না খেয়ে আমার অবস্থা খারাপ হয়ে পড়েছে। এক মাসে শরীর আমার একদম ভেঙে গিয়েছে। চোখের অবস্থা খারাপ। পেটের অবস্থা খারাপ হয়ে পড়েছে। বুকে ব্যথা অনুভব করতে শুরু করেছি। রেণু আমাকে সাবধান করল এবং বলল, "ভুলে যেও না, তুমি হার্টের অসুখে ভুগেছিলে এবং চক্ষু অপারেশন হয়েছিল।" ওকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম, আর কি করা যায়। হাচু আমাকে মোটেই ছাড়তে চায় না। আজকাল বিদায় নেওয়ার সময় কাঁদতে শুরু করে। কামালও আমার কাছে এখন আসে। হাচু 'আব্বা' বলে দেখে কামালও 'আব্বা' বলতে শুরু করেছে। গোপালগঞ্জ থানা এলাকার মধ্যে থাকতে পারি বলে কয়েক ঘণ্টা ওদের সাথে

থাকতে সুযোগ পেতাম। কিছুদিন পরে দুইজন সাথী পেলাম। নূরুন্নবী নামে একজন রাজনৈতিক বন্দি রাজশাহী থেকে এসেছে, কোর্টে হাজিরা দিতে। কারণ তার বিরুদ্ধে একটা মামলা আছে খুলনা কোর্টে। রাজশাহীতে যখন রাজবন্দিদের উপর গুলি করে তখন সে ওখানেই ছিল। গুলির আঘাতে তার একটা পা ভীষণভাবে জখম হয় এবং ডাক্তার সাহেবরা পা' টা কেটে ফেলে দেয়। তাকে এখন এক পায়ে হাঁটতে হয়। অল্প বয়স, সুন্দর চেহারা, জীবনটা নষ্ট করে দিয়েছে, কিন্তু মুক্তি দেয় নাই। তার বাড়ি বর্ধমান।

কিছুদিন পরে ঢাকা জেল থেকে কৃষক নেতা বিষ্ণু চ্যাটার্জি এলেন, পায়ে ডাণ্ডা বেড়ি দেওয়া অবস্থায়। তাঁর সাজা হয়েছে একটা মামলায়। এখন একজন সাধারণ কয়েদি। আর একটা মামলা খুলনা কোর্টে আছে। তার বিচার শুরু হবে। সদা হাসি খুশি মুখ, কোনো দুঃখ নাই বলে মনে হল। একদিন বললেন, "দুঃখ তো আর কিছু নয়, এরা আমাকে ডাকাতি মামলার আসামি করল!" বিষ্ণু বাবুকে ডিভিশন দেয় নাই। তাই কয়েদির কাপড় তাকে পরে থাকতে ও কয়েদির খানা খেতে হয়। নূরুন্নবী সকল সময়ই মুখটা কালো করে থাকত। জীবনের তরে খোঁড়া হয়ে গিয়েছে এই তার দুঃখ। তার কাছ থেকে রাজশাহী জেলের অত্যাচারের করুণ কাহিনী শুনলাম। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও একজন ইংরেজ কর্মচারী কি নির্দয়ভাবে গুলি চালাতে হুকুম দিয়েছিল এবং তাতে সাতজন স্বাধীনতা সংগ্রামী রাজনৈতিক বন্দি সকলে মৃত্যুবরণ করেছেন। আর যারা বেঁচে আছে তাদের অবস্থাও শোচনীয়। কারণ, এমনভাবে তাদের মারপিট করেছে যে জীবনে কিছুই করবার উপায় নাই।

প্রায় তিন মাস হয়েছে খুলনা জেলে এসেছি। নিরাপত্তা আইনের বন্দিরা ছয় মাস পর পর সরকার থেকে একটা করে নতুন হুকুম পেত। আমার বোধহয় আঠার মাস হয়ে গেছে। ছয় মাসের ডিটেনশন অর্ডারের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। নতুন অর্ডার এসে খুলনা জেলে পৌঁছায় নাই। জেল কর্তৃপক্ষ আমাকে কোন হুকুমের ওপর ভিত্তি করে জেলে রাখবেন? আমি বললাম, "অর্ডার যখন আসে নাই, আমাকে ছেড়ে দেন। যদি আমাকে বন্দি রাখেন, তবে আমি বেআইনিভাবে আটক রাখার জন্য মামলা দায়ের করে দিব।" জেল কর্তৃপক্ষ খুলনার ম্যাজিস্ট্রেট ও এসপির সাথে আলাপ করলেন, তাঁরা জানালেন তাঁদের কাছেও কোন অর্ডার নাই যে আমাকে জেলে বন্দি করে রাখতে বলতে পারেন। তবে আমার ওপরে একটা প্রডাকশন ওয়ারেন্ট ছিল, গোপালগঞ্জ মামলার। কাস্টডি ওয়ারেন্ট নাই যে জেলে রাখবে। অনেক পরামর্শ করে তাঁরা ঠিক করলেন, আমাকে গোপালগঞ্জ কোর্টে পাঠিয়ে দিবে এবং রেডিওগ্রাম করবে ঢাকায়। এর মধ্যে ঢাকা থেকে অর্ডার গোপালগঞ্জে পৌঁছাতে পারবে। আমাকে জাহাজে পুলিশ পাহারায় গোপালগঞ্জ পাঠিয়ে দিল। গোপালগঞ্জ কোর্টে আমাকে জামিন দিয়ে দিল পরের দিন। বিরাট শোভাযাত্রা করল জনগণ আমাকে নিয়ে। বাড়িতে খবর পাঠিয়ে দিয়েছি। রাতে বাড়িতে পৌঁছাব। আমার গোপালগঞ্জ বাড়িতে বসে আছি। নৌকা ভাড়া করতে গিয়েছে। যখন নৌকা এসে গেছে, আমি সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রওয়ানা করব ঠিক করেছি এমন সময় পুলিশ ইন্সপেক্টর ও গোয়েন্দা কর্মচারী আমার কাছে এসে বলল, "একটা কথা আছে।" কোনো পুলিশ তারা আনে নাই। আমার

কাছে তখনও একশতের মত লোক ছিল। আমি উঠে একটু আলাদা হয়ে ওদের কাছে যাই। তারা আমাকে একটা কাগজ দিল। রেডিওগ্রামে অর্ডার এসেছে আমাকে আবার গ্রেফতার করতে, নিরাপত্তা আইনে। আমি বললাম, "ঠিক আছে চলুন"। কর্মচারীরা ভদ্রতা করে বলল, "আমাদের সাথে আসতে হবে না। আপনি থানায় চলে গেলেই চলবে।" কারণ, আমাকে নিয়ে রওয়ানা হলে একটা গোলমাল হতে পারত। আমি সকলকে ডেকে বললাম, "আপনারা হৈচৈ করবেন না, আমি মুক্তি পেলাম না। আবার হুকুম এসেছে আমাকে গ্রেফতার করতে। আমাকে থানায় যেতে হবে। এদের কোনো দোষ নাই। আমি নিজে হুকুম দেখেছি।" নৌকা বিদায় করে দিতে বললাম। বাক্সে কাপড়চোপড়, বইখাতা বাঁধা ছিল সেগুলি থানায় পৌঁছে দিতে বললাম। কয়েকজন কর্মী কেঁদে দিল। আর কয়েকজন চিৎকার করে উঠল, "না যেতে দিব না, তারা কেড়ে নিয়ে যাক।" আমি ওদের বুঝিয়ে বললাম, তারা বুঝতে পারল। গোয়েন্দা বিভাগের অফিসার সাহেব খুবই ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁকে আমি বললাম, আপনি আমার সাথে চলুন, তা না হলে ভাল দেখায় না, কোনো গোলমাল হবে না। বাড়িতে আবার লোক পাঠালাম। রাতেই লোক রওয়ানা হয়ে গেল। আগামীকালই বোধহয় আমাকে অন্য কোন জেলে নিয়ে যাবে। নিষেধ করে দিয়েছিলাম, কেউ যেন না আসে, আমাকে পাবে না।

রাতে আবার থানায় রইলাম। থানার কর্মচারীরাও দুঃখ পেয়েছিল। সতের-আঠার মাস পরে ছেড়ে দিয়েও আবার গ্রেফতার করার কি কারণ থাকতে পারে? পরের দিন লোক ফিরে এসে বলল, রাতভর সকলে জেগেছিল বাড়িতে, আমি যে কোনো সময় পৌঁছাতে পারি ভেবে। মা অনেক কেঁদেছিল, খবর পেয়ে। আমার মনটাও খারাপ হল। আমার মা, আব্বা ও ভাইবোন এবং ছেলেমেয়েদের এ দুঃখ না দিলেই পারত। আমি তো সরকারের কাছে বন্ড দেই নাই। আমাকে মুক্তি দিল কেন? হুকুমনামা সময়মত আসে নাই কেন? আমার তো কোনো দোষ ছিল না? এই ব্যবহার আমার সাথে না করলেই পারত। অনেক রাত পর্যন্ত লোকজন থানায় রইল। আমিও বসে রইলাম। ভাবলাম, অনেক দিন থাকতে হবে কারাগারে। দুই দিন গোপালগঞ্জ থানায় আমাকে থাকতে হল। ঢাকা থেকে খবর আসে নাই আমাকে কোন জেলে নিবে। আমার শরীর খুবই খারাপ হয়ে পড়েছিল খুলনা জেলে থাকার সময়। এ ঘটনার পরে আরও একটু খারাপ হল।



দুই দিন পরে খবর এল, আমাকে ফরিদপুর জেলে নিয়ে যেতে। আমি ফরিদপুর জেলে ফিরে এলাম। এবার আমাকে রাখা হল রাজবন্দিদের ওয়ার্ডে। এই ওয়ার্ডে দুইটা কামরা; এক কামরায় পাঁচজন ছিল। আরেক কামরায় গোপালগঞ্জের বাবু চন্দ্র ঘোষ, মাদারীপুরের বাবু ফণি মজুমদার ও আমি। এই দুইজনকে আমি পূর্ব থেকেই জানতাম। ফণি মজুমদার পূর্বে ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতা ছিলেন। ইংরেজ আমলে আট-নয় বৎসর জেল

খেটেছেন। দেশ স্বাধীন হবার পরেও রেহাই পান নাই। বিবাহ করেন নাই। তাঁর বাবা আছেন পাকিস্তানে, পেনশন পান। ফণি বাবু দেশ ছাড়তে রাজি হন নাই বলে তিনিও দেশ ছাড়েন নাই। হিন্দু-মুসলমান জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে তাঁকে ভালবাসত। কেউ কোন বিপদে পড়লে ফণি মজুমদার হাজির হতেন। কারো বাড়িতে কেউ অসুস্থ হলে ফণি মজুমদারকে পাওয়া যেত। আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। সরকার যাদের কমিউনিস্ট ভাবতেন, তারা আছে এক কামরায়। আমরা তিনজন কমিউনিস্ট নই, তাই আমরা আছি অন্য কামরায়।

চন্দ্র ঘোষ ছিলেন একজন সমাজকর্মী। জীবনে রাজনীতি করেন নাই। মহাত্মা গান্ধীর মত একখানা কাপড় পরতেন, একখানা কাপড় গায়ে দিতেন। শীতের সময়ও তার কোনো ব্যতিক্রম হত না। জুতা পরতেন না, খড়ম পায়ে দিতেন। গোপালগঞ্জ মহকুমায় তিনি অনেক স্কুল করেছেন। কাশিয়ানী থানার রামদিয়া গ্রামে একটা ডিগ্রি কলেজ করেছেন। অনেক খাল কেটেছেন, রাস্তা করেছেন। এই সমস্ত কাজই তিনি করতেন। পাকিস্তান হওয়ার পরে একজন সরকারি কর্মচারী অতি উৎসাহ দেখাবার জন্য সরকারকে মিথ্যা খবর দিয়ে তাঁকে গ্রেফতার করায় এবং তাঁর শাস্তি হয়। শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেব গোপালগঞ্জে এসে ১৯৪৮ সালে সেই কর্মচারীকে বলেছিলেন, চন্দ্র ঘোষের মত মানুষকে গ্রেফতার করে ও মিথ্যা মামলা দিয়ে পাকিস্তানের বদনামই করা হচ্ছে।

চন্দ্র ঘোষ শাস্তি ভোগ করে আবার নিরাপত্তা বন্দি হয়েছেন। আমি গোপালগঞ্জের লোক, আমি সকল খবরই রাখতাম। মুসলিম লীগ ও পাকিস্তানের আন্দোলন আমি বেশি করেছি এই সমস্ত এলাকায়। দেশের মুসলমান, হিন্দু সকলেই ভালবাসত চন্দ্র ঘোষকে। তাঁর অনেক মুসলমান ভক্তও ছিল। তফসিলী সম্প্রদায়ের হিন্দুরাই তাঁর বেশি ভক্ত ছিল। গোপালগঞ্জের কিছু সংখ্যক তফসিলী সম্প্রদায়ের হিন্দু পাকিস্তান আন্দোলন সমর্থন করেছিল, এমনকি কিছু সংখ্যক নমশূদ্র হিন্দু কর্মী আমাদের সাথে সিলেটে গণভোটে কাজ করেছিল। চন্দ্র ঘোষ একটা মেয়েদের হাইস্কুলও করেছিলেন। আমিও অনেক সরকারি কর্মচারীকে বলেছিলাম, এ ভদ্রলোককে অত্যাচার না করতে। কারণ, তিনি কোনোদিন রাজনীতি করেন নাই। সমাজের অনেক কাজ হবে তাঁর মত নিঃস্বার্থ ত্যাগী সমাজসেবক দিয়ে। দেশ স্বাধীন হয়েছে, এদের ব্যবহার করা দরকার। কে কার কথা শোনে! সরকারকে খবর দেওয়া হয়েছিল, হিন্দুরা আইন মানছে না। হিন্দুস্থানের পতাকা তুলেছে। চন্দ্র ঘোষ এদের নেতা। শীঘ্রই আরও আর্মড পুলিশ পাঠাও, আরও কত কি, খোদা জানে! কিন্তু আমি জানি, সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। গোপালগঞ্জে মুসলমানদেরও শক্তি কম ছিল না। সে রকম হলে মুসলমানরা নিশ্চয়ই বাধা দিত। যদি এ সমস্ত অন্যায় করত, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও বেধে যেত। তেমন কোনো কিছুই হয় নাই। চন্দ্র ঘোষের গ্রেফতারে হিন্দুরা ভয় পেয়েছিল। বর্ণ হিন্দুরা পশ্চিমবঙ্গের দিকে রওয়ানা করতে শুরু করেছে। যা সামান্য কিছু আছে, তাও যাবার জন্য প্রস্তুত। তাঁকে গ্রেফতারের একমাত্র কারণ ছিল সরকারকে দেখান, 'দেখ আমি কিভাবে রাষ্ট্রদ্রোহী কাজ দমন করলাম। পাকিস্তানকে রক্ষা করলাম, ইত্যাদি ইত্যাদি।'

আমি ফরিদপুর জেলে আসলাম, স্বাস্থ্য খারাপ নিয়ে। এসেই আমার ভীষণ জ্বর; মাথার যন্ত্রণা, বুকে ব্যথা অনুভব করতে লাগলাম। চিকিৎসার ত্রুটি করছেন না জেল কর্তৃপক্ষ, তবুও কয়েকদিন খুব ভুগলাম। রাতভর চন্দ্র বাবু আমার মাথার কাছে বসে পানি ঢেলেছেন। যখনই আমার হুঁশ হয়েছে দেখি চন্দ্র বাবু বসে আছেন। ফণি বাবুও অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকতেন আমার জন্য। তিন দিনের মধ্যে আমি চন্দ্র বাবুকে বিছানায় শুতে দেখি নাই। আমার মাথা টিপে দিয়েছেন। কখনও পানি ঢালছেন, কখনও ওসুধ খাওয়াচ্ছেন। কখনও পথ্য খেতে অনুরোধ করছেন। না খেতে চাইলে ধমক দিয়ে খাওয়াতেন। আমি অনুরোধ করতাম, এত কষ্ট না করতে। তিনি বলতেন, "জীবনভরই তো এই কাজ করে এসেছি, এখন বুড়াকালে কষ্ট হয় না।" ডাক্তার সাহেব আমাকে হাসপাতালে নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু চন্দ্র বাবু ও ফণি বাবু দেন নাই, কারণ সেখানে কে দেখবে? অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দিরাও আমার জন্য অনেক কষ্ট করেছেন। কয়েকদিন পরেই আমি আরোগ্য লাভ করলাম। কিন্তু খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম বলে গোপালগঞ্জে মামলার দিনে যেতে পারি নাই। বাড়ির সকলে এসে ফিরে গিয়েছিল। বাড়ি থেকে নৌকায় আসতে হয় ও গোপালগঞ্জে থাকতে হয়, নানা অসুবিধা। আমি গোপালগঞ্জ না যাওয়ায় আব্বা খুব চিন্তিত হয়ে পরে টেলিগ্রাম করেছিলেন।

এদিকে জ্বর থেকে মুক্তি পেলেও হার্ট দুর্বল হয়ে পড়েছে। চোখের অসুখ বেড়েছে। পেটে একটা বেদনা অনুভব করতাম। এইভাবে আরও এক মাস কেটে গেল। গোপালগঞ্জে মামলার তারিখে আবার সেই পুরানা পথ দিয়ে যেতে হল। এবার যেন সিন্ধিয়া ঘাট ডাকবাংলোকে আমার আরও ভাল লাগল। অনেক দিন পরে রাতে ঘরের বাইরে আছি। কত কথাই না মনে পড়ল। ১৯৪৫ সালে এই জায়গাটায় সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে নিয়ে একরাত কাটিয়েছিলাম। আমার বন্ধু ও সহকর্মী মোল্লা জালালউদ্দিন আমার সাথে ছিল। এখান থেকেই পরের দিন নৌকায় তাঁকে গোপালগঞ্জ নিয়ে যায়। ফরিদপুরের জালাল ও হামিদ আমার সাথে পাকিস্তানের আন্দোলনে কাজ করেছে।

সন্ধ্যার পরে অনেক লোক আমাকে দেখতে আসল। এটা একটা ছোট্ট বন্দর। কয়েকজন ছোটখাটো সরকারি কর্মচারী এখানে থাকতেন। তাঁরাও অনেকে আমার শরীর খারাপ শুনে দেখতে আসলেন। কিছু সময় আলাপ করার পরে একে একে সকলে বিদায় হলেন। ভয় তো কিছুটা আছে, যদি গোয়েন্দারা রিপোর্ট দেয়।

এর মধ্যে একটা ঘটনাও ঘটে গেছে। মাদারীপুরের গোয়েন্দা বিভাগের এক কর্মচারী রিপোর্ট দিয়েছে যে, আমি যখন মাদারীপুরে জাহাজে ছিলাম তখন লোক দেখা করেছে আমার সাথে। তাই যারা আমাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে আসত তারা এখন ভয় পেয়ে গেছে। তারা আমাকে অনুরোধ করেছে যাতে আমি বাইরের লোকের সাথে বেশি আলাপ না

করি। আলাপ তো করব না সত্য, কিন্তু যারা আমাকে দেখতে আসে তাদের বাধা দেই কেমন করে? আলাপ তো শুধু এইটুকু 'আসসালামু আলাইকুম, ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন? আপনারা কেমন আছেন?' তাঁরা ভুলে গেছেন, এটা আমার জেলা, এখানে আমার আত্মীয়স্বজন অনেক। রাজনীতি করেছি এ জেলায়। আমি প্রায় সকল থানায়ই পাকিস্তানের জন্য সভা করেছি, অনেকে আমাকে জানে। অন্ততপক্ষে বিশ-ত্রিশজন আর্মড পুলিশ দিয়ে আমাকে পাঠান উচিত ছিল। সোজা সরকারি লঞ্চ দিয়ে ফরিদপুর থেকে গোপালগঞ্জ এবং গোপালগঞ্জ কোর্ট থেকে ফরিদপুর আনা নেয়া করা দরকার ছিল। এদের দোষ দিয়ে লাভ কি? যতদূর পারা যায় আমি নিজেই চেষ্টা করি, যাতে এই গরিবদের চাকরির ক্ষতি না হয়।

বেশি সময় বাইরে বসে থাকা উচিত না, আবার জ্বর হলে আর উপায় থাকবে না। ভোররাতে আবার জাহাজ ধরতে হবে, যদিও ঘাট একদম কাছে। গোপালগঞ্জ পৌঁছালাম। এবারও বাড়ি থেকে সকলে এসেছে। দুই তিনটা বড় নৌকা নিয়ে এসেছে। সকলেই আমার শরীরের অবস্থা দেখে চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়েছিল। মা তো চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করলেন। কোর্ট থেকে ফিরে এলাম বিকালে। আগামীকাল আবার তারিখ পড়েছে। কোর্ট ইন্সপেক্টর সাহেবকে বললাম, "দেরি করছেন কেন? সমস্ত সাক্ষী হাজির করেন।" গোপালগঞ্জের পুরানা এসডিও সাক্ষী ছিলেন। তিনি তো আসবেনই না, তখন বোধহয় চট্টগ্রামে ছিলেন। না এসে ভদ্রলোক ভালই করেছেন, কারণ একটা গোলমাল হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। লোক খুব ক্ষেপেছিল।

এক আশ্চর্য ঘটনা দেখলাম, গোপালগঞ্জের পুরানা পুলিশ ইন্সপেক্টর সাহেব সাক্ষী দিতে এসেছেন। বোধহয় এখন ঢাকায় বদলি হয়েছেন। গোপালগঞ্জে তাঁর নাম ছিল খুব, সাধু কর্মচারী হিসাবে। ঘুষ খেতেন না। তিনি সাক্ষী দিতে উঠে একটা মিথ্যা কথাও বললেন না, যা সত্য, যা দেখেছেন তাই বললেন। আমি যে জনগণকে শান্তভাবে চলে যেতে বলেছিলাম, সেকথাও স্বীকার করলেন। সরকারি উকিল ভদ্রলোক খুব চটে গেছেন দেখলাম। কিন্তু বলা তো হয়ে গেছে। আর হাকিম সাহেবও লিখে ফেলেছেন, এখন আর উপায় কি? আমি বুঝলাম, মামলায় বোধহয় কিছু হবে না, তবে ঘুরতে হবে আরও কিছুদিন। পাকিস্তানে এ রকম পুলিশ কর্মচারীও আছে, যারা মিথ্যা কথা বলতে চান না। আমাদের দেশে যে আইন সেখানে সত্য মামলায়ও মিথ্যা সাক্ষী না দিলে শাস্তি দেওয়া যায় না। মিথ্যা দিয়ে শুরু করা হয়, আর মিথ্যা দিয়ে শেষ করতে হয়। যে দেশের বিচার ও ইনসাফ মিথ্যার উপর নির্ভরশীল সেদেশের মানুষ সত্যিকারের ইনসাফ পেতে পারে কি না সন্দেহ!

আবার পরের মাসে তারিখ পড়ল। আমি আগের মত থানায় ফিরে এলাম। দুই দিন সকাল ও বিকালে সকলের সাথে দেখা হল। রাজা মামা ও মামী কিছুতেই অন্য কোথাও খাবার বন্দোবস্ত করতে দিলেন না। মামী আমাকে খুব ভালবাসতেন। নানীও আছেন সেখানে। আমার খাবার তাঁদের বাসা থেকেই আসত। বাড়ি থেকে যারা এসেছিল তাদের

মধ্যে মেয়েরা মামার বাড়ি, আর পুরুষরা নৌকায় থাকতেন। রেণু আমাকে যখন একাকী পেল, বলল, "জেলে থাক আপত্তি নাই, তবে স্বাস্থ্যের দিকে নজর রেখ। তোমাকে দেখে আমার মন খুব খারাপ হয়ে গেছে। তোমার বোঝা উচিত আমার দুনিয়ায় কেউ নাই। ছোটবেলায় বাবা-মা মারা গেছেন, আমার কেউই নাই। তোমার কিছু হলে বাঁচব কি করে?" কেঁদেই ফেলল। আমি রেণুকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম, তাতে ফল হল উল্টা। আরও কাঁদতে শুরু করল, হাচু ও কামাল ওদের মা'র কাঁদা দেখে ছুটে যেয়ে গলা ধরে আদর করতে লাগল। আমি বললাম, "খোদা যা করে তাই হবে, চিন্তা করে লাভ কি?" পরের দিন ওদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। মাকে বোঝাতে অনেক কষ্ট হল।



ফরিদপুর জেলে ফিরে এলাম। দেখি চন্দ্র বাবু হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন, অবস্থা খুবই খারাপ। তাঁর হার্নিয়ার ব্যারাম ছিল। পেটে চাপ দিয়েছিল, হঠাৎ নাড়ি উল্টে গেছে। ফলে গলা দিয়ে মল পড়তে শুরু করেছে। যে কোন সময় মারা যেতে পারেন। সিভিল সার্জন সাহেব খুব ভাল ডাক্তার। তিনি অপারেশন করতে চাইলেন, কারণ মারা যখন যাবেনই তখন শেষ চেষ্টা করে দেখতে চান। আত্মীয়স্বজন কেউ নাই যে, তাঁর পক্ষ থেকে অনুমতিপত্র লিখে দিবে। চন্দ্র ঘোষ নিজেই লিখে দিতে রাজি হলেন। বললেন, "কেউ যখন নাই তখন আর কি করা যাবে!" সিভিল সার্জন সাহেব বাইরের হাসপাতালে নিতে হুকুম দিলেন। চন্দ্র ঘোষ তাঁকে বললেন, "আমাকে বাইরের হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছেন। আমার তো কেউ নাই। আমি শেখ মুজিবুর রহমানকে একবার দেখতে চাই, সে আমার ভাইয়ের মত। জীবনে তো আর দেখা হবে না।" সিভিল সার্জন এবং জেলের সুপারিনটেনডেন্ট, তাঁদের নির্দেশে আমাকে জেলগেটে নিয়ে যাওয়া হল। চন্দ্র ঘোষ স্ট্রেচারে শুয়ে আছেন। দেখে মনে হল, আর বাঁচবেন না, আমাকে দেখে কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, "ভাই, এরা আমাকে 'সাম্প্রদায়িক' বলে বদনাম দিল; শুধু এই আমার দুঃখ মরার সময়! কোনোদিন হিন্দু মুসলমানকে দুই চোখে দেখি নাই। সকলকে আমায় ক্ষমা করে দিতে বোলো। আর তোমার কাছে আমার অনুরোধ রইল, মানুষকে মানুষ হিসাবে দেখ। মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য ভগবানও করেন নাই। আমার তো কেউ নাই, আপন ভেবে তোমাকেই শেষ দেখা দেখে নিলাম। ভগবান তোমার মঙ্গল করুক।" এমনভাবে কথাগুলো বললেন যে সুপারিনটেনডেন্ট, জেলার সাহেব, ডেপুটি জেলার, ডাক্তার ও গোয়েন্দা কর্মচারী সকলের চোখেই পানি এসে গিয়েছিল। আর আমার চোখেও পানি এসে গিয়েছিল। বললাম, "চিন্তা করবেন না, আমি মানুষকে মানুষ হিসাবেই দেখি। রাজনীতিতে আমার কাছে মুসলমান, হিন্দু ও খ্রিষ্টান বলে কিছু নাই। সকলেই মানুষ।" আর কথা বলার শক্তি আমার ছিল না। শেষ বারের মত বললাম, "আল্লাহ্ করলে আপনি ভাল হয়ে যেতে পারেন।" তাঁকে নিয়ে গেল। সিভিল সার্জন সাহেব বললেন, "আশা খুব কম, তবে শেষ চেষ্টা করছি, অপারেশন করে।"

আমরা সকলেই খুব চিন্তায় রইলাম, কি হয়! দুই ঘণ্টা পরে জেল কর্তৃপক্ষ খবর দিল, অপারেশন করা হয়ে গেছে, অবস্থা ভালই মনে হয়। সন্ধ্যায় আবার খবর পেলাম, বাঁচার সম্ভাবনা আছে, তবে এখনও বলা যায় না। রাতটা অনেক উদ্বেগে কাটালাম, সকালবেলা খবর পেলাম তাঁর অবস্থা উন্নতির দিকে। গলা দিয়ে মল আসছে না। আশা করা যায়, এবারকার মত বেঁচে যাবেন। পরেব দিন সরকার থেকে খবর এসেছে তাঁকে মুক্তি দিতে। মুক্তি তিনি পেলেন, তবে কিছুদিন হাসপাতালে থাকতে হবে, যদি বেঁচে যান। বোধহয় পনের দিন হাসপাতালে ছিলেন। আর ভয় নাই, শুধু ঘা এখনও সম্পূর্ণরূপে ভাল হয় নাই। তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়ার সাথে সাথে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অন্তরীণ আদেশ দিলেন। তাঁর গ্রাম রামদিয়ায় তাঁকে থাকতে হবে। চন্দ্র ঘোষ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সাথে দেখা করতে গেলে তিনি বললেন, "যদি পাকিস্তানে থাকতে হয়, তবে গ্রামে অন্তরীণ থাকতে হবে। আর যদি চিকিৎসা করতে কলকাতা যেতে চান, আমাদের আপত্তি নাই। যখন আসবেন, পুলিশকে খবর দিতে হবে।"

চন্দ্র বাবু রাজি হলেন এবং জেলগেটে আসলেন, তাঁর সামান্য জিনিস নিতে। আমাকে যাবার পূর্বে খবর দিয়েছিলেন। তাঁর চলে যাওয়াতে সত্যই আমি দুঃখ পেয়েছিলাম। কয়েকদিন পরে ফণি বাবুও যেন কোথায় চলে গেলেন। এখন এই কামরায় আমি একলা পড়লাম; দিনেরবেলায় যদিও দেখা হত অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দিদের সাথে। রাতে আমাকে একলাই থাকতে হত। তবে প্রত্যেক রবিবার আমরা এক জায়গায় বসতাম এবং হালকা গল্পগুজব করতাম, যে যা জানে। আমাদের মধ্যে রাজনীতির বেশি আলাপ হত না। কোনো সময় আলোচনা শুরু হলেই তর্ক-বিতর্ক শুরু হত। চারজন ছিলেন একমতাবলম্বী, আমি একা এবং বাবু নেপালী নাহা অন্য মতের। আমাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা। ডা. মারুফ হোসেন আমাদের খাবার ইনচার্জ ছিলেন। আমরা তাঁকে 'ম্যানেজার' বলতাম। আমাদের কষ্ট হত কারণ যা আমাদের দেওয়া হত, তাতে চলা কষ্টকর ছিল। ফরিদপুর জেলে যথেষ্ট শাক-সবজি হত। তার থেকে কিছু আমাদের মাঝে মাঝে দেওয়া হত।

যাহোক, আরও একবার গোপালগঞ্জ যাই। আমার স্বাস্থ্য খুব খারাপ হয়ে পড়েছিল। হার্ট দুর্বল হয়ে গেছে, চক্ষু যন্ত্রণা বেড়ে গেছে, লেখাপড়া করতে পারছি না। আমার বাম পায়ে একটা রিউম্যাটিকের ব্যথা হয়েছিল। সিভিল সার্জন ও ডাক্তার সাহেব আমাকে খুব ভালভাবে চিকিৎসা করছিলেন, কিন্তু কোনো উন্নতি হচ্ছে না দেখে আমাকে বললেন, "আপনাকে ঢাকা জেলে পাঠিয়ে দিতে চাই। কারণ চোখের ও হার্টের চিকিৎসা এখানে হওয়া সম্ভব নয়। মেডিকেল কলেজে আপনার ভর্তি হয়ে চিকিৎসা করা দরকার।" আমি বললাম, "যা ভাল হয়, তাই আপনারা করবেন। আমি কি বলতে পারি!" লেখালেখি করতে কয়েকদিন সময় লাগল। তারপর আরও কিছুদিন পরে সরকার থেকে হুকুম এল আমাকে ঢাকা জেলে পাঠাতে। ফরিদপুর থেকে ট্রেনে গোয়ালন্দ। গোয়ালন্দ থেকে জাহাজে নারায়ণগঞ্জ আসলাম এবং নারায়ণগঞ্জ থেকে ট্যাক্সিতে করে ঢাকা জেল। জেলগেট থেকে জেল হাসপাতাল।

গোয়ালন্দের জাহাজ তখনও ভাল এবং আরামদায়ক ছিল। সরকার আমাকে ইন্টার ক্লাসে নিয়ে যাওয়ার পাস দিয়েছিলেন। আমি বললাম, "আমি প্রথম ক্লাসে যাব। কারণ, জাহাজে অত্যন্ত ভিড়, আমার ঘুমাতে হবে। আমার টাকা আছে আপনাদের কাছে, সেই টাকা দিয়ে প্রথম শ্রেণীর টিকিট কিনে নেন।" কি করবে? আমার সাথে গোলমাল করে বোধহয় বেশি সুবিধা হবে না। তাঁরা রাজি হলেন। এছাড়াও গরিব সরকারি কর্মচারীরা কখনও চায় নাই আমার কোনো অসুবিধা হোক।



আমি যখন ঢাকা জেলে আসলাম তখন ১৯৫১ সালের শেষের দিক হবে। প্রায় এক মাস জেল হাসপাতালে রইলাম। আমার মালপত্র সেই পুরানা জায়গায় নিয়ে রাখা হয়েছিল। মওলানা ভাসানী সাহেব পূর্বেই মুক্তি পেয়ে গেছেন। কয়েকদিন পরে খবর পেলাম, বরিশালের মহিউদ্দিন সাহেবকে ঢাকা জেলে নিয়ে আসা হয়েছে, নিরাপত্তা আইনে বন্দি করে। সে কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত জেলা মুসলিম লীগের সম্পাদক ছিল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় জড়িত থাকার জন্য তাকে নাকি সরকার গ্রেফতার করেছে। ১৯৫১ সালে বরিশালে এক ভয়াবহ দাঙ্গা হয়েছিল। মহিউদ্দিন পাকিস্তান আন্দোলনের ভাল কর্মী ছিল। ছাত্র আন্দোলনে সে আমার বিরুদ্ধ দলে ছিল। আমরা মুসলিম লীগ ত্যাগ করলেও সে ত্যাগ করে নাই। বরিশালে তারই এক সহকর্মী আমার বিশিষ্ট বন্ধু কাজী বাহাউদ্দিন জেলা ছাত্রলীগের নেতা ছিলেন এবং মহিউদ্দিন সাহেবের বিরুদ্ধ দলে ছিলেন। আমি ও আমার সহকর্মীরা মহিউদ্দিনকে ভাল চোখে দেখতাম না। কারণ, তখন পর্যন্ত সে সরকারের অন্ধ সমর্থক ছিল। মহিউদ্দিনের সাথে আলাপ করে দেখলাম, তার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বের হতে পারলে সে আর মুসলিম লীগ করবে না, সেটা আমি বুঝতে পারলাম। সাম্প্রদায়িক রাজনীতি যে পাকিস্তানের জন্য ক্ষতিকর একথাও সে স্বীকার করল।

ঢাকা জেল হাসপাতালে আমার চিকিৎসা হবে না, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠাতে হবে। আমি জানিয়ে দিলাম আমাকে কেবিন দিতে হবে, না হলে আমি যাব না। সরকার কেবিন দিতে রাজি হলেন। আমাকে মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়ার বন্দোবস্ত চলছে। আমার ও মহিউদ্দিনের মধ্যে অনেক ভুল বোঝাবুঝি ছিল পূর্বে, এখন দুইজনই বন্দি। আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। মহিউদ্দিন আমাকে বলল, "তোমার জন্য তো তোমার দল ও ছাত্রলীগ মুক্তি-আন্দোলন করবে। আমার জন্য কেউ করবে না, আমি তো মুসলিম লীগে ছিলাম, আর মুসলিম লীগ সরকারই আমাকে গ্রেফতার করেছে। তুমি তো বোঝ, আমি রাজনৈতিক কর্মী। আমার পক্ষে নিজ হাতে দাঙ্গা করা সম্ভব নয়; আমার নামে মিথ্যা কথা রটাচ্ছে। কারণ, লীগের মধ্যে দুইটা দল হয়ে গেছে। আমি নূরুল আমিন সাহেবের দলের বিরুদ্ধে, তাই তিনি আমাকে নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করেছেন।" আরও বলল, "তোমার জন্য শহীদ সাহেব ও ভাসানী সাহেবও আন্দোলন করবেন।" আমি

বললাম, "যা হবার হয়ে গেছে, তাঁরা আমার মুক্তি চাইলে তোমার মুক্তিও চাইবেন। সে বন্দোবস্তও আমি করব, তুমি দেখে নিও।"

কয়েকদিন পরেই আমাকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হল। চক্ষু দুইটা বেশি যন্ত্রণা দিতেছিল। তাই প্রথমে চোখের চিকিৎসা শুরু করলেন ক্যাপ্টেন লস্কর, চোখের বিখ্যাত ডাক্তার। কিছুদিনের মধ্যে কিছুটা উপকার হল, আরও কিছুদিন লাগবে। ডা. শামসুদ্দিন সাহেব হার্টের চিকিৎসা শুরু করলেন। বিকালে অনেক লোক আসত আমাকে দেখতে। কারণ, বিকাল চারটা থেকে ছয়টা পর্যন্ত যে কেউ হাসপাতালে আসতে পারত। তখন সামান্য কয়েকটা কেবিন ছিল। আমার কেবিনটা ছিল দোতলায় ঠিক সিঁড়ির কাছে। মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা দলে দলে আসত, কেউ কিছু বলতে পারত না। পুলিশরা কেবিনের বাইরে ডিউটি করত। সন্ধ্যার পরে যখন ভিড় কম হত, আমি বাইরে বারান্দায় ঘুরতাম। আমি খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম।

ভাসানী সাহেব জেল থেকে বের হয়ে বসে নাই। হক সাহেব কিছুদিন চুপ করে ছিলেন। শহীদ সাহেবও পূর্ব বাংলায় এসেছেন। ভাসানী সাহেবকে নিয়ে তিনি ময়মনসিংহ, কুমিল্লা আরও অনেক জায়গায় সভা করলেন। প্রত্যেক সভায় মুসলিম লীগ গোলমাল করতে চেষ্টা করেছে। ঢাকার সভায় ১৪৪ ধারা জারি করেছিল, তবুও শহীদ সাহেব আরমানিটোলায় গিয়েছিলেন, কারণ অনেক লোক জমেছিল। শহীদ সাহেব সকলকে অনুরোধ করেছিলেন চলে যেতে। কারণ তিনি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করতে চান না। শহীদ সাহেব ও ভাসানী সাহেব আমার মুক্তির জন্য জোর দাবি তুলেছিলেন। আমি যে অসুস্থ, হাসপাতালে আছি সে কথাও বলতে ভোলেন নাই। শহীদ সাহেব ও আতাউর রহমান সাহেব বিশেষ অনুমতি নিয়ে আমাকে দেখতে আসেন হাসপাতালে। অনেক কথা হল, শহীদ সাহেব আমাকে খুব আদর করলেন। ডাক্তার সাহেবদের ডেকে বললেন, আমার দিকে বিশেষভাবে নজর দিতে। আমি মহিউদ্দিনের কথা তুললাম। শহীদ সাহেব আমার দিকে আশ্চর্য হয়ে চেয়ে রইলেন এবং বললেন, "তুমি বোধহয় জান না, এই মহিউদ্দিনই আমার বিরুদ্ধে লিয়াকত আলী খানের কাছে এক মিথ্যা চিঠি পাঠিয়েছিল যখন বরিশাল যাই, শান্তি মিশনের জন্য সভা করতে ১৯৪৮ সালে। আবার সে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও করেছে ১৯৫১ সালে।" আমি বললাম, "স্যার মানুষের পরিবর্তন হতে পারে, কর্মী তো ভাল ছিল, আপনি তো জানেন, এখন জেলে আছে, আমার সাথেই আছে। আমি আপনাকে বলছি আপনি বিশ্বাস করুন, ওর অনেক পরিবর্তন হয়েছে। ভালপথে আনতে পারলে দেশের অনেক কাজ হবে। আমরা উদার হলে তো কোন ক্ষতি নাই। আমার জন্য যখন মুক্তি দাবি করবেন ওর নামটাও একটু নিবেন, সকলকে বলে দিবেন।" শহীদ সাহেব ছিলেন সাগরের মত উদার। যে কোন লোক তাঁর কাছে একবার যেয়ে হাজির হয়েছে, সে যত বড় অন্যায়ই করুক না কেন, তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

শওকত সাহেব এবং ছাত্রলীগ কর্মীরা একটা আবেদনপত্র ছাপিয়েছে, ঢাকার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিদের দিয়ে দস্তখত করে আমার মুক্তি দাবি করে। আমি শওকত মিয়াকে

বললাম, মেহেরবানি করে মহিউদ্দিনের নামটাও আমার নামের সাথে দিবে। ছাত্রলীগ তো ক্ষেপে অস্থির। ছাত্রলীগ নেতারা পালিয়ে অনেক রাতে আমার সাথে মেডিকেল কলেজে দেখা করতে আসত। অনেকে আবার মেডিকেল কলেজের ছাত্র সেজে আমার সাথে দেখা করতে আসত। আমি অনেককে বুঝিয়ে রাজি করলাম। কিন্তু বরিশালের ছাত্রলীগ নেতারা আমাকে ভুল বুঝল। যদিও আমি মুক্তি পাওয়ার পরে ভুল বোঝাবুঝি দূর করতে পেরেছিলাম।



১৯৫১ সালের অক্টোবর মাসে মওলানা ভাসানী ও আমি যখন জেলে, সেই সময় জনাব লিয়াকত আলী খানকে রাওয়ালপিন্ডিতে এক জনসভায় গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেব গভর্নর জেনারেলের পদ ছেড়ে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী হলেন এবং গোলাম মোহাম্মদ অর্থমন্ত্রী ছিলেন, তাঁকে গভর্নর জেনারেল করলেন। লিয়াকত আলী খান যে ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু করেছিলেন সেই ষড়যন্ত্রেই তাঁকে মরতে হল। কে বা কারা লিয়াকত আলী খানকে হত্যা করার পেছনে ছিল আজ পর্যন্ত তা উদ্ঘাটন হয় নাই। আর হবেও না। এই ষড়যন্ত্রকারীরা যে খুব শক্তিশালী ছিল তা বোঝা যায়। কারণ তারা কোনো চিহ্ন পর্যন্ত রাখে নাই। প্রকাশ্য দিবালোকে জনসমাবেশে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। কি করে হত্যাকারী অত নিকটে স্থান পেল? কি করে পিস্তল তুলে গুলি করল কেউই দেখতে পেল না কেন? গুলির সাথে সাথে আততায়ীকে গুলি করে হত্যা করার কারণ কি? অনেক প্রশ্নই আমাদের মনে জেগেছিল। যদিও তাঁরই হুকুমে এবং নূরুল আমিন সাহেবের মেহেরবানিতে আমরা জেলে আছি, তবুও তাঁর মৃত্যুতে দুঃখ পেয়েছিলাম। কারণ ষড়যন্ত্রের রাজনীতিতে আমরা বিশ্বাস করি না।

পাকিস্তানে যে ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু হয়ে গেছে, তাতেই আমাদের ভয় হল। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে গুলি করে হত্যা করা যে কত বড় জঘন্য কাজ তা ভাষায় প্রকাশ করা কষ্টকর। আমরা যারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি, তারা এই সমস্ত জঘন্য কাজকে ঘৃণা করি। খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেব তাঁর মন্ত্রিত্বে একজন সরকারি আমলাকে গ্রহণ করলেন, তাঁর নাম চৌধুরী মোহাম্মদ আলী। তিনি পাকিস্তান সরকারের সেক্রেটারি জেনারেল ছিলেন। তাঁকে অর্থমন্ত্রী করা হল। এরপর আমলাতন্ত্রের প্রকাশ্য খেলা শুরু হল পাকিস্তানের রাজনীতিতে। একজন সরকারি কর্মচারী হলেন গভর্নর জেনারেল, আরেকজন হলেন অর্থমন্ত্রী। খাজা সাহেব ছিলেন দুর্বল প্রকৃতির লোক। তিনি অনেক গুণের অধিকারী ছিলেন, তবে কর্মক্ষমতা এবং উদ্যোগের অভাব ছিল। ফলে আমলাতন্ত্র মাথা তুলে দাঁড়াল। বিশেষ করে যখন তাদেরই একজনকে অর্থমন্ত্রী করা হল, অনেকের মনে গোপনে গোপনে উচ্চাশারও সঞ্চার হল। আমলাতন্ত্রের জোটের কাছে রাজনীতিবিদরা পরাজিত হতে শুরু করল। রাজনীতিকদের মধ্যে তখন এমন কোনো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নেতা মুসলিম লীগে ছিল

না, যারা এই ষড়যন্ত্রকারী আমলাতন্ত্রকে দাবিয়ে রাখতে পারে। নাজিমুদ্দীন সাহেব গণতন্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত করলেন। কারণ জাতীয় পরিষদের সদস্য নন, একজন সরকারি কর্মচারী, তাকে চাকরি থেকে পদত্যাগ করিয়ে মন্ত্রিত্ব দেওয়ার কি অর্থ থাকতে পারে? আমাদের মনে হল একটা বিশেষ প্রদেশের চাপে পড়েই তাঁকে একাজ করতে হয়েছিল। তিনি প্রধানমন্ত্রী হলেও দুইটা গ্রুপ তাঁর ক্যাবিনেটে কাজ করছিল। একটা গ্রুপ পাঞ্জাবিদের আর একটা গ্রুপ বাঙালিদের। পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশের নেতারা বাঙালি গ্রুপকে তলে তলে সাহায্য করছিল। খাজা সাহেব বিরাট ভুল করে বসলেন।

প্রধানমন্ত্রী হয়ে কিছুদিন পরে তিনি পূর্ব বাংলায় আসেন। প্রথমবারে তিনি কিছুই বলেন নাই। কিছুদিন পরে, বোধহয় ১৯৫১ সালের শেষের দিকে অথবা ১৯৫২ সালের জানুয়ারি মাসে পল্টন ময়দানে এক জনসভায় তিনি বক্তৃতা করলেন। সেখানে ঘোষণা করলেন, "উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে।" তিনি ১৯৪৮ সালে পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে যে ওয়াদা করেছিলেন, সে ওয়াদার খেলাপ করলেন। ১৯৪৮ সালের রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সাথে চুক্তি করেছিলেন এবং নিজেই পূর্ব বাংলা আইনসভায় প্রস্তাব পেশ করেছিলেন যে, পূর্ব বাংলার অফিসিয়াল ভাষা 'বাংলা' হবে। তাছাড়া যাতে বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হয়, তার জন্য কেন্দ্রীয় আইনসভায় কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করা হবে। এ প্রস্তাব পূর্ব বাংলার আইনসভায় সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয়। যে ঢাকায় বসে তিনি ওয়াদা করেছিলেন সেই ঢাকায় বসেই উল্টা বললেন। দেশের মধ্যে ভীষণ ক্ষোভের সৃষ্টি হল। তখন একমাত্র রাজনৈতিক দল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, ছাত্র প্রতিষ্ঠান ছাত্রলীগ এবং যুবাদের প্রতিষ্ঠান যুবলীগ সকলেই এর তীব্র প্রতিবাদ করে।

আমি হাসপাতালে আছি। সন্ধ্যায় মোহাম্মদ তোয়াহা ও অলি আহাদ দেখা করতে আসে। আমার কেবিনের একটা জানালা ছিল ওয়ার্ডের দিকে। আমি ওদের রাত একটার পরে আসতে বললাম। আরও বললাম, খালেক নেওয়াজ, কাজী গোলাম মাহাবুব আরও কয়েকজন ছাত্রলীগ নেতাকে খবর দিতে। দরজার বাইরে আইবিরা পাহারা দিত। রাতে অনেকে ঘুমিয়ে পড়েছে। তখন পিছনের বারান্দায় ওরা পাঁচ-সাতজন এসেছে। আমি অনেক রাতে একা হাঁটাচলা করতাম। রাতে কেউ আসে না বলে কেউ কিছু বলত না। পুলিশরা চুপচাপ পড়ে থাকে, কারণ জানে আমি ভাগব না। গোয়েন্দা কর্মচারী একপাশে বসে ঝিমায়। বারান্দায় বসে আলাপ হল এবং আমি বললাম, সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করতে। আওয়ামী লীগ নেতাদেরও খবর দিয়েছি। ছাত্রলীগই তখন ছাত্রদের মধ্যে একমাত্র জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান। ছাত্রলীগ নেতারা রাজি হল। অলি আহাদ ও তোয়াহা বলল, যুবলীগও রাজি হবে। আবার ষড়যন্ত্র চলছে বাংলা ভাষার দাবিকে নস্যাৎ করার। এখন প্রতিবাদ না করলে কেন্দ্রীয় আইনসভায় মুসলিম লীগ উর্দুর পক্ষে প্রস্তাব পাস করে নেবে। নাজিমুদ্দীন সাহেব উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার কথাই বলেন নাই, অনেক নতুন নতুন যুক্তিতর্ক দেখিয়েছেন। অলি আহাদ যদিও আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের সদস্য হয় নাই, তবুও আমাকে

ব্যক্তিগতভাবে খুবই শ্রদ্ধা করত ও ভালবাসত। আরও বললাম, "খবর পেয়েছি, আমাকে শীঘ্রই আবার জেলে পাঠিয়ে দিবে, কারণ আমি নাকি হাসপাতালে বসে রাজনীতি করছি। তোমরা আগামীকাল রাতেও আবার এস।" আরও দু'একজন ছাত্রলীগ নেতাকে আসতে বললাম। শওকত মিয়া ও কয়েকজন আওয়ামী লীগ কর্মীকেও দেখা করতে বললাম। পরের দিন রাতে এক এক করে অনেকেই আসল। সেখানেই ঠিক হল আগামী ২১শে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা দিবস পালন করা হবে এবং সভা করে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করতে হবে। ছাত্রলীগের পক্ষ থেকেই রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের কনভেনর করতে হবে। ফেব্রুয়ারি থেকেই জনমত সৃষ্টি করা শুরু হবে। আমি আরও বললাম, "আমিও আমার মুক্তির দাবি করে ১৬ই ফেব্রুয়ারি থেকে অনশন ধর্মঘট শুরু করব। আমার ছাব্বিশ মাস জেল হয়ে গেছে।" আমি একথাও বলেছিলাম, "মহিউদ্দিন জেলে আছে, আমার কাছে থাকে। যদি সে অনশন করতে রাজি হয়, তবে খবর দেব। তার নামটাও আমার নামের সাথে দিয়ে দিবে। আমাদের অনশনের নোটিশ দেওয়ার পরই শওকত মিয়া প্যামপ্লেট ও পোস্টার ছাপিয়ে বিলি করার বন্দোবস্ত করবে।"

দুই দিন পরেই দেখলাম একটা মেডিকেল বোর্ড গঠন করে আমাকে এক্সজামিন করতে এসেছে। তারা মত দিলেন আমি অনেকটা সুস্থ, এখন কারাগারে বসেই আমার চিকিৎসা হতে পারে। সরকার আমাকে ঢাকা জেলে পাঠিয়ে দিলেন, ভালভাবে চিকিৎসা না করে। আমি জেলে এসেই মহিউদ্দিনকে সকল কথা বললাম। মহিউদ্দিনও রাজি হল অনশন ধর্মঘট করতে। আমরা দুইজনে সরকারের কাছে পহেলা ফেব্রুয়ারি দরখাস্ত পাঠালাম। যদি ১৫ই ফেব্রুয়ারির মধ্যে আমাদের মুক্তি দেওয়া না হয় তাহা হলে ১৬ই ফেব্রুয়ারি থেকে অনশন ধর্মঘট করতে শুরু করব। দুইখানা দরখাস্ত দিলাম। আমাকে যখন জেল কর্তৃপক্ষ অনুরোধ করল অনশন ধর্মঘট না করতে তখন আমি বলেছিলাম, ছাব্বিশ-সাতাশ মাস বিনাবিচারে বন্দি রেখেছেন। কোনো অন্যায়ও করি নাই। ঠিক করেছি জেলের বাইরে যাব, হয় আমি জ্যান্ত অবস্থায় না হয় মৃত অবস্থায় যাব। "Either I will go out of the jail or my deadbody will go out." তারা সরকারকে জানিয়ে দিল। বাহিরে খবর দিয়েই এসেছিলাম এই তারিখে দরখাস্ত করব। বাইরে সমস্ত জেলায় ছাত্রলীগ কর্মীদের ও যেখানে যেখানে আওয়ামী লীগ ছিল সেখানে খবর পাঠিয়ে দিয়েছিল। সামান্য কয়েকটা জেলা ছাড়া আওয়ামী লীগ তখনও গড়ে ওঠে নাই। তবে সমস্ত জেলায়ই আমার ব্যক্তিগত বন্ধু ও সহকর্মী ছিল। এদিকে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদও গঠন করা হয়েছে। একুশে ফেব্রুয়ারি দিনও ধার্য করা হয়েছে। কারণ, ঐদিনই পূর্ব বাংলার আইনসভা বসবে। কাজী গোলাম মাহাবুবকে সংগ্রাম পরিষদের কনভেনর করা হয়েছিল। ১৯৪৮ সালে ছাত্ররাই এককভাবে বাংলা ভাষার দাবির জন্য সংগ্রাম করেছিল। এবার আমার বিশ্বাস ছিল, জনগণ এগিয়ে আসবে। কারণ জনগণ বুঝতে শুরু করেছে যে, বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা না করতে পারলে তাদের দাসত্বের শৃঙ্খল আবার পরতে হবে। মাতৃভাষার অপমান কোনো জাতি সহ্য করতে পারে না। পাকিস্তানের জনগণের শতকরা ছাপ্পান্নজন বাংলা ভাষাভাষী হয়েও শুধুমাত্র বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা বাঙালিরা করতে চায় নাই। তারা চেয়েছে বাংলার সাথে উর্দুকেও রাষ্ট্রভাষা করা

হোক, তাতে আপত্তি নাই। কিন্তু বাঙালির এই উদারতাটাই অনেকে দুর্বলতা হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছে। এদিকে বাঙালিরা অনুভব করতে শুরু করেছে যে, তাদের উপর অর্থনৈতিক দিক দিয়ে, ব্যবসা-বাণিজ্য, সরকারি চাকরিতেও অবিচার চলছে। পশ্চিম পাকিস্তানের করাচিতে রাজধানী হওয়াতে বাঙালিরা সুযোগ-সুবিধা হতে বঞ্চিত হতে শুরু করেছে। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি এবং শেষ পর্যন্ত সর্বদলীয় 'গ্রান্ড ন্যাশনাল কনভেনশনে' স্বায়ত্তশাসনের দাবি করায় বাঙালিদের মনোভাব ফুটে উঠেছে। পূর্ব বাংলার মুসলিম লীগ নেতারা যতই জনগণের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছিলেন ততই পশ্চিম পাকিস্তানের কোটারি ও আমলাতন্ত্রের উপর নির্ভর করতে শুরু করেছেন ক্ষমতায় থাকার জন্য। খাজা নাজিমুদ্দীন ও জনাব নূরুল আমিন জনগণকে ভয় করতে শুরু করেছেন। সেইজন্য টাঙ্গাইল উপনির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পরে অনেকগুলি আইনসভার সদস্যের পদ খালি হওয়া সত্ত্বেও উপনির্বাচন দিতে সাহস পাচ্ছিলেন না।

জনগণের আস্থা হারাতে শুরু করেছিল বলে আমলাতন্ত্রের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল মুসলিম লীগ নেতারা। তখন পূর্ব বাংলার চিফ সেক্রেটারি ছিলেন জনাব আজিজ আহমদ (পুরানা আইসিএস)। তিনি বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ ছিলেন, কাজকর্ম খুব ভাল বুঝতেন। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি হিসাবেই কাজ করতেন। হামিদুল হক চৌধুরী সাহেবের বিরুদ্ধে পোডো মামলায়[২২] সাক্ষী হিসাবে তিনি স্বীকার করেছিলেন, তিনি মন্ত্রীদের কাজকর্ম সম্বন্ধে ফাইল রাখতেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে সে ব্যাপারে খবর দিতেন। হামিদুল হক চৌধুরী সাহেব মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর সহকর্মীরা ক্ষমতায় ছিলেন। তাঁরা সাহস পেলেন না কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। আজিজ আহমদের ব্যক্তিত্বের সামনে অনেকে কথা বলতেও সাহস পেতেন না। মুসলিম লীগ সরকার জনমত যাতে তাদের দিকে থাকে তার চেষ্টা না করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আওয়ামী লীগ এবং বিরুদ্ধ মতবাদের কর্মী ও নেতাদের উপর। যে কোন অজুহাতে নিরাপত্তা আইন ব্যবহার করতে শুরু করেছিল।



এদিকে জেলের ভেতর আমরা দুইজনে প্রস্তুত হচ্ছিলাম অনশন ধর্মঘট করার জন্য। আমরা আলোচনা করে ঠিক করেছি, যাই হোক না কেন, আমরা অনশন ভাঙব না। যদি এই পথেই মৃত্যু এসে থাকে তবে তাই হবে। জেল কর্তৃপক্ষ বিশেষ করে সুপারিনটেনডেন্ট আমীর হোসেন সাহেব ও তখনকার দিনে রাজবন্দিদের ডেপুটি জেলার মোখলেসুর রহমান সাহেব আমাদের বুঝাতে অনেক চেষ্টা করলেন। আমরা তাঁদের বললাম, আপনাদের বিরুদ্ধে আমাদের বলবার কিছু নাই। আর আমরা সেজন্য অনশন করছি না। সরকার আমাদের বৎসরের পর বৎসর বিনা বিচারে আটক রাখছে, তারই প্রতিবাদ করার জন্য অনশন ধর্মঘট করছি। এতদিন জেল খাটলাম, আপনাদের সাথে আমাদের মনোমালিন্য হয় নাই। কারণ

আমরা জানি যে, সরকারের হুকুমেই আপনাদের চলতে হয়। মোখলেসুর রহমান সাহেব খুবই অমায়িক, ভদ্র ও শিক্ষিত ছিলেন। তিনি খুব লেখাপড়া করতেন।

১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে সকালবেলা আমাকে জেলগেটে নিয়ে যাওয়া হল এই কথা বলে যে, আমার সাথে আলোচনা আছে অনশন ধর্মঘটের ব্যাপার নিয়ে। আমি যখন জেলগেটে পৌঁছালাম দেখি, একটু পরেই মহিউদ্দিনকেও নিয়ে আসা হয়েছে একই কথা বলে। কয়েক মিনিট পরে আমার মালপত্র, কাপড়চোপড় ও বিছানা নিয়ে জমাদার সাহেব হাজির। বললাম, ব্যাপার কি? কর্তৃপক্ষ বললেন, আপনাদের অন্য জেলে পাঠানোর হুকুম হয়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম, কোন জেলে? কেউ কিছু বলেন না। এদিকে আর্মড পুলিশ, আইবি অফিসারও প্রস্তুত হয়ে এসেছে। খবর চাপা থাকে না। একজন আমাকে বলে দিল, ফরিদপুর জেলে। দুইজনকেই এক জেলে পাঠানো হচ্ছে। তখন নয়টা বেজে গেছে। এগারটায় নারায়ণগঞ্জ থেকে জাহাজ ছাড়ে, সেই জাহাজ আমাদেরকে ধরতে হবে। আমি দেরি করতে শুরু করলাম, কারণ তা না হলে কেউই জানবে না আমাদের কোথায় পাঠাচ্ছে! প্রথমে আমার বইগুলি এক এক করে মেলাতে শুরু করলাম, তারপর কাপড়গুলি। হিসাব-নিকাশ, কত টাকা খরচ হয়েছে, কত টাকা আছে। দেরি করতে করতে দশটা বাজিয়ে দিলাম। রওয়ানা করতে আরও আধা ঘণ্টা লাগিয়ে দিলাম। আর্মড পুলিশের সুবেদার ও গোয়েন্দা কর্মচারীরা তাড়াতাড়ি করছিল। সুবেদার পাকিস্তান হওয়ার সময় গোপালগঞ্জে ছিল এবং সে একজন বেলুচি ভদ্রলোক। আমাকে খুবই ভালবাসত এবং শ্রদ্ধা করত। আমাকে পাকিস্তানের পক্ষে কাজ করতে দেখেছে। আমাকে দেখেই বলে বসল, "ইয়ে কেয়া বাত হ্যায়, আপ জেলখানা মে।" আমি বললাম, "কিসমত"। আর কিছুই বললাম না। আমাদের জন্য বন্ধ ঘোড়ার গাড়ি আনা হয়েছে। গাড়ির ভিতর জানালা উঠিয়ে ও দরজার কপাট বন্ধ করে দিল। দুইজন ভিতরেই আমাদের সাথে বসল। আর একটা গাড়িতে অন্যরা পিছনে পিছনে ভিক্টোরিয়া পার্কের পাশে রোডের দিকে চলল। সেখানে যেয়ে দেখি পূর্বেই একজন আর্মড পুলিশ ট্যাক্সি রিজার্ভ করে দাঁড়িয়ে আছে। তখন ট্যাক্সি পাওয়া খুবই কষ্টকর ছিল। আমরা আস্তে আস্তে নামলাম ও উঠলাম। কোন চেনা লোকের সাথে দেখা হল না। যদিও এদিক ওদিক অনেকবার তাকিয়ে ছিলাম। ট্যাক্সি তাড়াতাড়ি চালাতে বলল। আমি ট্যাক্সিওয়ালাকে বললাম, "বেশি জোরে চালাবেন না, কারণ বাবার কালের জীবনটা যেন রাস্তায় না যায়।"

আমরা পৌঁছে খবর পেলাম জাহাজ ছেড়ে চলে গেছে। এখন উপায়? কোথায় আমাদের নিয়ে যাবে? রাত একটায় আর একটা জাহাজ ছাড়বে। আমাদের নারায়ণগঞ্জ থানায় নিয়ে যাওয়া হল। ওপরওয়ালাদের টেলিফোন করল এবং হুকুম নিল থানায়ই রাখতে। আমাদের পুলিশ ব্যারাকের একটা ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। একজন চেনা লোককে থানায় দেখলাম, তাকে বললাম, শামসুজ্জোহাকে খবর দিতে। খান সাহেব ওসমান আলী সাহেবের বাড়ি সকলেই চিনে। এক ঘণ্টার মধ্যে জোহা সাহেব, বজলুর রহমান ও আরও অনেকে থানায় এসে হাজির। আমাদের জন্য খাবার নিয়ে এসেছে। পরে আলমাস আলীও আমাদের

দেখতে এসেছিল। আমি ওদের বললাম, "রাতে হোটেলে খেতে যাব। কোন্ হোটেলে যাব বলে যান। আপনারা পূর্বেই সেই হোটেলে বসে থাকবেন। আলাপ আছে।" আমাদের কেন বদলি করেছে, ঢাকা জেল থেকে ফরিদপুর জেলে, এর মধ্যেই বলে দিলাম। বেশি সময় তাদের থাকতে দিল না থানায়। হোটেলের নাম বলে বিদায় নিল। আমি বললাম, "রাত আটটা থেকে সাড়ে আটটায় আমরা পৌঁছাব।" নতুন একটা হোটেল হয়েছে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রোডের উপরে, হোটেলটা দোতালা।

আমি সুবেদার সাহেবকে বললাম যে, "আমাদের খাওয়া-দাওয়া দরকার, চলুন, হোটেলে খাই। সেখান থেকে জাহাজঘাটে চলে যাব।" সে রাজি হল। আমার কথা ফেলবে না এ বিশ্বাস আমার ছিল। আর আমাদের তো খাওয়াতে হবে। একজন সিপাহি দিয়ে মালপত্র স্টেশনে পাঠিয়ে দিল আর আমরা যথাসময়ে হোটেলে পৌঁছালাম। দোতালায় একটা ঘরে বসার ব্যবস্থা ছিল। সেখানে আমাদের খাবার বন্দোবস্ত করে রেখেছে। আমরা বসে পড়লাম। আট-দশজন কর্মী নিয়ে জোহা সাহেব বসে আছেন। আমরা আস্তে আস্তে খাওয়া-দাওয়া করলাম, আলাপ-আলোচনা করলাম। ভাসানী সাহেব, হক সাহেব ও অন্যান্য নেতাদের খবর দিতে বললাম। খবরের কাগজে যদি দিতে পারে চেষ্টা করবে। বললাম, সাপ্তাহিক *ইত্তেফাক* তো আছেই। আমরা যে আগামীকাল থেকে আমরণ অনশন শুরু করব, সেকথাও তাদের বললাম, যদিও তারা পূর্বেই খবর পেয়েছিল। নারায়ণগঞ্জের কর্মীদের ত্যাগ ও তিতিক্ষার কথা কোনো রাজনৈতিক কর্মী ভুলতে পারে না। তারা আমাকে বলল, "২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে নারায়ণগঞ্জে পূর্ণ হরতাল হবে। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবি তো আছেই, আপনাদের মুক্তির দাবিও আমরা করব।" এখানেও আমাকে নেতারা প্রশ্ন করল, "মহিউদ্দিনকে বিশ্বাস করা যায় কি না! আবার বাইরে এসে মুসলিম লীগ করবে না তো।" আমি বললাম, "আমাদের কাজ আমরা করি, তার কর্তব্য সে করবে। তবে মুসলিম লীগ করবে না। সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নাই। সে বন্দি, তার মুক্তি চাইতে আপত্তি কি! মানুষকে ব্যবহার, ভালবাসা ও প্রীতি দিয়েই জয় করা যায়, অত্যাচার, জুলুম ও ঘৃণা দিয়ে জয় করা যায় না।"

রাত এগারটায় আমরা স্টেশনে আসলাম। জাহাজ ঘাটেই ছিল, আমরা উঠে পড়লাম। জাহাজ না ছাড়া পর্যন্ত সহকর্মীরা অপেক্ষা করল। রাত একটার সময় সকলের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। বললাম, "জীবনে আর দেখা না হতেও পারে। সকলে যেন আমাকে ক্ষমা করে দেয়। দুঃখ আমার নাই। একদিন মরতেই হবে, অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে যদি মরতে পারি, সে মরাতেও শান্তি আছে।"

জাহাজ ছেড়ে দিল, আমরা বিছানা করে শুয়ে পড়লাম। সকালে দুইজনে পরামর্শ করে ঠিক করলাম, জাহাজে অনশন করি কি করে? আমাদের জেলে নিতে হবে অনশন শুরু করার পূর্বে। সমস্ত দিন জাহাজ চলল, রাতে গোয়ালন্দ ঘাটে এলাম। সেখান থেকে ট্রেনে রাত চারটায় ফরিদপুর পৌঁছালাম। রাতে আমাদের জেল কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করল না। আমরা দুইজনে জেল সিপাহিদের ব্যারাকের বারান্দায় কাটালাম। সকালবেলা সুবেদার

সাহেবকে বললাম, "জেল অফিসাররা না আসলে তো আমাদের জেলে নিবে না, চলেন কিছু নাশতা করে আসি।" নাশতা খাবার ইচ্ছা আমাদের নাই। তবে যদি কারও সাথে দেখা হয়ে যায়, তাহলে ফরিদপুরের সহকর্মীরা জানতে পারবে, আমরা ফরিদপুর জেলে আছি এবং অনশন ধর্মঘট করছি। আধা ঘণ্টা দেরি করলাম, কাউকেও দেখি না—চায়ের দোকানের মালিক এসেছে, তাকে আমি আমার নাম বললাম এবং খবর দিতে বললাম আমার সহকর্মীদের। আমরা জেলের দিকে রওয়ানা করছি, এমন সময় আওয়ামী লীগের এক কর্মী, তার নামও মহিউদ্দিন—সকলে মহি বলে ডাকে, তার সঙ্গে দেখা। আমি যখন ফরিদপুরে ১৯৪৬ সালের ইলেকশনে ওয়ার্কার ইনচার্জ ছিলাম, তখন আমার সাথে সাথে কাজ করেছে। মহি সাইকেলে যাচ্ছিল, আমি তাকে দেখে ডাক দিলাম নাম ধরে, সে সাইকেল থেকে আমাকে দেখে এগিয়ে আসল। আইবি নিষেধ করছিল। আমি শুনলাম না, তাকে এক ধমক দিলাম এবং মহিকে বললাম, আমাদের ফরিদপুর জেলে এনেছে এবং আজ থেকে অনশন করছি সকলকে এখবর দিতে। আমরা জেলগেটে চলে আসলাম, মহিও সাথে সাথে আসল।

*

আমরা জেলগেটে এসে দেখি, জেলার সাহেব, ডেপুটি জেলার সাহেব এসে গেছেন। আমাদের তাড়াতাড়ি ভিতরে নিয়ে যেতে বললেন। তাঁরা পূর্বেই খবর পেয়েছিলেন। জায়গাও ঠিক করে রেখেছেন, তবে রাজবন্দিদের সাথে নয়, অন্য জায়গায়। আমরা তাড়াতাড়ি ঔষধ খেলাম পেট পরিষ্কার করবার জন্য। তারপর অনশন ধর্মঘট শুরু করলাম। দুই দিন পর অবস্থা খারাপ হলে আমাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। আমাদের দুইজনেরই শরীর খারাপ। মহিউদ্দিন ভুগছে প্লুরিসিস রোগে, আর আমি ভুগছি নানা রোগে। চার দিন পরে আমাদের নাক দিয়ে জোর করে খাওয়াতে শুরু করল। মহাবিপদ! নাকের ভিতর নল দিয়ে পেটের মধ্যে পর্যন্ত দেয়। তারপর নলের মুখে একটা কাপের মত লাগিয়ে দেয়। একটা ছিদ্রও থাকে। সে কাপের মধ্যে দুধের মত পাতলা করে খাবার তৈরি করে পেটের ভিতর ঢেলে দেয়। এদের কথা হল, 'মরতে দেব না'।

আমার নাকে একটা ব্যারাম ছিল। দুই তিনবার দেবার পরেই ঘা হয়ে গেছে। রক্ত আসে আর যন্ত্রণা পাই। আমরা আপত্তি করতে লাগলাম। জেল কর্তৃপক্ষ শুনছে না। খুবই কষ্ট হচ্ছে। আমার দুইটা নাকের ভিতরই ঘা হয়ে গেছে। তারা হ্যান্ডকাপ পরানোর লোকজন নিয়ে আসে। বাধা দিলে হ্যান্ডকাপ পরিয়ে জোর করে ধরে খাওয়াবে। আমাদের শরীরও খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে। পাঁচ-ছয় দিন পরে বিছানা থেকে ওঠার শক্তি হারিয়ে ফেলেছি। আমরা ইচ্ছা করে কাগজি লেবুর রস দিয়ে লবণ পানি খেতাম। কারণ এর মধ্যে কোনো ফুড ভ্যালু নাই। আমাদের ওজনও কমতে ছিল। নাকের মধ্য দিয়ে নল দিয়ে খাওয়ার সময় নলটা একটু এদিক ওদিক হলেই আর উপায় থাকবে না। সিভিল সার্জন সাহেব,

পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠার চিত্রলিপি

ডাক্তার সাহেব ও জেল কর্তৃপক্ষ আমাদের কোনো অসুবিধা না হয়, তার চেষ্টা করছিলেন। বার বার সিভিল সার্জন সাহেব অনশন করতে নিষেধ করছিলেন। আমার ও মহিউদ্দিনের শরীর অতিশয় দুর্বল হয়ে পড়েছে। এখন আর বিছানা থেকে উঠবার শক্তি নাই। আমার হার্টের অবস্থা খারাপ হয়ে পড়েছে বুঝতে পারলাম। প্যালপিটিশন হয় ভীষণভাবে। নিঃশ্বাস ফেলতে কষ্ট হয়। ভাবলাম আর বেশি দিন নাই। একজন কয়েদিকে দিয়ে গোপনে কয়েক টুকরা কাগজ আনালাম। যদিও হাত কাঁপে তথাপি ছোট ছোট করে চারটা চিঠি লিখলাম। আব্বার কাছে একটা, রেণুর কাছে একটা, আর দুইটা শহীদ সাহেব ও ভাসানী সাহেবের কাছে। দু'একদিন পরে আর লেখার শক্তি থাকবে না।

২১শে ফেব্রুয়ারি আমরা উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা নিয়ে দিন কাটালাম, রাতে সিপাহিরা ডিউটিতে এসে খবর দিল, ঢাকায় ভীষণ গোলমাল হয়েছে। কয়েকজন লোক গুলি খেয়ে মারা গেছে। রেডিওর খবর। ফরিদপুরে হরতাল হয়েছে, ছাত্র-ছাত্রীরা শোভাযাত্রা করে জেলগেটে এসেছিল। তারা বিভিন্ন স্লোগান দিচ্ছিল, 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'বাঙালিদের শোষণ করা চলবে না', 'শেখ মুজিবের মুক্তি চাই', 'রাজবন্দিদের মুক্তি চাই', আরও অনেক স্লোগান। আমার খুব খারাপ লাগল। কারণ, ফরিদপুর আমার জেলা, মহিউদ্দিনের নামে কোনো স্লোগান দিচ্ছে না কেন? শুধু 'রাজবন্দিদের মুক্তি চাই', বললেই তো হত। রাতে যখন ঢাকার খবর পেলাম তখন ভীষণ চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়লাম। কত লোক মারা গেছে বলা কষ্টকর। তবে অনেক লোক গুলি খেয়ে মারা গেছে শুনেছি। দু'জনে পাশাপাশি বিছানায় শুয়ে আছি। ডাক্তার সাহেব আমাদের নড়াচড়া করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু উত্তেজনায় উঠে বসলাম। দুইজন কয়েদি ছিল আমাদের পাহারা দেবার এবং কাজকর্ম করে দেবার জন্য। তাড়াতাড়ি আমাদের ধরে শুইয়ে দিল। খুব খারাপ লাগছিল, মনে হচ্ছিল চিন্তাশক্তি হারিয়ে ফেলেছি। গুলি করার তো কোন দরকার ছিল না। হরতাল করবে, সভা ও শোভাযাত্রা করবে, কেউ তো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায় না। কোনো গোলমাল সৃষ্টি করার কথা তো কেউ চিন্তা করে নাই। ১৪৪ ধারা দিলেই গোলমাল হয়, না দিলে গোলমাল হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। অনেক রাতে একজন সিপাহি এসে বলল, ছাত্র মারা গেছে অনেক। বহু লোক গ্রেফতার হয়েছে। রাতে আর কোন খবর নাই। ঘুম তো এমনিই হয় না, তারপর আবার এই খবর। পরের দিন নয়-দশটার সময় বিরাট শোভাযাত্রা বের হয়েছে, বড় রাস্তার কাছেই জেল। শোভাযাত্রীদের স্লোগান পরিষ্কার শুনতে পেতাম, হাসপাতালের দোতলা থেকে দেখাও যায়, কিন্তু আমরা নিচের তলায়। হর্ন দিয়ে একজন বক্তৃতা করছে। আমাদের জানাবার জন্যই হবে। কি হয়েছে ঢাকায় আমরা কিছু কিছু বুঝতে পারলাম। জেল কর্তৃপক্ষ আমাদের কোনো খবর দিতে চায় না। আমরা যেন কোন খবর না পাই, আর কোনো খবর না দিতে পারি বাইরে, এই তাদের চেষ্টা। খবরের কাগজ তো একদিন পরে আসবে, ঢাকা থেকে।

২২ তারিখে সারা দিন ফরিদপুরে শোভাযাত্রা চলল। কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী এক জায়গায় হলেই স্লোগান দেয়। ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়েরা রাস্তায় বেড়ায় আর স্লোগান দেয়। ২২ তারিখে খবরের কাগজ এল, কিছু কিছু খবর পেলাম। মুসলিম লীগ সরকার কত বড়

অপরিণামদর্শিতার কাজ করল। মাতৃভাষা আন্দোলনে পৃথিবীতে এই প্রথম বাঙালিরাই রক্ত দিল। দুনিয়ার কোথাও ভাষা আন্দোলন করার জন্য গুলি করে হত্যা করা হয় নাই। জনাব নূরুল আমিন বুঝতে পারলেন না, আমলাতন্ত্র তাঁকে কোথায় নিয়ে গেল। গুলি হল মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের এরিয়ার ভেতরে, রাস্তায়ও নয়। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করলেও গুলি না করে গ্রেফতার করলেই তো চলত। আমি ভাবলাম, দেখব কি না জানি না, তবে রক্ত যখন আমাদের ছেলেরা দিয়েছে তখন বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা না করে আর উপায় নাই। মানুষের যখন পতন আসে তখন পদে পদে ভুল হতে থাকে। বাংলাদেশের মুসলিম লীগ নেতারা বুঝলেন না, কে বা কারা খাজা সাহেবকে উর্দুর কথা বলালেন, আর কেনই বা তিনি বললেন! তাঁরা তো জানতেন, উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার কথা বলে মিস্টার জিন্নাহর মত নেতাও বাধা না পেয়ে ফিরে যেতে পারেন নাই। সেখানে খাজা সাহেব এবং তার দলবলের অবস্থা কি হবে? একটা বিশেষ গোষ্ঠী—যাঁরা ষড়যন্ত্রের রাজনীতি করতে শুরু করেছেন, তাঁরাই তাঁকে জনগণ থেকে যাতে দূরে সরে পড়েন তার বন্দোবস্ত করলেন। সাথে সাথে তাঁর সমর্থক নূরুল আমিন সাহেবও যাতে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান সে ব্যবস্থাও করালেন। কারণ ভবিষ্যতে এই বিশেষ গোষ্ঠী কোনো একটা গভীর ষড়যন্ত্রের প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। যদিও খাজা সাহেবের জনসমর্থন কোনোদিন বাংলাদেশে ছিল না।

খবরের কাগজে দেখলাম, মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ এমএলএ, খয়রাত হোসেন এমএলএ, খান সাহেব ওসমান আলী এমএলএ এবং মোহাম্মদ আবুল হোসেন ও খোন্দকার মোশতাক আহমদসহ শত শত ছাত্র ও কর্মীকে গ্রেফতার করেছে। দু'একদিন পরে দেখলাম কয়েকজন প্রফেসর, মওলানা ভাসানী, শামসুল হক সাহেব ও বহু আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীকে গ্রেফতার করেছে। নারায়ণগঞ্জে খানসাহেব ওসমান আলীর বাড়ির ভিতরে ঢুকে ভীষণ মারপিট করেছে। বৃদ্ধ খান সাহেব ও তাঁর ছেলেমেয়েদের উপর অকথ্য অত্যাচার হয়েছে। সমস্ত ঢাকায় ও নারায়ণগঞ্জে এক ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছে। আওয়ামী লীগের কোন কর্মীই বোধহয় আর বাইরে নাই।

আমাদের অবস্থা এখন এমন পর্যায়ে এসেছে যে, যে কোনো মুহূর্তে মৃত্যুর শান্তি ছায়ায় চিরদিনের জন্য স্থান পেতে পারি। সিভিল সার্জন সাহেব দিনের মধ্যে পাঁচ-সাতবার আমাদের দেখতে আসেন। ২৫ তারিখ সকালে যখন আমাকে তিনি পরীক্ষা করছিলেন হঠাৎ দেখলাম, তার মুখ গম্ভীর হয়ে গেছে। তিনি কোনো কথা না বলে, মুখ কালো করে বেরিয়ে গেলেন। আমি বুঝলাম, আমার দিন ফুরিয়ে গেছে। কিছু সময় পরে আবার ফিরে এসে বললেন, "এভাবে মৃত্যুবরণ করে কি কোনো লাভ হবে? বাংলাদেশ যে আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করে।" আমার কথা বলতে কষ্ট হয়, আস্তে আস্তে বললাম, "অনেক লোক আছে। কাজ পড়ে থাকবে না। দেশকে ও দেশের মানুষকে ভালবাসি, তাদের জন্যই জীবন দিতে পারলাম, এই শান্তি।" ডেপুটি জেলার সাহেব বললেন, "কাউকেও খবর দিতে হবে কি না? আপনার ছেলেমেয়ে ও স্ত্রী কোথায়? আপনার আব্বার কাছে কোনো টেলিগ্রাম

করবেন?" বললাম, "দরকার নাই। আর তাদের কষ্ট দিতে চাই না।" আমি আশা ছেড়ে দিয়েছি, হাত-পা অবশ হয়ে আসছিল। হার্টের দুর্বলতা না থাকলে এত তাড়াতাড়ি দুর্বল হয়ে পড়তাম না। একজন কয়েদি ছিল, আমার হাত-পায়ে সরিষার তেল গরম করে মালিশ করতে শুরু করল। মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিল।

মহিউদ্দিনের অবস্থাও ভাল না, কারণ প্লুরিসিস আবার আক্রমণ করে বসেছে। আমার চিঠি চারখানা একজন কর্মচারীকে ডেকে তাঁর কাছে দিয়ে বললাম, আমার মৃত্যুর পরে চিঠি চারখানা ফরিদপুরে আমার এক আত্মীয়ের কাছে পৌঁছে দিতে। তিনি কথা দিলেন, আমি তাঁর কাছ থেকে ওয়াদা নিলাম। বার বার আব্বা, মা, ভাইবোনদের চেহারা ভেসে আসছিল আমার চোখের সামনে। রেণুর দশা কি হবে? তার তো কেউ নাই দুনিয়ায়। ছোট ছেলেমেয়ে দুইটার অবস্থাই বা কি হবে? তবে আমার আব্বা ও ছোট ভাই ওদের ফেলবে না, এ বিশ্বাস আমার ছিল। চিন্তাশক্তিও হারিয়ে ফেলছিলাম। হাচিনা, কামালকে একবার দেখতেও পারলাম না। বাড়ির কেউ খবর পায় নাই, পেলে নিশ্চয়ই আসত।

মহিউদ্দিনের তো কেউ ফরিদপুর নাই। বরিশালের এক গ্রামে তার বাড়ি। ভাইরা বড় বড় চাকরি করেন। এক ভাই ছাড়া কেউ বেশি খবর নিতেন না। তিনি সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তাঁকে আমি জানতাম। যাহোক, মহিউদ্দিন ও আমি পাশাপাশি দুইটা খাট পেতে নিয়েছিলাম। একজন আরেকজনের হাত ধরে শুয়ে থাকতাম। দু'জনেই চুপচাপ পড়ে থাকি। আমার বুকে ব্যথা শুরু হয়েছে। সিভিল সার্জন সাহেবের কোন সময় অসময় ছিল না। আসছেন, দেখছেন, চলে যাচ্ছেন। ২৭ তারিখ দিনেরবেলা আমার অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়ল। বোধহয় আর দু'একদিন বাঁচতে পারি।

২৭ তারিখ রাত আটটার সময় আমরা দুইজন চুপচাপ শুয়ে আছি। কারও সাথে কথা বলার ইচ্ছাও নাই, শক্তিও নাই। দুইজনেই শুয়ে শুয়ে কয়েদির সাহায্যে ওজু করে খোদার কাছে মাপ চেয়ে নিয়েছি। দরজা খুলে বাইরে থেকে ডেপুটি জেলার এসে আমার কাছে বসলেন এবং বললেন, "আপনাকে যদি মুক্তি দেওয়া হয়, তবে খাবেন তো?" বললাম, "মুক্তি দিলে খাব, না দিলে খাব না। তবে আমার লাশ মুক্তি পেয়ে যাবে।" ডাক্তার সাহেব এবং আরও কয়েকজন কর্মচারী এসে গেছে চেয়ে দেখলাম। ডেপুটি জেলার সাহেব বললেন, "আমি পড়ে শোনাই, আপনার মুক্তির অর্ডার এসে গেছে রেডিওগ্রামে এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের অফিস থেকেও অর্ডার এসেছে। দুইটা অর্ডার পেয়েছি"। তিনি পড়ে শোনালেন, আমি বিশ্বাস করতে চাইলাম না। মহিউদ্দিন শুয়ে শুয়ে অর্ডারটা দেখল এবং বলল যে, তোমার অর্ডার এসেছে। আমাকে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। ডেপুটি সাহেব বললেন, "আমাকে অবিশ্বাস করার কিছুই নাই। কারণ, আমার কোনো স্বার্থ নাই; আপনার মুক্তির আদেশ সত্যিই এসেছে।" ডাক্তার সাহেব ডাবের পানি আনিয়েছেন। মহিউদ্দিনকে দুইজন ধরে বসিয়ে দিলেন। সে আমাকে বলল, "তোমাকে ডাবের পানি আমি খাইয়ে দিব।" দুই চামচ ডাবের পানি দিয়ে মহিউদ্দিন আমার অনশন ভাঙিয়ে দিল। মহিউদ্দিনের কোনো অর্ডার আসে নাই এখনও। এটা আমায় আরও পীড়া দিতে লাগল। ওকে ছেড়ে যাব কেমন

করে? মুক্তির আদেশ এলেও জেলের বাইরে যাবার শক্তি আমার নেই। সিভিল সার্জন সাহেবও ছাড়বেন না। মাঝে মাঝে ডাবের পানিই আমাকে খেতে দিচ্ছিল। রাত কেটে গেল। সকালে একটু খেলেও ডাব খেতে দিল। আমি অনেকটা সুস্থ বোধ করতে লাগলাম, কিন্তু মহিউদ্দিনকে ফেলে যাব কেমন করে? দু'জন একসাথে ছিলাম। আমি চলে গেলে ওর উপায় কি হবে, কে দেখবে? যদি ওকে না ছাড়ে! ওর অবস্থা তো আমারই মত, তবে কেন ছাড়বে না! আমি তো পাকিস্তান হওয়ার পর থেকে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ দলের নেতাদের 'দুশমন' হয়ে পড়েছি, কিন্তু মহিউদ্দিন তো জেলে আসার পূর্ব দিন পর্যন্তও মুসলিম লীগের বিশিষ্ট সদস্য ছিল। রাজনীতিতে দেখা গেছে একই দলের লোকের মধ্যে মতবিরোধ হলে দুশমনি বেশি হয়।

সকাল দশটার দিকে খবর পেলাম, আব্বা এসেছেন। জেলগেটে আমাকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই কর্তৃপক্ষ তাঁকে ভিতরে নিয়ে আসলেন। আমাকে দেখেই আব্বার চোখে পানি এসে গেছে। আব্বার সহ্য শক্তি খুব বেশি। কোনোমতে চোখের পানি মুছে ফেললেন। কাছে বসে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন এবং বললেন, "তোমার মুক্তির আদেশ হয়েছে, তোমাকে আমি নিয়ে যাব বাড়িতে। আমি ঢাকায় গিয়েছিলাম তোমার মা, রেণু, হাচিনা ও কামালকে নিয়ে, দুই দিন বসে রইলাম, কেউ খবর দেয় না, তোমাকে কোথায় নিয়ে গেছে। তুমি ঢাকায় নাই একথা জেলগেট থেকে বলেছে। যদিও পরে খবর পেলাম, তুমি ফরিদপুর জেলে আছ। তখন যোগাযোগব্যবস্থা বন্ধ। নারায়ণগঞ্জ এসে যে জাহাজ ধরব তারও উপায় নেই। তোমার মা ও রেণুকে ঢাকায় রেখে আমি চলে এসেছি। কারণ, আমার সন্দেহ হয়েছিল তোমাকে ফরিদপুর নেওয়া হয়েছে কি না! আজই টেলিগ্রাম করব, তারা যেন বাড়িতে রওয়ানা হয়ে যায়। আমি আগামীকাল বা পরশু তোমাকে নিয়ে রওয়ানা করব বাকি খোদা ভরসা। সিভিল সার্জন সাহেব বলেছেন, তোমাকে নিয়ে যেতে হলে লিখে দিতে হবে যে, 'আমার দায়িত্বে নিয়ে যাচ্ছি।' আব্বা আমাকে সান্ত্বনা দিলেন এবং বললেন, তিনি খবর পেয়েছেন মহিউদ্দিনও মুক্তি পাবে, তবে একসাথে ছাড়বে না, একদিন পরে ছাড়বে।



পরের দিন আব্বা আমাকে নিতে আসলেন। অনেক লোক জেলগেটে হাজির। আমাকে স্ট্রেচারে করে জেলগেটে নিয়ে যাওয়া হল এবং গেটের বাইরে রেখে দিল, যদি কিছু হয় বাইরে গিয়ে হোক, এই তাদের ধারণা। আমাকে কয়েকজনে বয়ে নিয়ে গেল আলাউদ্দিন খান সাহেবের বাড়িতে। সেখানে কিছু সময় রাখল। বিকালে আমার বোনের বাড়িতে নিয়ে আসল। রাতটা সেখানে কাটালাম। আত্মীয়স্বজনসহ অনেক লোক আমাকে দেখতে আসল। আব্বা আমার কাছেই রইলেন। পরের দিন সকালে আমার এক বন্ধু ট্যাক্সি নিয়ে এল। সে নিজেই ড্রাইভ করে আমাকে ভাঙ্গায় নিয়ে আসল। আব্বা একটা বড় নৌকা ভাড়া করলেন। আমার ফুপুর বাড়ি রাস্তার পাশেই। তিনি রাস্তায় চলে এসেছেন আমাকে দেখতে। আব্বাকে

বললেন, তাঁদের বাড়ি নূরপুর গ্রামে থাকতে। আব্বা বললেন, এখান থেকে নৌকায় বড়বোনের বাড়ি দত্তপাড়া যাবেন। সেখানে আরও একদিন থাকবেন। একটু সুস্থ হলে বড়বোনকে সাথে নিয়ে বাড়িতে যাবেন। আমি অনেকটা সুস্থ বোধ করছি, যদিও খুবই দুর্বল।

দত্তপাড়া মাদারীপুর মহকুমায়, সেখান থেকে একদিন একরাত লাগবে গোপালগঞ্জ পৌঁছাতে নৌকায়। সিন্ধিয়া ঘাটে কর্মীরা বসে আছে খবর পেয়ে। আমাকে দেখেই তারা স্টিমারে গোপালগঞ্জ রওয়ানা করল। আমি কয়েক ঘণ্টা পরে গোপালগঞ্জ পৌঁছে দেখি, বিরাট জনতা, সমস্ত নদীর পাড় ভরে গেছে। আমাকে তারা নামাবেই। আব্বা আপত্তি করলেও তারা শুনল না। আমাকে কোলে করে রাস্তায় শোভাযাত্রা বের করল এবং আবার নৌকায় পৌঁছে দিল। আব্বা আর দেরি না করে আমাকে নিয়ে বাড়িতে রওয়ানা করলেন। কারণ, আমার মা, রেণু ও বাড়ির সকলে আমার জন্য ব্যস্ত হয়ে আছে। আমার ভাইও খবর পেয়ে খুলনা থেকে রওয়ানা হয়ে চলে এসেছে।

পাঁচ দিন পর বাড়ি পৌঁছালাম। মাকে তো বোঝানো কষ্টকর। হাচু আমার গলা ধরে প্রথমেই বলল, "আব্বা, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, রাজবন্দিদের মুক্তি চাই।" ২১শে ফেব্রুয়ারি ওরা ঢাকায় ছিল, যা শুনেছে তাই বলে চলেছে। কামাল আমার কাছে আসল না, তবে আমার দিকে চেয়ে রইল। আমি খুব দুর্বল, বিছানায় শুয়ে পড়লাম। গতকাল রেণু ও মা ঢাকা থেকে বাড়ি এসে আমার প্রতীক্ষায় দিন কাটাচ্ছিল। এক এক করে সকলে যখন আমার কামরা থেকে বিদায় নিল, তখন রেণু কেঁদে ফেলল এবং বলল, "তোমার চিঠি পেয়ে আমি বুঝেছিলাম, তুমি কিছু একটা করে ফেলবা। আমি তোমাকে দেখবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। কাকে বলব নিয়ে যেতে, আব্বাকে বলতে পারি না লজ্জায়। নাসের ভাই বাড়ি নাই। যখন খবর পেলাম খবরের কাগজে, তখন লজ্জা শরম ত্যাগ করে আব্বাকে বললাম। আব্বা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তাই রওয়ানা করলাম ঢাকায়, সোজা আমাদের বড় নৌকায় তিনজন মাল্লা নিয়ে। কেন তুমি অনশন করতে গিয়েছিলে? এদের কি দয়া মায়া আছে? আমাদের কারও কথাও তোমার মনে ছিল না? কিছু একটা হলে কি উপায় হত? আমি এই দুইটা দুধের বাচ্চা নিয়ে কি করে বাঁচতাম? হাচিনা, কামালের অবস্থা কি হত? তুমি বলবা, খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট তো হত না? মানুষ কি শুধু খাওয়া পরা নিয়েই বেঁচে থাকতে চায়? আর মরে গেলে দেশের কাজই বা কিভাবে করতা?" আমি তাকে কিছুই বললাম না। তাকে বলতে দিলাম, কারণ মনের কথা প্রকাশ করতে পারলে ব্যথাটা কিছু কমে যায়। রেণু খুব চাপা, আজ যেন কথার বাঁধ ভেঙে গেছে। শুধু বললাম, "উপায় ছিল না।" বাচ্চা দুইটা ঘুমিয়ে পড়েছে। শুয়ে পড়লাম। সাতাশ-আঠাশ মাস পরে আমার সেই পুরানা জায়গায়, পুরানা কামরায়, পুরানা বিছানায় শুয়ে কারাগারের নির্জন প্রকোষ্ঠের দিনগুলির কথা মনে পড়ল। ঢাকার খবর সবই পেয়েছিলাম। মহিউদ্দিনও মুক্তি পেয়েছে। আমি বাইরে এলাম আর আমার সহকর্মীরা আবার জেলে গিয়েছে।

পরের দিন সকালে আব্বা ডাক্তার আনালেন। সিভিল সার্জন সাহেবের প্রেসক্রিপশনও ছিল। ডাক্তার সকলকে বললেন, আমাকে যেন বিছানা থেকে উঠতে না দেওয়া হয়। দিন

87

পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠার চিত্রলিপি

দশেক পরে আমাকে হাঁটতে হুকুম দিল শুধু বিকেলবেলা। আমাকে দেখতে রোজই অনেক লোক বাড়িতে আসত। গোপালগঞ্জ, খুলনা ও বরিশাল থেকেও আমার কিছু সংখ্যক সহকর্মী এসেছিল।

একদিন সকালে আমি ও রেণু বিছানায় বসে গল্প করছিলাম। হাচু ও কামাল নিচে খেলছিল। হাচু মাঝে মাঝে খেলা ফেলে আমার কাছে আসে আর 'আব্বা' 'আব্বা' বলে ডাকে। কামাল চেয়ে থাকে। একসময় কামাল হাচিনাকে বলছে, "হাচু আপা, হাচু আপা, তোমার আব্বাকে আমি একটু আব্বা বলি।" আমি আর রেণু দু'জনই শুনলাম। আস্তে আস্তে বিছানা থেকে উঠে যেয়ে ওকে কোলে নিয়ে বললাম, "আমি তো তোমারও আব্বা।" কামাল আমার কাছে আসতে চাইত না। আজ গলা ধরে পড়ে রইল। বুঝতে পারলাম, এখন আর ও সহ্য করতে পারছে না। নিজের ছেলেও অনেক দিন না দেখলে ভুলে যায়! আমি যখন জেলে যাই তখন ওর বয়স মাত্র কয়েক মাস। রাজনৈতিক কারণে একজনকে বিনা বিচারে বন্দি করে রাখা আর তার আত্মীয়স্বজন ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে দূরে রাখা যে কত বড় জঘন্য কাজ তা কে বুঝবে? মানুষ স্বার্থের জন্য অন্ধ হয়ে যায়। আজ দুইশত বৎসর পরে আমরা স্বাধীন হয়েছি। সামান্য হলেও কিছুটা আন্দোলনও করেছি স্বাধীনতার জন্য। ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস আজ আমাকে ও আমার সহকর্মীদের বছরের পর বছর জেল খাটতে হচ্ছে। আরও কতকাল খাটতে হয়, কেইবা জানে? একেই কি বলে স্বাধীনতা? ভয় আমি পাই না, আর মনও শক্ত হয়েছে। যে পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখেছিলাম, সেই পাকিস্তানই করতে হবে, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম। গোপালগঞ্জ মহকুমার যে কেউ আসে, তাদের এক প্রশ্ন, "আপনাকে কেন জেলে নেয়? আপনিই তো আমাদের পাকিস্তানের কথা শুনিয়েছেন।" আবার বলে, "কত কথা বলেছিলেন, পাকিস্তান হলে কত উন্নতি হবে। জনগণ সুখে থাকবে, অত্যাচার জুলুম থাকবে না। কয়েক বছর হয়ে গেল দুঃখই তো আরও বাড়ছে, কমার লক্ষণ তো দেখছি না। চাউলের দাম কত বেড়ে গেছে।" কি উত্তর দেব! এরা সাধারণ মানুষ। কি করে এদের বোঝাব! গ্রামের অনেক মাতবর শ্রেণীর লোক আছেন, যারা বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান। কথা খুব সুন্দরভাবে বলতে পারেন। এক কথায় তো বোঝানোও যায় না। পাকিস্তান খারাপ না, পাকিস্তান তো আমাদেরই দেশ। যাদের হাতে ইংরেজ ক্ষমতা দিয়ে গেছে তারা জনগণের স্বার্থের চেয়ে নিজেদের স্বার্থই বেশি দেখছে। পাকিস্তানকে কি করে গড়তে হবে, জনগণের কি করে উন্নতি করা যাবে সেদিকে ক্ষমতাসীনদের খেয়াল নাই। ১৯৫২ সালে ঢাকায় গুলি হওয়ার পরে গ্রামে গ্রামে জনসাধারণ বুঝতে আরম্ভ করেছে যে, যারা শাসন করছে তারা জনগণের আপনজন নয়। খবর নিয়ে জানতে পারলাম, ২১শে ফেব্রুয়ারি গুলি হওয়ার খবর বাতাসের সাথে সাথে গ্রামে গ্রামে পৌঁছে গেছে এবং ছোট ছোট হাটবাজারে পর্যন্ত হরতাল হয়েছে। মানুষ বুঝতে আরম্ভ করেছে যে, বিশেষ একটা গোষ্ঠী (দল) বাঙালিদের মুখের ভাষা কেড়ে নিতে চায়।

ভরসা হল, আর দমাতে পারবে না। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা না করে উপায় নাই। এই আন্দোলনে দেশের লোক সাড়া দিয়েছে ও এগিয়ে এসেছে। কোনো কোনো মওলানা সাহেবরা

ফতোয়া দিয়েছিলেন বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে। তাঁরাও ভয় পেয়ে গেছেন। এখন আর প্রকাশ্যে বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে কথা বলতে সাহস পাচ্ছেন না। জনমত সৃষ্টি হয়েছে, জনমতের বিরুদ্ধে যেতে শোষকরাও ভয় পায়। শাসকরা যখন শোষক হয় অথবা শোষকদের সাহায্য করতে আরম্ভ করে তখন দেশের ও জনগণের মঙ্গল হওয়ার চেয়ে অমঙ্গলই বেশি হয়।



মার্চ মাস পুরাটাই আমাকে বাড়িতে থাকতে হল। শরীরটা একটু ভাল হয়েছে, কিন্তু হার্টের দুর্বলতা আছে। আব্বা আমাকে ছাড়তে চান না। ডাক্তারও আপত্তি করে। রেণুর ভয় ঢাকায় গেলে আমি চুপ করে থাকব না, তাই আবার গ্রেফতার করতে পারে। আমার মন রয়েছে ঢাকায়, নেতারা ও কর্মীরা সকলেই জেলে। সংগ্রাম পরিষদের নেতারা গোপনে সভা করতে যেয়ে সকলে একসাথে গ্রেফতার হয়ে গেছে। ছাত্রলীগের নেতা ও কর্মীরা অনেকেই জেলে বন্দি। আওয়ামী লীগের কাজ একেবারে বন্ধ। কেউ সাহস করে কথা বলছে না। লীগ সরকার অত্যাচারের স্টিমরোলার চালিয়ে দিয়েছে। যা কিছুই হোক না কেন বসে থাকা চলবে না।

এই সময় মানিক ভাইয়ের কাছ থেকে একটা চিঠি পেলাম। তিনি আমাকে অতিসত্বর ঢাকায় যেতে লিখেছেন। চিকিৎসা ঢাকায়ই করা যাবে এবং ঢাকায় বসে থাকলেও কাজ হবে। আমি আব্বাকে চিঠিটা দেখালাম। আব্বা চুপ করে থাকলেন কিছু সময়। তারপর বললেন, যেতে চাও যেতে পার। রেণুও কোনো আপত্তি করল না। টাকা পয়সারও দরকার। খবর পেয়েছি, আমার বিছানাপত্র কাপড়চোপড় কিছুই নেই। আবার নতুন করে সকল কিছু কিনতে হবে। আব্বাকে বললাম, খাট, টেবিল-চেয়ার, বিছানাপত্র সকল কিছুই নতুন করে কিনতে হবে। আমার কিছু টাকার দরকার। কয়েক মাসের খরচও তো লাগবে। ঢাকা থেকে আবদুল হামিদ চৌধুরী ও মোল্লা জালালউদ্দিন খবর দিয়েছে তাঁতীবাজারে একটা বাসা ভাড়া নিয়েছে। আমি তাদের কাছে উঠতে পারব। ১৫০ নম্বর মোগলটুলীতে আর উঠতে চাই না, কারণ সেখানে এত লোক আসে যায় যে, নিজের বলতে কিছুই থাকে না। তবে ওখানে থাকার আকর্ষণও আছে। শওকত মিয়ার মত মুরব্বি থাকলে চিন্তা করতে হয় না। আমার শরীর ভাল না, চিকিৎসা করাতে হবে। রেণুও কিছু টাকা আমাকে দিল গোপনে। আব্বার কাছ থেকে টাকা নিয়ে ঢাকায় রওয়ানা করলাম, এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে। হাচিনা ও কামাল আমাকে ছাড়তে চায় না, ওদের উপর আমার খুব দুর্বলতা বেড়ে গেছে। রওয়ানা করার সময় দুই ভাইবোন খুব কাঁদল। আমি বরিশাল হয়ে ঢাকায় পৌঁছালাম। পূর্বেই খবর দিয়েছি, জালাল আমাকে নারায়ণগঞ্জ থেকে নিয়ে যেতে আসল ওদের বাসায়। আমার জন্য একটা কামরাও ঠিক করে রেখেছে।

শামসুল হক সাহেব আওয়ামী লীগের অফিস নবাবপুর নিয়ে এসেছেন। এই বাড়ির দুইটা কামরায় মানিক ভাই তাঁর ছেলেমেয়েদের নিয়ে কিছুদিন ছিলেন। মানিক ভাই, আতাউর

রহমান সাহেব ও আরও অনেকের সাথে দেখা করলাম। ডাক্তার নন্দীর কাছে যেয়ে নিজেকে দেখালাম। তিনি ঔষধ লিখে দিলেন আওয়ামী লীগ অফিসে যেয়ে দেখি একখানা টেবিল, দুই তিনখানা চেয়ার, একটা লম্বা টুল। প্রফেসার কামরুজ্জামান অফিসে বসেন। একটা ছেলে রাখা হয়েছে, যাকে অফিস পিয়ন বলা যেতে পারে। শামসুল হক সাহেব জেলে। আমি জয়েন্ট সেক্রেটারি। ওয়ার্কিং কমিটির সভা ডাকলাম। তাতে যে বার-তেরজন সদস্য উপস্থিত ছিলেন তারা আমাকে এ্যাকটিং জেনারেল সেক্রেটারি করে প্রতিষ্ঠানের ভার দিলেন। আতাউর রহমান সাহেব অন্যতম সহ-সভাপতি ছিলেন, তিনি সভাপতিত্ব করলেন।

ঢাকায় তখন একটা ত্রাসের রাজত্ব চলছে। ভয়ে মানুষ কোনো কথা বলে না। কথা বললেই গ্রেফতার করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলিতে একই অবস্থা। আওয়ামী লীগ অফিসে কেউই আসে না ভয়ে। আমি ও কামরুজ্জামান সাহেব বিকালে বসে থাকি। অনেক চেনা লোক দেখলাম, নবাবপুর দিয়ে যাবার সময় আমাদের অফিসের দিকে আসলেই মুখ ঘুরিয়ে নিতেন। দু'একজন আমাদের দলের সদস্যও ছিল। আমার সাথে কেউ দেখা করতে আসলে আমি বলতাম, অফিসে আমার সাথে দেখা করবেন, সেখানেই আলাপ করব।

শহীদ সাহেব যখন এসেছিলেন, তাঁর এক ভক্তের কাছ থেকে একটা টাইপ রাইটিং মেশিন নিয়ে অফিসের জন্য দিয়ে গিয়েছিলেন। ঢাকার একজন ছাত্র সিরাজ, এক হাত দিয়ে আস্তে আস্তে টাইপ করতে পারত। তাকে বললাম, অফিসে কাজ করতে, সে রাজি হল। কাজ করতে করতে পরে ভাল টাইপ করা শিখেছিল। একজন পিয়ন রাখলাম, প্রফেসার কামরুজ্জামান সাহেবের বাসায় থাকত।

এই সময় একজন এডভোকেট আমাদের অফিসে আসলেন। তিনি বললেন, "আমি আপনাদের দলের সভ্য হতে চাই। আমার দ্বারা বেশি কাজ পাবেন না, তবে অফিসের কাজ আমি বিকালে এসে করে দিতে পারি।" আমি খুব খুশিই হলাম। ভদ্রলোক আস্তে আস্তে কথা বলেন, আমার বয়সীই হবেন। আমার খুব পছন্দ হল। আমি তাঁকে অনুরোধ করলাম, অফিসের ভার নিতে। তিনি বললেন, কোর্টের কাজ শেষ করে বাড়ি যাওয়ার পূর্বে রোজই আসব। সত্যই তিনি আসতে লাগলেন এবং কাজ করতে লাগলেন। পুরানা অফিস সেক্রেটারি ভদ্রলোক কেটে পড়েছেন। পরে ওয়ার্কিং কমিটির সভায় আমি প্রস্তাব করলাম, তাঁকে অফিস সেক্রেটারি করতে। সকলেই রাজি হলেন। আজ ষোল বৎসর তিনি অফিস সেক্রেটারি আছেন। কোনোদিন কোনো পদের জন্য কাউকেও তিনি বলেন নাই। আমার সাথে ব্যক্তিগত বন্ধুত্বও হয়ে গিয়েছে। তিনি কোনোদিন সভায় বক্তৃতা করেন না। তাঁকে অফিসের কাজ ছাড়া কোনো কাজেও কেউ বলেন নাই। তিনিও চান না অন্য কাজ করতে। অফিসের খরচও তাঁর হাতে আমি দিয়েছিলাম। হিসাব-নিকাশ তিনিই রাখতেন। আমাদের আয়ও কম, খরচও কম। কোনোদিন কোনো সরকার তাঁকে খারাপ চোখে দেখে নাই। আর গ্রেফতারও করে নাই। এবারেই তাঁকে কয়েকদিনের জন্য গ্রেফতার করে এনেছিল। তাঁর শরীরও ভাল না। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ তাঁর মত অফিস সেক্রেটারি পেয়েছিল বলে অনেক কাজ হয়েছে। তাঁর নামটা বলি নাই, মিস্টার মোহাম্মদউল্লাহ। শহীদ সাহেব

ও ভাসানী সাহেবও তাঁকে ভালবাসতেন এবং বিশ্বাস করতেন। অফিসের কাজ কখনও পড়ে থাকত না।

যাহোক, দুই তিনটা জেলা ছাড়া জেলা কমিটিও গঠন হয় নাই। প্রতিষ্ঠান গড়ার সুযোগ এসেছে। সাহস করে কাজ করে যেতে পারলে প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে। কারণ, জনগণ এখন মুসলিম লীগ বিরোধী হয়ে গেছে। আর আওয়ামী লীগ এখন একমাত্র বিরোধী দল, যার আদর্শ আছে এবং নীতি আছে। তবে সকলের চেয়ে বড় অসুবিধা হয়েছে টাকার অভাব।

এদিকে মুসলিম লীগের কাগজগুলি শহীদ সাহেবের বিবৃতি এমনভাবে বিকৃত করে ছাপিয়েছে যে মনে হয় তিনিও উর্দুই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হোক এটাই চান। আমি সাধারণ সম্পাদক হয়েই একটা প্রেস কনফারেন্স করলাম। তাতে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করতে হবে, রাজবন্দিদের মুক্তি দিতে হবে এবং যাঁরা ২১শে ফেব্রুয়ারি শহীদ হয়েছেন তাঁদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দান এবং যারা অন্যায়ভাবে জুলুম করেছে তাদের শাস্তির দাবি করলাম। সরকার যে বলেছেন, বিদেশী কোন রাষ্ট্রের উসকানিতে এই আন্দোলন হয়েছে, তার প্রমাণ চাইলাম। 'হিন্দু ছাত্ররা' কলকাতা থেকে এসে পায়জামা পরে আন্দোলন করেছে, একথা বলতেও কৃপণতা করে নাই মুসলিম লীগ নেতারা। তাদের কাছে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ছাত্রসহ পাঁচ ছয়জন লোক মারা গেল গুলি খেয়ে, তারা সকলেই মুসলমান কি না? যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বইজন মুসলমান কি না? এত ছাত্র কলকাতা থেকে এল, একজনকেও ধরতে পারল না যে সরকার, সে সরকারের গদিতে থাকার অধিকার নাই। পার্টির কাজে আতাউর রহমান খান সাহেবের কাছ থেকে সকল রকম সাহায্য ও সহানুভূতি আমি পেয়েছিলাম। ইয়ার মোহাম্মদ খানও আমাকে সাহায্য করেছিলেন কাজ করতে। আমরা এক আলোচনা সভা করলাম, তাতে ঠিক হল আমাকে করাচি যেতে হবে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের সাথে সাক্ষাৎ করে রাজবন্দিদের মুক্তির দাবি করতে হবে। শহীদ সাহেবের সাথেও আলাপ-আলোচনা করা দরকার। তাঁর সাহায্য আমাদের খুব প্রয়োজন।



পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও করাচিতে আওয়ামী লীগ গঠন করা হয়েছে। তবে নবাব মামদোতের দল জিন্নাহ মুসলিম লীগে যোগদান করায়, জিন্নাহ আওয়ামী মুসলিম লীগ করা হয়েছে পাঞ্জাবে। আমরা পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটি সভায় সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, আমাদের প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করব না। জিন্নাহ সাহেবের নাম কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে রাখা উচিত না। কোনো লোকের নামেই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হতে পারে না। আমাদের ম্যানিফেস্টোও আমরা পরিবর্তন করব না। তখন পর্যন্ত আমরা এফিলিয়েশন নেই নাই। সোহরাওয়ার্দী সাহেব তাতে অসন্তুষ্ট হয়েছেন। এ সমস্ত বিষয় নিয়েও তাঁর সাথে আলোচনা করা দরকার হয়ে

পড়েছে। তিনি আমাকে চিঠিও লিখেছেন হায়দ্রাবাদ (সিন্ধু) থেকে। তখন তিনি 'পিন্ডি কনসপিরেসি'[২৩] মামলার আসামিদের পক্ষ সমর্থন করছিলেন। মে মাসে আমি করাচি পৌঁছালাম। আমাকে করাচি আওয়ামী লীগের সভাপতি মাহমুদুল হক ওসমানী ও জেনারেল সেক্রেটারি শেখ মঞ্জুরুল হক দলবল নিয়ে অভ্যর্থনা করল। আমি ওসমানী সাহেবের বাড়িতে উঠলাম। আওয়ামী লীগ কর্মীদের এক সভা ডাকা হয়েছিল। সেখানে আমাকে ইংরেজিতেই বক্তৃতা করতে হল। উর্দু বক্তৃতা আমি করতে পারতাম না, তাঁরাও বাংলা বুঝতেন না।

আমি পৌঁছেই খাজা সাহেবের কাছে একটা চিঠি পাঠালাম, তাঁর সাথে দেখা করার অনুমতি চেয়ে। তিনি আমার চিঠির উত্তর দিলেন এবং সময় ঠিক করে দিলেন দেখা করার অনুমতি দিয়ে।

আমানুল্লাহ নামে এক বাঙালি ছাত্র করাচিতে লেখাপড়া করত, সে আমার সেক্রেটারি হিসাবে সকল কাজকর্ম করে দিত। সর্বক্ষণ আমার সাথেই থাকত। সে করাচি আওয়ামী লীগের সভ্যও ছিল। সমস্ত কাজ করতে পারত, কোনো বিশ্রামের প্রয়োজন তার ছিল না বলে মনে হত। করাচির কফি হাউসই ছিল করাচির রাজনৈতিক কর্মীদের প্রধান আড্ডাখানা। সেখানেও সে আসর গরম করে রাখত এবং একাই লড়ত বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য। জনাব ওসমানী ও মঞ্জুর ঠিক করল আমাকে এক প্রেস কনফারেন্স করে পূর্ব পাকিস্তানে কি ঘটেছিল এবং কি ঘটছে তা বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করতে হবে এখানে। কারণ, পশ্চিম পাকিস্তানে একতরফা প্রপাগান্ডা হয়েছে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন সম্বন্ধে।

আমি যথাসময়ে প্রধানমন্ত্রী খাজা সাহেবের সাথে দেখা করতে তাঁর অফিসে হাজির হলাম। প্রধানমন্ত্রীর এ্যাসিসট্যান্ট সেক্রেটারি মিস্টার সাজেদ আলী আমাকে অভ্যর্থনা করলেন। তাঁকে আমি পূর্ব থেকে জানতাম, তিনি কলকাতার বাসিন্দা। পূর্বে তিনি পূর্ব পাকিস্তান প্রধানমন্ত্রীর পিএ ছিলেন। আমাকে নিয়ে বসালেন তাঁর কামরায়। আমার জন্য বিশ মিনিট সময় ধার্য করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। আমাকে খাজা সাহেব তাঁর কামরায় নিজে এগিয়ে এসে নিয়ে বসালেন। যথেষ্ট ভদ্রতা করলেন, আমার শরীর কেমন? আমি কেমন আছি, কতদিন থাকব—এইসব জিজ্ঞাসা করলেন। তিনিও জানতেন, ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করি। আমি যে একজন ভাল কর্মী সে কথা তিনি নিজেই স্বীকার করতেন এবং আমাকে স্নেহও করতেন। আমি তাঁকে অনুরোধ করলাম, "মওলানা ভাসানী, শামসুল হক, আবুল হাশিম, মওলানা তর্কবাগীশ, খয়রাত হোসেন, খান সাহেব ওসমান আলীসহ সমস্ত কর্মীকে মুক্তি দিতে। আরও বললাম, জুডিশিয়াল ইনকোয়ারি বসাতে, কেন গুলি করে ছাত্রদের হত্যা করা হয়েছিল?" তিনি বললেন, "এটা প্রাদেশিক সরকারের হাতে, আমি কি করতে পারি?" আমি বললাম, "আপনি মুসলিম লীগ সরকারের প্রধানমন্ত্রী, আর পূর্ব বাংলায়ও মুসলিম লীগ সরকার, আপনি তাদের নিশ্চয়ই বলতে পারেন। আপনি তো চান না যে দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হোক, আর আমরাও তা চাই না। আমি করাচি পর্যন্ত এসেছি আপনার সাথে দেখা করতে, এজন্য যে প্রাদেশিক সরকারের কাছে দাবি করে কিছুই হবে না।

তারা যে অন্যায় করেছে সেই অন্যায়কে ঢাকবার জন্য আরও অন্যায় করে চলেছে।" তিনি বিশ মিনিটের জায়গায় আমাকে এক ঘন্টা সময় দিলেন। আমি তাঁকে বললাম যে, "আওয়ামী লীগ বিরোধী পার্টি। তাকে কাজ করতে সুযোগ দেওয়া উচিত। বিরোধী দল না থাকলে গণতন্ত্র চলতে পারে না। আপনি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন, তা আমি জানি।" তিনি স্বীকার করলেন, আওয়ামী লীগ সরকারবিরোধী রাজনৈতিক দল। আমি তাঁকে বললাম, "আওয়ামী লীগ বিরোধী দল আপনি স্বীকার করে নিয়েছেন, একথা আমি খবরের কাগজে দিতে পারি কি না?" তিনি বললেন, "নিশ্চয়ই দিতে পার।" তিনি আমাকে বললেন, প্রদেশের কোন কাজে তিনি হস্তক্ষেপ করেন না, তবে তিনি চেষ্টা করে দেখবেন কি করতে পারেন। আমি তাঁকে আদাব করে বিদায় নিলাম। তিনি যে আমার কথা ধৈর্য ধরে শুনেছেন এ জন্য তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। দুই দিন পরে প্রেস কনফারেন্স করলাম। আমার লেখা বিবৃতি পাঠ করার পরে প্রেস প্রতিনিধিরা আমাকে প্রশ্ন করতে শুরু করলেন, অনেক প্রশ্নই আমাকে করলেন। আমি তাদের প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পেরেছিলাম এবং পূর্ব বাংলার অবস্থা তাদের বুঝিয়ে বলতে পেরেছিলাম। এখানে এক প্রশ্নের উত্তরে তাদের বলেছিলাম, "প্রায় ত্রিশটা উপনির্বাচন বন্ধ করে রাখা হয়েছে। যে কোন একটায় ইলেকশন হোক, আমরা মুসলিম লীগ প্রার্থীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করতে সক্ষম হব।"

*

তখনও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ ও শিক্ষিত সমাজের ধারণা, আওয়ামী লীগের কোনো জনপ্রিয়তা নাই। মুসলিম লীগ নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে। পাঞ্জাবে নির্বাচনের ফলাফল দেখে তাদের এই ধারণা হয়েছে। তাঁরা বাংলার জনসাধারণকে জানেন না, আর তাদের সম্বন্ধে ধারণাও নাই। সরকার সমর্থক কাগজগুলি এমনভাবে প্রচার করে চলেছে যে, সত্য চাপা পড়ে আছে। পূর্ব বাংলার সঠিক অবস্থা, পশ্চিম পাকিস্তানকে কোনোদিন বলা হয় নাই। স্বায়ত্তশাসনের দাবি সম্বন্ধেও প্রশ্ন করা হয়েছিল, আমি তাদের পাকিস্তানের ভৌগোলিক অবস্থা চিন্তা করতে অনুরোধ করেছিলাম। প্রায় দুই ঘণ্টা প্রেস কনফারেন্স চলেছিল। আমার মনে হল, তাঁরা কিছুটা বুঝতে পেরেছিলেন। *পাকিস্তান টাইমস* ও *ইমরোজ* খুব ভালভাবে ছাপিয়েছিল আমার প্রেস কনফারেন্সের জবাবগুলি। মুসলিম লীগের অনেক পুরানা সহকর্মীদের সাথে সাক্ষাৎও হয়েছিল। শেখ মঞ্জুরুল হক দিল্লিতে মুসলিম লীগ ন্যাশনাল গার্ডের সালারে সুবা ছিল। এখন আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি হয়েছে। দিল্লিতে তার সাথে আমার পরিচয় হয়েছিল। আমি এই প্রথম করাচি দেখলাম; ভাবলাম এই আমাদের রাজধানী! বাঙালিরা কয়জন তাদের রাজধানী দেখতে সুযোগ পাবে! আমরা জন্মগ্রহণ করেছি সবুজের দেশে, যেদিকে তাকানো যায় সবুজের মেলা। মরুভূমির এই পাষাণ বালু আমাদের পছন্দ হবে কেন? প্রকৃতির সাথে মানুষের মনেরও একটা সম্বন্ধ আছে। বালুর দেশের মানুষের মনও বালুর মত উড়ে বেড়ায়। আর পলিমাটির বাংলার মানুষের মন ঐ

রকমই নরম, ঐ রকমই সবুজ। প্রকৃতির অকৃপণ সৌন্দর্যে আমাদের জন্ম, সৌন্দর্যই আমরা ভালবাসি।

মঞ্জুর তার জিপে করে আমাকে নিয়ে হায়দ্রাবাদ চলল। কিছুদূর যওয়ার পরই মরুভূমি চোখে পড়ল। অনেক মাইল পর্যন্ত বাড়িঘর নাই, মাঝে মাঝে দু'একটা ছোট ছোট বাজারের মত। দেখলাম, সামান্য কয়েকজন লোক বসে আছে। মঞ্জুরকে বললাম, "তোমরা এই মরুভূমিতে থাক কি করে?" উত্তর দিল "বাধ্য হয়ে। মোহাজের হয়ে এসেছি, এই তো আমাদের বাড়িঘর, এখানেই মরতে হবে। দিল্লি তো তুমি দেখছ, এ রকম মরুভূমি তুমি দেখ নাই? প্রথম প্রথম খারাপ লেগেছিল, এখন সহ্য হয়ে গেছে। আমরা মোহাজেররা এসেছি, ভবিষ্যতে আসলে দেখ করাচিকেও আমরা ফুলে ফলে ভরে ফেলব।"

আমরা বিকালে পৌঁছালাম। মঞ্জুর নিজেই ড্রাইভ করছিল। সে চমৎকার গাড়ি চালাতে পারে। মঞ্জুরের সাথে আমার বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। অনেক উত্থান-পতন হয়েছে, বন্ধুত্ব যায় নাই। পরে যতবার করাচি গিয়েছি, ছায়ার মত আমার কাছেই রয়েছে। যাহোক, সোজা ডাকবাংলোতে পৌঁছালাম। শহীদ সাহেব বাইরে গেছেন, রাতে ফিরবেন। আমরা দুইজনে একটা হোটেলে চলে আসলাম, সেখানে হাতমুখ ধুয়ে খাওয়া-দাওয়া করে রাত নয়টার সময় ডাকবাংলোতে এসে দেখি তখনও তিনি ফেরেন নাই। আমরা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে লাগলাম। রাত দশটায় তিনি ফিরলেন। আমাকে দেখে বললেন, "খুব প্রেস কনফারেন্স করছ পশ্চিম পাকিস্তানে এসে।" বললাম, 'কি আর করি!' আমি যে হায়দ্রাবাদ আসব তিনি জানতেন। অনেকক্ষণ পর্যন্ত আলোচনা হল।

তিনি পূর্ব বাংলার কথা জিজ্ঞাসা করলেন, নেতারা সকলেই জেলে আছেন, কি আর ভাল থাকবেন! নাজিমুদ্দীন সাহেবের সাথে আমার যে আলাপ হয়েছিল তাও বললাম। একুশে ফেব্রুয়ারি যা যা ঘটেছিল তাও জানালাম। বললাম, রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে তাঁর মতামত খবরের কাগজে বের হয়েছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কি বের হয়েছে?" আমি বললাম, "আপনি নাকি কোন রিপোর্টারকে বলেছেন যে, উর্দুই রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত।" তিনি ক্ষেপে গেলেন এবং বললেন, "এ কথা তো আমি বলি নাই। উর্দু ও বাংলা দুইটা হলে আপত্তি কি? একথাই বলেছিলাম।" আরও জানালেন যে, গুলি ও অত্যাচারের প্রতিবাদও তিনি করেছেন। আমি তাঁকে জানালাম, "সে সব কথা কোনো কাগজে পরিষ্কার করে ছাপান হয় নাই। পূর্ব বাংলার জনসাধারণ আপনার মতামত না পেয়ে খুবই দুঃখিত হয়েছে।" তিনি আমাকে পরের দিন বিকালে আসতে বললেন, কারণ সকালে কোর্ট আছে। 'পিন্ডি ষড়যন্ত্র' মামলার বিচার হায়দ্রাবাদ জেলের ভিতরে হচ্ছে। তিনি সন্ধ্যার দিকে হায়দ্রাবাদ থেকে মোটরে করাচি যাবেন। আমিও সাথে যেতে পারব। মঞ্জুর বলল যে, সে সকালেই চলে যাবে। আমরা দুইজন হোটেলে চলে আসলাম। মঞ্জুর সকালবেলা মিস্টার মাসুদকে খোঁজ করে নিয়ে আসল। মাসুদ সাহেব নিখিল ভারত স্টেট মুসলিম লীগের সেক্রেটারি ছিলেন। এখন হায়দ্রাবাদে এসে বাড়ি করেছেন। শহীদ সাহেবের ভক্ত এবং আওয়ামী লীগে যোগদান করেছেন। মঞ্জুর তাঁর কাছে আমাকে রেখে রওয়ানা করল। মাসুদ সাহেব

আমাকে নিয়ে বেলা একটা পর্যন্ত ঘুরলেন। একসাথে খাওয়া-দাওয়া করলাম এবং অনেকের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

দু'টার সময় আমি মালপত্র নিয়ে শহীদ সাহেবের কাছে চলে আসলাম। শহীদ সাহেব কয়েকখানা বিস্কুট ও হরলিক্স খেলেন। এই তাঁর দুপুরের খাওয়া। এক এডভোকেট পেশোয়ার থেকে এসেছিল, অন্য এক আসামির পক্ষে। রাতে শহীদ সাহেব তাকে এবং আমাকে নিয়ে খানা খান। আমি বললাম, "এভাবে চলে কেমন করে?" তিনি বললেন, "বিস্কুট, মাখন, রুটিও আছে, এই খেয়েই হয়ে যায় দুপুরবেলা।" কোনো লোকজনও নাই। নিজেই সকল কিছু করেন। আমরা আবার আলাপ শুরু করলাম। তিনি বললেন, "পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কোনো এফিলিয়েশন নেয় নাই। আমি তো তোমাদের কেউ নই।" আমি বললাম, "প্রতিষ্ঠান না গড়লে কার কাছ থেকে এফিলিয়েশন নেব। আপনি তো আমাদের নেতা আছেনই। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ আপনাকে তো নেতা মানে, এমনকি পূর্ব পাকিস্তানের জনগণও আপনাকে সমর্থন করে।" তিনি বললেন, "একটা কনফারেন্স ডাকব, তার আগে পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী লীগের এফিলিয়েশন নেওয়া দরকার।" আমি তাঁকে জানালাম, "আপনি জিন্নাহ আওয়ামী লীগ করেছেন, আমরা নাম পরিবর্তন করতে পারব না। কোনো ব্যক্তির নাম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগ করতে চাই না। দ্বিতীয়ত আমাদের ম্যানিফেস্টো আছে, গঠনতন্ত্র আছে, তার পরিবর্তন করা সম্ভবপর নয়। মওলানা ভাসানী সাহেব আমাকে ১৯৪৯ সালে আপনার কাছে পাঠিয়েছিলেন। তখনও তিনি নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ গঠনের জন্য অনুরোধ করেছিলেন। তাঁরও কোনো আপত্তি থাকবে না, যদি আপনি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ম্যানিফেস্টো ও গঠনতন্ত্র মেনে নেন।'

অনেক আলোচনার পরে তিনি মানতে রাজি হলেন এবং নিজ হাতে তাঁর সম্মতির কথা লিখে দিলেন। কারণ, আমাকে ফিরে যেয়ে ওয়ার্কিং কমিটির সভায় তা পাস করিয়ে এফিলিয়েশনের জন্য দস্তখত করতে হবে। আমি বললাম, "আপনার হাতের লেখা থাকলে কেউই আর আপত্তি করবে না। মওলানা সাহেবের সাথে জেলে আমার কথা হয়েছিল। তাতে আমাদের ম্যানিফেস্টো, নাম ও গঠনতন্ত্র মেনে নিলে এফিলিয়েশন নিতে তাঁর আপত্তি নাই।" আমি আর একটা অনুরোধ করলাম, তাঁকে লিখে দিতে হবে যে, উর্দু ও বাংলা দুইটাকেই রাষ্ট্রভাষা হিসাবে তিনি সমর্থন করেন। কারণ অনেক ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গেছে। মুসলিম লীগ এবং তথাকথিত প্রগতিবাদীরা প্রপাগান্ডা করছেন তাঁর বিরুদ্ধে। তিনি বললেন, "নিশ্চয়ই লিখে দেব, এটা তো আমার নীতি ও বিশ্বাস।" তিনি লিখে দিলেন।

মামলা শেষ হলেই তিনি পূর্ব পাকিস্তানে আসবেন, কথা দিলেন। বললেন, এক মাস থাকবেন এবং প্রত্যেকটা জেলায় একটা করে সভার ব্যবস্থা করতে হবে। সময় নষ্ট করা যাবে না। তবে বিপদ হয়েছে, কতদিন এই মামলা চলে বলা যায় না। তাঁকে যখন জিজ্ঞাসা করলাম, "পিন্ডি ষড়যন্ত্র মামলা সত্য কি না? আসামিদের রক্ষা করতে পারবেন কি না? আর ষড়যন্ত্র করে থাকলে তাদের শাস্তি হওয়া উচিত কি না?" তিনি বললেন, "ওসব প্রশ্ন কর না, আমি কিছুই বলব না, কারণ এডভোকেটদের শপথ নিতে হয়েছে, কোন কিছু

কাউকেও না বলতে এ মামলা সম্বন্ধে।" তিনি একটু রাগ করেই বললেন, আমি চুপ করে গেলাম।

বিকালে করাচি রওয়ানা করলাম, শহীদ সাহেব নিজে গাড়ি চালালেন, আমি তাঁর পাশেই বসলাম। পিছনে আরও কয়েকজন এডভোকেট বসলেন। রাস্তায় এডভোকেট সাহেবরা আমাকে পূর্ব বাংলার অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। বাংলা ভাষাকে কেন আমরা রাষ্ট্রভাষা করতে চাই? হিন্দুরা এই আন্দোলন করছে কি না? আমি তাঁদের বুঝাতে চেষ্টা করলাম। শহীদ সাহেবও তাঁদের বুঝিয়ে বললেন এবং হিন্দুদের কথা যে সরকার বলছে, এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা তা তিনিই তাঁদের ভাল করে বুঝিয়ে দিলেন। আমার কাছে তাঁরা নজরুল ইসলামের কবিতা শুনতে চাইলেন। আমি তাঁদের 'কে বলে তোমায় ডাকাত বন্ধু', 'নারী', 'সাম্য'—আরও কয়েকটা কবিতার কিছু কিছু অংশ শুনালাম। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কবিতাও দু'একটার কয়েক লাইন শুনালাম। শহীদ সাহেব তাঁদের ইংরেজি করে বুঝিয়ে দিলেন। কবিগুরুর কবিতার ইংরেজি তরজমা দু'একজন পড়েছেন বললেন। আমাদের সময় কেটে গেল। আমরা সন্ধ্যারাতেই করাচি পৌঁছালাম। শহীদ সাহেব আমাকে ওসমানী সাহেবের বাড়িতে নামিয়ে দিলেন এবং সকালে ১৩ নম্বর কাচারি রোডে যেতে বললেন।

তাঁর সাথে দেখা করতে গেলে তিনি বললেন, আমাকে লাহোর হয়ে ঢাকায় যেতে। তিনি লাহোরে খাজা আবদুর রহিম বার-এট-ল এবং মির্জা হাসান আখতারকে টেলিগ্রাম করে দিবেন বললেন। লাহোরেও প্রেস কনফারেন্স করতে এবং কর্মীদের সাথে আলোচনা করতে বললেন। অনেক দিন হয়ে গেছে, দেরি না করে ট্রেনে আমি লাহোর রওয়ানা করলাম। খাজা আবদুর রহিম পূর্বে আইসিএস ছিলেন (তখন ওকালতি করেন), খুবই ভদ্রলোক। আমাকে তাঁর কাছে রাখলেন, 'জাভেদ মঞ্জিলে'। তিনি জাভেদ মঞ্জিলে থাকতেন। 'জাভেদ মঞ্জিল' কবি আল্লামা ইকবালের বাড়ি। কবি এখানে বসেই পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখেছিলেন। আল্লামা শুধু কবি ছিলেন না, একজন দার্শনিকও ছিলেন। আমি প্রথমে তাঁর মাজার জিয়ারত করতে গেলাম এবং নিজকে ধন্য মনে করলাম। আল্লামা যেখানে বসে সাধনা করেছেন সেখানে থাকার সুযোগ পেয়েছি!

খাজা সাহেব ও লাহোরের শহীদ সাহেবের ভক্তরা প্রেস কনফারেন্সের আয়োজন করলেন। আমি অনেকের সাথে দেখা করেছিলাম। হামিদ নিজামীর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম। পূর্বে যখন লাহোর এসেছিলাম, তিনি আমাকে খুব আদর আপ্যায়ন করেছিলেন। তিনি নিজেই প্রেস কনফারেন্সে উপস্থিত থাকবেন বললেন এবং সকলকে ফোন করে দিলেন। প্রেস কনফারেন্সে সমস্ত দৈনিক কাগজের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। এমনকি এপিপি'র প্রতিনিধিও উপস্থিত ছিলেন। আমার বক্তব্য পেশ করার পরে আমাকে প্রশ্ন করতে শুরু করলেন, আমি তাঁদের প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পেরেছিলাম। আমরা যে উর্দু ও বাংলা দু'টাই রাষ্ট্রভাষা চাই, এ ধারণা তাঁদের ছিল না। তাঁদের বলা হয়েছে শুধু বাংলাকেই রাষ্ট্রভাষা করার দাবি করছি আমরা। পাকিস্তান আন্দোলনে যে সমস্ত নেতা ও কর্মী মুসলিম লীগ ও পাকিস্তানের জন্য কাজ করেছে তারাই আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠান

গড়েছে তা আমি প্রমাণ করতে পেরেছিলাম। আমি যখন এক এক করে নেতাদের নাম বলতে শুরু করলাম তখন তাঁরা বুঝতে পারলেন বলে মনে হল। লাহোরের আওয়ামী লীগ নেতারা আমাকে অনেক ধন্যবাদ দিলেন। আমি তাঁদের বললাম, আমি মুখে যা বলি, তাই বিশ্বাস করি। আমার পেটে আর মুখে এক কথা। আমি কথা চাবাই না, যা বিশ্বাস করি বলি। সেজন্য বিপদেও পড়তে হয়, এটা আমার স্বভাবের দোষও বলতে পারেন, গুণও বলতে পারেন। একটা কথা লাহোরে পরিষ্কার করে বলে এসেছিলাম, ইলেকশন হলে খবর পাবেন মুসলিম লীগের অবস্থা। তারা এমনভাবে পরাজিত হবে যা আপনারা ভাবতেও পারবেন না।



এক বিপদ হল, সাত দিন পরে একদিন প্লেন লাহোর থেকে ঢাকায় আসে। তিন দিন পরে যে প্লেন ছাড়বে সে প্লেনে যাওয়ার উপায় নাই। কাজ শেষ হয় নাই, আর টিকিটও পাওয়া যাবে না। পরের সপ্তাহেও প্লেন যাবে না, শুনলাম প্রায় সতের-আঠার দিন আমাকে লাহোরে থাকতে হবে। খাজা আবদুর রহিম ও রাজা হাসান আখতার রাওয়ালপিন্ডি ও মারী বেড়াতে যাবেন। আমাকেও যেতে বললেন। আমি রাজি হলাম। একদিন রাওয়ালপিন্ডিতে দেরি করে দেখে নিলাম আমাদের মিলিটারি হেডকোয়ার্টার্স, আরও দেখলাম সেই পার্ক—যে পার্কে লিয়াকত আলী খানকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। পরের দিন সকালে মারী পৌঁছালাম। মারীতে রীতিমত শীত, গরম কাপড় প্রয়োজন, রাতে কম্বলের দরকার হয়েছিল। রাওয়ালপিন্ডির গরমে আমার মুখ আগুনে পুড়লে যেমন গোটা গোটা হয়, তাই দু'একটা হয়েছিল। মারী পিন্ডি থেকে মাত্র ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে, কিন্তু কি সুন্দর আবহাওয়া! বড় আরাম লাগল। পাহাড়ের উপর ছোট্ট শহর। পাঞ্জাবের বড় বড় জমিদার ও ব্যবসায়ীদের অনেকের নিজেদের বাড়ি আছে। গরমের সময় ছেলেমেয়ে নিয়ে মারীতে থাকেন। আমার খুব ভাল লাগল। সবুজে ঘেরা পাহাড়গুলি, তার উপর শহরটি। একদিন থাকলাম, ইচ্ছা হয়েছিল আরও কিছুদিন থাকি। পরের দিনই আমাদের চলে আসতে হল। লাহোরে পীর সালাহউদ্দিন আমার সাথী ছিলেন। তাঁকে নিয়ে ঘোরাফেরা করতাম। *নওয়াই ওয়াক্ত*, *পাকিস্তান টাইমস*, *ইমরোজ* ও অন্যান্য কাগজে আমার প্রেস কনফারেন্সের বক্তব্য খুব ভালভাবে ছাপিয়েছিল। সরকার সমর্থক কাগজগুলি আমার বক্তব্যের বিরুদ্ধে সমালোচনাও করেছিল। আমি রাষ্ট্রভাষা বাংলা, রাজবন্দিদের মুক্তি, গুলি করে হত্যার প্রতিবাদ, স্বায়ত্তশাসন ও অর্থনৈতিক সমস্যার উপর বেশি জোর দিয়েছিলাম।

লাহোর থেকে প্লেনে ঢাকা আসলাম। তখন সোজা করাচি বা লাহোর থেকে প্লেন আসত না। দিল্লি ও কলকাতা হয়ে প্লেন আসত। ঢাকা এসেই ওয়ার্কিং কমিটির সভা ডাকলাম। মওলানা সাহেবের সাথে যোগাযোগ করলাম। সোহরাওয়ার্দী সাহেবের মতামত সকলকে জানালাম। সকলেই এফিলেশন নিতে রাজি হলেন। সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব নেওয়া হল।

সাপ্তাহিক *ইত্তেফাক* তখন খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। মানিক ভাই সর্বস্ব দিয়ে কাগজটি চালাচ্ছেন। আমি তাঁকে দরকার মত সাহায্য করছি। আতাউর রহমান সাহেবও সাহায্য করতে ত্রুটি করেন নাই।

এই সময় মওলানা সাহেব অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সরকার তাঁর কেবিন খরচ দিতে রাজি হল না। ওয়ার্ডে রাখতে রাজি আছে। কেবিনে থাকতে দিতে আপত্তি নাই, তবে খরচটা বাইরে থেকে দিতে হবে আমাদের। মওলানা ভাসানী বন্দি, টাকা পয়সা কোথায় পাবেন? সরকারের খরচ দেওয়া উচিত, তবুও দেবে না। কতটুকু নিচ হলে এ কাজ করতে পারে একটা সরকার। আমাকে মওলানা সাহেব খবর দিলেন, কি করবেন? মহাবিপদে পড়লাম, টাকা কোথায় পাব, আর কেইবা আমাদের সাহায্য করবে? দশ দিনে প্রতিদিন প্রায় একশত পঞ্চাশ টাকা করে লাগবে। কেবিনে থাকলে ঔষধ এবং অন্যান্য জিনিস নিজের কিনতে হবে। তবুও আমি মওলানা সাহেবকে কেবিনে যেতে বললাম এবং টাকার বন্দোবস্তে লাগলাম। আতাউর রহমান সাহেবও কিছু সাহায্য করবেন বললেন। আমার এক সরকারি কর্মচারী বন্ধু এবং আনোয়ারা খাতুনও মাঝে মাঝে সাহায্য করতেন। তবে একজনের কথা স্বীকার করা দরকার। হাজী গিয়াসউদ্দিন নামে একজন বন্ধু ছিলেন আমার। তিনি ব্যবসা করতেন। কোনোদিন আওয়ামী লীগের সভ্য হন নাই; তবে আমাকে ভালবাসতেন। তাঁর বাড়ি কুমিল্লায়। যখন আর কোথাও টাকা জোগাড় করতে পারি নাই, তখন তার কাছে গেলে কখনও আমাকে খালি হাতে ফিরে আসতে হয় নাই। দশ দিনের মধ্যেই টাকা জোগাড় করতে হত। দেরি হলেই মওলানা সাহেবের কাছে নোটিশ আসত আর মওলানা সাহেব আমাকে চিঠি দিতেন হাসপাতাল থেকে। দু'একবার মওলানা সাহেবের সাথে আমি হাসপাতালে সাক্ষাৎও করেছি। তবে কথা বেশি বলতে পারতাম না। গেলেই পুলিশ বা আইবি কর্মচারী বলতেন, তাদের চাকরি থাকবে না। ফলে আমি বাধ্য হয়ে চলে আসতাম। এই সময় ঢাকার বংশাল এলাকার অনেক কর্মী জনাব আবদুল মালেক ও হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগে যোগদান করে। তারা নিজেরাও টাকা তুলে সাহায্য করত। তখন কর্মীরাই আওয়ামী লীগে টাকা দিয়ে কাজ চালাত।

মওলানা সাহেব যখন হাসপাতালে তখন আমি জেলায় জেলায় সভা করার জন্য প্রোগ্রাম করলাম। আতাউর রহমান খান ও আবদুস সালাম খানের মধ্যে তখন মনে মনে রেষারেষি চলছিল। সালাম সাহেবও সহ-সভাপতি, তাঁকে কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় না, শুধু আতাউর রহমান খানকে দেওয়া হয়। তাই তিনি বলতে আরম্ভ করলেন, তিনি হাইকোর্টের এডভোকেট আর আতাউর রহমান জজ কোর্টের এডভোকেট, বয়সেও তিনি বড়, আর রাজনীতিতেও তিনি সিনিয়র, তবু তাকে গুরুত্বও দেওয়া হয় না। আমি তাঁকে বুঝাতে শুরু করলাম। বললাম, "আতাউর রহমান খান সাহেব পূর্বের থেকেই ঢাকায় আছেন, ঢাকার জনগণ তাঁকে জানে। আপনি ঢাকায় নতুন এসেছেন। এতে কিছুই আসে যায় না।" ওয়ার্কিং কমিটির সভায় একদিন আতাউর রহমান সাহেব সভাপতিত্ব করতেন, আর অন্য দিন

আবদুস সালাম খান করতেন। মওলানা সাহেব বন্দি। আমি পড়লাম বিপদে। সালাম সাহেব কর্মীদের সাথে মিশতে জানতেন না। দরকার মত তাঁকে পাওয়া কষ্টকর ছিল। কিন্তু আতাউর রহমান সাহেবকে যে কোন সময় ডাকলে পাওয়া যেত। কাজী গোলাম মাহাবুব আত্মগোপন করে থাকার সময় ও পরে জেলে গেলে আতাউর রহমান সাহেব রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক হন। ফলে তিনি কর্মী ও ছাত্রদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করার সুযোগ পান। যে কোনো সময় আতাউর রহমান সাহেবকে পেতাম। ফলে আমিও তাঁর দিকে বেশি ঝুঁকে পড়েছিলাম। তিনি কোনো সময় কোনো কাজে আপত্তি করতেন না। তাঁর নিজের উদ্যোগ খুব কম ছিল, তবুও ডাকলে পাওয়া যেত। আমি বাইরে প্রকাশ করতাম না যে, আতাউর রহমান সাহেবকে আমি বেশি পছন্দ করি। আমি সালাম সাহেবকে বললাম, আতাউর রহমান সাহেবকে নিয়ে আওয়ামী লীগ গড়তে উত্তরবঙ্গে যাচ্ছি। আপনি আমার সাথে ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, যশোর ও খুলনা যাবেন। তিনি রাজি হলেন।

আতাউর রহমান সাহেব ও আমি পাবনা, বগুড়া, রংপুর ও দিনাজপুরে প্রোগ্রাম করলাম। নাটোর ও নওগাঁয় কমিটি করতে পেরেছিলাম, কিন্তু রাজশাহীতে তখনও কিছু করতে পারি নাই। দিনাজপুরে সভা করলাম, সেদিন বৃষ্টি ছিল। তাই লোক বেশি হয় নাই। রাতে এক কর্মিসভা করে রহিমুদ্দিন সাহেবের নেতৃত্বে একটা জেলা কমিটি করলাম। এইভাবে বিভিন্ন জেলায় কমিটি করতে পারলাম। কিন্তু রাজশাহীতে পারলাম না। পাবনায়ও কেউ এগিয়ে আসল না। থাকার জায়গা পাওয়া কষ্টকর ছিল। পরে ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ও আবদুর রব ওরফে বগাকে দিয়ে একটা কমিটি করলাম। অন্য কোনো লোক পাওয়া গেল না বলে, কয়েকজন ছাত্রের নাম দিয়ে দিলাম। পাবনায় ছাত্রলীগের কর্মীরা দুই ঘণ্টার নোটিশে এক সভা ডাকল টাউন হল মাঠে। মাইক্রোফোন ছিল না। আমি ও আতাউর রহমান সাহেব মাইক্রোফোন ছাড়াই সভা করলাম। এইভাবে উত্তরবঙ্গ সেরে আবার দক্ষিণ বঙ্গে রওয়ানা করলাম। কুষ্টিয়া, যশোরে ভাল কমিটি হল। খুলনায় কোন বয়েসী লোক পাওয়া গেল না। আমার সহকর্মী যুবক শেখ আবদুল আজিজ সভাপতি এবং মমিনুদ্দিনকে সেক্রেটারি করে জেলা আওয়ামী লীগ গঠন করলাম। সালাম সাহেব আপত্তি করছিলেন। আমি বললাম, "বয়স্ক লোক না পাওয়া গেলে প্রতিষ্ঠান গড়ব না মনে করেছেন! দেখবেন এরাই একদিন এই জেলার নেতা হয়ে কাজ করতে পারবে।" যেখানে এডভোকেট সাহেবরা যেতে পারে নাই, সে সমস্ত জেলায় আমি একলাই যেতাম এবং সভা করতাম, কমিটি গঠন করতাম। জুন, জুলাই, আগস্ট মাস পর্যন্ত আমি বিশ্রাম না করে প্রায় সমস্ত জেলা ও মহকুমা ঘুরে আওয়ামী লীগ শাখা গঠন করতে সক্ষম হয়েছিলাম।

শামসুল হক সাহেব পূর্বেই ময়মনসিংহে কমিটি গঠন করেছিলেন। জনাব আবুল মনসুর আহমদ সাহেব কলকাতা থেকে ফিরে এসেছেন। তিনি আওয়ামী লীগের সভাপতি হলেন এবং হাশিমউদ্দিন সাহেবকে সেক্রেটারি করলেন। হাশিমউদ্দিন আহমদ সাহেব, রফিকুদ্দিন ভুঁইয়া, হাতেম আলী তালুকদার রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সময় গ্রেফতার হয়ে রাজবন্দি হিসাবে জেলে ছিলেন। নোয়াখালীতে আবদুল জব্বার খদ্দর সাহেব জেলা কমিটি গঠন

করেছেন। চট্টগ্রামে আবদুল আজিজ, মোজাফফর আহম্মদ, জহুর আহমদ চৌধুরী ও কুমিল্লায় আবদুর রহমান খান, লাল মিঞা ও মোশতাক আহমদ আওয়ামী লীগ গঠন করেছেন। আমি এই সমস্ত জেলায়ও ঘুরে প্রতিষ্ঠানকে জোরদার করতে চেষ্টা করলাম। আগস্ট মাসের শেষের দিকে বরিশাল হয়ে বাড়ি যেতে হল, টাকা পয়সার খুব অভাব হয়ে পড়েছে। কিছুদিন বাড়িতে থাকলাম, তারপর ঢাকায় ফিরে এলাম। ল'পড়া ছেড়ে দিয়েছি। আব্বা খুবই অসন্তুষ্ট, টাকা পয়সা দিতে চান না। আমার কিছু একটা করা দরকার। ছেলেমেয়ে হয়েছে, এভাবে কতদিন চলবে! রেণু কিছুই বলে না, নীরবে কষ্ট সহ্য করে চলেছে। আমি বাড়ি গেলেই কিছু টাকা লাগবে তাই জোগাড় করার চেষ্টায় থাকত। শেষ পর্যন্ত আব্বা আমাকে টাকা দিলেন, খুব বেশি টাকা দিতে পারেন নাই, তবে আমার চলবার মত টাকা দিতে কোনোদিন আপত্তি করেন নাই। আমার নিজের বেশি কোনো খরচ ছিল না, একমাত্র সিগারেটই বাজে খরচ বলা যেতে পারে। আমার ছোট ভাই নাসের ব্যবসা শুরু করেছে খুলনায়। সে আমার ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা করে। বাড়ি থেকে তার কোনো টাকা পয়সা নিতে হয় না। লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে। মাঝে মাঝে কিছু টাকা বাড়িতে দিতেও শুরু করেছে।

*

ঢাকায় ফিরে এসে পূর্ব পাকিস্তান শান্তি কমিটির সভায় যোগদান করলাম। আতাউর রহমান খান সাহেব সভাপতি। আমরা 'যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই'—এই আমাদের স্লোগান। সেপ্টেম্বর মাসের ১৫-১৬ তারিখে খবর এল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলির প্রতিনিধিরা শান্তি সম্মেলনে যোগদান করবে। আমাদেরও যেতে হবে পিকিং-এ, দাওয়াত এসেছে। সমস্ত পাকিস্তান থেকে ত্রিশজন আমন্ত্রিত। পূর্ব বাংলার ভাগে পড়েছে মাত্র পাঁচজন। আতাউর রহমান খান, *ইত্তেফাক* সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন, খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, উর্দু লেখক ইবনে হাসান ও আমি। সময় নাই, টাকা পয়সা কোথায়? পাসপোর্ট কখন করব? টিকিট অবশ্য পাওয়া যাবে যাওয়া-আসার জন্য শান্তি সম্মেলনের পক্ষ থেকে।

আমরা পাসপোর্টের জন্য দরখাস্ত করলাম, পাওয়ার আশা আমাদের খুবই কম। কারণ, সরকার ও তার দলীয় সভ্যরা তো ক্ষেপে অস্থির। কমিউনিস্ট না হলে কমিউনিস্ট চীনে যেতে চায়? শান্তি সম্মেলন তো না, কমিউনিস্ট পার্টির সভা, এমনি নানা কথা শুরু করে দিল। মিয়া ইফতিখারউদ্দিন সাহেব চেষ্টা করছেন করাচিতে, আমাদের পাসপোর্টের জন্য। পাসপোর্ট অফিসার ভদ্রলোক বললেন, "আমি লিখে পড়ে সব ঠিক করে রেখেছি, হুকুম আসলেই দুই মিনিটের মধ্যে পেয়ে যাবেন।" তিনি নিজেও করাচিতে খবর দিলেন। আমরা পূর্ব বাংলা সরকারের হোম ডিপার্টমেন্টে খবর নিতে লাগলাম। আতাউর রহমান সাহেবও জয়েন্ট সেক্রেটারি ও সেক্রেটারির সাথে দেখা করলেন। কেউই কিছু বলতে পারে না। আমরা চেষ্টায় রইলাম, বিওএসি অফিসে খোঁজ নিলাম। তারা আমাদের জানালেন,

আপনাদের টিকিট এসে গেছে। তবে পাসপোর্ট না আনলে টিকিট ইস্যু করতে পারব না, সিটও রিজার্ভ করা যাবে না। সপ্তাহে একদিন বিওএসি'র প্লেন ঢাকায় আসে। শুনলাম, ২৩ কি ২৪ তারিখ ঢাকা-রেঙ্গুন হয়ে হংকং যাবে।

জানলাম পিকিংয়ে ভীষণ শীত, গরম কাপড় লাগবে; কিন্তু গরম কাপড় আমার ছিল না। তবে হংকং থেকেও কিনে নেওয়া যাবে। খুব নাকি সস্তা। ২২-২৩ তারিখে আমরা আশা ছেড়ে দিলাম। বোধহয় ২৪ তারিখ একটা প্লেন ঢাকায় আসবে। সরকার থেকে খবর এসেছে আমাদের পাসপোর্ট দেওয়া হবে। আমরা বুঝলাম এটা দেয়া না, শুধু মুখ রক্ষা করা। পাসপোর্ট পেলাম একটায়। কখন বাড়িতে যাব, কাপড় আনব আর কখনই বা প্লেনে উঠব। আতাউর রহমান সাহেব টেলিফোন করলেন বিওএসি অফিসে, প্লেনের খবর কি? তারা বলল, প্লেনের কোন খবর নাই। তবে কয়েক ঘণ্টা লেট আছে। মনে আশা এল, তবে বোধহয় যেতে পারব। আমরা দেরি করতে লাগলাম, আতাউর রহমান সাহেবের বাড়িতে। এক ঘণ্টার মধ্যে খবর দেবে বলেছে, ঠিক কত ঘণ্টা লেট আছে। মানিক ভাই বলতে শুরু করেছেন, তাঁর যাওয়া হবে না, কারণ *ইত্তেফাককে* দেখবে? টাকা কোথায়? *ইত্তেফাকে* লিখবে কে? কিছু সময় পরে খবর পেলাম চব্বিশ ঘণ্টা প্লেন লেট। আগামী দিন বারটায় প্লেন আসবে, একটায় ছাড়বে। আমরা একটু আশ্বস্ত হলাম। কিছু সময় পাওয়া গেল। আওয়ামী লীগের কাজ চালাবার জন্য কিছু ব্যবস্থা করতে হবে। বাসায় এলাম, মোল্লা জালাল ও হামিদ চৌধুরী আমার সকল কিছু ঠিক করে দিল। আওয়ামী লীগ অফিস হয়ে মানিক ভাইয়ের কাছে ইত্তেফাক অফিসে চললাম। মানিক ভাইকে অনেক করে বললাম, একটু একটু করে রাজি হলেন, তবে ঠিক করে বলতে পারছেন না। আমাদের কথা ছিল, সকাল দশটায় আমরা আতাউর রহমান সাহেবের বাড়ি থেকে একসাথে এয়ারপোর্ট রওয়ানা করব। খন্দকার ইলিয়াস আমার ব্যক্তিগত বন্ধু, *যুগের দাবী* সাপ্তাহিক কাগজের সম্পাদক। দুজনেই এক বয়সী, একসাথে থাকব ঠিক করলাম। মানিক ভাইকে নিয়ে বিপদ! কি যে করে বলা যায় না।

সকালে প্রস্তুত হয়ে আমি মানিক ভাইয়ের বাড়িতে চললাম। তখন ঢাকায় রিকশাই একমাত্র সম্বল। সকাল আটটায় যেয়ে দেখি তিনি আরামে শুয়ে আছেন। অনেক ডাকাডাকি করে তুললাম। আমাকে বলেন, "কি করে যাব, যাওয়া হবে না, আপনারাই বেড়িয়ে আসেন।" আমি রাগ করে উঠলাম। ভাবীকে বললাম, "আপনি কেন যেতে বলেন না, দশ-পনের দিনে কি অসুবিধা হবে? মানিক ভাই লেখক, তিনি গেলে নতুন চীনের কথা লিখতে পারবেন, দেশের লোক জানতে পারবে। কাপড় কোথায়? সুটকেস ঠিক করেন। আপনি প্রস্তুত হয়ে নেন। আপনি না গেলে আমাদের যাওয়া হবে না।" মানিক ভাই জানে যে, আমি নাছোড়বান্দা। তাই তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে নিলেন। আমরা আতাউর রহমান সাহেবের বাড়িতে উপস্থিত হলাম। প্লেন সময় মতই আসছে। আজ আমাদের এগারটার মধ্যে পৌঁছাতে হবে। অনেক ফরমালিটিজ আছে। টিকিট অনেক পূর্বেই নিয়েছি। আমাদের সিটও রিজার্ভ আছে। আমরা পৌঁছার কিছু সময় পরেই বিওএসি'র প্লেন এসে নামল। কিছু কিছু বন্ধুবান্ধব আমাদের

বিদায় দিতে এসেছে। শান্তি কমিটির সেক্রেটারি আলী আকসাদ কয়েকটা ফুলের মালাও নিয়ে এসেছে। আমাদের মালপত্র, পাসপোর্ট যথারীতি পরীক্ষা করা হল। এই প্লেনেই মিয়া মাহমুদ আলী কাসুরী ও আরও দুই তিনজন পশ্চিম পাকিস্তানের নেতা চীন চলেছেন। শুনলাম, পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা করাচি থেকে হংকং রওয়ানা হয়ে গিয়েছেন, সেখানেই আমাদের সাথে দেখা হবে এবং একসাথে চীনে যাব। প্লেন প্রথমে রেঙ্গুন পৌঁছাবে। রাতে রেঙ্গুনে আমাদের থাকতে হবে। আমরা অনেক সময় পাব। বিকাল ও রাতটা রেঙ্গুনে থাকতে হবে। আতাউর রহমান সাহেব বললেন, "রেঙ্গুনে ব্যারিস্টার শওকত আলীর বড় ভাই থাকেন, তাঁর বিরাট ব্যবসা আছে। ঠিকানাও আমার জানা আছে।"

আমরা রেঙ্গুন পৌঁছার পরেই বিওএসি'র বিশ্রামাগারে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হল। ব্রহ্মদেশ ও বাংলাদেশ একই রকমে ফুলে ফলে ভরা। ব্রহ্মদেশে তখন ভীষণ গোলমাল, স্বাধীনতা পেলেও চারিদিকে অরাজকতা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জাপান ও চীনের কাছ থেকে জনসাধারণ অনেক অস্ত্র পেয়েছিল। নিজেদের ইচ্ছামত এখন তা ব্যবহার করতে শুরু করেছে। কমিউনিস্ট ও 'কারেন'রা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। গৃহযুদ্ধে দেশটা শেষ হতে চলেছে। আইনশৃঙ্খলা বলে কোন জিনিস নাই। যে কোন সময় এমনকি দিনেরবেলায়ও রেঙ্গুন শহরে রাহাজানি ও ডাকাতি হয়। সন্ধ্যার পরে সাধারণত মানুষ ভয়েতে ঘর থেকে বের হয় না। যাদের অবস্থা ভাল অথবা বড় ব্যবসায়ী তাদের অবস্থা আরও শোচনীয়। যে কোন মুহূর্তে তাদের ছেলেমেয়েদের ধরে নিয়ে যেতে পারে। আর যে টাকা দুর্বৃত্তরা দাবি করবে, তা না দিলে হত্যা করে ফেলবে। প্রায়ই এই সকল ঘটনা ঘটছে। আমাদের হুঁশিয়ার করে দেওয়া হয়েছে। কোথাও বের হলে বলে যেতে বলেছে। হোটেলকে রক্ষা করার জন্য রীতিমত সশস্ত্র সিপাহি রাখা হয়েছে। আমরা বিদেশী মানুষ, আমাদের আছেই বা কি?

হোটেলে পৌঁছেই আতাউর রহমান সাহেব রয়্যাল স্টেশনারির মালিক আমজাদ আলীকে টেলিফোন করলেন। তখন তিনি বাইরে ছিলেন, কিন্তু কিছু সময় পরে ফিরে এসে খবর পেয়ে হোটেলে উপস্থিত হলেন। আমাদের পেয়ে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত। বিদেশে আপনজন বা দেশের লোক পেলে কেই বা খুশি না হয়! তাঁর নিজের গাড়ি আছে, আমাদের নিয়ে তিনি বেড়াতে বের হলেন। প্রথমেই তাঁর দোকানে নিয়ে গেলেন। রেঙ্গুনের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ দোকান ছিল রয়্যাল স্টেশনারি। মনে হল যেন, সবকিছু ঝিমিয়ে পড়ছে আস্তে আস্তে। তিনি আমাদের রেঙ্গুনের অবস্থা বললেন। তবে যা কিছু হোক, রেঙ্গুন তিনি ছাড়বেন না। রেঙ্গুন শহর ও তার আশেপাশের কুড়ি মাইলই মাত্র বার্মা সরকারের হাতে আছে। সরকার কিছুতেই বিদ্রোহীদের দমাতে পারছে না। যাহোক, ভদ্রলোক তাঁর বাড়িতেও আমাদের নিয়ে গেলেন এবং স্ত্রীর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ভদ্রমহিলা অমায়িক ও ভদ্র। রাতে আমাদের তার ওখানেই খেতে হবে। কোনো আপত্তি শুনলেন না।

আমাদের নিয়ে আমজাদ সাহেব বের হয়ে পড়লেন রেঙ্গুন শহর দেখাতে। বড় বড় কয়েকটা প্যাগোডা (বৌদ্ধ মন্দির) দেখলাম। একটার ভিতরেও আমরা যেয়ে দেখলাম।

সকলের চেয়ে বড় প্যাগোডা কয়েক মাইল দূরে। ফিরে আসতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে তাই যাওয়া চলবে না, পথে বিপদ হতে পারে। আতাউর রহমান সাহেবের আর এক পরিচিত লোক আছেন, তিনিও পূর্ব বাংলার লোক। একবার মন্ত্রীও হয়েছিলেন। তাঁর বাড়িতে আমরা উপস্থিত হলাম। তিনি বাড়ি ছিলেন না, অনেকক্ষণ ডাকাডাকির পরে উপর থেকে এক ব্রহ্ম মহিলা মুখ বের করে বললেন, বাড়িতে কেউ নাই। দরজা খুলতে পারবেন না। কারণ, আমাদের চিনেন না। কাগজ চাইলাম। তিনি বললেন, "দরজা খুলব না, কাগজ বাইরেই আছে, লিখে জানালা দিয়ে ফেলে যান।" এই ব্যবহার কেন? আমজাদ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, "এইভাবে গাড়িতে করে ব্যান্ডিটরা আসে। বাড়ির মালিকের নাম ধরে ডাক দিলে আগে লোকেরা সাধারণত দরজা খুলে দিত। ব্যান্ডিটরা দরজা খুললেই হাত-মুখ বেঁধে বন্দুক ও পিস্তল দেখিয়ে সবকিছু লুট করে নিয়ে যায়। এ রকম ঘটনা প্রায়ই রেঙ্গুন শহরে ঘটছে, তাই কেউই এখন আর দরজা খোলে না—জানাশোনা লোক না দেখলে।

রেঙ্গুন শহরের একদিন শ্রী ছিল। এখনও কিছুটা আছে, তবে লাবণ্য নষ্ট হয়ে গেছে। আমজাদ সাহেব কয়েক ঘণ্টা আমাদের নিয়ে অনেক জায়গা দেখালেন। পরে আমাদের বার্মা ক্লাবে নিয়ে গেলেন। স্বাধীন হওয়ার পূর্বে এই ক্লাবে ইউরোপিয়ান ছাড়া কেউ সদস্য হতে পারত না। এমনকি ভিতরে যাওয়ার হুকুম ছিল না। লেকের পাড়ে এই ক্লাবটা অতি চমৎকার। আমজাদ সাহেবকে সকলেই খাতির এবং শ্রদ্ধা করে। দিনভর বেড়িয়ে রাতে আমাদের পৌঁছে দিলেন হোটেলে এবং বিশেষ করে অনুরোধ করলেন ফেরার পথে দুই একদিন থেকে বেড়িয়ে যেতে। আমি ও ইলিয়াস এক রুমে ছিলাম। রেঙ্গুন শান্তি কমিটির কয়েকজন সদস্য আমাদের সাথে দেখা করতে আসলেন। অনেকক্ষণ আলোচনা হল। তাদের নেতা আমাদের জানালেন, পূর্বেই শান্তি কমিটির কয়েকজন সদস্য চীন চলে গিয়েছেন। আরও সদস্য যাবেন, তবে পাসপোর্ট এখনও পান নাই। কিছু সদস্য পালিয়ে চলে গিয়েছেন, একথাও জানালেন।

খুব ভোরে আমাদের রওয়ানা করতে হল। আমরা ব্যাংকক পৌঁছালাম। থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংকক, বেশ বড় এয়ারপোর্ট তাদের। এখানে আমরা চা-নাশতা খেলাম। এক ঘণ্টা পরে হংকং রওয়ানা করলাম। সোজা হংকং, আর কোথাও প্লেন থামবে না। আমার প্লেনে ঘুমাতে কোনো কষ্ট হয় না। থাইল্যান্ড, লাওস, ভিয়েতনাম ও দক্ষিণ চীন সাগর পাড়ি দিয়ে বেলা একটায় হংকংয়ের কাইতেক বিমান ঘাঁটিতে পৌঁছালাম। 'সিনহুয়া' সংবাদ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা আমাদের অভ্যর্থনা করল। ইংরেজিতে 'নিউ চায়না নিউজ এজেন্সি' বলা হয় সংবাদ প্রতিষ্ঠানটাকে। কৌলুন হোটেলে আমাদের থাকার বন্দোবস্ত হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে দশ-বারজন প্রতিনিধি আগেই পৌঁছে গেছেন। ঐদিন সন্ধ্যায় ও পরের দিন ভোরের মধ্যে পাকিস্তানের প্রতিনিধি সকলেই পৌঁছাবে। পরের দিন ভোরে আমাদের সভা হল, সভায় পীর মানকী শরীফকে নেতা করা হল।

রাতে ও দিনে হংকং ঘুরে দেখলাম। হংকংয়ের নাম ইংরেজরা রেখেছে 'ভিক্টোরিয়া'। নদীর এক পাড়ে হংকং, অন্য পাড়ে কৌলুন। আমরা সকলেই কিছু কিছু গরম কাপড় কিনে

নিলাম। আমাদের টাকা বেশি নাই, কিন্তু জিনিসপত্র খুব সস্তা। তবে সাবধান হয়ে কিনতে হবে। এক টাকা দামের জিনিস পঁচিশ টাকা চাইবে, আপনাকে এক টাকাই বলতে হবে, লজ্জা করলে ঠকবেন। জানাশোনা পুরানা লোকের সাহায্য ছাড়া মালপত্র কেনা উচিত না। হংকংয়ের আরেকটা নাম হওয়া উচিত ছিল 'ঠগিবাজ শহর'। রাস্তায় হাঁটবেন পকেটে হাত দিয়ে, নাহলে পকেট খালি। এত সুন্দর শহর তার ভিতরের রূপটা চিন্তা করলে শিউরে উঠতে হয়। এখন ইংরেজের কলোনি। অনেক চীনা অর্থশালী লোক পালিয়ে হংকং এসেছে। বাস্তুহারা লোকেরা পেটের দায়েও অনেক অসৎ কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। এক পাকিস্তানী বন্ধুর সাথে আলাপ হয়েছিল। সিন্ধুতে তার বাড়ি ছিল, এখন হংকংয়ে আছে। তার সাথে বসে বসে অনেক গল্প শুনলাম। পরে অনেকবার হংকংয়ে যেতে হয়েছে এবং কয়েকদিন থাকতেও হয়েছে। হংকং এত পাপ সহ্য করে কেমন করে, শুধু তাই ভাবি!



বোধহয় হংকং থেকে ২৭ তারিখে রেলগাড়িতে ক্যান্টন পৌঁছালাম। সেনচুন স্টেশন কমিউনিস্ট চীনের প্রথম স্টেশন। ব্রিটিশ এরিয়ার পরে আর ব্রিটিশ রেল যায় না। আমরা হেঁটে হেঁটে পুল পার হয়ে স্টেশনে পৌঁছালাম। শান্তি কমিটির স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকারা আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাল। কোন চিন্তা নাই। মালপত্র সব কিছুর ভার তারা গ্রহণ করেছেন। আমাদের জন্য ট্রেনে খাবার ও থাকার সুবন্দোবস্ত করা হয়েছে। দুই তিনজনের জন্য একজন করে ইন্টারপ্রেটার রয়েছে। এদের সকলেই প্রায় স্কুল, কলেজের ছেলেমেয়ে। আমি ট্রেনের ভিতর ঘুরতে শুরু করলাম। ট্রেনে এপাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত যাওয়া যায়। নতুন চীনের লোকের চেহারা দেখতে চাই। 'আফিং' খাওয়া জাত যেন হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠেছে। আফিং এখন আর কেউ খায় না, আর ঝিমিয়েও পড়ে না। মনে হল, এ এক নতুন দেশ, নতুন মানুষ। এদের মনে আশা এসেছে, হতাশা আর নাই। তারা আজ স্বাধীন হয়েছে, দেশের সকল কিছুই আজ জনগণের। ভাবলাম, তিন বছরের মধ্যে এত বড় আলোড়ন সৃষ্টি এরা কি করে করল! ক্যান্টন পৌঁছালাম সন্ধ্যার পরে। শত শত ছেলেমেয়ে ফুলের তোড়া নিয়ে হাজির। শান্তি কমিটির কর্মকর্তারা আমাদের রেলস্টেশনে অভ্যর্থনা করলেন। পার্ল নদীর পাড়ে এক বিরাট হোটেলে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাতেই আবার ডিনার, শান্তি কমিটির পক্ষ থেকে। চীনের লোকেরা বাঙালিদের মত বক্তৃতা করতে আর বক্তৃতা শুনতে ভালবাসে।

খাবার শুরু হবার পূর্বে বক্তৃতা হল। আমাদের পক্ষ থেকে পীর সাহেব বক্তৃতা করলেন। হাততালি কথায় কথায়, আমাদেরও তালি দিতে হল। ভোরেই রওয়ানা করতে হবে পিকিং। আমাদের অনেক দেরি হয়ে গেছে পৌঁছাতে। তাই কনফারেন্স বন্ধ রাখা হয়েছে। কারণ, অনেক দেশের প্রতিনিধিরাই সময় মত পৌঁছাতে পারে নাই। ক্যান্টন থেকে প্লেনে যেতে হবে দেড় হাজার মাইল। সকালে নাশতা খেয়ে আমরা রওয়ানা করলাম। দিনেরবেলা

প্লেনে দেড় হাজার মাইল চীনের ভূখণ্ডের উপর দিয়ে যাবার সময় সেদেশের সৌন্দর্য দেখে আমি সত্যিই মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলাম।

ক্যান্টন প্রদেশ বাংলাদেশের মতই সুজলা সুফলা। শত শত বছর বিদেশীরা এই দেশকে শোষণ করেও এর সম্পদের শেষ করতে পারে নাই। নয়া চীন মন প্রাণ দিয়ে নতুন করে গড়তে শুরু করেছে। বিকেলবেলা আমরা পৌঁছালাম পিকিং এয়ারপোর্টে। পিকিং শান্তি কমিটির সদস্যরা, ভারতবর্ষেরও কয়েকজন প্রতিনিধি এবং ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা উপস্থিত হয়েছে। আমাদের পরিচয় পর্ব শেষ করে পিকিং হোটেলে নিয়ে আসা হল। এই সেই পিকিং, চীনের রাজধানী। পূর্বে অনেক জাতি পিকিং দখল করেছে। ইংরেজ বা জাপান অনেক কিছু ধ্বংসও করেছে। অনেক লুটপাট করেছে, দখল করার সময়। এখন সমস্ত শহর যেন নতুন রূপ ধরেছে। পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্তি পেয়ে প্রাণভরে হাসছে।

আমাদের পিকিং হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করেছে। এই হোটেলটাই সবচেয়ে বড় এবং সুন্দর। আতাউর রহমান সাহেব, মানিক ভাই ও আমি এক রুমে। বড় ক্লান্ত আমরা। রাতে আর কোথাও বের হব না। আমাদের দলের নেতা পীর সাহেব বলে দিয়েছেন, কোনো মুসলমান হোটেলে খাওয়ার ব্যবস্থা করতে। রাতে বাসে চড়ে সেখানে যেতে হবে খাবার জন্য। ভীষণ শীত বাইরে, যেতে ইচ্ছা আমাদের ছিল না, তবুও উপায় নাই। প্রায় দুই মাইল দূরে এই হোটেলটা। আমরা পৌঁছার সাথে সাথে খাবার আয়োজন করে ফেলেছে। মনে হল হোটেলের মালিক খুব খুশি হয়েছেন। চীনা ভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা তারা জানে না। ইন্টারপ্রেটার সাথেই আছে। খেতে শুরু করলাম, কিন্তু খাবার উপায় নাই। ভীষণ ঝাল। দু'এক টুকরা রুটি মুখে দিয়ে বিদায় হলাম। যা কিছু খেয়েছিলাম তার ধাক্কা চলল, পেটের ব্যথা শুরু হল। রুমে আঙ্গুর ও অন্যান্য ফলফলারি ছিল, তাই খেয়ে আর চা খেয়ে রাত কাটালাম। মানিক ভাই বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন, তিনি আর যাবেন না ঐ হোটেলে খেতে। পিকিং হোটেলেই সব কিছু পাওয়া যায়। যা খেতে চাইবেন, তাই দিবে। মানিক ভাই আর কয়েকজন পরের দিন দুপুরে পিকিং হোটেলে খেয়ে শুয়ে পড়লেন। আমি ও আতাউর রহমান সাহেব দুপুরেও বাধ্য হয়ে খেলাম ঐ হোটেলে। রাতে দেখা গেল পাঁচ ছয়জন আছেন পীর সাহেবের সাথে। পরের দিন পীর সাহেব ও তাঁর সেক্রেটারি হানিফ খান (এখন কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি) ছাড়া আর কেউ মুসলমান হোটেলে খেতে গেলেন না। পিকিং হোটেলে ভাত, তরকারি, চিংড়ি মাছ, মুরগি, গরুর মাংস, ডিম সবকিছুই পাওয়া যায়। কয়েক মিনিট দেরি করলে এবং বলে দিলে ঐসব খাবার পাক করে এনে হাজির করে। আমাদের এখন আর কোনো অসুবিধা হয় না। কয়েকদিন পূর্বে কলকাতা থেকে বিখ্যাত লেখক বাবু মনোজ বসু এবং বিখ্যাত গায়ক ক্ষিতীশ বোস এসেছেন। তাঁরা বাঙালি খানার বন্দোবস্ত করে ফেলেছেন। তাঁদের সাথে আমাদের আলাপ হওয়ার পরে আরও সুবিধা হয়ে গেল।

আমাদের হাতে দুই-তিন দিন সময় আছে। ১লা অক্টোবর নয়া চীনের স্বাধীনতা দিবস। ১৯৪৯ সালের ১লা অক্টোবর এরা স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল। চীন থেকে পালিয়ে চিয়াং কাইশেকের দল ফরমোজায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল।

শান্তি সম্মেলন শুরু হবে ২রা অক্টোবর থেকে। ভাবলাম, সম্মেলন শুরু হবার আগে দেখে নিই ভাল করে পিকিং শহরকে। পিকিং শহরের ভিতরেই আর একটা শহর, নাম ইংরেজিতে 'ফরবিডেন সিটি'। সম্রাটরা পূর্বে অমাত্যবর্গ নিয়ে এখানে থাকতেন। সাধারণ লোকের এর মধ্যে যাওয়ার হুকুম ছিল না। এই নিষিদ্ধ শহরে না আছে এমন কিছুই নাই। পার্ক, লেক, প্রাসাদ সকল কিছুই আছে এর মধ্যে। ভারতে লালকেল্লা, ফতেহপুর সিক্রি এবং আগ্রাকেল্লাও আমি দেখেছি। ফরবিডেন সিটিকে এদের চেয়েও বড় মনে হল। এখন সকলের জন্য এর দরজা খোলা, শ্রমিকদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা। মিউজিয়াম, লাইব্রেরি, পার্ক, লেক সবকিছুই আজ জনসাধারণের সম্পত্তি। হাজার হাজার লোক আসছে, যাচ্ছে। দেখলাম ও ভাবলাম, রাজ-রাজড়ার কাণ্ড সব দেশেই একই রকম ছিল। জনগণের টাকা তাদের আরাম আয়েশের জন্য ব্যয় করতেন, কোনো বাধা ছিল না।

পরের দিন গ্রীষ্ম প্রাসাদ দেখতে গেলাম, যাকে ইংরেজিতে বলা হয়, 'সামার প্যালেস'। নানা রকমের জীব জানোয়ারের মূর্তি, বিরাট বৌদ্ধ মন্দির, ভিতরে বিরাট লেক, লেকের মধ্যে একটা দ্বীপ। এটাকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রমোদ নগরী বলা চলে।

পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত মেজর জেনারেল রেজা পিকিং হোটেলে আমাদের সাথে দেখা করতে এলেন। তিনি বললেন, আমাদের কোন অসুবিধা হলে বা কোনো কিছুর দরকার হলে তাঁকে যেন খবর দেই। তিনি আমাদের খাবার দাওয়াতও করেছিলেন। তাঁর কাছ থেকে গল্প শুনলাম অনেক। কালোবাজার বন্ধ, জনগণ কাজ পাচ্ছে। চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি বন্ধ হয়ে গেছে। কঠোর হাতে নতুন সরকার এইসব দমন করেছে। যে কোন জিনিস কিনতে যান, এক দাম। আমি একাকী বাজারে সামান্য জিনিসপত্র কিনেছি। দাম লেখা আছে। কোনো দরকষাকষি নাই। রিকশায় চড়েছি। কথা বুঝতে পারি না। চীনা টাকা যাকে 'ইয়েন' বলে, হাতে করে বলেছি, "ভাড়া নিয়ে যাও কত নেবা।" তবে যা ভাড়া, তাই নিয়েছে, একটুও বেশি নেয় নাই।

এবারের ১লা অক্টোবর তৃতীয় স্বাধীনতা দিবস। শান্তি সম্মেলনের ডেলিগেটদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমাদের ঠিক পিছনে উঁচুতে মাও সে তুং, চ্যু তে, মাদাম সান ইয়েৎ সেন (সুং চিং লিং), চৌ এন লাই, লিও শাও চী আরও অনেকে অভিবাদন গ্রহণ করবেন। জনগণ শোভাযাত্রা করে আসতে লাগল। মনে হল, মানুষের সমুদ্র। পদাতিক, নৌ, বিমান বাহিনী তাদের কুচকাওয়াজ ও মহড়া দেখাল। তারপরই শুরু হল, শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, ইয়াং পাইওনিয়ারের মিছিল, শুধু লাল পতাকাসহ। একটা জিনিস আমার চোখে পড়ল। এতবড় শোভাযাত্রা কিন্তু শৃঙ্খলা ঠিকই রেখেছে। পাঁচ-সাত লক্ষ লোক হবে মনে হল। পরের দিন খবরের কাগজে দেখলাম, পাঁচ লাখ। বিপ্লবী সরকার সমস্ত জাতটার মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছে নতুন চিন্তাধারা দিয়ে।

আমি জানতাম না মাহাবুব এখানে আছে। মাহাবুব তৃতীয় সেক্রেটারি পাকিস্তান রাষ্ট্রদূতের অফিসে। আমার সাথে কিছুদিন ল' পড়েছে। তার আব্বাকেও আমি জানতাম; জনাব আবুল কাশেম, সাবজজ ছিলেন। চট্টগ্রামে বাড়ি। বড় স্বাধীনচেতা লোক ছিলেন।

সত্য কথা বলতে কখনও ভয় পেতেন না। মাহাবুবও দেখলাম তার স্ত্রীকে নিয়ে চলেছে স্বাধীনতা দিবসে যোগদান করতে। আমি মাহাবুবকে দূর থেকে দেখে ডাক দিলাম। হঠাৎ পিকিংয়ে নাম ধরে কে ডাকছে, একটু আশ্চর্যই হল বলে মনে হল। আমাকে দেখে খুবই খুশি হল। কাগজে দেখেছে আমি এসেছি। বিকালে হোটেলে এল, তার স্ত্রীও এলেন। আমাকে নিয়ে নিজেই শহরের অনেকগুলি জায়গা দেখাল। রাতে খাবার দাওয়াত ছিল বলে বেশি সময় থাকতে পারলাম না। পরদিন আবার দেখা হবে। যে কয়দিন পিকিংয়ে ছিলাম, রাতে আমি ওদের সাথেই খেতাম। বাংলাদেশের খাবার না খেলে আমার তৃপ্তি কোনোদিনই হয় নাই। মাহাবুবের বেগম আমাকে একটা ক্যামেরা উপহার দিলেন। টাকার প্রয়োজন ছিল, তাই মাহাবুব কিছু টাকাও আমাকে দিল। বলল, হংকং থেকে কিছু জিনিস কিনে নিও, খুব সস্তা। আমার স্ত্রীর কথাও বলল, "কিছু দিতে পারলাম না তাকে। এই টাকা থেকে ভাবীর জন্য উপহার নিও।" বেগম মাহাবুব আমাকে একটা ঘটনা বললেন। একদিন তিনি স্কুল থেকে আসছিলেন রিকশায়, কলম পড়ে গিয়েছিল রিকশার মধ্যে। বাড়ি এসে খোঁজাখুঁজি করে দেখলেন, কলম পাওয়া গেল না। তখন ভাবলেন, রিকশায় পড়ে গিয়াছে, আর পাওয়া যাবে না। পরের দিন রিকশাওয়ালা নিজে এসে কলম ফেরত দিয়ে গিয়েছিল। এ রকম অনেক ঘটনাই আজকাল হচ্ছে। অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে চীনের জনসাধারণের মধ্যে। বেগম মাহাবুব ও মাহাবুবের আদর আপ্যায়নের কথা কোনোদিন ভুলতে পারি নাই। চীনের পাকিস্তান দূতাবাসে মাহাবুবই একমাত্র বাঙালি কর্মচারী।

⁂

শান্তি সম্মেলন শুরু হল। তিনশত আটাত্তর জন সদস্য সাঁইত্রিশটা দেশ থেকে যোগদান করেছে। সাঁইত্রিশটা দেশের পতাকা উড়ছে। শান্তির কপোত এঁকে সমস্ত হলটা সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছে। প্রত্যেক টেবিলে হেডফোন আছে। আমরা পাকিস্তানের প্রতিনিধিরা একপাশে বসেছি। বিভিন্ন দেশের নেতারা বক্তৃতা করতে শুরু করলেন। প্রত্যেক দেশের একজন বা দুইজন সভাপতিত্ব করতেন। বক্তৃতা চলছে। পাকিস্তানের পক্ষ থেকেও অনেকেই বক্তৃতা করলেন। পূর্ব পাকিস্তান থেকে আতাউর রহমান খান ও আমি বক্তৃতা করলাম। আমি বাংলায় বক্তৃতা করলাম। আতাউর রহমান সাহেব ইংরেজি করে দিলেন। ইংরেজি থেকে চীনা, রুশ ও স্পেনিশ ভাষায় প্রতিনিধিরা শুনবেন। কেন বাংলায় বক্তৃতা করব না? ভারত থেকে মনোজ বসু বাংলায় বক্তৃতা করেছেন। পূর্ব বাংলার ছাত্ররা জীবন দিয়েছে মাতৃভাষার জন্য। বাংলা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু লোকের ভাষা। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে না জানে এমন শিক্ষিত লোক চীন কেন দুনিয়ায় অন্যান্য দেশেও আমি খুব কম দেখেছি। আমি ইংরেজিতে বক্তৃতা করতে পারি। তবু আমার মাতৃভাষায় বলা কর্তব্য। আমার বক্তৃতার পরে মনোজ বসু ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "ভাই মুজিব, আজ আমরা দুই দেশের লোক, কিন্তু আমাদের ভাষাকে ভাগ করতে কেউ পারে নাই। আর পারবেও

না। তোমরা বাংলা ভাষাকে জাতীয় মর্যাদা দিতে যে ত্যাগ স্বীকার করেছ আমরা বাংলা ভাষাভাষী ভারতবর্ষের লোকেরাও তার জন্য গর্ব অনুভব করি।"

বক্তৃতার পর, খন্দকার ইলিয়াস তো আমার গলাই ছাড়ে না। যদিও আমরা পরামর্শ করেই বক্তৃতা ঠিক করেছি। ক্ষিতীশ বাবু পিরোজপুরের লোক ছিলেন, বাংলা গানে মাতিয়ে তুলেছেন। সকলকে বললেন, বাংলা ভাষাই আমাদের গর্ব। (বক্তৃতার কপি আমার কাছে আছে পরে তুলে দেব),[২৪] কতগুলি কমিশনে সমস্ত কনফারেন্স ভাগ হয়ে ভিন্ন ভিন্ন রুমে বসা হল। আমিও একটা কমিশনে সদস্য ছিলাম। আলোচনায় যোগদানও করেছিলাম। কমিশনগুলির মতামত জানিয়ে দেওয়া হল, ড্রাফট কমিটির কাছে। প্রস্তাবগুলি ড্রাফট করে আবার সাধারণ অধিবেশনে পেশ করা হল এবং সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হল।

মানিক ভাই কমিশনে বসতেন না বললেই চলে। তিনি বলতেন, প্রস্তাব ঠিক হয়েই আছে। কনফারেন্সের শেষ হওয়ার পর, এক জনসভার আয়োজন করা হয়েছিল। বিরাট জনসভায় প্রত্যেক দেশের প্রতিনিধি—দলের নেতারা বক্তৃতা করলেন এবং সকলের এক কথা, "শান্তি চাই, যুদ্ধ চাই না"। বিভিন্ন ধর্মের লোকেরাও যোগদান করেছিল আলাদা আলাদাভাবে শোভাযাত্রা করে। চীনে কনফুসিয়ান ধর্মের লোকেরা সংখ্যায় বেশি। তারপর বৌদ্ধ, মুসলমানের সংখ্যাও কম না, কিছু খ্রিষ্টানও আছে। একটা মসজিদে গিয়েছিলাম, তারা বললেন, ধর্ম কর্মে বাধা দেয় না এবং সাহায্যও করে না। আমার মনে হল, জনসভায় তাহেরা মাজহারের বক্তৃতা খুবই ভাল হয়েছিল। তিনি একমাত্র মহিলা পাকিস্তানের পক্ষ থেকে বক্তৃতা করেছিলেন। তাঁর বক্তৃতার পরে পাকিস্তানের ইজ্জত অনেকটা বেড়েছিল।

ভারতবর্ষের প্রতিনিধিদের ও পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের সাথে কাশ্মীর নিয়ে অনেক আলোচনা হওয়ার পরে একটা যুক্ত বিবৃতি দেওয়া হয়েছিল। তাতে ভারতের প্রতিনিধিরা স্বীকার করেছিলেন, গণভোটের মাধ্যমে এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হওয়া উচিত। এতে কাশ্মীর সমস্যা সমস্ত প্রতিনিধিদের সামনে আমরা তুলে ধরতে পেরেছিলাম।

আমরা ভারতের প্রতিনিধিদের খাবার দাওয়াত করেছিলাম। আমাদেরও তারা দাওয়াত করেছিল। আমাদের দেশের মুসলিম লীগ সরকারের যারা এই কনফারেন্সে যোগদান করেছিল তারা মোটেই খুশি হয় নাই। কিন্তু এই সমস্ত কনফারেন্সে যোগদান করলে দেশের মঙ্গল ছাড়া অমঙ্গল হয় না। পাকিস্তান নতুন দেশ, অনেকের এদেশ সম্পর্কে ভাল ধারণা নাই। যখন পাকিস্তানের পতাকা অন্যান্য পতাকার পাশে স্থান পায়, প্রতিনিধিরা বক্তৃতার মধ্যে পাকিস্তানের নাম বার বার বলে তখন অনেকের পাকিস্তান সম্বন্ধে আগ্রহ হয় এবং জানতে চায়।

রাশিয়ার প্রতিনিধিদেরও আমরা খাবার দাওয়াত করেছিলাম। এখানে রুশ লেখক অ্যাসিমভের সাথে আলাপ হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এই সম্মেলনেই আমি মোলাকাত করি তুরস্কের বিখ্যাত কবি নাজিম হিকমতের সাথে। বহুদিন দেশের জেলে ছিলেন। এখন তিনি দেশত্যাগ করে রাশিয়ায় আছেন। তাঁর একমাত্র দোষ তিনি কমিউনিস্ট। দেশে তাঁর

স্থান নাই, যদিও বিশ্ববিখ্যাত কবি তিনি। ভারতের ড. সাইফুদ্দিন কিচলু, ডাক্তার ফরিদী ও আরও অনেক বিখ্যাত নেতাদের সাথেও আলাপ হয়েছিল। আমি আর ইলিয়াস সুযোগ বুঝে একবার মাদাম সান ইয়েৎ সেনের সাথে দেখা করি এবং কিছু সময় আলাপও করি।

একটা জিনিস আমি অনুভব করেছিলাম, চীনের সরকার ও জনগণ ভারতবর্ষ বলতে পাগল। পাকিস্তানের সাথে বন্ধুত্ব করতে তারা আগ্রহশীল, তবে ভারতবর্ষ তাদের বন্ধু, তাদের সবকিছুই ভাল। আমরাও আমাদের আলোচনার মাধ্যমে তাদের বোঝাতে চেষ্টা করেছি, পাকিস্তানের জনগণ চীনের সাথে বন্ধুত্ব করতে আগ্রহশীল। পিকিংয়ের মেয়র চেং পেংয়ের সাথেও ব্যক্তিগতভাবে আলাপ হয়েছিল আমার কিছু সময়ের জন্য।

আমরা পে ইয়ং পার্ক ও স্বর্গ মন্দির (টেম্পেল অব হেভেন) দেখতে যাই। চীন দেশের লোকেরা এই মন্দিরে পূজা দেয় যাতে ফসল ভাল হয়। এখন আর জনগণ বিশ্বাস করে না, পূজা দিয়ে ভাল ফসল উৎপাদন সম্ভব। কমিউনিস্ট সরকার জমিদারি বাজেয়াপ্ত করে চাষিদের মধ্যে জমি বিলি বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন। ফলে ভূমিহীন কৃষক জমির মালিক হয়েছে। চেষ্টা করে ফসল উৎপাদন করছে, সরকার সাহায্য করছে। ফসল উৎপাদন করে এখন আর অকর্মণ্য জমিদারদের ভাগ দিতে হয় না। কৃষকরা জীবনপণ করে পরিশ্রম করছে। এক কথায় তারা বলে, আজ চীন দেশ কৃষক মজুরদের দেশ, শোষক শ্রেণী শেষ হয়ে গেছে।



এগার দিন সম্মেলন হওয়ার পরে দেশে ফিরবার সময় হয়েছে। শান্তি কমিটি আমাদের জানালেন ইচ্ছা করলে আমরা চীন দেশের যেখানে যেতে চাই বা দেখতে চাই তারা দেখাতে রাজি আছেন। খরচপত্র শান্তি কমিটি বহন করবে। আতাউর রহমান খান সাহেব ও মানিক ভাই দেশে ফিরবার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন। তাঁরা বিদায় নিলেন। ইলিয়াস ও আমি আরও কয়েকটা জায়গা দেখে ফিরব ঠিক করলাম। কয়েকজন একসাথে গেলে ভাল হয়। পীর মানকী শরীফ ও পাকিস্তানের কয়েকজন নেতার সাথে আমরা দুইজনে যোগ দিলাম। ভাবলাম, আমাদের দেশের সরকারের যে মনোভাব তাতে ভবিষ্যতে আর চীন দেখার সুযোগ পাব কি না জানি না। তবে বেশি দেরি করারও উপায় নাই। বেশি দিন দেরি হলে সরকার সোজা এয়ারপোর্ট থেকে সরকারি অতিথিশালায় নিয়ে যেতে পারেন। যাহোক, ইউসুফ হাসান অন্য একটা দলে যোগদান করেন। আমরা অন্যদলে ট্রেনে যাব ঠিক হল। পিকিং থেকে বিদায় নিয়ে প্রথমে তিয়েন শিং বন্দরে এলাম। পীর সাহেবকে নিয়ে এক বিপদই হল, তিনি ধর্ম মন্দির, প্যাগোডা আর মসজিদ, এইসব দেখতেই বেশি আগ্রহশীল। আমরা শিল্প কারখানা, কৃষকদের অবস্থা, সাংস্কৃতিক মিলনের জায়গা ও মিউজিয়াম দেখার জন্য ব্যস্ত। তিনি আমাদের দলের নেতা, আমাদের তাঁর প্রোগ্রামই মানতে হয়। তবুও ফাঁকে ফাঁকে আমরা দুইজন এদিক ওদিক বেড়াতে বের হতাম। আমাদের কথাও এরা বোঝে না, এদের কথাও আমরা বুঝি না। একমাত্র উপায় হল ইন্টারপ্রেটার।

তিয়েন শিং সামুদ্রিক বন্দর। এখানে আমরা অনেক রাশিয়ান দেখতে পাই। আমি ও ইলিয়াস বিকালে পার্কে বেড়াতে যেয়ে এক রাশিয়ান ফ্যামিলির সাথে আলাপ করতে চেষ্টা করি। কিন্তু ইন্টারপ্রেটার না থাকার জন্য তা সম্ভব হল না। মনের ইচ্ছা মনে রেখে আমাদের বিদায় নিতে হল, ইশারায় শুভেচ্ছা জানিয়ে। ইচ্ছা থাকলেও উপায় নাই। আমরাও তাদের ভাষা জানি না, তারাও আমাদের ভাষা জানে না। রাতে আমাদের জন্য যে খাবার বন্দোবস্ত করেছিল সেখানে একজন ইমাম সাহেব ও কয়েকজন মুসলমানকে দাওয়াত করা হয়েছিল। মুসলমানরা ও ইমাম সাহেব জানালেন তারা সুখে আছেন। ধর্মে-কর্মে কোনো বাধা কমিউনিস্ট সরকার দেয় না। তবে ধর্ম প্রচার করা চলে না।

দুই দিন তিয়েন শিং থেকে আমরা নানকিং রওয়ানা করলাম। গাড়ির প্রাচুর্য বেশি নাই। সাইকেল, সাইকেল রিকশা আর দুই চারখানা বাস। মোটরগাড়ি খুব কম। কারণ, নতুন সরকার গাড়ি কেনার দিকে নজর না দিয়ে জাতি গঠন কাজে আত্মনিয়োগ করেছে।

আমার নিজের একটা অসুবিধা হয়েছিল। আমার অভ্যাস, নিজে দাড়ি কাটি। নাপিত ভাইদের বোধহয় দাড়ি কাটতে কোনোদিন পয়সা দেই নাই। ব্লেড আমার কাছে যা ছিল শেষ হয়ে গেছে। ব্লেড কিনতে গেলে শুনলাম, ব্লেড পাওয়া যায় না। বিদেশ থেকে ব্লেড আনার অনুমতি নাই। পিকিংয়েও চেষ্টা করেছিলাম পাই নাই। ভাবলাম, তিয়েন শিং-এ নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। এত বড় শিল্প এলাকা ও সামুদ্রিক বন্দর! এক দোকানে বহু পুরানা কয়েকখানা ব্লেড পেলাম, কিন্তু তাতে আর দাড়ি কাটা যাবে না। আর এগুলো কেউ কিনেও না। চীন দেশে যে জিনিস তৈরি হয় না, তা লোকে ব্যবহার করবে না। পুরানা আমলের ক্ষুর দিয়ে দাড়ি কাটা হয়। আমার আর উপায় রইল না, শেষ পর্যন্ত হোটেলের সেলুনেই দাড়ি কাটতে হল। এরা শিল্প কারখানা বানানোর জন্যই শুধু বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে। আমাদের দেশে সেই সময়ে কোরিয়ার যুদ্ধের ফলস্বরূপ যে বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয়েছিল তার অধিকাংশ ব্যয় হল জাপানি পুতুল, আর শৌখিন দ্রব্য কিনতে। দৃষ্টিভঙ্গির কত তফাৎ আমাদের সরকার আর চীন সরকারের মধ্যে! এদেশে একটা বিদেশী সিগারেট পাওয়া যায় না। সিগারেট তারা তৈরি করছে নিকৃষ্ট ধরনের, তাই বড় ছোট সকলে খায়। আমরাও বাধ্য হলাম চীনা সিগারেট খেতে। প্রথম প্রথম একটু কষ্ট হয়েছিল কড়া বলে, আস্তে আস্তে রপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

নানকিং অনেক পুরানা শহর। অনেক দিন চীনের রাজধানী ছিল। এখানে সান ইয়েৎ সেনের সমাধি। আমরা প্রথমেই সেখানে যাই শ্রদ্ধা জানাতে। পীর সাহেব ফুল দিলেন, আমরা নীরবে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম এই বিপ্লবী নেতাকে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও চীনের মাঞ্চু রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করেছেন এবং বিপুল ত্যাগ স্বীকার করেছেন। রাজতন্ত্রকে খতম করে দুনিয়ায় চীন দেশের মর্যাদা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিও বুঝতে পেরেছিল চীন জাতিকে বেশি দিন দাবিয়ে রাখা যাবে না, আর শোষণও করা চলবে না।

নানকিং থেকে আমরা সাংহাই পৌঁছালাম। এটা দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শহর ও ব্যবসা কেন্দ্র। বিদেশী শক্তিগুলি বার বার একে দখল করেছে। নতুন চীন সৃষ্টির পূর্বে এই সাংহাই ছিল বিদেশী শক্তির বিলাসীদের আরাম, আয়েশ ও ফুর্তি করার শহর। হংকংয়ের মতই এর অবস্থা ছিল। নতুন চীন সরকার কঠোর হস্তে এসব দমন করেছে। সাংহাইতে অনেক শিল্প কারখানা আছে। সরকার কতগুলি শিল্প বাজেয়াপ্ত করেছে। যারা চিয়াং কাইশেকের ভক্ত ছিল, অনেকে পালিয়ে গেছে। আর কতগুলি শিল্প আছে যেগুলি বাজেয়াপ্ত করে নাই, তবে শ্রমিক ও মালিক যুক্তভাবে পরিচালনা করে। আমাদেরকে দুনিয়ার অন্যতম বিখ্যাত টেক্সটাইল মিল দেখাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এটা তখন জাতীয়করণ করা হয়েছে। শ্রমিকদের থাকার জন্য অনেক নতুন নতুন দালান করা হয়েছে। তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য স্কুল করা হয়েছে, চিকিৎসার জন্য আলাদা হাসপাতাল করা হয়েছে। বিরাট এলাকা নিয়ে কলোনি গড়ে তুলেছে। আমি কিছু সময় পীর সাহেবের সাথে সাথে দেখতে লাগলাম। পরে ইলিয়াসকে বললাম, "এগুলো তো আমাদের দেখাবে, আমি শ্রমিকদের বাড়িতে যাব এবং দেখব তারা কি অবস্থায় থাকে। আমাদের হয়ত শুধু ভাল জিনিসই এরা দেখাবে, খারাপ জিনিস দেখাবে না।" ইলিয়াস বলল, "তাহলে তো ওদের বলতে হয়।" বললাম, "আগেই কথা বল না, হঠাৎ বলব এবং সাথে সাথে এক শ্রমিকের বাড়ির ভিতরে যাব।"

পীর সাহেব তাঁর পছন্দের জন্য কিছু দেখতে গেলেন। আমরা ইন্টারপ্রেটারকে বললাম, "এই কলোনির যে কোনও একটা বাড়ির ভিতরটা দেখতে চাই। এদের ঘরের ভিতরের অবস্থা আমরা দেখব।" আমাদের একটু অপেক্ষা করতে বলে ভিতরে চলে গেল ইন্টারপ্রেটার এবং পাঁচ মিনিটের ভিতরেই এক ফ্ল্যাটে আমাদের নিয়ে চলল। আমরা ভিতরে যেয়ে দেখলাম, এক মহিলা আমাদের জন্য দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি আমাদের অভ্যর্থনা করলেন, ভিতরে নিয়ে বসতে দিলেন। দুই তিনটা চেয়ার, একটা খাট, ভাল বিছানা—এই মহিলাও শ্রমিক। মাত্র এক মাস পূর্বে বিবাহ হয়েছে, স্বামী মিলে কাজ করতে গেছে। বাড়িতে একলাই আছে, স্বামী ফিরে আসলে তিনিও কাজ করতে যাবেন। তিনি বললেন, "খুবই দুঃখিত, আমার স্বামী বাড়িতে নাই, খবর না দিয়ে এলেন, আপনাদের আপ্যায়ন করতে পারলাম না, একটু চা খান।" তাড়াতাড়ি চা বানিয়ে আনলেন। চীনের চা দুধ চিনি ছাড়াই আমরা খেলাম। ইন্টারপ্রেটার আমাদের বললেন, "ভেতরে চলুন, দুইখানা কামরাই দেখে যান।" আমরা দুইটা কামরাই দেখলাম। এতে একটা মধ্যবিত্ত ফ্যামিলি ভালভাবে বাস করতে পারে। আসবাপত্রও যা আছে তাতে মধ্যবিত্ত ঘরের আসবাবপত্র বলতে পারা যায়। একটা পাকের ঘর ও একটা গোসলখানা ও পায়খানা। আবার ফিরে এসে বসলাম। ইলিয়াসকে বললাম, "এদের বাড়ি দেখতে এসে বিপদে পড়লাম। সামান্য কয়েকদিন পূর্বে ভদ্রমহিলার বিবাহ হয়েছে, আমাদের সাথে কিছুই নাই যে উপহার দেই। এরা মনে করবে কি? আমাদের দেশের বদনাম হবে।" ইলিয়াস বলল, "কি করা যায়, আমি ভাবছি।" হঠাৎ আমার হাতের দিকে নজর পড়ল, হাতে আংটি আছে একটা। আংটি খুলে ইন্টারপ্রেটারকে

বললাম, "আমরা এই সামান্য উপহার ভদ্রমহিলাকে দিতে চাই। কারণ, আমার দেশের নিয়ম কোনো নতুন বিবাহ বাড়িতে গেলে বর ও কনেকে কিছু উপহার দিতে হয়।" ভদ্রমহিলা কিছুতেই নিতে রাজি নয়, আমরা বললাম, "না নিলে আমরা দুঃখিত হব। বিদেশীকে দুঃখ দিতে নাই। চীনের লোক তো অতিথিপরায়ণ শুনেছি, আর দেখছিও।" আংটি দিয়ে বিদায় নিলাম। পীর সাহেবের কাছে হাজির হলাম এবং গল্পটি বললাম। পীর সাহেব খুব খুশি হলেন আংটি দেওয়ার জন্য।

পরের দিন সকালবেলা শ্রমিক মহিলা আর তার স্বামী কিংকং হোটেলে আমার সাথে দেখা করতে আসেন। হাতে ছোট্ট একটা উপহার। চীনের লিবারেশন পেন। আমি কিছুতেই নিতে চাইলাম না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিতে হল। এটা নাকি তাদের দেশের নিয়ম। সাংহাইয়ের শান্তি কমিটির সদস্যরা তখন উপস্থিত ছিল।

দুই-তিন দিন সমানে চলল ঘোরাফেরা। যদিও সাংহাইয়ের সে শ্রী নাই, বিদেশীরা চলে যাওয়ার পরে। তবুও যেটুকু আছে তার মধ্যে কৃত্রিমতা নাই। ঘষামাজা করে রঙ লাগালে যে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয় তাতে সত্যিকারের সৌন্দর্য নষ্ট হয়। নিজস্বতা চাপা পড়ে। এখন সাংহাইয়ের যা কিছু সবই চীনের নিজস্ব। এতে চীনের জনগণের পূর্ণ অধিকার। সমুদ্রগামী জাহাজও কয়েকখানা দেখলাম।

নতুন নতুন স্কুল, কলেজ গড়ে উঠেছে চারিদিকে। ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ভার সরকার নিয়েছে। চীনের নিজস্ব পদ্ধতিতে লেখাপড়া শুরু করা হয়েছে।

সাংহাই থেকে আমরা হ্যাংচোতে আসলাম। হ্যাংচো পশ্চিম হ্রদের পাড়ে। একে চীনের কাশ্মীর বলা হয়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও ফলে ফুলে ভরা এই দেশটা। লেকের চারপাশে শহর। আমাদের নতুন হোটেলে রাখা হয়েছে, লেকের পাড়ে। ছোট ছোট নৌকায় চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে চীন দেশের লোকেরা। তারা এখানে আসে বিশ্রাম করতে। লেকের ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মধ্যে দ্বীপ আছে। হ্যাংচো ও ক্যান্টন দেখলে মনে হবে যেন পূর্ব বাংলা। সবুজের মেলা চারিদিকে। পীর সাহেব একদিন শুধু প্যাগোডা দেখলেন, পরের দিনও যাবেন অতি পুরাতন প্যাগোডাগুলি দেখতে। আমি ও ইলিয়াস কেটে পড়লাম। নৌকায় চড়ে লেকের চারিদিকে ঘুরে দেখতে লাগলাম। দ্বীপগুলির ভিতরে সুন্দরভাবে বিশ্রাম করার ব্যবস্থা রয়েছে। মেয়েরা এখানে নৌকা চালায়। নৌকা ছাড়া বর্ষাকালে এখানে চলাফেরার উপায় নাই। বড়, ছোট সকল অবস্থার লোকেরই নিজস্ব নৌকা আছে। আমি নৌকা বাইতে জানি, পানির দেশের মানুষ। আমি লেকে নৌকা বাইতে শুরু করলাম।

এক দ্বীপে আমরা নামলাম, সেখানে চায়ের দোকান আছে। আমরা চা খেয়ে লেকে ভ্রমণ শেষ করলাম। হ্যাংচো থেকে ক্যান্টন ফিরে এলাম। ক্যান্টন থেকে হংকং হয়ে দেশে ফিরব। এবার ক্যান্টনকে ভালভাবে দেখবার সুযোগ পেলাম। চীন দেশের লোকের মধ্যে দেখলাম নতুন চেতনা। চোখে মুখে নতুন ভাব ও নতুন আশায় ভরা। তারা আজ গর্বিত যে তারা স্বাধীন দেশের নাগরিক। এই ক্যান্টনেই ১৯১১ সালে সান ইয়েৎ সেনের দল আক্রমণ করে। ক্যান্টন প্রদেশের লোক খুবই স্বাধীনতাপ্রিয়। আমরা চীন দেশের জনগণকে ও

মাও সে তুং-এর সরকারকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ইতিহাস বিখ্যাত চীন দেশ থেকে বিদায় নিলাম। আবার হংকং ইংরেজে-কলোনি, কৃত্রিম সৌন্দর্য ও কৃত্রিম মানুষ, চোরাকারবারিদের আড্ডা। দুই-তিন দিন এখানে থেকে তারপর দেশের দিকে হাওয়াই জাহাজে চড়ে রওয়ানা করলাম। ঢাকায় পৌঁছালাম নতুন প্রেরণা ও নতুন উৎসাহ নিয়ে। বিদেশে না গেলে নিজের দেশকে ভালভাবে চেনা কষ্টকর।

আমরা স্বাধীন হয়েছি ১৯৪৭ সালে আর চীন স্বাধীন হয়েছে ১৯৪৯ সালে। যে মনোভাব পাকিস্তানের জনগণের ছিল, স্বাধীনতা পাওয়ার সাথে সাথে আজ যেন তা ঝিমিয়ে গেছে। সরকার তা ব্যবহার না করে তাকে চেপে মারার চেষ্টা করেছে। আর চীনের সরকার জনগণকে ব্যবহার করছে তাদের দেশের উন্নয়নমূলক কাজে। তাদের সাথে আমাদের পার্থক্য হল, তাদের জনগণ জানতে পারল ও অনুভব করতে পারল এই দেশ এবং এদেশের সম্পদ তাদের। আর আমাদের জনগণ বুঝতে আরম্ভ করল, জাতীয় সম্পদ বিশেষ গোষ্ঠীর আর তারা যেন কেউই নন। ফলে দেশের জনগণের মধ্যে ও রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে হতাশা দেখা দিয়েছে। একটা মাত্র পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছিল সাদা চামড়ার জায়গায় কালা চামড়ার আমদানি হয়েছে।

চীনের জনগণ সরকারের কাজে সাহায্য করছে এটা বুঝতে কষ্ট হল না। জনমত দেখলাম চীন সরকারের সাথে। চীন সরকার নিজেকে 'কমিউনিস্ট সরকার' বলে ঘোষণা করে নাই, তারা তাদের সরকারকে 'নতুন গণতন্ত্রের কোয়ালিশন সরকার' বলে থাকে। কমিউনিস্ট ছাড়াও অন্য মতাবলম্বী লোকও সরকারের মধ্যে আছে। যদিও আমার মনে হল কমিউনিস্টরা নিয়ন্ত্রণ করছে সকল কিছুই। আমি নিজে কমিউনিস্ট নই। তবে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বিশ্বাস করি না। একে আমি শোষণের যন্ত্র হিসাবে মনে করি। এই পুঁজিপতি সৃষ্টির অর্থনীতি যতদিন দুনিয়ায় থাকবে ততদিন দুনিয়ার মানুষের উপর থেকে শোষণ বন্ধ হতে পারে না। পুঁজিপতিরা নিজেদের স্বার্থে বিশ্বযুদ্ধ লাগাতে বদ্ধপরিকর। নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত জনগণের কর্তব্য বিশ্বশান্তির জন্য সংঘবদ্ধভাবে চেষ্টা করা। যুগ যুগ ধরে পরাধীনতার শৃঙ্খলে যারা আবদ্ধ ছিল, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যাদের সর্বস্ব লুট করেছে—তাদের প্রয়োজন নিজের দেশকে গড়া ও জনগণের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক মুক্তির দিকে সর্বশক্তি নিয়োগ করা। বিশ্বশান্তির জন্য জনমত সৃষ্টি করা তাই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।



আমি ঢাকায় এসে পার্টির কাজে আত্মনিয়োগ করলাম। মওলানা ভাসানী ও আমার সহকর্মীদের অনেকে আজও জেল থেকে মুক্তি পান নাই। বন্দি মুক্তি আন্দোলন জোরদার করা কর্তব্য হয়ে পড়েছে। পল্টন ময়দানে সভা দিলাম। আতাউর রহমানের সভাপতিত্বে এক বিরাট সভা হল। আমি সরকারের জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলাম। ১৯৫২ সালের

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের পরে এই আমার প্রথম সভা, যদিও আমাদের মুক্তির পরে ঢাকা বার লাইব্রেরি হলে ছাত্রলীগ এক সভা করেছিল সদ্য কারামুক্ত কর্মীদের এখানে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য। রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের সভাও কয়েকটা হয়েছিল বিভিন্ন বাড়িতে।

আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠানকে গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করলাম। সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে খবর দিলাম, পূর্ব বাংলায় আসবার জন্য। তিনি আমাকে পূর্বেই কথা দিয়েছিলেন এক মাস সমস্ত প্রদেশ ঘুরবেন এবং জনসভায় বক্তৃতা করবেন। আমি প্রোগ্রাম করে তাঁকে জানালাম। সমস্ত জেলা হেডকোয়ার্টারে একটা করে সভা হবে এবং বড় বড় কতগুলি মহকুমায়ও সভার বন্দোবস্ত করা হল। তিনি ঢাকায় আসলেন, ঢাকায় জনসভায়ও বক্তৃতা করলেন। পাকিস্তান হওয়ার পরে বিরোধী দলের এত বড় সভা আর হয় নাই। তিনি পরিষ্কার ভাষায় রাষ্ট্রভাষা বাংলা, বন্দি মুক্তি, স্বায়ত্তশাসনের সমর্থনে বক্তৃতা করলেন। সিলেট থেকে শুরু করে দিনাজপুর এবং বগুড়া থেকে বরিশাল প্রত্যেকটা জেলায়ই আওয়ামী লীগ কর্মীরা সভার আয়োজন করেছিল। একমাত্র রাজশাহীতে জনসভা হয় নাই, তবে নাটোরে হয়েছিল। রাজশাহীতে তখনও জেলা কমিটি করতে আমি পারি নাই। রাজশাহীর অনেক নেতা নাটোরে শহীদ সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাঁকে রাজশাহী নিয়ে গেলেন, সেখানে বসে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠান গড়া হল। এই সময় প্রায় প্রত্যেকটা মহকুমায় ও জেলায় আওয়ামী লীগ সংগঠন গড়ে উঠেছে। শহীদ সাহেবের সভার পরে সমস্ত দেশে এক গণজাগরণ পড়ে গেল। জনসাধারণ মুসলিম লীগ ছেড়ে আওয়ামী লীগ দলে যোগদান করতে শুরু করেছিল। শহীদ সাহেবের নেতৃত্বের প্রতি জনগণের ও শিক্ষিত সমাজের আস্থা ছিল। জনগণ বিশ্বাস করত শহীদ সাহেব একমাত্র নেতা যিনি দেশের বিকল্প নেতৃত্ব দিতে পারবেন এবং তাঁকে প্রধানমন্ত্রী করতে পারলে দেশের ও জনগণের উন্নতি হবে। দেশের মধ্যে দুর্নীতি, অত্যাচার ও জুলুম চলছে। কোনো সুষ্ঠু উন্নতিমূলক কাজে সরকার হাত না দিয়ে ষড়যন্ত্রমূলক রাজনীতি শুরু করেছে। আমলাতন্ত্র ও ষড়যন্ত্রমূলক রাজনীতি শুরু করেছে। খাজা সাহেবের দুর্বল শাসনব্যবস্থার জন্য তাদের মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, গোলাম মোহাম্মদ, নবাব গুরমানির মত পুরানা সরকারি কর্মচারীরা রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে শুরু করেছে। পাঞ্জাবি আমলাতন্ত্রকে খুশি করার জন্য চৌধুরী মোহাম্মদ আলীকে অর্থমন্ত্রী করে খাজা সাহেব নিজেই ষড়যন্ত্রের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছেন। জনগণের মধ্যে হতাশা দেখা দিয়েছে এবং তারা শহীদ সাহেবের নেতৃত্বের উপর আস্থা প্রকাশ করতে শুরু করেছে। রাজনৈতিক দল ছাড়া গণতন্ত্র সফল হতে পারে না। এই সময় মুসলিম লীগ দলের মোকাবেলায় একমাত্র আওয়ামী লীগই বিরোধী দল হিসাবে গড়ে উঠতে লাগল। পশ্চিম পাকিস্তানেও একদল নিঃস্বার্থ নেতা ও কর্মী আওয়ামী লীগ গঠন করতে এগিয়ে এলেন পীর মানকী শরীফের নেতৃত্বে।

শহীদ সাহেব পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব বাংলায় ঘুরে ঘুরে প্রতিষ্ঠান গড়তে সাহায্য করতে লাগলেন। প্রত্যেকটা জনসভার পরেই আমি জেলা ও মহকুমার নেতাদের ও কর্মীদের নিয়ে আলোচনা সভা করে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান গঠনে সাহায্য করতে লাগলাম। শহীদ

সাহেবের পুরানা ভক্তরা প্রায়ই আওয়ামী লীগে যোগদান করতে লাগল; বিশেষ করে যুবক শ্রেণীর কর্মীরা এগিয়ে এল মুসলিম লীগ সরকারের অত্যাচারের মোকাবেলা করার জন্য। শত শত কর্মী জেলের মধ্যে দিনযাপন করছে নিরাপত্তা আইনে। প্রথমে জেলায় জেলায় চেষ্টা করেছে আমাদের সভায় গোলমাল সৃষ্টি করার জন্য, পরে আর পারে নাই। জনমত আওয়ামী লীগ ও শহীদ সাহেবের পক্ষে ছিল। এই সময় শহীদ সাহেব মওলানা ভাসানী ও অন্য রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তির জন্য প্রবল জনমত সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মওলানা ভাসানীও এই সময় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন সারা পূর্ব পাকিস্তানে।

১৯৪৯ সালে আওয়ামী লীগ গঠন হলেও আজ পর্যন্ত কোন কাউন্সিল সভা হতে পারেও নাই, কারণ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সকলকেই প্রায় কারাগারে দিন অতিবাহিত করতে হয়েছে। আমি সমস্ত জেলা ও মহকুমা আওয়ামী লীগকে নির্দেশ দিলাম তিন মাসের মধ্যে নির্বাচন শেষ করতে হবে। তারপর পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কাউন্সিল সংগঠনের কর্মকর্তা নির্বাচন করবে এবং গঠনতন্ত্র ও ম্যানিফেস্টো গ্রহণ করবে। আমি দিনরাত সমানভাবে পরিশ্রম শুরু করলাম। শহীদ সাহেব যে সমস্ত মহকুমায় যেতে পারেন নাই আমি সেই সকল মহকুমায় সভা করে পার্টি গড়তে সাহায্য করলাম। জনগণ ও কর্মীদের থেকে সাড়া যে পেলাম তা প্রথমে কল্পনা করতে পারি নাই। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগও আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠান গড়বার কাজে সাহায্য করছিল এই জন্য যে, শক্তিশালী বিরোধী দল ছাড়া সরকারের জুলুমকে মোকাবেলা করা কষ্টকর। আওয়ামী লীগ গড়ে উঠবার পূর্ব পর্যন্ত একমাত্র ছাত্রলীগই সরকারের অত্যাচার, অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করত এবং জনগণ ও ছাত্রদের দাবি দাওয়া তুলে ধরত। ছাত্র প্রতিষ্ঠান হিসাবে তাদের নেতা ও কর্মীদের অনেক অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছে। মুসলিম লীগ সরকার ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠানকে খতম করার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। গণতান্ত্রিক যুবলীগও অলি আহাদের নেতৃত্বে জনমত সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছিল।



১৯৫৩ সালের প্রথম দিক থেকে রাজনৈতিক ও ছাত্রকর্মীরা মুক্তি পেতে শুরু করল। শামসুল হক সাহেবও মুক্তি পেলেন, তখন তিনি অসুস্থ। তাঁর যে কিছুটা মস্তিষ্ক বিকৃতি হয়েছে কারাগারের বন্দি থেকে, তা বুঝতে কারও বাকি রইল না। তিনি কোনো গোলমাল করতেন না, তবে কিছু সময় কথা বললেই বোঝা যেত যে, এক কথা বলতে অন্য কথা বলতে শুরু করেন। আমরা খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লাম। একজন নিঃস্বার্থ দেশকর্মী, ত্যাগী নেতা আজ দেশের কাজ করতে যেয়ে কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে থেকে পাগল হয়ে বের হলেন। এ দুঃখের কথা কোথায় বলা যাবে? পাকিস্তান আন্দোলনে তাঁর অবদান যারা এখন ক্ষমতায় আছেন, তাঁদের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। বাংলাদেশে যে কয়েকজন কর্মী সর্বস্ব দিয়ে পাকিস্তান আন্দোলন করেছে তাদের মধ্যে শামসুল হক সাহেবকে সর্বশ্রেষ্ঠ

কর্মী বললে বোধহয় অন্যায় হবে না। ১৯৪৩ সাল থেকে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠানকে জমিদার, নবাবদের দালানের কোঠা থেকে বের করে জনগণের পর্ণকুটিরে যাঁরা নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে শামসুল হক সাহেব ছিলেন অন্যতম। একেই বলে কপাল, কারণ সেই পাকিস্তানের জেলেই শামসুল হক সাহেবকে পাগল হতে হল।

আমি অনেকের সাথে পরামর্শ করে তাঁর চিকিৎসার বন্দোবস্ত করতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু তিনি রাজি হলেন না। উল্টা আমার উপর ক্ষেপে গেলেন। আমি তখন তাঁকে প্রতিষ্ঠানের জেনারেল সেক্রেটারির ভার নিতে অনুরোধ করলাম। কার্যকরী কমিটির সভা ডেকে তাঁকে অনুরোধ করলাম, কারণ এতদিন আমি এ্যাকটিং জেনারেল সেক্রেটারি হিসাবে কাজ করছিলাম। ভাবলাম, কাজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লে তিনি ভাল হয়ে যেতে পারেন। তিনি সভায় উপস্থিত হলেন এবং বললেন, "আমি প্রতিষ্ঠানের জেনারেল সেক্রেটারির ভার নিতে পারব না, মুজিব কাজ চালিয়ে যাক।" আজেবাজে কথাও বললেন, যাতে সকলেই বুঝতে পারলেন যে, তাঁর মাথায় কিছুটা গোলমাল হয়েছে। আমি কাজ চালিয়ে যেতে লাগলাম। ঢাকা শহর আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সভায় হক সাহেবকে সভাপতিত্ব করার জন্য জোর করেই উপস্থিত করলাম। তিনি এমন এক বক্তৃতা করলেন যাতে সকলেই দুঃখ পেলাম। কারণ তিনি নিজকে সমস্ত দুনিয়ার খলিফা বলে ঘোষণা করলেন। আমরা হতাশ হয়ে পড়লাম, কি করে তাঁর চিকিৎসা করানো যাবে? আরও অসুবিধায় পড়লাম, হক সাহেবের স্ত্রী প্রফেসর আফিয়া খাতুন বিদেশে লেখাপড়া করতে যাওয়ায়। তিনি থাকলে হয়ত কিছুটা ব্যবস্থা করা যেত।

ইয়ার মোহাম্মদ খান আমাকে সাহায্য করতে লাগলেন। তাঁর সমর্থন ও সাহায্য না পেলে খুবই অসুবিধা ভোগ করতে হত। মানিক ভাই *ইত্তেফাক* কাগজকে জনপ্রিয় করে তুলেছেন। সাপ্তাহিক কাগজ হলেও শহরে ও গ্রামে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। *পাকিস্তান অবজারভার* কাগজও আমাদের সংবাদ কিছু কিছু দিত। মুসলিম লীগ ও মুসলিম লীগ সরকার জনপ্রিয়তা দ্রুত হারিয়ে ফেলেছিল। আমি বুঝতে পারলাম, এখন শুধু সুষ্ঠু নেতৃত্ব ও সুশৃঙ্খল প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন। এই সুযোগ আমি ও আমার সহযোগীরা পুরাপুরি গ্রহণ করলাম এবং দেশের প্রায় শতকরা সত্তরটা ইউনিয়নে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সক্ষম হলাম। যুবক কর্মীরা আমার দিকে ঝুঁকে পড়ল। কারণ আমিও তখন যুবক ছিলাম। ভাসানী সাহেব ও আওয়ামী লীগ কর্মীরা অনেকেই মুক্তি পেলেন। আমি মওলানা ভাসানী ও আতাউর রহমান খানের সাথে কাউন্সিল সভা সম্পর্কে পরামর্শ করলাম। কাউন্সিল সভা তাড়াতাড়ি করা প্রয়োজন একথা তাঁরাও স্বীকার করলেন। প্রথম কাউন্সিল সভা ডাকা হল ঢাকায়। হল পাওয়া খুবই কষ্টকর। ইয়ার মোহাম্মদ খানের সাহায্যে মুকুল সিনেমা হল পেতে কষ্ট হল না। কাউন্সিল সদস্যদের থাকার জন্য কোন জায়গা না পেয়ে বড় বড় নৌকা ভাড়া করলাম সদরঘাটে। ঠিক হল সোহরাওয়ার্দী সাহেব কাউন্সিলে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন।

কাউন্সিল সভার দিন যতই ঘনিয়ে আসছিল আওয়ামী লীগের কয়েকজন প্রবীণ নেতা এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন, যাতে আমাকে জেনারেল সেক্রেটারি না করা হয়। আমি এ

সম্বন্ধে খোঁজখবর রাখতাম না, কারণ প্রতিষ্ঠানের কাজ, টাকা জোগাড়, কাউন্সিলারদের থাকার বন্দোবস্তসহ নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে হত। আবদুস সালাম খান, ময়মনসিংহের হাশিমউদ্দিন আহমদ, রংপুরের খয়রাত হোসেন, নারায়ণগঞ্জের আলমাস আলী ও আবদুল আউয়াল এবং আরও কয়েকজন এই ষড়যন্ত্রের নায়ক ছিলেন। প্রতিষ্ঠানের জন্য টাকা পয়সা এরা দিতেন না, বা জোগাড় করতেন না। প্রতিষ্ঠানের কাজও ভালভাবে করতেন না। তবে আমি যাতে জেনারেল সেক্রেটারি না হতে পারি তার জন্য অর্থ ব্যয়ও করতেন। সালাম সাহেবের অসন্তুষ্ট হবার প্রধান কারণ ছিল আমি নাকি তাঁকে ইমপর্টেন্স না দিয়ে আতাউর রহমান খান সাহেবকে দেই। আমি এ সমস্ত পছন্দ করতাম না, তাই আতাউর রহমান সাহেবকে কাউন্সিল সভার প্রায় পনের দিন পূর্বে একাকী বললাম, "আপনি জেনারেল সেক্রেটারি হতে রাজি হন; আমার পদের দরকার নাই। কাজ তো আমি করছি এবং করব, আপনার কোনো অসুবিধা হবে না।" আতাউর রহমান সাহেব বললেন, "আমি এত সময় কোথায় পাব? সকল কিছু ছেড়ে দিয়ে কাজ করার উপায় আমার নাই। এখন যে জেনারেল সেক্রেটারি হবে তার সর্বক্ষণের জন্য পার্টির কাজ করতে হবে। আপনি ছাড়া কেউ এ কাজ পারবে না, আপনাকেই হতে হবে।" আমি বললাম, "কয়েকজন নেতা তলে তলে ষড়যন্ত্র করছে। তারা বলে বেড়ান একজন বয়েসী লোকের জেনারেল সেক্রেটারি হওয়া দরকার। দুঃখের বিষয় এই ভদ্রলোকদের এতটুকু কৃতজ্ঞতা বোধ নাই যে, আমি জেল থেকে বের হয়ে রাতদিন পরিশ্রম করে প্রতিষ্ঠানের একটা রূপ দিয়েছি।" আতাউর রহমান সাহেব বললেন, "ছেড়ে দেন ওদের কথা, কাজ করবে না শুধু বড় বড় কথা বলতে পারে সভায় এসে।" আমি বললাম, "চিন্তা করে দেখেন; একবার যদি আমি ঘোষণা করে দেই যে, আমি প্রার্থী তখন কিন্তু আর কারও কথা শুনব না।" তিনি বললেন, "আপনাকেই হতে হবে।" আতাউর রহমান সাহেব জানতেন, তাঁর জন্যই সালাম সাহেব আমার উপর ক্ষেপে গেছেন। মওলানা সাহেব আমাকে জেনারেল সেক্রেটারি করার পক্ষপাতী। তাঁকেও আমি বলেছিলাম, আমি ছাড়া অন্য কাউকে ঠিক করতে, তিনি রাজি হলেন না এবং বললেন, "তোমাকেই হতে হবে।" শহীদ সাহেব করাচিতে আছেন, তিনি এ সমস্ত বিষয় কিছুই জানতেন না।

১৯৫০ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে জনাব আবুল হাশিম পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে পূর্ব বাংলায় চলে আসেন। তাঁর অনেক সহকর্মী আওয়ামী লীগে যোগদান করেছেন। ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের পর তাঁকে গ্রেফতারও করা হয়। এই সময় জেলে তিনি অনেক আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীদের সাথে প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে আলোচনা করতে সুযোগ পান।

আমার বিরোধী গ্রুপ অনেক চেষ্টা করেও কোনো প্রার্থী দাঁড় করাতে পারছিলেন না। কেউই সাহস পাচ্ছিল না, আমার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে। কারণ তাঁরা জানেন, কাউন্সিলাররা আমাকেই ভোট দিবে। ভদ্রলোকেরা তাই নতুন পন্থা অবলম্বন করলেন। তাঁরা আবুল হাশিম সাহেবের কাছে ধরনা দিলেন এবং তাঁকে আওয়ামী লীগে যোগদান করতে ও সাধারণ সম্পাদক হতে অনুরোধ করলেন। হাশিম সাহেব রাজি হলেন এবং বললেন, তাঁর কোনো

আপত্তি নাই, তবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হতে হবে। তিনি মওলানা ভাসানী সাহেবকে খাবার দাওয়াত করলেন। তাঁকে যে কয়েকজন আওয়ামী লীগ নেতা এ ব্যাপারে অনুরোধ করেছেন তাও বললেন এবং মওলানা সাহেবের মতামত জানতে চাইলেন। মওলানা সাহেব তাঁকে বললেন, "সাধারণ সম্পাদক বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় করা যাবে কি না সন্দেহ, কারণ মুজিবের আপনার সম্বন্ধে খুব খারাপ ধারণা। তবে যদি সভাপতি হতে চান, আমি ছেড়ে দিতে রাজি আছি।" মওলানা সাহেব একথা আমাকে বলেছিলেন।

কাউন্সিলের প্রথম অধিবেশন হওয়ার পরে মওলানা ভাসানী ঘোষণা করলেন, আমাদের চারজনের নাম—সর্বজনাব আতাউর রহমান খান, আবদুস সালাম খান, আবুল মনসুর আহমদ ও আমি। এই চারজন আলাদা বসে সর্বসম্মতিক্রমে একটা লিস্ট করে আনবে কর্মকর্তাদের নামের। কাউন্সিল সভার একদিন পূর্বে আমার বিরোধী গ্রুপ আতাউর রহমান সাহেবকে অনুরোধ করলেন সাধারণ সম্পাদক হতে। আতাউর রহমান সাহেব একটু নিমরাজি হয়ে পড়লেন এবং আমার সাথে পরামর্শ করবেন বলে দিলেন। আতাউর রহমান সাহেব আমাকে ডেকে বললেন, তাঁদের অনুরোধের কথা। আমি তাঁকে বলে দিলাম এখন আর সময় নাই, পূর্বে হলে রাজি হতাম। তাঁদের কাউকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে বলেন। আতাউর রহমান সাহেব তাঁদের জানিয়ে দিলেন। তাঁরা মওলানা সাহেবের কাছে অনুরোধ করলে, তিনি চারজনের উপর কমিটির নাম প্রস্তাব করার ভার দেয়ার কথা বললেন। তবে তা সর্বসম্মতিক্রমে হতে হবে। আলোচনা সভা বেশি সময় চলল না, কারণ অন্য কোনো নাম তাঁরা প্রস্তাব করতে পারলেন না। আমি কাউন্সিল সভায় উপস্থিত হয়ে ভাসানী সাহেবকে জানিয়ে দিলাম, নির্বাচন হবে। একমত হতে পারা গেল না। আতাউর রহমান সাহেব আমাকে সমর্থন করলেন। আমরা ম্যানিফেস্টো ও গঠনতন্ত্র নিয়ে সমস্ত রাত আলোচনা করলাম সাবজেক্ট কমিটিতে। কাউন্সিল সভায় ম্যানিফেস্টো ও গঠনতন্ত্র গ্রহণ করা হল এবং নির্বাচনও সর্বসম্মতিক্রমে হয়ে গেল। মওলানা ভাসানী সভাপতি, আতাউর রহমান সাহেব সহ-সভাপতি, আমি সাধারণ সম্পাদক (ম্যানিফেস্টো আমার কাছে এখন নাই, পরে তুলে দিব)।[২৫] এখন আওয়ামী লীগ একটা সত্যিকারের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে জনগণের সামনে দাঁড়াল। ম্যানিফেস্টো বা ঘোষণাপত্র না থাকলে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান চলতে পারে না।

এর পূর্বে আমরা লাহোরে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কনফারেন্সে যোগদান করি। সেখানে জমিদারি প্রথা বিলোপ এবং অন্যান্য প্রোগ্রাম নিয়ে নবাব মামদোতের সাথে একমত হতে না পারায় নবাব সাহেব আওয়ামী লীগ ত্যাগ করলেন।

পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে বিরাট প্রভেদ রয়েছে। সেখানে রাজনীতি করে সময় নষ্ট করার জন্য জমিদার, জায়গিরদার ও বড় বড় ব্যবসায়ীরা। আর পূর্ব পাকিস্তানে রাজনীতি করে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। পশ্চিম পাকিস্তানে শক্তিশালী মধ্যবিত্ত না থাকার জন্য জনগণ রাজনীতি সম্বন্ধে বা দেশ সম্বন্ধে কোনো চিন্তাও করে না। জমিদার বা জায়গিরদার অথবা তাদের পীর সাহেবরা যা বলেন, সাধারণ মানুষ তাই বিশ্বাস করে।

বহুকাল থেকে বাংলাদেশে কৃষক আন্দোলন হওয়াতে জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের চেয়ে অনেকটা বেশি। এছাড়াও স্বাধীনতা আন্দোলনেও বাঙালিরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছে। বাংলাদেশে দীর্ঘকাল যাবৎ গ্রাম্য পঞ্চায়েত প্রথা, তারপর ইউনিয়ন বোর্ড, লোকাল বোর্ড ও ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড থাকাতে জনগণের মধ্যেও রাজনৈতিক শিক্ষা অনেক পরিমাণে বেড়ে গিয়েছিল। শিক্ষিতের সংখ্যা বেশি না থাকলেও বাঙালিরা অজ্ঞ বা অসচেতন ছিল না। ভালমন্দ বিচার করার ক্ষমতা তাদের ছিল এবং এর প্রমাণও করেছিল ১৯৪৬ সালে পাকিস্তান দাবির উপরে সাধারণ নির্বাচনের সময়।

আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠানকে জনগণ ও শিক্ষিত সমাজ সমর্থন দিল। মুসলিম লীগের ভিতর তখন ষড়যন্ত্রের রাজনীতি চরম আকার ধারণ করেছিল। ব্রিটিশ আমলের আমলাদের রাজনীতিতে স্থান দিয়ে তারা ষড়যন্ত্রের জালে আটকে পড়েছিল। তাই প্রতিষ্ঠানের ভিতর আত্মকলহ দেখা দিল প্রবলভাবে। ছোট ছোট উপদলে ভাগ হয়ে পড়েছিল দলটি। নীতির কোন বালাই ছিল না, একমাত্র আদর্শ ছিল ক্ষমতা আঁকড়িয়ে থাকা। জেলায় ও মহকুমার পুরানা নেতাদের কোনো সংগ্রামী ঐতিহ্য যেমন ছিল না, তেমনি দুনিয়া যে এগিয়ে চলেছে সেদিকে খেয়াল ছিল না কারও। শুধু ক্ষমতায় থাকা যায় কি করে সেই একই চিন্তা।

এদিকে পূর্ব বাংলার সম্পদকে কেড়ে নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানকে কত তাড়াতাড়ি গড়া যায়, একদল পশ্চিমা তথাকথিত কেন্দ্রীয় নেতা ও বড় বড় সরকারি কর্মচারী গোপনে সে কাজ করে চলেছিল। তাদের একটা ধারণা ছিল, পূর্ব বাংলা শেষ পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে থাকবে না। তাই যত তাড়াতাড়ি পারা যায় পশ্চিম পাকিস্তানকে গড়ে তুলতে হবে।

আওয়ামী লীগ যখন হিসাব-নিকাশ বের করে প্রমাণ করল যে, পূর্ব বাংলাকে কি করে শোষণ করা হচ্ছে তখন তারা মরিয়া হয়ে উঠল এবং আওয়ামী লীগ ও আওয়ামী লীগ নেতাদের উপর চরম অত্যাচার করতে আরম্ভ করল। এদিকে জনগণ মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠান ও সরকারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠছিল। পূর্ব বাংলায় তখন মুসলিম লীগের নাভিশ্বাস শুরু হয়েছে।

খাজা সাহেবের আমলে পাঞ্জাবে এক ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। তাতে হাজার হাজার লোক মারা যায়। লাহোরে মার্শাল ল' জারি করা হয়। আহমদিয়া বা কাদিয়ানি বিরোধী আন্দোলন থেকে এই দাঙ্গা শুরু হয়। কয়েকজন বিখ্যাত আলেম এতে উসকানি দিয়েছিলেন। 'কাদিয়ানিরা মুসলমান না'—এটাই হল এই সকল আলেমদের প্রচার। আমার এ সম্বন্ধে বিশেষ কোনো ধারণা নাই। তবে একমত না হওয়ার জন্য যে অন্যকে হত্যা করা হবে, এটা যে ইসলাম পছন্দ করে না এবং একে অন্যায় মনে করা হয়—এটুকু ধারণা আমার আছে। কাদিয়ানিরা তো আল্লাহ ও রসুলকে মানে। তাই তাদের তো কথাই নাই, এমনকি বিধর্মীর উপরও অন্যায়ভাবে অত্যাচার করা ইসলামে কড়াভাবে নিষেধ

করা আছে। লাহোরে ও অন্যান্য জায়গায় জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে স্বামী, স্ত্রী, ছেলেমেয়েকে একসাথে ফেলে দিয়ে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। যারা এই সমস্ত জঘন্য দাঙ্গার উসকানি দিয়েছিল তারা আজও পাকিস্তানের রাজনীতিতে সশরীরে অধিষ্ঠিত আছে।

পাকিস্তান হবে একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এখানে প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী বা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের সমান নাগরিক অধিকার থাকবে। দুঃখের বিষয়, পাকিস্তান আন্দোলনের যারা বিরুদ্ধাচরণ করেছিল, এখন পাকিস্তানকে ইসলামিক রাষ্ট্র করার ধুয়া তুলে রাজনীতিকে তারাই বিষাক্ত করে তুলেছে। মুসলিম লীগ নেতারাও কোনো রকম অর্থনৈতিক ও সমাজনৈতিক প্রোগ্রাম না দিয়ে একসঙ্গে যে স্লোগান দিয়ে ব্যস্ত রইল, তা হল 'ইসলাম'। পাকিস্তানের শ্রমিক, কৃষক, মেহনতি মানুষ যে আশা ও ভরসা নিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলন, তথা পাকিস্তান আন্দোলনে শরিক হয়ে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছে তাদের অর্থনৈতিক মুক্তির দিকে কোন নজর দেওয়াই তারা দরকার মনে করল না। জমিদার ও জায়গিরদাররা যাতে শোষণ করতে পারে সে ব্যাপারেই সাহায্য দিতে লাগল। কারণ, এই শোষক লোকেরাই এখন মুসলিম লীগের নেতা এবং এরাই সরকার চালায়।

অন্যদিকে পূর্ব বাংলার বৈদেশিক মুদ্রা থেকে প্ল্যান প্রোগ্রাম করেই পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্প কারখানা গড়ে উঠতে সাহায্য করতে লাগল। ফলে একদল শিল্পপতি গড়ে তুলতে শুরু করল, যারা লাগাম ছাড়া অবস্থায় যত ইচ্ছা মুনাফা আদায় করতে লাগল জনসাধারণের কাছ থেকে এবং রাতারাতি কোটি কোটি টাকার মালিক বনে গেল। করাচি বসে ইমপোর্ট ও এক্সপোর্ট ব্যবসার নাম করে লাইসেন্স বিক্রি করে বিপুল অর্থ উপার্জন করে আস্তে আস্তে অনেকে শিল্পপতি হয়ে পড়ছেন। এটাও মুসলিম লীগ সরকারের কীর্তি এবং খাজা সাহেবের দুর্বল নেতৃত্বও এর জন্য কিছুটা দায়ী। কারণ তিনি কোনোদিন বোধহয় সরকারি কর্মচারীদের অযৌক্তিক প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে পারেন নাই। এদিকে চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর মত ঘুঘু সরকারি কর্মচারীকে অর্থমন্ত্রী করে তিনি তাঁর উপর নির্ভর করতে শুরু করেছিলেন শুনেছি; ঠিক কি না বলতে পারি না, তবে কিছুটা সত্য হলেও হতে পারে। মরহুম ফজলুর রহমান সাহেবও তখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছিলেন। তিনি চৌধুরী মোহাম্মদ আলীকে বাধা দিতে চেষ্টা করেছিলেন। খাজা সাহেবের মন্ত্রীদের মধ্যে দুইটা দল হয়েছিল। ফজলুর রহমান সাহেব একটা দলের নেতৃত্ব করতেন, যাকে 'বাঙালি দল' বলা হত। আরেকটা দল চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে ছিল যাকে 'পাঞ্জাবি দল' বলা হত। বাঙালি তথাকথিত নেতারা কেন্দ্রীয় রাজধানী, মিলিটারি হেডকোয়ার্টারগুলি, সমস্ত বড় বড় সরকারি পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য পাঞ্জাবি ভাইদের হাতে দিয়েও গোলাম মোহাম্মদ ও চৌধুরী মোহাম্মদ আলীকে খুশি করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। গণপরিষদে বাঙালিরা ছয়টা সিট পশ্চিম পাকিস্তানের 'ভাইদের' দিয়েও সংখ্যাগুরু ছিলেন। তাঁরা ইচ্ছা করলে পূর্ব বাংলার জনগণের স্বার্থ রক্ষা করতে পারতেন। তাঁরা তা না করে তাঁদের গদি রক্ষা করার জন্য এক এক করে সকল কিছু তাদের পায়ে সমর্পণ করেও গদি রাখতে পারলেন না। পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা বুঝতে পেরেছেন, এদের কাছ থেকে যতটুকু নেওয়ার নেওয়া হয়েছে। এখন নতুন লোকদের

নেওয়া প্রয়োজন, পুরানরা আর দিতে চাইবে না। কারণ, এরা এদের চিনতে পেরেছে বোধহয়। পূর্ব বাংলার নেতাদের দিয়ে এমন সকল কাজ করিয়েছে যে, এদের আর পূর্ব বাংলার জনগণ বিশ্বাস করবে না। ধাক্কা দিলেই এরা পড়ে যাবে। যেমন খাজা সাহেবকে দিয়ে বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিয়ে তাঁর উপর বাঙালিদের যতটুকু আস্থা ছিল তাও খতম করতে সক্ষম হয়েছিল। এবার তাই নতুন চাল চালতে শুরু করল। ঘাগু ব্রিটিশ আমলের সরকারি আমলাদের কূটবুদ্ধির কাছে এরা টিকবে কেমন করে? জনগণের আস্থা হারিয়ে এরা সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল আমলাতন্ত্রের উপরে, যারা সকলেই প্রায় পশ্চিম পাকিস্তান তথা পাঞ্জাবের অধিবাসী।

১৯৫৩ সালের এপ্রিল মাসে গভর্নর জেনারেল জনাব গোলাম মোহাম্মদ ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের সভাপতি, গণপরিষদ ও পার্লামেন্টের সংখ্যাগুরু দলের নেতা প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনকে বরখাস্ত করে আমেরিকায় পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আলী বগুড়াকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করলেন, যদিও মোহাম্মদ আলী গণপরিষদেরও সদস্য ছিলেন না। এমনকি মুসলিম লীগেরও সভ্য ছিলেন না। ১৯৪৮ সাল থেকে তিনি পাকিস্তানের বাইরেই ছিলেন, দেশের মানুষের কোন খবরই রাখতেন না।

আমার মনে আছে, এই দিন আওয়ামী লীগ ঢাকার পল্টন ময়দানে এক সভা করছিল। সোহরাওয়ার্দী সাহেব বক্তৃতা করছিলেন। বহু জনসমাগম হয়েছিল। শহীদ সাহেব যখন বক্তৃতা করছিলেন, তখন কে একজন এসে খবর দিল, এই মাত্র রেডিওর খবরে বলেছে নাজিমুদ্দীন সাহেবকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। শহীদ সাহেব জনসাধারণকে বললেন, "আজ পাকিস্তানের একটা বিরাট খবর আছে।" সভা শেষে যখন শহীদ সাহেবকে নিয়ে ফিরছিলাম, তিনি বললেন, "নাজিমুদ্দীন সাহেবকে বরখাস্ত করেছে, তবে এতে খুশি হবার কিছুই নাই।" আমি শহীদ সাহেবকে বললাম, "এটা খাজা সাহেব আর তাঁর দলবলের প্রাপ্য।" শহীদ সাহেব বললেন, "হ্যাঁ, শাসনতন্ত্র না দিয়ে এবং সাধারণ নির্বাচন না করে এরা পাকিস্তানকে ষড়যন্ত্রের রাজনীতিতে জড়িয়ে ফেলেছে।" আরও অনেক বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম। যাহোক, অগণতান্ত্রিকভাবে খাজা সাহেবকে ডিসমিস করার প্রতিবাদ মুসলিম লীগ নেতারা করলেন না। এক এক করে তাঁদের নেতাকে ছেড়ে দিয়ে ক্ষমতার লোভে মোহাম্মদ আলী সাহেবকে নেতা মেনে নিলেন। এমন কি মুসলিম লীগের সভাপতির পদও খাজা সাহেবকে ত্যাগ করতে হল। মুসলিম লীগ নেতারা মোহাম্মদ আলী বগুড়াকে নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের সভাপতি করে নিলেন, একজনও প্রতিবাদ করলেন না। আমার মনে আছে, এমন অগণতান্ত্রিকভাবে নাজিমুদ্দীন সাহেবকে বরখাস্ত করার প্রতিবাদ একমাত্র পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগই করেছিল।

পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী জনাব নূরুল আমিন খাজা সাহেবের বিশ্বস্ত ভক্ত ছিলেন। তিনি ও অন্যান্য প্রদেশের মুসলিম লীগ প্রধানমন্ত্রীরাও মোহম্মদ আলী সাহেবকে আনুগত্য জানালেন এবং একমাত্র নেতা হিসাবে গ্রহণ করে নিলেন। এই ঘটনার পরে আর কোনো শিক্ষিত মানুষ বা বুদ্ধিজীবীদের মুসলিম লীগের উপর আস্থা থাকার কারণ ছিল না। এটা

যে একটা সুবিধাবাদী ও সুযোগ সন্ধানীদের দল তাই প্রমাণ হয়ে গেল। গোলাম মোহাম্মদ বড়লাট হয়ে এ সাহস কোথা থেকে পেয়েছিলেন? বড় বড় সরকারি কর্মচারী এবং এক অদৃশ্য শক্তি তাঁকে অভয় দিয়েছিল এবং দরকার হলে তাঁর পেছনে দাঁড়াবে সে প্রতিশ্রুতিও তিনি পেয়েছিলেন। মুসলিম লীগ নেতা ও কর্মীদের চরিত্র সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছিল। খাজা সাহেবের সমর্থকরা একে একে মোহম্মদ আলী সাহেবের মন্ত্রিত্বে যোগদান করলেন। খাজা সাহেব নিজেও এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে সাহস পেলেন না। ১৯৪৬ সালে যেমন চুপটি করে ঘরে বসে পড়েছিলেন, এবারও তিনি বিশ্রাম গ্রহণ করলেন—যদি কোনোদিন সুযোগ আসে তখন আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠবেন, এই ভরসায়।

মোহাম্মদ আলীর (বগুড়া) মধ্যে কোনো রাজনৈতিক চেতনা ছিল না। তাঁর মধ্যে কোনো গভীরতাও ছিল না। শুধু আমেরিকা থেকে তিনি আমেরিকানদের মত কিছু হাবভাব ও হাঁটাচলা আর কাপড় পরা শিখে এসেছিলেন। গোলাম মোহাম্মদ যা বলেন, তাতেই তিনি রাজি। আর আমেরিকানরা যে বুদ্ধি দেয় সেইটাই তিনি গ্রহণ করে চলতে লাগলেন। আমেরিকান শাসকগোষ্ঠীরা যেমন সকল কিছুর মধ্যে কমিউনিস্ট দেখতেন, তিনিও তাই দেখতে শুরু করলেন। প্রথমে তিনি শহীদ সাহেবকে তাঁর 'রাজনৈতিক পিতা' বলে সম্বোধন করলেন, পরে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে শুরু করলেন।

মওলানা ভাসানী, আমি ও আমার সহকর্মীরা সময় নষ্ট না করে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠান গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করলাম। পূর্ব বাংলার জেলায়, মহকুমায়, থানায় ও গ্রামে গ্রামে ঘুরে এক নিঃস্বার্থ কর্মীবাহিনী সৃষ্টি করতে সক্ষম হলাম। ছাত্রলীগের নেতৃত্বে ছাত্ররা মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে মনপ্রাণ দিয়ে রুখে দাঁড়াল। দেশের মধ্যে স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি চরম আকার ধারণ করেছিল। শাসনযন্ত্র শিথিল হয়ে গিয়েছিল। সরকারি কর্মচারীরা যা ইচ্ছা তাই করতে পারত। খাদ্য সংকট চরম আকার ধারণ করে। বেকার সমস্যা ভীষণভাবে দেখা দিয়েছে। শাসকদের কোন প্ল্যান প্রোগ্রাম নাই। কোনোমতে চললেই তারা খুশি। পূর্ব বাংলার মন্ত্রীরা কোথাও সভা করতে গেলে জনগণ তাদের বক্তৃতা শুনতেও চাইত না। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির কথা কেউই ভুলে নাই। আমরা তাড়াতাড়ি শাসনতন্ত্র করতে জনমত সৃষ্টি করতে লাগলাম। পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবি মেনে নেওয়া ছাড়া এবং বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা না মেনে নিলে আমরা কোনো শাসনতন্ত্র মানব না। এসময় ফজলুর রহমান সাহেব আরবি হরফে বাংলা লেখা পদ্ধতি চালু করতে চেষ্টা করছিলেন। আমরা এর বিরুদ্ধেও জনমত সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলাম। কোনো কোনো মুসলিম লীগ নেতা এককেন্দ্রিক সরকার গঠনের জন্য তলে তলে প্রপাগান্ডা করছিলেন। আওয়ামী লীগ ফেডারেল শাসনতন্ত্র ও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবির ভিত্তিতে প্রচার শুরু করে জনগণকে বুঝাতে সক্ষম হয়েছিল।

বিনা বিচারে কাউকে বন্দি করে রাখা অন্যায়। ফলে রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তির আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠেছিল। প্রগতিশীল যুবক কর্মীরাও আওয়ামী লীগে যোগদান করতে আরম্ভ করছিল। ১৯৫৩ সালের মাঝামাঝি পূর্ব বাংলায় সাধারণ নির্বাচন হবে ঘোষণা করা হল। আওয়ামী লীগ ও মুসলিম লীগের মধ্যেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ রইল না। 'গণতান্ত্রিক দল' নামে একটা রাজনৈতিক দল করা হয়েছিল, তা কাগজপত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। জনাব এ. কে. ফজলুল হক সাহেব তখন পর্যন্ত এডভোকেট জেনারেল ছিলেন ঢাকা হাইকোর্টের। পাকিস্তান হওয়ার পরে আর তিনি কোনো রাজনীতি করেন নাই। ১৯৫৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি এডভোকেট জেনারেলের পদ থেকে পদত্যাগ করে মুসলিম লীগে যোগদান করেন। মুসলিম লীগের মধ্যে তখন কোন্দল শুরু হয়েছিল ভীষণভাবে। মোহন মিয়া সাহেব নূরুল আমিন সাহেবের বিরুদ্ধে গ্রুপ সৃষ্টি করেন এবং হক সাহেবকে মুসলিম লীগের সভাপতি করতে চেষ্টা করে পরাজিত হন। কার্জন হলে দুই গ্রুপের মধ্যে বেদম মারপিটও হয়। নূরুল আমিন সাহেবের দলই জয়লাভ করে, ফলে মোহন মিয়া ও তাঁর দলবল লীগ থেকে বিতাড়িত হলেন।

এরপর আমি হক সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে আওয়ামী লীগে যোগদান করতে অনুরোধ করলাম। চাঁদপুরে আওয়ামী লীগের এক জনসভায় তিনি যোগদানও করলেন। সেখানে ঘোষণা করলেন, "যাঁরা চুরি করবেন তাঁরা মুসলিম লীগে থাকুন, আর যাঁরা ভাল কাজ করতে চান তাঁরা আওয়ামী লীগে যোগদান করুন।" আমাকে ধরে জনসভায় বললেন, "মুজিব যা বলে তা আপনারা শুনুন। আমি বেশি বক্তৃতা করতে পারব না, বুড়া মানুষ।" এ বক্তৃতা খবরের কাগজেও উঠেছিল।

এই সময় আওয়ামী লীগের মধ্যে সেই পুরাতন গ্রুপ যুক্তফ্রন্ট করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আবদুস সালাম খান, ময়মনসিংহের হাশিমউদ্দিন ও আরও কয়েকজন এজন্য প্রচার শুরু করলেন। এদিকে তথাকথিত প্রগতিশীল এক গ্রুপও বিরোধী দলের ঐক্য হওয়া উচিত বলে চিৎকার আরম্ভ করলেন। অতি প্রতিক্রিয়াশীল ও অতি প্রগতিবাদীরা এই জায়গায় একমত হয়ে গেল। কোনো বিরোধী রাজনৈতিক দল তখন ছিল না—একমাত্র আওয়ামী লীগ ছাড়া—যার নাম জনসাধারণ জানে। ভাসানী সাহেব ও আমি পরামর্শ করলাম, কি করা যায়! তিনি আমাকে পরিষ্কার ভাষায় বলে দিলেন, যদি হক সাহেব আওয়ামী লীগে আসেন তবে তাঁকে গ্রহণ করা হবে এবং উপযুক্ত স্থান দেওয়া যেতে পারে। আর যদি অন্য দল করেন তবে কিছুতেই তাঁর সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট করা চলবে না। যে লোকগুলি মুসলিম লীগ থেকে বিতাড়িত হয়েছে তারা এখন হক সাহেবের কাঁধে ভর করতে চেষ্টা করছে। তাদের সাথে আমরা কিছুতেই মিলতে পারি না। মুসলিম লীগের সমস্ত কুকার্যের সাথে এরা ১৯৫৩ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জড়িত ছিল। এরা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার বিরোধিতাও করেছে। মওলানা সাহেব আমাদের অনেকের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। আমাকে বলে দিয়েছেন, আওয়ামী লীগ সদস্যদের মধ্যে যেন যুক্তফ্রন্ট সমর্থকরা মাথা তুলতে না পারে।

ওয়ার্কিং কমিটির সভায় এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হল। বেশি সংখ্যক সদস্যই যুক্তফ্রন্টের বিরোধী। কারণ, যাদের সাথে নীতির মিল নাই, তাদের সাথে মিলে সাময়িকভাবে কোনো ফল পাওয়া যেতে পারে, তবে ভবিষ্যতে ঐক্য থাকতে পারে না। তাতে দেশের উপকার হওয়ার চেয়ে ক্ষতিই বেশি হয়ে থাকে। আওয়ামী লীগের মধ্যে যারা এই একতা চাচ্ছিল, তাদের উদ্দেশ্য মুসলিম লীগকে পরাজিত করা এবং ক্ষমতায় যে কোনোভাবে অধিষ্ঠিত হওয়া। ক্ষমতায় না গেলে চলে কেমন করে, আর কতকাল বিরোধী দল করবে!

অতি প্রগতিবাদীদের কথা আলাদা। তারা মুখে চায় ঐক্য। কিন্তু দেশের জাতীয় নেতাদের জনগণের সামনে হেয়প্রতিপন্ন করতে এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি যাতে জনগণের আস্থা হারিয়ে ফেলে, চেষ্টা করে সেজন্য। তাহলেই ভবিষ্যতে জনগণকে বলতে পারে যে, এ নেতাদের ও তাদের দলগুলি দ্বারা কোনো কাজ হবে না। এরা ঘোলা পানিতে মাছ ধরবার চেষ্টা করতে চায়।

মুসলিম লীগ জনগণের আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। এই দলটার কোনো নীতির বালাই নাই। ক্ষমতায় বসে করে নাই এমন কোন জঘন্য কাজ নাই। পরিষ্কারভাবে জনগণ ও পূর্ব বাংলার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এই দল হতে যে লোকগুলি বিতাড়িত হয়েছিল তারা এই জঘন্য দলের সভ্যদের মধ্যেও টিকতে পারে নাই। এরা কতটুকু গণবিরোধী হতে পারে ভাবতেও কষ্ট হয়। এরা নীতির জন্য বা আদর্শের জন্য মুসলিম লীগ ত্যাগ করে নাই, ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল ক্ষমতার লড়াইয়ে পরাজিত হয়ে। এই বিতাড়িত মুসলিম লীগ সভ্যরা পাকিস্তান হওয়ার পরে একদিনের জন্যও সরকারের অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করে নাই। এমনকি সরকার থেকে সুযোগ-সুবিধাও গ্রহণ করেছে। তারা চেষ্টা করতে লাগল যাতে হক সাহেবের জনপ্রিয়তাকে ব্যবহার করে আওয়ামী লীগের সাথে দরকষাকষি করতে পারে।

হক সাহেব আওয়ামী লীগে যোগদান করবেন ঠিক করে ফেলেছিলেন। এমনকি অনেকের কাছে বলেওছিলেন। এই লোকগুলি হক সাহেবের ঘাড়ে সওয়ার হয়ে তাঁকে বোঝাতে লাগল, আলাদা দল করে যুক্তফ্রন্ট করলে সুবিধা হবে। আওয়ামী লীগ তাঁকে উপযুক্ত স্থান দিবে না। সোহরাওয়ার্দী সাহেব তাঁকে প্রধানমন্ত্রী নাও করতে পারেন, এমনই নানা কথা। তাদের নিজের দল হলে আওয়ামী লীগ বাধা দিলেও মুসলিম লীগের সাথে মিলতে পারবে নির্বাচনের পরে। মুসলিম লীগও কিছু আসন নির্বাচনে দখল করতে পারবে। প্রথমে আওয়ামী লীগের সাথে মিলে নির্বাচন করে নেওয়া যাক, তারপর দেখা যাবে। পথ খোলা থাকলে যে কোনো পন্থা অবলম্বন করা যাবে। যদিও হক সাহেবকে আমরা জানিয়ে দিয়েছিলাম, তিনি পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক আইন পরিষদে আওয়ামী লীগের নেতা হবেন, শহীদ সাহেব পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় আইনসভার নেতা থাকবেন।

এই সময় ভাসানী সাহেব আমাকে চিঠি দিলেন আওয়ামী লীগ কাউন্সিল সভা ডাকতে ময়মনসিংহে। আমার সাথে তিনি এই সম্বন্ধে আগে কোনো পরামর্শ করেন নাই। ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগ সেক্রেটারি হাশিমউদ্দিন যুক্তফ্রন্ট চায়। আমি তাঁকে পছন্দ করতাম

না, তা তিনি জানতেন। গোপনে গোপনে সালাম সাহেবের সাথে মিশে তিনি কিছু ষড়যন্ত্রও করতেন। আমার সমর্থক ময়মনসিংহ জেলার বিশিষ্ট কর্মী রফিকউদ্দিন ভুঁইয়া ও হাতেম আলী তালুকদার ও আরও অনেকে তখনও কারাগারে বন্দি।

মওলানা ভাসানীর খেলা বোঝা কষ্টকর। ময়মনসিংহ কনফারেন্সে বেশ একটা বোঝাপড়া হবে বলে আমি ধারণা করলাম। তবু আমি কনফারেন্স ডেকে বলে দিলাম, সভাপতি হিসাবে মওলানা ভাসানী আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন সভা ডাকতে। শহীদ সাহেবকে দাওয়াত করা হল এবং তাঁকে সভায় উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করা হল। শহীদ সাহেব আমাকে জানিয়ে দিলেন সভার দুই দিন পূর্বে তিনি ঢাকায় পৌঁছাবেন। সমস্ত জেলায় জেলায় আমি চিঠি পাঠিয়ে দিলাম। হাশিমউদ্দিন সাহেবকে নির্দেশ দিলাম, সমস্ত কাউন্সিলারদের থাকার বন্দোবস্ত করতে এবং হোটেল ঠিক করতে যেখানে সদস্যরা নিজেদের টাকা দিয়েই খাবে। যদিও জেলা কমিটির উচিত ছিল বাইরের জেলার সদস্যদের খাবার ব্যবস্থা করা।

আবুল মনসুর আহমদ সাহেব জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি। তিনি সকল কিছুই ছেড়ে দিয়েছেন হাশিমউদ্দিন সাহেবের কাছে। আমি যে সেখানে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের অফিস করব সে বন্দোবস্ত করা হয় নাই। সমস্ত জেলায় খবর দেওয়া হয়েছে যেন সকলে উপস্থিত থাকে। আমার জানা আছে যেখানে সভা হোক না কেন শতকরা দশ ভাগ ভোটও আমার মতের বিরুদ্ধে যাবে না। অনেক জেলার কর্মীদের জন্য থাকবার বন্দোবস্ত করা হয় নাই। এই অবস্থায় আবদুর রহমান সিদ্দিকী নামে একজন কর্মীর সাহায্য পেয়েছিলাম। ছোট ছোট হোটেল ভাড়া করে বিভিন্ন জেলার সভ্যদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

সভার তিন-চার দিন পূর্বে মওলানা সাহেব খবর দিলেন, তিনি সভায় উপস্থিত হতে পারবেন না। কিন্তু কেন সে কারণ কিছুই জানান নাই। আমি জানতাম, কোনো রকম বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় তিনি সরে থাকতে চেষ্টা করতেন। আমি ও খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস বাধ্য হয়ে রওয়ানা করলাম তাঁকে ধরে আনতে বগুড়া জেলার পাঁচবিবি গ্রাম হতে। সময়ও খুব অল্প, অনেক কাজ পড়ে আছে। বিভিন্ন জেলার কর্মীদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। পার্টির যুক্তফ্রন্ট সমর্থকরা লোক পাঠিয়েছে বিভিন্ন জেলায়। খোন্দকার মোশতাক আহমদও যুক্তফ্রন্ট সমর্থক। ইলিয়াস ও আমি বাহাদুরাবাদ ঘাট পার হয়ে ফুলছড়ি ঘাটে ট্রেনে উঠেছি, এমন সময় বগুড়া থেকে একটা ট্রেন আসল। আমি দেখলাম, মওলানা সাহেবের মত একজন লোক দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় বসে আছেন। ইলিয়াসকে বললাম, "দেখ তো কে?" ইলিয়াস উঁকি দিয়ে বলল, "ঐ তো মওলানা সাহেব।" আমাদের ট্রেন ছাড়ার সময় হয়েছে। তাড়াতাড়ি মালপত্র নিয়ে নেমে পড়লাম এবং মওলানা সাহেবের কাছে পৌঁছালাম। তিনি বেশি কোনো কথা না বলে হাঁটতে লাগলেন, আমরাও তাঁর সাথে হাঁটতে লাগলাম এবং হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞাসা করলাম, "ব্যাপার কি? আপনি সভা ডাকতে বললেন, এখন আবার উপস্থিত হবেন না কেন?" তিনি বললেন, "তোমরা জান না, ঐক্যফ্রন্ট করবার জন্য তোমাদের নেতারা পাগল হয়ে গেছে। আমি কিছুতেই ঐ সমস্ত নীতিছাড়া

নেতাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হতে চাই না। আওয়ামী লীগের কাউন্সিলে যুক্তফ্রন্ট করার সংখ্যা বেশি। ভোটে পারা যাবে না। আমি আর রাজনীতি করব না। আমার তো কিছুই নাই। আমি তো নির্বাচনে দাঁড়াব না। কারও ক্যানভাস করতেও পারব না, তাই আর রাজনীতি করার ইচ্ছা নাই। কাউন্সিল সভায় যোগদানও করতে পারব না।" আমি রাগ করে তাঁকে বললাম, "আপনি তো আমাদের সাথে পরামর্শ না করে ময়মনসিংহে কাউন্সিল সভা ডাকতে বলেছেন, কাউন্সিল সভা তো আরও কিছুদিন পরে ঢাকায় ডাকার কথা ছিল। তবে কাউন্সিলের মতামত আপনি জানেন না। আপনিও ইচ্ছা করলে ঐক্যফ্রন্ট করার পক্ষে প্রস্তাব পাস করাতে পারবেন কি না সন্দেহ! আওয়ামী লীগের সভ্যরা বিতাড়িত মুসলিম লীগ নেতাদের কাছে বহু অত্যাচার সহ্য করেছে এবং তারা জানে এরা বিরোধী দল করতে আসে নাই। আওয়ামী লীগের কাঁধে পাড়া দিয়ে ইলেকশন পাস করতে চায়, তারপর তাদের পথ বেছে নেবে। আপনি যদি উপস্থিত না হন তবে আমি টেলিগ্রাম করে সভা বন্ধ করে দিয়ে এই পথেই বাড়ি চলে যাব।"

মওলানার সঙ্গে আলাপ করতে করতে চরের ভিতর দিয়ে 'পদ্দারের চর' নামে একটা গ্রামে পৌঁছালাম এবং তাঁর এক মুরিদ মুসা মিয়ার বাড়িতে পৌঁছালাম। মুসা মিয়া খুবই গরিব মানুষ, মাত্র ছোট্ট ছোট্ট দুইখানা কুঁড়েঘর তার সম্বল। একটা গাছতলায় আমাদের সুটকেস ও বিছানা নিয়ে একটা মাদুরের উপর বসে পড়লাম। ভদ্রলোক আমাদের নিয়ে মহাবিপদে পড়লেন। কি যে করবেন বুঝতে পারেন না। গরিব হতে পারেন, কিন্তু এত বড় প্রাণ আমার জীবনে খুবই কম দেখেছি। ট্রেন নাই ঢাকায় ফিরে যাবার। ভাসানী সাহেবও কিছু বলছেন না। রাতে সেখানে থাকতে হবে। মুসা মিয়ার বোধহয় যা কিছু ছিল তা ব্যয় করে আমাদের জন্য খাবার ব্যবস্থা করলেন। দেড় মাইল দূরে ফুলছড়ি ঘাটে লোক পাঠিয়ে আমাদের জন্য চায়ের বন্দোবস্তও করলেন। রাতে তার এক পাশের বাড়িতে—সেও মওলানা সাহেবের ভক্ত, সেখানে কাটালাম। তার বাড়িতে একটা ছোট আলাদা ঘর ছিল। মওলানা সাহেবের সাথে নরম গরম আলাপ হওয়ার পরে তিনি সভায় আসবেন বলে দিলেন। ইলিয়াসও মওলানা সাহেবের সাথে অনেক আলোচনা করল। পরের দিন সকালে আমরা দুইজন রওয়ানা করে ফিরে আসলাম। মোহাম্মদউল্লাহ সাহেব, কোরবান আলী, হামিদ চৌধুরী, মোল্লা জালালউদ্দিন পূর্বেই পৌঁছে গিয়েছে। শহীদ সাহেবকে অভ্যর্থনা করবার জন্য ঢাকায় আসতে হল। তাঁকে নিয়ে ময়মনসিংহে পৌঁছালাম। আওয়ামী লীগ অফিস করবার জন্য কোন স্থান না পেয়ে হামিদ, জালাল ও মোহাম্মদউল্লাহ আজিজুর রহমান সাহেবের বাসায় একটা কামরা নিজেরাই ঠিক করে নিয়েছিল। আমার একলার জন্য থাকার বন্দোবস্ত করেছিল হাশিমউদ্দিনের বাড়িতে। আমি কেমন করে অন্যান্য কর্মকর্তাদের রেখে হাশিমউদ্দিন সাহেবের বাড়িতে থাকি? পূর্বে যখন গিয়েছি, আমি হাশিমউদ্দিন সাহেবের বাড়িতেই থাকতাম। খালেক নেওয়াজ, শামসুল হক, রশিদ ময়মনসিংহের বিশিষ্ট কর্মী, তারা হাশিমউদ্দিনকে পছন্দ না করলেও আমাকে ভালবাসত। তাদের সাহায্যও পেলাম কাউন্সিলারদের থাকার বন্দোবস্ত করতে। অলকা সিনেমা হলে সম্মেলন হবে। রাতে

আমি খবর পেলাম, হাশিমউদ্দিন বাইরের লোক হলের মধ্যে পূর্বেই নিয়ে রাখবে অথবা আওয়ামী লীগ কাউন্সিলার নামেও কিছু বাইরের লোক নিবে যাতে তারা সংখ্যাগুরু হতে পারে।

আমি ভোর পাঁচটায় আবুল মনসুর আহমদ সাহেবকে এ বিষয়ে জানালাম এবং বললাম, "তাকে নিষেধ করবেন এ সমস্ত করতে। কারণ গোলমাল হলে লোকে মন্দ বলবে।" আবুল মনসুর সাহেব বললেন, "আমি তো কিছুই জানি না, তবে দেখব।" আমি সকালবেলায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিলাম, এক একজন সেক্রেটারি এক একটা দরজায় থাকবে এবং তাদের প্রত্যেকের সাথে আটজন করে কর্মী থাকবে। আমার দস্তখত করা কার্ড ছাড়া কাউকে ভিতরে যেতে দেওয়া হবে না। বিভিন্ন জেলা থেকে ভাল ভাল যুবক কর্মীদের গেটে থাকতে নির্দেশ দিলাম। ফল ভালই হল; বাইরের লোক কেউই ভেতরে যেতে পারল না। কেউ কেউ কয়েকবার চেষ্টা করেছে, লাভ হয় নাই। কর্মীদের মনোভাব দেখে আর অগ্রসর হতে সাহস পায় নাই। আমি সেক্রেটারির রিপোর্ট পেশ করলাম। শহীদ সাহেব ও ভাসানী সাহেব বক্তৃতা করলেন। আমার যতদূর মনে হয় বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ পেয়ে মিয়া ইফতিখারউদ্দিন সভায় যোগদান করেছিলেন; শেষে তিনি বক্তৃতাও করলেন। 'বৈদেশিক নীতি ও যুক্তফ্রন্ট' এই দুইটা বিষয় নিয়ে খুবই আলোচনা হল। সাবজেক্ট কমিটিও বসেছিল, কিন্তু কোনো মীমাংসা হল না। আমি কাউন্সিল সভায় বৈদেশিক নীতির উপর প্রস্তাব আনলাম। আওয়ামী লীগের বৈদেশিক নীতি হবে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ। আবদুস সালাম খান এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বক্তৃতা করলেন এবং অতি প্রগতিবাদী বলে আমাকে আক্রমণ করলেন। আমি তাঁকে অতি প্রতিক্রিয়াশীল বলে যথোপযুক্ত জবাব দিলাম। প্রস্তাব পাস হয়ে গেল, অবস্থা দেখে তিনি আর তোটাভুটি চাইলেন না।

এর পরই শুরু হল মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলির ঐক্যফ্রন্ট করা হবে কি হবে না সেই বিতর্ক! ঐক্যফ্রন্ট সমর্থকরা প্রস্তাব আনলেন, আমি বিরোধিতা করে বক্তৃতা করে জিজ্ঞাসা করলাম, "আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্য বিরোধী কোনো দল আছে কি না? যাদের নীতি ও আদর্শ নাই তাদের সাথে ঐক্যফ্রন্ট করার অর্থ হল কতকগুলি মরা লোককে বাঁচিয়ে তোলা। এরা অনেকেই দেশের ক্ষতি করেছে। রাজনীতি এরা ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য করে, দেশের কথা ঘুমের ঘোরেও চিন্তা করে না।" আমার বক্তৃতায় একটু ভাবপ্রবণতা ছিল। কারণ এদের মধ্যে অনেকে ১৯৪৮, ১৯৫২ সালের বাংলা ভাষা আন্দোলনকে দমাবার জন্য সকল রকম চেষ্টা করেছে। লীগ সরকার আমাদের দিনের পর দিন কারাগারে বিনা বিচারে বন্দি করে রেখেছিল। ভাসানী সাহেবও ঐক্যফ্রন্টের খুব বিরোধী, শহীদ সাহেবও বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছিলেন না। ঐক্যবাদীরা একটু ঘাবড়িয়ে গেল। তবে আতাউর রহমান সাহেব ও আমি একমত, 'যুক্তফ্রন্ট চাই না'—এ প্রস্তাব হওয়া উচিত না। জনগণ মনে করবে আওয়ামী লীগই একতা চায় না। আমি আমার বন্ধুদের কাছে জিজ্ঞাসা করলাম, তারা কি কারও কাছ থেকে প্রস্তাব পেয়েছেন যে, গায়ে পড়ে প্রস্তাব করতে চান? যুক্তফ্রন্টের

প্রস্তাব আসলে ভোটে পরাজিত হয়ে যেত। শেষ পর্যন্ত অবস্থা বিবেচনা করে শহীদ সাহেব ও ভাসানী সাহেবকে তার দেওয়া হল, তাঁরা যা ভাল বিবেচনা করেন তাই করবেন। তবে দুইজনের একমত হতে হবে এবং ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের সাথে আলোচনা করবেন, যখন এ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। আমার বন্ধুরা জানতেন, শহীদ সাহেব ও ভাসানী সাহেব দুইজনই ঐ সমস্ত লোকদের অনেককে পছন্দ করেন না। শহীদ সাহেব ও ভাসানী সাহেব পরিষ্কার ভাষায় বলে দিলেন, যদি ফজলুল হক সাহেব আওয়ামী লীগে আসেন তাঁকে তারা মাথা পেতে গ্রহণ করবেন এবং পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী বানাবার চেষ্টা করবেন। পূর্ব বাংলা আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি দলের নেতাও তিনি হবেন। শহীদ সাহেব আমাকে বলেছিলেন, "বৃদ্ধ নেতা, বহু কাজ করেছেন জীবনে, শেষ বয়সে তাঁকে একবার সুযোগ দেওয়া উচিত দেশ সেবা করতে।"

মওলানা ভাসানী আমাকে বলে দিলেন, তিনি যুক্তফ্রন্ট করবেন না। হামিদুল হক চৌধুরী ও মোহন মিয়ার সাথে একসাথে রাজনীতি করার কোনো কথাই ওঠে না। নূরুল আমিন সাহেব যে দোষে দোষী এরাও সেই দোষেই দোষী। আমাকে নির্বাচন অফিস করা এবং কাকে নমিনেশন দেওয়া হবে সে সকল বিষয়ে সবকিছু ঠিক করার জন্য নির্দেশ দিলেন। আমি মওলানা সাহেবকে বললাম, "আওয়ামী লীগ নির্বাচনে জয়লাভ করবে, ভয়ের কোনো কারণ নাই। আর যদি সংখ্যাগুরু না হতে পারি আইনসভায় আওয়ামী লীগই বিরোধী দল হয়ে কাজ করবে। রাজনীতি স্বচ্ছ থাকবে, জগাখিচুড়ি হবে না। আদর্শহীন লোক নিয়ে ক্ষমতায় গেলেও দেশের কাজ হবে না। ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধার হতে পারে।" মওলানা সাহেব একমত হলেন, আমাকে বিভিন্ন জেলায় সভার ব্যবস্থা করতে বললেন। তিনি ও আমি প্রত্যেক জেলায় ও মহকুমায় ঘুরব, কোথায় কাকে নমিনেশন দেওয়া হবে ঠিক করব। শহীদ সাহেবও কয়েকদিনের মধ্যে করাচি থেকে ফিরে আসবেন এবং সমস্ত নির্বাচনের ভার নিবেন। আওয়ামী লীগের একটা জিনিসেরই অভাব ছিল, সেটা হল অর্থবল। তবে নিঃস্বার্থ এক বিরাট কর্মীবাহিনী ছিল, যাদের মূল্য টাকায় দেওয়া যায় না। টাকা বেশি দরকার হবে না, প্রার্থীরা যে যা পারে তাই খরচ করবে। জনমত আওয়ামী লীগের পক্ষে।

সালাম সাহেব কিন্তু হাল ছাড়েন নাই। তিনি তখন কিছুটা কনসাস্সকিপার হয়ে পড়েছিলেন হক সাহেবের। হক সাহেব রাতারাতি নিজের দল সৃষ্টি করলেন। তার নাম দিলেন, কৃষক শ্রমিক দল। দেশে কোথাও কোনো সংগঠন নাই, কয়েকজন লীগ থেকে বিতাড়িত নেতা হামিদুল হক চৌধুরী সাহেব ও মোহন মিয়ার নেতৃত্বে আর কিছু পুরানা হক সাহেবের ভক্ত এসে জুটল। এরা রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে সংসার ধর্ম পালন করছিলেন। কারণ, এরা প্রায়ই পাকিস্তান আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন। জনাব আবুল হাশিম সাহেবও হক সাহেবকে পরামর্শ দিয়েছিলেন আওয়ামী লীগে যোগদান না করে নিজের দল সৃষ্টি করতে। সালাম সাহেবও হক সাহেবকে আওয়ামী লীগে যোগদান করার জন্য বেশি জোর দেন নাই। কারণ, আওয়ামী লীগে সালাম সাহেবের অবস্থা ভাল ছিল না। সালাম

সাহেব আমাকে একদিন বললেন, "আর কত কাল বিরোধী দল করা যায়, ক্ষমতায় না গেলে জনসাধারণের আস্থা থাকবে না। যেভাবে হয় ক্ষমতায় যেতে হবে। যুক্তফ্রন্ট করলে নিশ্চয়ই ক্ষমতায় যেতে পারব।" এই কথার উত্তরে আমি তাঁকে বলেছিলাম, "ক্ষমতায় যাওয়া যেতে পারে, তবে জনসাধারণের জন্য কিছু করা সম্ভব হবে না, আর এ ক্ষমতা বেশি দিন থাকবেও না। যেখানে আদর্শের মিল নাই সেখানে ঐক্যও বেশি দিন থাকে না।" তিনি একমত হতে পারেন নাই। তাঁকে নিয়ে বিপদ, কারণ ক্ষমতায় তাঁর যেতেই হবে, যেভাবে হোক। তাঁর ধারণা, আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠ হলে তিনি নেতা হতে পারবেন না, তার চেয়ে হক সাহেবের সঙ্গে থাকলে তাঁর নেতৃত্ব মানতে আপত্তি হবে না। হক সাহেবকে আওয়ামী লীগে আনতে কেউ তো আপত্তি করে নাই। তবে যেসব লোক তাঁর সঙ্গে জুটেছে তারা হক সাহেবের সর্বনাশ করবে এবং সাথে সাথে দেশের এবং আওয়ামী লীগেরও সর্বনাশ করবে এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ আমার ছিল না। তাই আমি বিরোধিতা করতে লাগলাম। যুক্তফ্রন্ট করবার পক্ষে জনমত সৃষ্টি কিছুটা হয়েছিল সত্য, কিন্তু সেটা ভাবাবেগের উপর। জনসাধারণ মুসলিম লীগের হাত থেকে বাঁচবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। মুসলিম লীগ ও আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্য কোনো দলের নাম জনসাধারণ জানত না।

শহীদ সাহেবও সভা করতে আরম্ভ করলেন। তিনি জানতেন, যুক্তফ্রন্ট হলে কি হবে! অতটা ব্যস্ত তিনি ছিলেন না। একদিন শহীদ সাহেব ও ভাসানী সাহেব আলাপ করছিলেন, আমিও তাঁদের সাথে ছিলাম। এ সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত আমি বলেছিলাম, "ইলেকশন এলায়েন্স করলে করা যেতে পারে। যেখানে হক সাহেবের দলের ভাল লোক থাকবে, সেখানে আওয়ামী লীগ নমিনেশন দিবে না। আর যেখানে আওয়ামী লীগের ভাল নমিনি থাকবে সেখানে তারা নমিনেশন দিবেন না। যার যার পার্টির প্রোগ্রাম নিয়ে ইলেকশন করবে।" ভাসানী সাহেব তাতেও রাজি নন। তিনি বললেন, "আওয়ামী লীগ এককভাবে ইলেকশন লড়বে। আমাকে কাজ চালিয়ে যেতে বললেন। ১৯৫৩ সালের নভেম্বর মাস হবে, শহীদ সাহেব ভাসানী সাহেব ও আমাকে বললেন, করাচি যেতে হবে কয়েকদিনের জন্য; কিছু টাকার জোগাড় করতে হবে। এবার ফিরে এসে আর পশ্চিম পাকিস্তানে যাবেন না ইলেকশন শেষ না করে—তাও বললেন।

মওলানা সাহেব ও আমি জেলায় জেলায় সভা করতে বের হয়ে গেলাম। শহীদ সাহেব যেদিন ঢাকা আসবেন তার দু'একদিন পূর্বে আমরা ঢাকায় পৌঁছাব। এবার আমরা উত্তরবঙ্গ সফরে রওয়ানা করলাম। উত্তরবঙ্গ সফর শেষ করে কুষ্টিয়া জেলায় তিনটা সভা করে ঢাকায় পৌঁছাব। খুবই ভাল সাড়া পেলাম। কোথায় কাকে নমিনেশন দেওয়া হবে সে বিষয়ে সুপারিশ করার জন্য জেলা কর্মকর্তাদের জানিয়ে দিলাম। তারা নাম ঠিক করে আমাকে জানাবে। যাদের জেলা কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে সুপারিশ করবে তাদের মনোনয়ন দেওয়া হবে। যেখানে একমত হতে পারবে না, সেখানে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রার্থী মনোনীত করবে। তবে শহীদ সাহেব ও ভাসানী সাহেব একমত হয়ে যাকে ইচ্ছা

তাকে নমিনেশন দিতে পারবেন। যেদিন ভাসানী সাহেব ও আমি কুষ্টিয়া পৌঁছালাম সেইদিনই টেলিগ্রাম পেলাম, আতাউর রহমান সাহেব ও মানিক মিয়া আমাদের দুইজনকে ঢাকায় যেতে অনুরোধ করেছেন। আমি রাতে আতাউর রহমান খান সাহেবের কাছে টেলিফোন করলাম কুষ্টিয়া থেকে। তিনি জানালেন, সভা বন্ধ করে দিয়ে ফিরে আসতে। আমি তাঁকে বুঝিয়ে বললাম যে, আগামীকাল সভা, এখন বন্ধ করলে কর্মীরা মার খাবে। পার্টির অবস্থাও খারাপ হয়ে যাবে। খান সাহেব পীড়াপীড়ি করলেন। তখন আমি তাঁকে বুঝিয়ে বললাম, মওলানা সাহেবকে পাঠিয়ে দিতেছি আজ, আমি সভাগুলিতে বক্তৃতা করে তিন দিন পরেই পৌঁছাব। তিনি রাজি হলেন। আতাউর রহমান সাহেবও আমাদের সাথে প্রথমে একমত ছিলেন যে, যুক্তফ্রন্ট করা উচিত হবে না। দুঃখের বিষয়, তাঁর নিজের কোনো মতামত বেশি সময় ঠিক থাকে না। যে যা বলে, তাতেই তিনি হ্যাঁ, হ্যাঁ করেন। এক কথায়, "তাঁর হাত ধরলে, তিনি না বলতে পারেন না।" মওলানা সাহেব ঢাকায় রওয়ানা করে গেলেন। আমি মিটিংগুলি শেষ করে রওয়ানা হব। এমন সময় খবর পেলাম, হক সাহেব ও মওলানা ভাসানী দস্তখত করে যুক্তফ্রন্ট করে ফেলেছেন।

আমি বুঝতে পারলাম না, ভাসানী সাহেব কি করে দস্তখত করলেন! শহীদ সাহেবের অনুপস্থিতিতে কি প্রোগ্রাম হবে? সংগঠনের কি হবে? নমিনেশন কোন পদ্ধতিতে দেওয়া হবে? কেনই বা মওলানা সাহেব এত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন? কিছুই বুঝতে পারলাম না। ঢাকায় ফিরে এসে ইয়ার মোহাম্মদ খানের বাড়িতে মওলানা সাহেবের সাথে দেখা করতে গেলাম। নিচের কামরায় আওয়ামী লীগের অফিস। অফিসে যেয়ে যখন বসেছি, তখন কর্মীরা আমায় খবর দিল, কিভাবে কি হয়েছে। আবুল মনসুর আহমদ সাহেব বিচক্ষণ লোক সন্দেহ নাই। তিনি ব্যাপারটি বুঝতে পারলেন এবং তাড়াতাড়ি কফিলুদ্দিন চৌধুরীর সাহায্যে একুশ দফা প্রোগ্রামে দস্তখত করিয়ে নিলেন হক সাহেবকে দিয়ে। তাতে আওয়ামী লীগের স্বায়ত্তশাসন, বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা, রাজবন্দিদের মুক্তি এবং আরও কতকগুলি মূল দাবি মেনে নেওয়া হল। আমরা যারা এদেশের রাজনীতির সাথে জড়িত আছি তারা জানি, এই দস্তখতের কোনো অর্থ নাই অনেকের কাছে।

আমি মওলানা সাহেবের সাথে দেখা করতে গেলে তিনি বললেন, "দেখ মুজিব, আমি যুক্তফ্রন্টে দস্তখত করতে আপত্তি করেছিলাম তুমি ফিরে না আসা পর্যন্ত; আতাউর রহমান ও মানিককে আমি বললাম যে, মুজিব সাধারণ সম্পাদক আওয়ামী লীগের, তার সাথে পরামর্শ না করে আমি কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারি না। আতাউর রহমান ও মানিক বলল যে, তারা দুইজনে তোমার দায়িত্ব নিল। আমরা যা করব, মুজিব তা মেনে নেবে। তাই হক সাহেব যখন আমার কাছে এসে আমাকে অনুরোধ করলেন, তখন আমি দস্তখত করতে বাধ্য হলাম।" আমি তাঁকে বললাম, "আমার কথা ছেড়ে দেন, শহীদ সাহেবের জন্য দুই দিন দেরি করলে কি অন্যায় হত? তিনি তো দুই তিন দিনের মধ্যে ঢাকায় আসবেন। পূর্বে আমাকে এক কথা বলেছেন, আজ করলেন তার উল্টা। আমাকে এগিয়ে দিয়ে নিজে দস্তখত করে বসলেন! কোন পন্থায় নমিনেশন হবে? কিভাবে কাজ চলবে?

দায়িত্ব কে নিবে এই নির্বাচনের, কিছুই ঠিক না করে ঘোষণা করে দিলেন 'আমি আর হক সাহেব যুক্তফ্রন্ট করলাম!' যা করেছেন ভালই করেছেন, আমি আর কি করব! আর যখন আতাউর রহমান সাহেব ও মানিক ভাই আমার ভার নিয়েছেন দাবি করে, তখন তাদের কথা আমি ফেলি বা কেমন করে! এতে দেশের যদি মঙ্গল হয় ভাল। আর যদি ক্ষতি হয় আপনারাই দায়ী হবেন, আমি তো পার্টির সেক্রেটারি ছাড়া আর কিছুই না! আপনারা নেতা, যখন যুক্তফ্রন্ট করেছেন—এখন যাতে তা ভালভাবে চলে তার বন্দোবস্ত করুন।" মওলানা সাহেব বললেন, "আমি বলে দিয়েছি, শহীদ সাহেব এসে সকল কিছু ঠিক করবেন। নমিনেশন বা নিয়মকানুন যা করতে হয় তিনিই করবেন।"

আমার মতের বিরুদ্ধে হলেও যখন নেতারা ভাল বুঝে এটা করেছেন তাতে দেশের ভালই হতে পারে। আমি চেষ্টা করতে লাগলাম যাতে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে যুক্তফ্রন্ট চলে। দুই দিন না যেতেই প্রথম খেলা শুরু হল। নামও শুনি নাই এমন দলের আবির্ভাব হল। হক সাহেব খবর দিলেন, 'নেজামে ইসলাম পার্টি' নামে একটা পার্টির সাথে পূর্বেই তিনি দস্তখত করেছেন। তাদেরও যুক্তফ্রন্টে নিতে হবে। আমি মওলানা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, "আমি তো কিছুই জানি না।" আমি বললাম, "ঐ পার্টি কোথায়, এর প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি কারা? সংগঠন কোথায় যে এদের নিতে হবে? এদের নিলে 'গণতান্ত্রিক দল' বলে যে একটা দল কাগজের মারফতে দু'একবার দেখেছি তাদেরও নিতে হবে। এদের মধ্যে তবু দুই চারজন প্রগতিশীল কর্মীও আছে। কিন্তু আমাদের নিজেদের মধ্যে অনেকে গণতান্ত্রিক দলকে নেওয়া হয়, তা চায় না।"

শহীদ সাহেব এসে অফিস ঠিক করলেন। তাঁকে যুক্তফ্রন্টের চেয়ারম্যান করতে কেউই আপত্তি করল না। আওয়ামী লীগ থেকে আতাউর রহমান খান ও কৃষক শ্রমিক পার্টি হতে কফিলুদ্দিন চৌধুরী জয়েন্ট সেক্রেটারি এবং কামরুদ্দিন আহমদকে অফিস সেক্রেটারি করা হল। একটা স্টিয়ারিং কমিটিও করা হল। তিন পার্টির সমসংখ্যক সদস্য নিয়ে বোর্ড করা হল, যারা নমিনেশন দিবেন। শহীদ সাহেবকে চেয়ারম্যান করা হল, আর ঠিক হল সর্বসম্মতিক্রমে নমিনেশন দিতে হবে। কোন রকম তোটাভুটি হবে না। শহীদ সাহেব কার্যাবলি ঠিক করে ফেললেন রাতদিন পরিশ্রম করে। তিনি অফিসের ভিতরেই একটা কামরায় থাকার বন্দোবস্ত করলেন। রাতদিন সেখানেই থেকে সকল কিছু ঠিকঠাক করে কাজ শুরু করলেন। নমিনেশনের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হল। ফর্ম ছাপিয়ে দেওয়া হল, তাতে প্রার্থী কোন পার্টির সদস্য তাও লেখা থাকবে এবং পার্টিকে কপি দিতে হবে। শহীদ সাহেব টাকা পয়সার অভাব অনুভব করতে লাগলেন।

যাঁরা নমিনেশন পাওয়ার জন্য দরখাস্ত করবেন তাঁদের একটা ফি জমা দিতে হবে। নমিনেশন না দিলেও ঐ টাকা ফেরত দেওয়া হবে না। যত লোক নমিনেশনের জন্য দরখাস্ত করেছিল তাতে প্রায় এক লক্ষ টাকার মত জমা পড়েছিল। শহীদ সাহেব নিজে কয়েকটা মাইক্রোফোন জোগাড় করে এনেছিলেন। আমাদের যানবাহন বলতে কিছুই ছিল না। শহীদ সাহেব একটা পুরানা জিপ কিনেছিলেন।

আওয়ামী লীগের প্রার্থীর অভাব ছিল না। প্রত্যেকটা নির্বাচনী এলাকায় আওয়ামী লীগ প্রার্থী ছিল, যারা ১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত নিজ নিজ এলাকায় কাজ করেছে। হক সাহেবের কৃষক শ্রমিক দলের প্রার্থীর অভাব থাকায় বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকা থেকে যারাই ইলেকশন করতে আশা করে তারাই কৃষক শ্রমিক দলে নাম লিখিয়ে দরখাস্ত করেছিল। কোনোদিন রাজনীতি করে নাই, অথবা রাজনীতি ছেড়ে দিয়েছিল অথবা মুসলিম লীগের সভ্য আছে তারা নমিনেশন পাবে না। কিন্তু এমন প্রমাণও আছে প্রথমে মুসলিম লীগে দরখাস্ত করেছে, নমিনেশন না পেয়ে কৃষক শ্রমিক দলে নাম লিখিয়ে নমিনেশন পেয়েছে।

অনেক প্রার্থী—যারা জেল খেটেছে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে, তাদের নমিনেশন দেওয়া যায় নাই; যেমন চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের সম্পাদক এম. এ. আজিজকে নমিনেশন দেওয়া যায় নাই। তার পরিবর্তে একজন ব্যবসায়ীকে নমিনেশন দেওয়া হয়েছিল। খোন্দকার মোশতাক আহমদের মত জেলখাটা কর্মীকেও নমিনেশন দেওয়া হয় নাই। নোয়াখালীর আবদুল জব্বার খদ্দর প্রথম থেকেই আওয়ামী লীগ করেছেন, তাঁকেও বাদ দিতে হয়েছিল। নেজামে ইসলাম দল কয়েকজন মওলানা সাহেবের নাম নিয়ে এসেছে, তারা দরখাস্তও করে নাই। তাদের সব কয়জনকে নমিনেশন দিতে হবে। এই দল একুশ দফায় দস্তখতও করে নাই। তবে এই দলের প্রতিনিধি একটা লিস্ট দাখিল করলেন, যাদের নমিনেশন দেওয়া যাবে না। কারণ তারা সকলেই নাকি কমিউনিস্ট। এরা কিছু আওয়ামী লীগের জেলখাটা সদস্য আর কিছু কিছু গণতান্ত্রিক দলের সদস্য। এর প্রতিবাদে আমি বললাম, "আমারও একটা লিস্ট আছে, তাদের নমিনেশন দেওয়া হবে না, কারণ এরা পাকিস্তানের বিরোধিতা করেছে।"

এদের দাবি এমন পর্যায়ে চলে গেল যে নিঃস্বার্থ কর্মী ও নেতাদের নমিনেশন না দিয়ে যারা মাত্র চার-পাঁচ মাস পূর্ব পর্যন্ত মুসলিম লীগ করেছে অথবা জীবনে রাজনীতি করে নাই, তাদেরই নমিনেশন দিতে হবে। মাঝে মাঝে হক সাহেবের কাছ থেকে ছোট্ট ছোট্ট চিঠিও এসে হাজির হয়। তাঁর চিঠিকে সম্মান না করে পারা যায় না। আবার কৃষক শ্রমিক পার্টি ও নেজামে ইসলামের স্টিয়ারিং কমিটির সদস্যরা সভা ছেড়ে উঠে চলে যায়, হক সাহেবের সাথে পরামর্শ করার কথা বলে। এইভাবে চলতে লাগল। মওলানা ভাসানী সাহেবকে অনেক কষ্ট করে ঢাকায় আনলাম। তিনি এসেই আবার বাইরে চলে যেতে চাইলেন। আমরা তাঁকে সব কথা বললাম। তিনি উত্তর দিলেন, "ঐ সমস্ত লোকের সাথে কি করে কাজ করা যায়, আমি এর ধার ধারি না। তোমাদের যুক্তফ্রন্ট মানি না। আমি চললাম।" আমার সাথে খুবই কথা কাটাকাটি হল। তাঁকে বললাম, "নমিনেশন নিয়ে আলোচনার সময় অন্য দলের লোকেরা আলোচনা করতে চলে যায় হক সাহেবের কাছে, আর আমরা কোথায় যাই? শহীদ সাহেব তো চেয়ারম্যান, তিনি তো পক্ষ অবলম্বন করতে পারেন না। আপনি ঢাকায় থাকেন, আগামীকাল শহীদ সাহেবের সাথে আপনার আলোচনা হওয়া দরকার।" তিনি চুপ করে রইলেন। আমাকে তাড়াতাড়ি সভায় যেতে হবে। আতাউর রহমান সাহেবও চুপ করে থাকেন। আমাকেই সকল সময় তর্ক বিতর্ক করতে হয়।

পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠার চিত্রলিপি

প্রত্যেকটা প্রার্থীর খবরাখবর নিতে হয়। কফিলুদ্দিন চৌধুরী সাহেব কৃষক শ্রমিক পার্টির সদস্য হলেও তাঁর দলের নেতাদের ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। তিনি আওয়ামী লীগের ভাল প্রার্থী হলে তাকে সমর্থন করতেন। তাই তার উপরে ক্ষেপে গিয়েছে তাঁর দলের লোকেরা। আতাউর রহমান সাহেবও ক্ষেপে যেয়ে অনেক সময় বলতেন, "এদের সাথে কথা বলতে আমার ঘৃণা করে।"

মওলানা সাহেব আবার ঢাকা ত্যাগ করলেন কাউকেও কিছু না বলে। আমি খবর পেয়ে রেলস্টেশনে তাঁহার সাথে দেখা করতে পেরেছিলাম। ঢাকায় থাকার জন্য অনেক অনুরোধ করলাম, তিনি শুনলেন না। এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যে যুক্তফ্রন্ট ভেঙে যায় যায়, শুধু শহীদ সাহেবের ধৈর্য, সহনশীলতা ও বিচক্ষণতা যুক্তফ্রন্টকে রক্ষা করতে পেরেছিল।

⁕

তিন চারটা জেলায় তখনও নমিনেশন দেওয়া হয় নাই। আমাকে ঢাকা ত্যাগ করতে হল, কারণ আমার নমিনেশনের কাগজ দাখিল করতে হবে গোপালগঞ্জ ইলেকশন অফিসে। মাত্র একদিন সময় থাকতে রওয়ানা করলাম। আমি না থাকার জন্য এই সমস্ত জেলায় আমার অনেক ত্যাগী সহকর্মীকে নমিনেশন দেওয়া হয় নাই। এমনকি শহীদ সাহেবের অনুরোধও তাঁরা রাখেন নাই। মওলানা ভাসানীর দরকারের সময় এই আত্মগোপনের মনোভাব কোনোদিন পরিবর্তন হয় নাই। ভবিষ্যতে অনেক ঘটনায় তার প্রমাণ হয়েছে।

আমি গোপালগঞ্জ যেয়ে দেখি, মুসলিম লীগ মনোনীত প্রার্থী ওয়াহিদুজ্জামান সাহেব ময়দানে সদলবলে নেমে পড়েছেন। তিনি নিজের জীবনেই বহু অর্থের মালিক হয়েছেন। লঞ্চ, স্পিডবোট, সাইকেল, মাইক্রোফোন কোনো কিছুরই তার অভাব নাই। আমার একটা মাইক্রোফোন ছাড়া আর কিছুই নাই। গোপালগঞ্জ ও কোটালীপাড়া এই দুই থানা নিয়ে আমাদের নির্বাচনী এলাকা। রাস্তাঘাট নাই। যাতায়াতের খুবই অসুবিধা। আমার নির্বাচন চালাবার জন্য মাত্র দুইখানা সাইকেল ছিল। কর্মীরা যার যার নিজের সাইকেল ব্যবহার করত। আমার টাকা পয়সারও অভাব ছিল। বেশি টাকা খরচ করার সামর্থ্য আমার ছিল না। আমার ফ্যামিলির কয়েকখানা ভাল দেশী নৌকা ছিল তাই ব্যবহার করতে হল। ছাত্র ও যুবক কর্মীরা নিজেদের টাকা খরচ করে আমার জন্য কাজ করতে শুরু করল। কয়েকটা সভায় বক্তৃতা করার পরে বুঝতে পারলাম, ওয়াহিদুজ্জামান সাহেব শোচনীয়ভাবে পরাজয়-বরণ করবেন। টাকায় কুলাবে না, জনমত আমার পক্ষে। আমি যে গ্রামেই যেতাম, জনসাধারণ শুধু আমাকে ভোট দেওয়ার ওয়াদা করতেন না, আমাকে বসিয়ে পানদানের পান এবং কিছু টাকা আমার সামনে নজরানা হিসাবে হাজির করত এবং না নিলে রাগ করত। তারা বলত, এ টাকা নির্বাচনের খরচ বাবদ দিচ্ছে।

আমার মনে আছে খুবই গরিব এক বৃদ্ধ মহিলা কয়েক ঘণ্টা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে, শুনেছে এই পথে আমি যাব, আমাকে দেখে আমার হাত ধরে বলল, "বাবা আমার এই

কুঁড়েঘরে তোমায় একটু বসতে হবে।" আমি তার হাত ধরেই তার বাড়িতে যাই। অনেক লোক আমার সাথে, আমাকে মাটিতে একটা পাটি বিছিয়ে বসতে দিয়ে এক বাটি দুধ, একটা পান ও চার আনা পয়সা এনে আমার সামনে ধরে বলল, "খাও বাবা, আর পয়সা কয়টা তুমি নেও, আমার তো কিছুই নাই।" আমার চোখে পানি এল। আমি দুধ একটু মুখে নিয়ে, সেই পয়সার সাথে আরও কিছু টাকা তার হাতে দিয়ে বললাম, "তোমার দোয়া আমার জন্য যথেষ্ট, তোমার দোয়ার মূল্য টাকা দিয়ে শোধ করা যায় না।" টাকা সে নিল না, আমার মাথায় মুখে হাত দিয়ে বলল, "গরিবের দোয়া তোমার জন্য আছে বাবা।" নীরবে আমার চক্ষু দিয়ে দুই ফোঁটা পানি গড়িয়ে পড়েছিল, যখন তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসি। সেইদিনই আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, 'মানুষেরে ধোঁকা আমি দিতে পারব না।' এ রকম আরও অনেক ঘটনা ঘটেছিল। আমি পায়ে হেঁটেই এক ইউনিয়ন থেকে অন্য ইউনিয়নে যেতাম। আমাকে রাস্তায় রাস্তায়, গ্রামে গ্রামে দেরি করতে হত। গ্রামের মেয়েরা আমাকে দেখতে চায়। আমি ইলেকশনে নামার পূর্বেই জানতাম না, এ দেশের লোক আমাকে কত ভালবাসে। আমার মনের একটা বিরাট পরিবর্তন এই সময় হয়েছিল।

জামান সাহেব ও মুসলিম লীগ যখন দেখতে পারলেন তাদের অবস্থা ভাল না, তখন এক দাবার ঘুঁটি চাললেন। অনেক বড় বড় আলেম, পীর ও মওলানা সাহেবদের হাজির করলেন। গোপালগঞ্জে আমার নিজের ইউনিয়নে পূর্ব বাংলার এক বিখ্যাত আলেম মওলানা শামসুল হক সাহেব জন্মগ্রহণ করেছেন। আমি তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে খুবই শ্রদ্ধা করতাম। তিনি ধর্ম সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান রাখেন। আমার ধারণা ছিল, মওলানা সাহেব আমার বিরুদ্ধাচরণ করবেন না। কিন্তু এর মধ্যে তিনি মুসলিম লীগে যোগদান করলেন এবং আমার বিরুদ্ধে ইলেকশনে লেগে পড়লেন। ঐ অঞ্চলের মুসলমান জনসাধারণ তাকে খুবই ভক্তি করত। মওলানা সাহেব ইউনিয়নের পর ইউনিয়নে স্পিডবোট নিয়ে ঘুরতে শুরু করলেন এবং এক ধর্ম সভা ডেকে ফতোয়া দিলেন আমার বিরুদ্ধে যে, 'আমাকে ভোট দিলে ইসলাম থাকবে না, ধর্ম শেষ হয়ে যাবে।' সাথে শর্ষিনার পীর সাহেব, বরগুনার পীর সাহেব, শিবপুরের পীর সাহেব, রহমতপুরের শাহ সাহেব সকলেই আমার বিরুদ্ধে নেমে পড়লেন এবং যত রকম ফতোয়া দেওয়া যায় তাহা দিতে কৃপণতা করলেন না। দুই চারজন ছাড়া প্রায় সকল মওলানা, মৌলভী সাহেবরা এবং তাদের তালবেলেমরা নেমে পড়ল। একদিকে টাকা, অন্যদিকে পীর সাহেবরা, পীর সাহেবদের সমর্থকরা টাকার লোভে রাতের আরাম ও দিনের বিশ্রাম ত্যাগ করে ঝাঁপিয়ে পড়লেন আমাকে পরাজিত করার জন্য। কিছু সংখ্যক সরকারি কর্মচারীও এতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করল। ঢাকা থেকে পুলিশের প্রধানও গোপালগঞ্জে হাজির হয়ে পরিষ্কারভাবে তার কর্মচারীদের হুকুম দিলেন মুসলিম লীগকে সমর্থন করতে। ফরিদপুর জেলার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আলতাফ গওহর সরকারের পক্ষে কাজ করতে রাজি না হওয়ায় সরকার তাকে বদলি করে আরেকজন কর্মচারী আনলেন। তিনি আমার এলাকায় যেয়ে নিজেই বক্তৃতা করতে শুরু করলেন এবং ইলেকশনের তিন দিন পূর্বে সেন্টারগুলি

এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে গেলেন, যেখানে জামান সাহেবের সুবিধা হতে পারে। আমার পক্ষে জনসাধারণ, ছাত্র ও যুবকরা কাজ করতে শুরু করল নিঃস্বার্থভাবে। নির্বাচনের চার দিন পূর্বে শহীদ সাহেব সরকারি দলের ঐসব অপকীর্তির খবর পেয়ে হাজির হয়ে দু'টা সভা করলেন। আর নির্বাচনের একদিন পূর্বে মওলানা সাহেব হাজির হয়ে একটা সভা করলেন। নির্বাচনের কয়েকদিন পূর্বে খন্দকার শামসুল হক মোক্তার সাহেব, রহমত জান, শহীদুল ইসলাম ও ইমদাদকে নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করে ফরিদপুর জেলে আটক করা হল। একটা ইউনিয়নের প্রায় চল্লিশজন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। নির্বাচনের মাত্র তিন দিন পূর্বে আরও প্রায় পঞ্চাশজনের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট দেওয়া হয়। শামসুল হক মোক্তার সাহেবকে জনসাধারণ ভালবাসত। তাঁর কর্মীরা খুব নামকরা ছিল। আরও অনেককে গ্রেফতার করার ষড়যন্ত্র আমার কানে আসলে তাদের আমি শহরে আসতে নিষেধ করে দিলাম। আমার নির্বাচনী এলাকা ছাড়া আশেপাশের দুই এলাকাতে আমাকে যেতে হয়েছিল—যেমন যশোরের আবদুল হাকিম সাহেবের নির্বাচনী এলাকায়, ইনি পরে স্পিকার হন; এবং আবদুল খালেকের এলাকায়, ইনি পরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হন।

নির্বাচনে দেখা গেল ওয়াহিদুজ্জামান সাহেব প্রায় দশ হাজার ভোটে পরাজিত হয়েছেন। জনসাধারণ আমাকে শুধু ভোটই দেয় নাই, প্রায় পাঁচ হাজার টাকা নজরানা হিসাবে দিয়েছিল নির্বাচনে খরচ চালানোর জন্য। আমার ধারণা হয়েছিল, মানুষকে ভালবাসলে মানুষও ভালবাসে। যদি সামান্য ত্যাগ স্বীকার করেন, তবে জনসাধারণ আপনার জন্য জীবন দিতেও পারে। মওলানা শামসুল হক সাহেব পরে অবস্থা বুঝতে পেরে সক্রিয় রাজনীতি হতে সরে পড়েছিলেন। এই নির্বাচনে মুসলিম লীগ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। নির্বাচনের কিছুদিন পূর্বে শহীদ সাহেব বিবৃতির মারফত বলেছিলেন, 'মুসলিম লীগ নয়টির বেশি সিট পেলে আমি আশ্চর্য হব।' তিনশতের মধ্যে মুসলিম লীগ নয়টা আসনই পেয়েছিল।[২৬]

দুনিয়ার ইতিহাসে একটা ক্ষমতাসীন দলের এভাবে পরাজয়ের খবর কোনোদিন শোনা যায় নাই। বাঙালিরা রাজনীতির জ্ঞান রাখে এবং রাজনৈতিক চেতনাশীল। এবারও তারা তার প্রমাণ দিল। ১৯৪৬ সালে পাকিস্তান ইস্যুর উপর সাধারণ নির্বাচনেও তারা তা প্রমাণ করেছিল। এবারের নির্বাচনে মুসলিম লীগের অনেক বড় বড় এবং হোমরাচোমরা নেতারা, এদের মধ্যে অনেকেই আবার কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্য ছিলেন, যাঁরা শুধু পরাজিতই হন নাই, তাঁদের জামানতের টাকাও বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। এমনকি পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী জনাব নূরুল আমিনও পরাজিত হন। এতে শাসকগোষ্ঠী, শোষকগোষ্ঠী এবং আমলারা অনেকেই ঘাবড়িয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তবু আশা ছাড়েন নাই। তাঁরা চক্রান্তমূলক নতুন কর্মপন্থা গ্রহণ করতে চেষ্টা করতে লাগলেন—বিশেষ করে পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা—যাঁরা পূর্ব বাংলায় কারখানা ও ব্যবসা পেতে বসেছেন এবং যথেষ্ট টাকাও মুসলিম লীগকে প্রকাশ্যভাবে দিয়ে সাহায্য করেছেন তারা ভয়ানক অসুবিধায় পড়ে গেলেন। তাঁরা জানেন, তাঁদের পিছনে দাঁড়াবার জন্য এখনও কেন্দ্রীয় সরকার মুসলিম লীগের হাতে আছে। যাঁরা পরাজিত হলেন তাঁরা গণতান্ত্রিক পন্থায় বিশ্বাস কোনোদিন করতেন না, তাই

জনগণের এই রায় মেনে নিলেন না। ষড়যন্ত্রের রাজনীতি আরম্ভ করলেন। পূর্ব বাংলা ছেড়ে সকলেই প্রায় করাচিতে আশ্রয় নিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা, শিল্পপতিরা ও আমলারা এদের বিপর্যয়ে খুবই ব্যথা পেলেন, কারণ এ রকম 'সুবোধ বালক' তাঁরা কি আর ভবিষ্যতে পাবেন; যাঁরা পূর্ব বাংলার সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে দিয়ে দেবেন, একটু প্রতিবাদও করবেন না! শুধু একটা জিনিস তাঁরা পেলেই সন্তুষ্ট থাকেন, 'মন্ত্রিত্ব' এবং ক্ষমতার একটু ভাগ। কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন দল জানেন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ স্বায়ত্তশাসনের জন্য জনমত সৃষ্টি করেছে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যে অর্থনৈতিক বৈষম্য দিন দিন বেড়ে চলেছে—চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও মিলিটারিতে বাঙালিদের স্থান দেওয়া হচ্ছে না—এ সম্বন্ধে আওয়ামী লীগ সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে কতগুলি প্রচারপত্র ছাপিয়ে বিলি করেছে সমস্ত দেশে। সমস্ত পূর্ব বাংলায় গানের মারফতে গ্রাম্য লোক কবিরা প্রচারে নেমেছেন।

এই নির্বাচনে একটা জিনিস লক্ষ্য করা গেছে যে, জনগণকে 'ইসলাম ও মুসলমানের নামে' স্লোগান দিয়ে ধোঁকা দেওয়া যায় না। ধর্মপ্রাণ বাঙালি মুসলমানরা তাদের ধর্মকে ভালবাসে; কিন্তু ধর্মের নামে ধোঁকা দিয়ে রাজনৈতিক কার্যসিদ্ধি করতে তারা দিবে না এ ধারণা অনেকেরই হয়েছিল। জনসাধারণ চায় শোষণহীন সমাজ এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি। মুসলিম লীগ নেতারা এসব বিষয়ে কোনো সুষ্ঠু প্রোগ্রাম জনগণের সামনে পেশ না করে বলে চলেছে 'পাকিস্তান ধ্বংস হয়ে যাবে, মুসলিম লীগ পাকিস্তান কায়েম করেছে, তাই মুসলিম লীগ পাকিস্তানের শত্রু, পাকিস্তান অর্থ মুসলিম লীগ ইত্যাদি। আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য নেতারা রাষ্ট্রদ্রোহী, হিন্দুদের দালাল, পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলা এক করতে চায়'—এ রকম নানা রকমের স্লোগান দিতে আরম্ভ করেছিল। জনগণ শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে জানত যে তিনি পাকিস্তানের অন্যতম স্রষ্টা। শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হককে জানত, তিনি এদেশের মানুষকে ভালবাসতেন এবং মওলানা ভাসানীও পাকিস্তানের জন্য সংগ্রাম করেছেন। আর আমরা যারা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য সামান্য ত্যাগ স্বীকার করেছি তাও জনগণের জানা ছিল, তাই ধোঁকায় কাজ হল না।

একুশ দফা দাবি জনগণের সার্বিক কল্যাণের জন্য পেশ করা হয়েছে। তা জনগণ বুঝতে পেরেছে। কারণ, আওয়ামী লীগ ১৯৪৯ সাল থেকে বাংলাদেশে এর অনেকগুলো দাবি প্রচার করেছে। ইলেকশনের কিছুদিন পূর্বে এক সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হয়েছিল। চন্দ্রঘোনার কর্ণফুলী কাগজের কারখানায় বাঙালিরা প্রায় সকলেই শ্রমিক, আর অবাঙালিরা বড় বড় কর্মচারী। তাদের ব্যবহারও ভাল ছিল না। মুসলিম লীগ নেতারা প্রচার করেছে, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসলে অবাঙালিদের পূর্ব বাংলায় থাকতে দেবে না।

আওয়ামী লীগ ও তার কর্মীরা যে কোনো ধরনের সাম্প্রদায়িকতাকে ঘৃণা করে। আওয়ামী লীগের মধ্যে অনেক নেতা ও কর্মী আছে যারা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করে; এবং তারা জানে সমাজতন্ত্রের পথই একমাত্র জনগণের মুক্তির পথ। ধনতন্ত্রবাদের মাধ্যমে জনগণকে শোষণ করা চলে। যারা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করে, তারা কোনোদিন কোনো রকমের সাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাস করতে পারে না। তাদের কাছে মুসলমান, হিন্দু, বাঙালি, অবাঙালি সকলেই সমান।

শোষক শ্রেণীকে তারা পছন্দ করে না। পশ্চিম পাকিস্তানেও আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে এ রকম অপপ্রচার করা হয়েছে।



নির্বাচনের ফলাফল বের হওয়ার পরে আমি ঢাকা আসলাম। আমাকে রেলস্টেশনে বিরাটভাবে অভ্যর্থনা করা হয়েছিল। শোভাযাত্রা করে আমাকে আওয়ামী লীগ অফিসে নিয়ে আসা হল। শহীদ সাহেব আমার জন্য চিন্তায় ছিলেন। যদিও আমার গ্রামের বাড়িতে বসে আমাকে বলে এসেছিলেন, "তোমার চিন্তার কোনো কারণ নাই, আমি যা দেখলাম তাতে তোমার জয় সুনিশ্চিত।"

তাড়াতাড়ি যুক্তফ্রন্টের এমএলএদের সভা ডাকা হল, ঢাকা বার লাইব্রেরি হলে। আওয়ামী লীগ দলীয় এমএলএদের সভা ডাকা হল আওয়ামী লীগ অফিসে ঐ একই দিন সকালবেলা। নির্বাচনে জয় লাভ করার সাথে সাথে আমাদের কানে আসতে লাগল জনাব মোহাম্মদ আলী বগুড়া হক সাহেবের সাথে যোগাযোগ করতে চেষ্টা করছেন, পুরানা মুসলিম লীগারদের মারফতে—যারা কিছুদিন পূর্বে হক সাহেবের দলে যোগদান করে এমএলএ হয়েছেন কৃষক শ্রমিক দলের নামে। আদতে তারা মনে প্রাণে মুসলিম লীগ। সকালবেলা আওয়ামী লীগ সদস্যদের সভা আর বিকালে বার লাইব্রেরি হলে সমস্ত দল মিলে যুক্তফ্রন্ট এমএলএদের সভা। আওয়ামী লীগের সভায় শহীদ সাহেব ও ভাসানী সাহেব উপস্থিত ছিলেন। সভায় রংপুরের আওয়ামী লীগ নেতা খয়রাত হোসেন সাহেব প্রস্তাবের মারফতে বললেন, "জনাব এ. কে. ফজলুল হক সাহেবকে নেতা নির্বাচন করার পূর্বে শহীদ সাহেব ও ভাসানী সাহেব তাঁর সাথে পরামর্শ করে মন্ত্রীদের লিস্ট ফয়সালা করা উচিত। একবার তাঁকে যুক্তফ্রন্ট পার্লামেন্টারি দলের নেতা করলে তাঁর দলবলের মধ্যে এমন সমস্ত পাকা খেলোয়াড় আছে, যারা চক্রান্তের খেলা শুরু করতে পারে। আর একজন ডেপুটি লিডার আমাদের দল থেকে করা উচিত, কারণ আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল যুক্তফ্রন্টের মধ্যে।" শহীদ সাহেব বললেন, "তিনি নিশ্চয়ই আমাদের দুইজনের সাথে পরামর্শ করবেন, মন্ত্রীদের নাম ঠিক করার পূর্বে। বৃদ্ধ মানুষ এখন তাঁকে আর বিরক্ত করা উচিত হবে না।" ভাসানী সাহেবও শহীদ সাহেবকে সমর্থন করলেন। আমি জনাব খয়রাত হোসেনের সাথে একমত ছিলাম। কিন্তু এই নিয়ে আর জোর করলাম না। আমি যখন আমার বাড়ি টুঙ্গিপাড়া থেকে নির্বাচনের পরে ফিরে আসি, শহীদ সাহেব আমাকে একাকী ডেকে বললেন, "তুমি মন্ত্রিত্ব নেবা কি না?" আমি বললাম, "আমি মন্ত্রিত্ব চাই না। পার্টির অনেক কাজ আছে, বহু প্রার্থী আছে দেখে শুনে তাদের করে দেন।" শহীদ সাহেব আর কিছুই আমাকে বলেন নাই।

ঢাকা বার লাইব্রেরি হলে যুক্তফ্রন্ট এমএলএদের সভা হল। শহীদ সাহেব ও ভাসানী সাহেব তাতে উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় এ. কে. ফজলুল হক সাহেবকে সর্বসম্মতিক্রমে নেতা করা হল। আর দ্বিতীয় প্রস্তাবে মুসলিম লীগ দলীয় কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সদস্য,

যারা পুরানা প্রাদেশিক আইনসভার মারফতে নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং প্রাদেশিক নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন তাদের পদত্যাগ দাবি করা হল। হক সাহেব নেতা নির্বাচিত হওয়ার কিছু সময় পরেই পূর্ব বাংলার গভর্নর তাঁকে মন্ত্রিসভা গঠন করতে আহ্বান করলেন। তিনি রাজি হয়ে এসে, শীঘ্রই মন্ত্রিসভার নাম পেশ করবেন বলে বাড়িতে ফিরে গেলেন। সেইদিন সন্ধ্যার পরে শহীদ সাহেব ও ভাসানী সাহেব তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে গেলেন। আমিও সাথে ছিলাম। তিন নেতা আলোচনায় বসলেন, এক আলাদা ঘরে। বাইরে থেকে কৃষক শ্রমিক পার্টির নেতাদের হাবভাব দেখে আমার খুব খারাপ লাগল। চারিদিকে একটা ষড়যন্ত্র চলছে বলে মনে হল। কিছু সময় পরে শহীদ সাহেব ও তাসানী সাহেব বের হয়ে আসলেন এবং সোজা ইয়ার মোহাম্মদ খানের বাড়িতে পৌঁছালেন। আতাউর রহমান সাহেবও উপস্থিত হলেন। তাঁরা আমাদের জানালেন, হক সাহেব এখন মাত্র চার পাঁচজন মন্ত্রী নিয়ে মন্ত্রিসতা গঠন করবেন; কিছুদিন পরে আরও কিছু সংখ্যক মন্ত্রী নিবেন। এখন আবু হোসেন সরকার, সৈয়দ আজিজুল হক (নান্না মিয়া), আশরাফউদ্দিন চৌধুরী, আতাউর রহমান খান ও আবদুস সালাম খানকে নিয়ে মন্ত্রিসতা গঠন করতে চান। আমাদের নেতারা তাঁকে অনুরোধ করে বলেছিলেন, পুরা টিম নিয়ে কাজ শুরু করা উচিত। জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা হল, যুক্তফ্রন্ট তাড়াতাড়ি দেশের জন্য কাজ শুরু করবেন। তাঁরা আরও আপত্তি করলেন, এখন নান্না মিয়াকে না নিয়ে পরে নিলেই ভাল হয়। আর যদি পুরা টিম নিয়ে মন্ত্রিত্ব গঠন করেন তবে তাকে এখনই নিতে আপত্তি নাই। তাঁরা বিশেষ করে জোর দিলেন পুরা টিম নিতে। হক সাহেব রাজি না হওয়াতে তাঁরা তাঁকে বলে এসেছেন, আওয়ামী লীগের কেউই এভাবে মন্ত্রিত্বে যেতে পারে না। আপনি আপনার দল নিয়ে মন্ত্রিত্ব গঠন করেন। আওয়ামী লীগ আপনার মন্ত্রিসভাকে সমর্থন দিবে এবং যখন পুরা মন্ত্রিত্ব গঠন করবেন তখন আওয়ামী লীগ তাতে যোগদান করবে। আওয়ামী লীগের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টির এক ষড়যন্ত্র হচ্ছে এটা বুঝতে আর নেতাদের বাকি রইল না।

হক সাহেব শহীদ সাহেব ও ভাসানী সাহেবকে বলেছেন, "আমি শেখ মুজিবকে আমার মন্ত্রিত্বে নিব না।" তার উত্তরে শহীদ সাহেব বলেছিলেন, "আওয়ামী লীগের কাকে নেওয়া হবে না হবে সেটা তো আমি ও ভাসানী সাহেব ঠিক করব; আপনি যখন বলছেন নান্না মিয়াকে ছাড়া আপনার চলে না, তখন আমরাও তো বলতে পারি শেখ মুজিবকে ছাড়া আমাদের চলে না। সে আমাদের দলের সেক্রেটারি। মুজিব তো মন্ত্রিত্বের প্রার্থী না। এ সকল কথা বললে পার্টি থেকে বলতে পারে।"

আমি শহীদ সাহেব ও ভাসানী সাহেবকে বললাম, "আমাকে নিয়ে গোলমাল করার প্রয়োজন নাই। আমি মন্ত্রী হতে চাই না। আমাকে বাদ দিলে যদি পুরা মন্ত্রিত্ব গঠন করতে রাজি হয়, আপনারা তাই করেন।" আমরা বসে আলাপ করছি, প্রায় এক ঘণ্টা পরে হক সাহেব খবর পাঠিয়েছেন, তিনি ছয়জনকে নিয়ে মন্ত্রিত্ব গঠন করতে চান এবং মুজিবকেও নিতে রাজি আছেন। ভাসানী সাহেব বলে দিলেন, "আওয়ামী লীগ যখন যোগদান করবে, আওয়ামী লীগের সব কয়জনই একসাথে যোগদান করবেন। এভাবে ভাঙা ভাঙাভাবে

যোগদান করবে না।" পরদিন হক সাহেব শপথ গ্রহণ করলেন। আবু হোসেন সরকার, সৈয়দ আজিজুল হক নান্না মিয়া (কেএসপি) এবং আশরাফউদ্দিন চৌধুরী (নেজামে ইসলাম) শপথ গ্রহণ করলেন। লাটভবনের সামনে এক বিক্ষোভ মিছিল হল, 'স্বজনপ্রীতি চলবে না', 'কোটারি চলবে না', এমনি নানা রকমের স্লোগান। যদি একসাথে পুরা মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করত তা হলে লক্ষ লক্ষ লোক অভিনন্দন জানাত। মনে হল, একদিনের মধ্যে গণজাগরণ নষ্ট হয়ে গেছে। জনসাধারণ ঝিমিয়ে পড়েছে। হক সাহেবের দলবল বলতে শুরু করল, "এ সমস্ত শেখ মুজিবের কাজ।" সত্য কথা বলতে কি, আমি কিছুই জানতাম না। সব খবরের কাগজ পড়ে দেখেছি জনগণ ক্ষেপে যাচ্ছিল এবং যারা সংবর্ধনা দিতে গিয়েছিল তারাই উল্টা স্লোগান দিয়েছিল নান্না মিয়াকে মন্ত্রী করার জন্য। কারণ, তিনি বেশি পরিচিত ছিলেন না। তাঁর একমাত্র পরিচয় লোকে জানত, 'হক সাহেবের ভাগিনেয়'। লোক হিসাবে সৈয়দ আজিজুল হক অমায়িক ও ভদ্র। আমার সাথে তাঁর ব্যক্তিগত সম্বন্ধ খুবই মধুর ছিল। কলকাতা থেকে তাঁকে আমি জানতাম। কোনোদিন তাঁকে আমি রাগ হতে দেখি নাই। যাহোক, হক সাহেব এই সমস্ত কাজ নিজে কিছুই করেন নাই। বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। অন্যের কথা শুনতেন, বিশেষ করে লীগ থেকে বিতাড়িত দলের, যার নেতৃত্ব করতেন ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া) সাহেব। তিনি নিজে মন্ত্রী হতে চান। তিনি জীবনভর মন্ত্রিত্ব ভাঙছেন আর গড়েছেন। তাঁর একটা বিশেষ অসুবিধা হল তিনি লেখাপড়া ভাল জানতেন না, তাই কেউই তাঁর নাম বলেন না। কর্মী হিসাবে তাঁর মত কর্মী এ দেশে খুব কম জন্মগ্রহণ করেছেন। রাতদিন সমানভাবে পরিশ্রম করতে পারতেন। তাঁকে অনেকে Evil Genius বলে থাকেন। যদি ভাল কাজে তাঁর বুদ্ধি ও কর্মশক্তি ব্যবহার করতেন তাহলে সত্যিকারের দেশের কাজ করতে পারতেন।

※

আমরা মন্ত্রিসভায় যোগদান না করে পার্টি গঠনের কাজে মন দিলাম। শহীদ সাহেব করাচিতে ফিরে গেলেন। তাঁর স্বাস্থ্যও খারাপ হয়ে পড়েছে অত্যধিক পরিশ্রমে। হক সাহেব করাচিতে বেড়াতে গেলে কেন্দ্রীয় গণপরিষদের পূর্ব বাংলার সদস্যরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "তাঁরা পদত্যাগ করবেন কি না," তিনি তাঁর উত্তরে বলেছিলেন, "তিনি নিজেই পদত্যাগ করেন নাই, আর তাঁদের করতে হবে কেন?" যদিও যুক্তফ্রন্ট পার্লামেন্টারি পার্টির প্রথম সভায় দ্বিতীয় প্রস্তাবে তাঁদের পদত্যাগ করতে বলা হয়েছিল। করাচিতে মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ নেতারা তাঁর সাথে যোগাযোগ করে তাঁকে জানিয়ে দিল, তাঁদের রাগ আওয়ামী লীগারদের বিরুদ্ধে; হক সাহেবকে তাঁরা সমর্থন করবেন এবং যাতে তিনি প্রধানমন্ত্রী থাকতে পারেন তার চেষ্টা করবেন। শুধু আওয়ামী লীগকে যেন দূরে সরিয়ে রাখেন। গোপনে গোপনে আওয়ামী লীগ থেকে সদস্য তাগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চলছিল, কিন্তু উপায় ছিল না। কেউই দলত্যাগ করতে রাজি না। যাদের মনের মধ্যে মন্ত্রিত্বের

খায়েশ ছিল তারাও জনমতের ভয়ে পিছিয়ে পড়েছিল। হক সাহেবকে তাঁর দলবল ধোঁকা দিয়েই চলেছে। মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় সরকার দুর্বলতা পেলেই যে ঝাঁপিয়ে পড়বে এ সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল না, কারণ তারা জানত আওয়ামী লীগের সমর্থন ছাড়া সরকার চলতে পারে না। সংসদ সদস্যদের মধ্যে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগুরু। সকল দল মিলেও আওয়ামী লীগের সমান হতে পারবে না।

করাচি হতে ফিরবার পথে হক সাহেব কলকাতায় দু'একদিনের জন্য ছিলেন। সেখানে তাঁর বক্তৃতা বলে কথিত কয়েকটা সংবাদ সংবাদপত্রে ফলাও করে ছাপানো হয়েছিল।[২৭] সুযোগ বুঝে মোহাম্মদ আলী বগুড়া ও তাঁর দলবলেরা হক সাহেবের বিরুদ্ধে তাই নিয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। হক সাহেব মহাবিপদে পড়লেন। এই বিপদের মুহূর্তে আওয়ামী লীগ নেতা বা কর্মীরা হক সাহেব ও তাঁর দলবলের বিরুদ্ধাচরণ করলেন না। তাঁরা জানিয়ে দিলেন যে, তাঁরা হক মন্ত্রিসভাকে সমর্থন করবেন। হক সাহেব এই অবস্থায় আওয়ামী লীগারদের সাথে আলোচনা করে পুরা মন্ত্রিসভা গঠন করতে আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগলেন। এই সময় হক সাহেবের আর এক ভাগিনেয় জনাব মাহবুব মোর্শেদ বার এট ল (পরবর্তীকালে পূর্ব বাংলা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হন) হক সাহেবের সাথে পরামর্শ করে আতাউর রহমান খান ও মানিক মিয়াকে অনুরোধ করলেন যাতে আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভায় যোগদান করে। তাঁকে সাহায্য করছিলেন ঢাকার কফিলুদ্দিন চৌধুরী সাহেব ও মির্জা আবদুল কাদের সর্দার। শহীদ সাহেব তখন করাচিতে ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, তাঁর পক্ষে ঢাকায় আসা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

আমি ও মওলানা সাহেব জনসভা করতে মফস্বলে বের হয়ে গেছি। আমাদের প্রোগ্রাম জানা ছিল অফিসের। হক সাহেব আতাউর রহমান খান ও মানিক ভাইকে বলেছেন যে, আমাকে মন্ত্রী করতে চান। মওলানা সাহেব ও আমি টাঙ্গাইলে এক কর্মী সম্মেলনে বক্তৃতা করছিলাম। এই সময় টাঙ্গাইলের এসডিও একটা রেডিওগ্রাম নিয়ে সভায় হাজির হলেন। আমাকে জানালেন, প্রধানমন্ত্রী আমাকে ঢাকায় যেতে অনুরোধ করে রেডিওগ্রাম পাঠিয়েছেন। আমি মওলানা সাহেবের সাথে পরামর্শ করলাম। মওলানা সাহেব বললেন, "দরকার হলে তোমাকে মন্ত্রিসভায় যোগদান করতে হবে। তবে শহীদ সাহেবের সাথে পরামর্শ করে নিও—এ সময় এইভাবে মন্ত্রিত্বে যাওয়া উচিত হবে কি না? বোধহয় হক সাহেবের দল কোনো মুশকিলে পড়েছে, তাই ডাক পড়েছে।"

আমি সন্ধ্যার দিকে ঢাকায় ফিরে এলাম। বাসায় যেয়ে দেখি রেণু ছেলেমেয়ে নিয়ে গতকাল ঢাকায় এসেছে। সে এখন ঢাকায়ই থাকবে, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার বন্দোবস্ত হওয়া দরকার। আমি খুশিই হলাম, আমি তো মোসাফিরের মত থাকি। সে এসে সকল কিছু ঠিকঠাক করতে শুরু করেছে। আমার অবস্থা জানে, তাই বাড়ি থেকে কিছু টাকাও নিয়ে এসেছে। আমি হক সাহেবের সাথে দেখা করতে গেলে তিনি বললেন, "তোকে মন্ত্রী হতে হবে। আমি তোকে চাই, তুই রাগ করে 'না' বলিস না। তোরা সকলে বসে ঠিক কর, কাকে কাকে নেওয়া যেতে পারে।" আমি তাঁকে বললাম, "আমাদের তো আপত্তি নাই।

শহীদ সাহেব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, তাঁর অনুমতি দরকার। আর মওলানা সাহেব উপস্থিত নাই, তাঁর সাথেও আলোচনা করতে হবে।" আমি ইত্তেফাক অফিসে মানিক ভাই ও আতাউর রহমান খান সাহেবকে নিয়ে বসলাম। একটু পরে মোর্শেদ সাহেব, কাদের সর্দার সাহেব, কফিলুদ্দিন চৌধুরী সাহেব আসলেন। আলোচনা করে শহীদ সাহেবের সাথে ফোনে আলাপ করতে চেষ্টা করলাম, তিনি কথা বলতে পারলেন না। তাঁর জামাতা আহমেদ সোলায়মান কথা বললেন, তাঁর মারফতে তিনি জানিয়ে দিলেন তাঁর কোনো আপত্তি নাই।

আমি আপত্তি করলাম, মওলানা সাহেবেরও মতামত প্রয়োজন, কারণ অনেক পানি এর মধ্যে ঘোলা করা হয়েছে। শহীদ সাহেব, ভাসানী সাহেব যদিও কয়েকজনের নাম পূর্বেই ঠিক করে রেখেছিলেন, তবু আবারও আলোচনা করে মতামত নেওয়া উচিত। এদিকে কৃষক শ্রমিক দল কফিলুদ্দিন চৌধুরী সাহেবকে তাদের পার্টি থেকে মন্ত্রিত্ব দিতে রাজি নন। আমরা জানিয়ে দিলাম, দরকার হয় তিনি আমাদের দলের পক্ষ থেকে মন্ত্রী হবেন। সত্য কথা বলার জন্য তাঁকে আমরা শাস্তি পেতে দিতে রাজি নই। রাত এগারটায় হক সাহেবের সাথে পরামর্শ করে দুইখানা জিপ গাড়ি নিয়ে আতাউর রহমান সাহেব, মোর্শেদ সাহেব, কফিলুদ্দিন চৌধুরী সাহেব, আবদুল কাদের সর্দার ও আমি টাঙ্গাইলের পথে রওয়ানা করলাম। রাস্তা খুবই খারাপ, তখনকার দিনে ঢাকা থেকে টাঙ্গাইল পৌঁছাতে ছয় ঘণ্টা সময় লাগত। চারটা খেয়া পার হতে হত। আমরা খুব ভোরে টাঙ্গাইল পৌঁছালাম। মওলানা সাহেব আওয়ামী লীগ অফিসের দোতলায় আছেন। আমরা তাঁর সাথে পরামর্শ করলাম। তিনি খুব ক্ষেপে গিয়েছিলেন। পরে মোর্শেদ সাহেবের ওকালতিতে তিনি রাজি হলেন। আতাউর রহমান সাহেব তাঁকে নামগুলি দেখালেন। আতাউর রহমান খান, আবুল মনসুর আহমদ, আবদুস সালাম খান, হাশিমউদ্দিন আহমদ ও আমি। কফিলুদ্দিন চৌধুরী সাহেব সম্বন্ধে তাঁরা যখন আপত্তি করেছে তখন তিনিও আওয়ামী লীগের পক্ষ হতে মন্ত্রী হবেন। হক সাহেব ছাড়া মোটামুটি বারজন মন্ত্রী হবেন। পরে দেখা গেল, আরও কয়েকজন বেড়ে গেল রাতারাতি।



১৯৫৪ সালের মে মাস। আমরা সকলে শপথ নিতে সকাল নয়টায় লাটভবনে উপস্থিত হলাম। আমাদের যখন মন্ত্রী হিসাবে শপথ নেওয়া শেষ হল, ঠিক সেই সময় খবর এল আদমজী জুট মিলে বাঙালি ও অবাঙালি শ্রমিকদের মধ্যে ভীষণ দাঙ্গাহাঙ্গামা শুরু হয়েছে। ভোররাত থেকে সৈয়দ আজিজুল হক সেখানে উপস্থিত আছেন। রাতেই ইপিআর ফোর্স ও পুলিশ বাহিনী সেখানে মোতায়েন করা হয়েছে। ঢাকার দু'একজন বড় সরকারি কর্মকর্তা ও পুলিশের কর্মচারীরাও উপস্থিত আছেন। আমরা যখন শপথ নিচ্ছি ঠিক সেই মুহূর্তে দাঙ্গা শুরু হওয়ার কারণ কি? বুঝতে বাকি রইল না, এ এক অশুভ লক্ষণ! হক সাহেব আমাদের নিয়ে সোজা রওয়ানা করলেন আদমজী জুট মিলে। তখন নারায়ণগঞ্জ হয়ে

লঞ্চে যেতে হত। সোজা রাস্তা হয়েছে, তবে গাড়ি তখনও ভালভাবে চলতে পারে না। ট্রাক ও জিপ কষ্ট করে যেতে পারে। সকলেই রওয়ানা হয়ে গেছেন। আমাকে লাটভবনের সামনে জনতা ঘিরে ফেলল এবং আমাকে নিয়ে শোভাযাত্রা তারা করবে বলে ঠিক করেছে। তাদের বুঝিয়ে বিদায় নিতে আধ ঘণ্টার মত দেরি হয়ে গেল।

নারায়ণগঞ্জ যেয়ে শুনলাম, হক সাহেব আমার জন্য অপেক্ষা করে ঢাকা রওয়ানা হয়ে গেছেন। একটা লঞ্চ রেখে গেছেন। আমি পৌঁছালাম এবং সাথে সাথে যেখানে দাঙ্গা তখনও চলছিল সেখানে উপস্থিত হলাম। আমাকে একটা পুলিশের জিপে করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। দাঙ্গা তখন অল্প অল্প চলছিল। যেদিকে যাই দেখি রাস্তায় রাস্তায় বস্তিতে বস্তিতে মরা মানুষের লাশ পড়ে আছে। অনেকগুলি আহত লোক চিৎকার করছে, সাহায্য করার কেউই নাই। ইপিআর পাহারা দিতেছে, বাঙালি ও অবাঙালিদের আলাদা আলাদা করে দিয়েছে। গ্রাম থেকে খবর পেয়ে হাজার হাজার বাঙালি এগিয়ে আসছে। অবাঙালিদের ট্রাকে করে মিলের বাইরে থেকে মিলের ভিতরে নিতেছে। আমার বড় অসহায় মনে হল। আমার সাথে মাত্র দুইজন আর্মড পুলিশ। এই সময় আরও কয়েকজন পুলিশের সাথে আমার দেখা হল। তাদের কাছে আসতে হুকুম দিলাম। এক গাছতলায় আমি আস্তানা পাতলাম। মিলের চারটা ট্রাক আছে, একটাকে পাওয়া যাচ্ছে না। কিছু সংখ্যক লোক পাওয়া গেল, তাদের সাহায্যে যারা মরে গেছে তাদের রেখে আহত লোকগুলিকে এক জায়গায় করে পানি দিতে শুরু করলাম। আমার দেখাদেখি কয়েকজন কর্মচারীও কাজে হাত দিল। এই সময় মোহন মিয়া সাহেব এসে উপস্থিত হলেন। আমার মনে বল এল। তিনটা ট্রাক হাজির করা হল। ড্রাইভাররা ভাগতে চেষ্টা করছিল। আমি হুকুম দিলাম, ভাগতে চেষ্টা করলেই গ্রেফতার করে জেলে পাঠিয়ে দিব। আমার মেজাজ দেখে তারা ভয় পেয়ে গেল। ঢাকায় টেলিফোন করা হয়েছে, এ্যাম্বুলেন্স পাঠাবার জন্য। মোহন মিয়া ও আমি সকাল এগারটা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রায় তিনশতের মত আহত লোককে হাসপাতালে পাঠাতে পেরেছিলাম। বিভিন্ন জায়গা থেকে যে সমস্ত বাঙালি জনসাধারণ জমা হচ্ছিল মিল আক্রমণ করার জন্য তাদের কাছে গিয়ে আমি বক্তৃতা করে তাদের শান্ত করলাম। তারা আমার কথা শুনল। যদি তারা সঠিক খবর পেত তাহা হলে আমার কথা শুনত কি না সন্দেহ ছিল। সন্ধ্যার একটু পূর্বে আমি সমস্ত এলাকা ঘুরে মৃত লাশের হিসাব করলাম একটা একটা করে গণনা করে, তাতে পাঁচশতের উপর লাশ আমি স্বচক্ষে দেখলাম। আরও শ'খানেক পুকুরের মধ্যে আছে, তাতে সন্দেহ নাই।

সামান্য একটা ঘটনা নিয়ে এই দাঙ্গা শুরু হয়। তিন দিন পূর্বে এক অবাঙালি দারোয়ানের সাথে এক বাঙালি শ্রমিকের কথা কাটাকাটি ও মারামারি হয়। তাতে বাঙালি শ্রমিকের এক আঘাতে হঠাৎ দারোয়ানটা মারা যায়। এই নিয়ে উত্তেজনা এবং ষড়যন্ত্র শুরু হয়। দারোয়ানরা সবাই অবাঙালি। আর কিছু সংখ্যক শ্রমিকও আছে অবাঙালি। এই ঘটনা নিয়ে বেশ মনকষাকষি শুরু হয়। মিল কর্তৃপক্ষ অবাঙালিদের উসকানি দিতে থাকে। মিল অফিসে কালো পতাকা ওড়াতে অনুমতি দেয়। মিলে কাজ বন্ধ করে দিয়ে বাঙালিদের বেতন নেবার দিন ঘোষণা

করে বলা হয়, বেতন নিতে মিলের ভেতরে আসতে। যখন তারা বেতন নিতে ভিতরে আসে তখন চারদিক থেকে বন্দুকধারী দারোয়ান ও অবাঙালিরা তাদের আক্রমণ করে। এই আকস্মিক আক্রমণের জন্য তারা প্রস্তুত ছিল না। হঠাৎ আক্রান্ত হয়ে বহু লোক মারা যায়। পরে আবার বাঙালিরা যারা বাইরে ছিল, তারা অবাঙালিদের আক্রমণ করে এবং বহু লোককে হত্যা করে। নতুন যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা যে সময় শপথ নিচ্ছে সেই সময় বেতন দেবার সময় ঘোষণা করার অর্থ কি? ইপিআর উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও একটা গুলিও করা হয় নাই। ফলে দাঙ্গা করে পাঁচশত লোকের উপরে মারা যায়। পুলিশ কর্মচারীরা পূর্বেই খবর পেয়েছিল, তবু কেন ব্যবস্থা গ্রহণ করে নাই? মন্ত্রী সৈয়দ আজিজুল হক সাহেবকে মিষ্টি কথা বলে মিল অফিসে বসিয়ে রেখেছে। দাঙ্গা যে মিলের অন্যদিকে শুরু হয়েছে, সে খবর তাঁকে দেওয়া হয় নাই। হক সাহেব ও অন্যান্য মন্ত্রীরা ঢাকায় চলে এসেছেন, আমি ও মোহন মিয়া উপস্থিত আছি রাত নয়টা পর্যন্ত। জনাব মাদানী তখন ঢাকার কমিশনার এবং হাফিজ মোহাম্মদ ইসহাক সিএসপি তখন চিফ সেক্রেটারি।

আমি যখন মাদানী সাহেবকে বললাম, পাঁচশত লোক মারা গেছে, তাঁরা বিশ্বাস করতে চান নাই। মাদানী সাহেব বললেন, পঞ্চাশ জন হতে পারে। আমি তাঁকে বললাম, একটা একটা করে গণনা করেছি, নিজে গিয়ে দেখে আসুন। পরে মাদানী সাহেব স্বীকার করেছিলেন। রাত নয়টায় আমাকে ও মোহন মিয়াকে জানান হল, মিল এরিয়া মিলিটারিদের হাতে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। জনাব শামসুদ্দোহা তখন পুলিশের আইজি। আমাকে এসে বললেন, "স্যার, সর্বনাশ হয়ে গেছে, মিলিটারিরা সকলে অবাঙালি।" আমি হেসে দিয়ে বললাম, "সর্বনাশের কি আর কিছু বাকি আছে? আপনি যখন পুলিশ ও ইপিআর নিয়ে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করতে পারলেন না, তখন আর মিলিটারির হাতে না দিয়ে উপায় কি?" তখন ইপিআর (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস) প্রাদেশিক গভর্নমেন্টের অধীনে ছিল। ঢাকায় যেয়ে দেখি কি হয়েছে। চিফ মিনিস্টার নিশ্চয়ই মত দিয়েছেন। আমরা সোজা চিফ মিনিস্টারের বাড়িতে পৌঁছালাম। যেয়ে শুনতে পারলাম, তিনি আমার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। চিৎকার করে সকলের সঙ্গে রাগারাগি করছেন, আমাকে কেন দাঙ্গা এরিয়ায় রেখে সকলে চলে এসেছে। আমি তাঁর কাছে গেলে তিনি আমাকে খুব আদর করলেন। আমাকে বললেন, "ক্যাবিনেট মিটিং এখনই হবে, তুমি যেও না"। রাত সাড়ে দশটায় ক্যাবিনেট মিটিং বসল। ক্যাবিনেট মিটিং শুরু হওয়ার পূর্বে দেখলাম, মন্ত্রীদের মধ্যে দু'একজনকে এর মধ্যে হাত করে নিয়েছেন দোহা সাহেব। আবদুল লতিফ বিশ্বাস সাহেব মিলিটারিকে কেন ভার দেওয়া হয়েছে তাই নিয়ে চিৎকার করছেন। হক সাহেব আসলেন। সভা শুরু হওয়ার পূর্বেই চিফ সেক্রেটারি ইসহাক সাহেবকে কড়া কথা বলতে শোনা গেল। আমি প্রতিবাদ করলাম এবং বললাম, ও কথা পরে হবে। পূর্বে যারা আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করতে পারে নাই এবং এতগুলি লোকের মৃত্যুর কারণ তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। এরপর ক্যাবিনেট আলোচনা শুরু হল। অনেক বিষয়ে আলোচনা হয়, সে কথা আমার পক্ষে বলা উচিত না, কারণ ক্যাবিনেটে মিটিংয়ের খবর বাইরে বলা উচিত না।

মিটিং শেষ হবার পর যখন বাইরে এলাম, তখন রাত প্রায় একটা। দেখি সোহরাওয়ার্দী সাহেবের ভক্ত কলকাতার পুরানা মুসলিম লীগ কর্মী রজব আলী শেঠ ও আরও অনেক অবাঙালি নেতা দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁরা আমাকে বললেন, এখনই ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকায় বের হতে। খবর রটে গেছে যে বাঙালিদের অবাঙালিরা হত্যা করেছে। যে কোনো সময় অবাঙালিদের উপর আক্রমণ হতে পারে। তাড়াতাড়ি রজব আলী শেঠ ও আরও কয়েকজনকে নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তার মোড়ে মোড়ে ভিড় জমে আছে তখন পর্যন্ত। আমি গাড়ি থেকে নেমে বক্তৃতা করে সকলকে বুঝাতে লাগলাম এবং অনেকটা শান্ত করতে সক্ষম হলাম। রাত চার ঘটিকায় বাড়িতে পৌঁছালাম। শপথ নেওয়ার পরে পাঁচ মিনিটের জন্য বাড়িতে আসতে পারি নাই। আর দিনভর কিছু পেটেও পড়ে নাই। দেখি রেণু চুপটি করে না খেয়ে বসে আছে, আমার জন্য।

এই দাঙ্গা যে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে হেয়প্রতিপন্ন করার জন্য এবং দুনিয়াকে নতুন সরকারের অক্ষমতা দেখাবার জন্য বিরাট এক ষড়যন্ত্রের অংশ সে সম্বন্ধে আমার মনে কোনো সন্দেহ নাই। কয়েকদিন পূর্বে এই ষড়যন্ত্র করাচি থেকে করা হয়েছিল এবং এর সাথে একজন সরকারি কর্মচারী এবং মিলের কোন কোন কর্মচারী প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল। যুগ যুগ ধরে পুঁজিপতিরা তাদের শ্রেণী স্বার্থে এবং রাজনৈতিক কারণে গরিব শ্রমিকদের মধ্যে দাঙ্গাহাঙ্গামা, মারামারি সৃষ্টি করে চলেছে। তবে ব্যক্তিগতভাবে আদমজী মিলের মালিক গুল মোহাম্মদ আদমজী এসব জানতেন কি না সন্দেহ!

কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সরকার মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে যে সুযোগ খুঁজতে ছিল এই দাঙ্গায় তা সৃষ্টি করতে সক্ষম হল। মোহাম্মদ আলী মুসলিম লীগ ও পশ্চিমা শিল্পপতিদের যোগসাজশে যে যুক্তফ্রন্টকে ভাঙতে চেষ্টা করছিল আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভায় যোগদান করায় তা সফল হল না। তাই ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ও তাদের দালালদের সাহায্যে চেষ্টা করে হতাশ হয়ে পরে অন্য পন্থা অবলম্বন করতে লাগল। এ সুযোগ সৃষ্টি করতে পারত না, যদি প্রথম দিনই যুক্তফ্রন্ট পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা গঠন করে শাসনব্যবস্থাকে কন্ট্রোল করতে চেষ্টা করত।

যুক্তফ্রন্ট ইলেকশনে জয়লাভ করার পরে বড় বড় সরকারি আমলাদের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার হয়েছিল। অনেকে প্রত্যক্ষভাবে মুসলিম লীগের পক্ষে প্রচার করেছিল। আওয়ামী লীগ প্রথমে মন্ত্রিসভায় যোগদান না করায় তাদের প্রাণে পানি এসেছিল। যোগদান করার পরে তাঁরা হতাশ হয়ে পড়ল এবং ষড়যন্ত্রে যোগদান করল। তবে হাফিজ মোহাম্মদ ইসহাক, চিফ সেক্রেটারি এই পরিবর্তনকে আনন্দের সাথে গ্রহণ করেছিলেন।

পরের দিন আবার আমি আদমজী জুটমিলে যাই এবং যাতে শ্রমিকদের খাবার ও থাকার কোন কষ্ট না হয় তার দিকে নজর দিতে সরকারি কর্মচারীদের অনুরোধ করি। সেক্রেটারিয়েটে যেয়ে চিফ সেক্রেটারিকে ডেকে তাঁর সঙ্গে আলাপ করলাম। ঐদিকে কাকে কোন মন্ত্রণালয় দেওয়া হবে তাই নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। সেখানেও ষড়যন্ত্র আরম্ভ হয়েছে। আওয়ামী লীগারদের যেন ভাল দপ্তর দেওয়া না হয় সে চেষ্টা চলছে। এক মহাবিপদে পড়া গেল। মোহন

মিয়া সাহেবই হক সাহেবের সাথে পরামর্শ করে উল্টাপাল্টা করতে লাগলেন। আমি হক সাহেবকে বললাম, "এ সমস্ত ভাল লাগে না, দরকার হয় মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিয়ে চলে যাব।"

পরের দিন দফতর ভাগ করা হল। আমাকে কো-অপারেটিভ ও এগ্রিকালচার ডেভেলপমেন্ট দফতর দেওয়া হল। এগ্রিকালচার আবার আলাদা করে অন্যকে দিল। জনাব সোবহান সিএসপি, দপ্তর ভাগ বাটোয়ারা করতে মোহন মিয়াকে পরামর্শ দিতেছিল। আমি তাঁকে ডেকে বললাম, "আপনি আমাকে জানেন না, বেশি ষড়যন্ত্র করবেন না।" আমি হক সাহেবের কাছে আবার হাজির হয়ে বললাম, "নানা, ব্যাপার কি? এ সমস্ত কি হচ্ছে, আমরা তো মন্ত্রী হতে চাই নাই। আমাদের ভিতরে এনে এ সমস্ত ষড়যন্ত্র চলছে কেন?" তিনি আমাকে ডেকে বললেন, "করবার দে, আমার পোর্টফলিও তোকে দিয়ে দেব, তুই রাগ করিস না, পরে সব ঠিক করে দেব।" বৃদ্ধলোক, তাঁকে আর কি বলব, তিনি আমাকে খুব স্নেহ করতে শুরু করেছেন। দরকার না হলেও আমাকে ডেকে পাঠাতেন। তিনি খবরের কাগজের প্রতিনিধিদের বলেছেন, "আমি বুড়া আর মুজিব গুড়া, তাই ওর আমি নানা ও আমার নাতি।" আমি সকলের চেয়ে বয়সে ছোট। আর হক সাহেব সকলের চেয়ে বয়সে বড়। তিনি আমাকে যে কাজই করতে বলতেন, আমি করতে লাগলাম। তাঁর মনটা উদার ছিল, যে কারণে তাঁকে আমি ভক্তি করতে শুরু করলাম। ষড়যন্ত্রকারীরা যখন তাঁর কাছে না থাকত তখন তিনি উদার ও অমায়িক। খুব বেশি বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, তাই এদের উপর তাঁর নির্ভর করতে হত। কিন্তু যেভাবে তিনি আমাকে স্নেহ করতে আরম্ভ করেছিলেন আমার বিশ্বাস হয়েছিল এদের হাত থেকে তাঁকে রক্ষা করা যাবে। আমি অফিসে যেয়ে ঐ ডিপার্টমেন্ট কি বুঝতে চেষ্টা করলাম, কারণ ডিপার্টমেন্ট সম্বন্ধে আমার বিশেষ কোনো ধারণা ছিল না। এই সময় মন্ত্রীরা সরকারি বাড়িতে উঠে এল, আমিও ঢাকার মিন্টো রোডে সরকারি ভবনে ছেলেমেয়ে নিয়ে উঠলাম।

*

দু'একদিন পরই হক সাহেব আমাকে বললেন, "করাচি থেকে খবর এসেছে, আমাকে যেতে হবে। তুই ও আতাউর রহমান আমার সাথে চল। নান্না, মোহন মিয়া ও আশরাফউদ্দিন চৌধুরীও যাবে, বেটাদের হাভভাব ভাল না।" আমি প্রস্তুত ছিলাম, কারণ আমাকে যেতেই হত। শহীদ সাহেব অসুস্থ হয়ে আছেন, তাঁকে দেখতে।

আমরা করাচি পৌঁছালাম। প্রথমেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সাথে আমাদের পূর্ব বাংলার সমস্যা নিয়ে আলোচনা হল। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আমাদের কি কি সাহায্যের প্রয়োজন তাও জানান হল। পশ্চিম পাকিস্তানে আমাদের বিরুদ্ধে ভীষণভাবে মিথ্যা প্রচার চালানো হয়েছে। যুক্তফ্রন্ট সরকারই নাকি এই দাঙ্গা সৃষ্টি করেছে। একথা কেউ কোনোদিন শুনেছে কি না আমার জানা নাই যে, সরকার নিজেই দাঙ্গা করে নিজেকে হেয় করার জন্য! আইনশৃঙ্খলা রক্ষার মালিক সরকার, সে কেন দাঙ্গা করে বদনাম নিবে? দাঙ্গা বাধিয়েছে যারা পরাজিত হয়েছে তারা। করাচি থেকে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে দুনিয়ার কাছে হেয় করতে

এই দাঙ্গার সৃষ্টি করা হয়। তারা সুযোগ খুঁজছে কোনো রকমে প্রাদেশিক সরকারকে বরখাস্ত করা যায় কি না? কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটের সাথে আলোচনা হওয়ার পরে প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী বগুড়া আমাদের তাঁর রুমে নিয়ে বসতে দিলেন। হক সাহেবও আছেন সেখানে। মোহাম্মদ আলী বেয়াদবের মত হক সাহেবের সাথে কথা বলতে আরম্ভ করলেন। আমার সহ্যের সীমা অতিক্রম করছিল। এমন সময় মোহাম্মদ আলী আমাকে বললেন, "কি মুজিবর রহমান, তোমার বিরুদ্ধে বিরাট ফাইল আছে আমার কাছে।" এই কথা বলে, ইয়াংকিদের মত ভাব করে পিছন থেকে ফাইল এনে টেবিলে রাখলেন। আমি বললাম, "ফাইল তো থাকবেই, আপনাদের বদৌলতে আমাকে তো অনেক জেল খাটতে হয়েছে। আপনার বিরুদ্ধেও একটা ফাইল প্রাদেশিক সরকারের কাছে আছে।" তিনি বললেন, "এর অর্থ।" আমি বললাম, "যখন খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেব ১৯৪৭ সালে পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী হয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করেন তখন আপনাকে মন্ত্রী করেন নাই। আমরা যখন ১৯৪৮ সালে প্রথম বাংলা ভাষার আন্দোলন করি, তখন আপনি গোপনে দুইশত টাকা চান্দা দিয়েছিলেন, মনে আছে আপনার? পুরানা কথা অনেকেই ভুলে যায়।" হক সাহেব ও সৈয়দ আজিজুল হক সাহেব দেখলেন হাওয়া গরম হয়ে উঠছে। তখন বললেন, "এখন আমরা চলি, পরে আবার আলাপ হবে।" আমি এক ফাঁকে হক সাহেবের সাথে যে সে বেয়াদবের মত কথা বলেছিল, সে সম্বন্ধেও দু'এক কথা শুনিয়ে দিয়েছিলাম।

আমি অসুস্থ সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে দেখতে গেলাম। শহীদ সাহেব বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেন না, কথা বলতেও কষ্ট হয়। ডাক্তার বাইরের লোকের সাথে দেখা করতে নিষেধ করে দিয়েছেন। আমাকে দেখে তিনি খুব খুশি হলেন। বেবী (শহীদ সাহেবের একমাত্র মেয়ে) আমাকে বলে দিয়েছিল, রাজনীতি নিয়ে আলাপ যেন না করি। তিনি আস্তে আস্তে আমার কাছে রাজনীতি বিষয়েই জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। আমি দু'এক কথা বলেই চুপ করে যাই। তিনি শেষ পর্যন্ত বললেন, "বিরাট খেলা শুরু করেছে মোহাম্মদ আলী ও মুসলিম লীগ নেতারা।"

হক সাহেব আমাকে বললেন, "গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ তাঁর সাথে আমাদের দেখা করতে অনুরোধ করেছেন।" আমরা বড়লাটের বাড়িতে উপস্থিত হলাম। তিনি যে কামরায় শুয়ে শুয়ে দেশ শাসন করতেন, সেই ঘরেই আমাদের নিয়ে যাওয়া হল। তিনি খুবই অসুস্থ। হাত-পা সকল সময়ই কাঁপে। কথাও পরিষ্কার করে বলতে পারেন না। তিনি হক সাহেবের সাথে আলাপ করলেন। আমার নাম ধরে জিজ্ঞাসা করলেন, উপস্থিত আছি কি না! হক সাহেব আমাকে দেখিয়ে দিলেন। আমি আদাব করলাম। তিনি আমাকে কাছে ডেকে নিয়ে বসালেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, "লোকে বলে, আপনি কমিউনিস্ট, একথা সত্য কি না?" আমি তাঁকে বললাম, "যদি শহীদ সাহেব কমিউনিস্ট হন, তাহলে আমিও কমিউনিস্ট। আর যদি তিনি অন্য কিছু হন তবে আমিও তাই।" তিনি হেসে দিয়ে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে বললেন, "আপনি এখনও যুবক, দেশের কাজ করতে পারবেন। আমি আপনাকে দোয়া করছি। আপনাকে দেখে আমি খুশি হলাম।" কথাগুলি বুঝতে আমার খুব

কষ্ট হচ্ছিল, কারণ কথা তিনি পরিষ্কার করে বলতে পারেন না। মুখটাও বাঁকা হয়ে গেছে। হাত-পা শুকিয়ে গিয়েছে। আল্লাহ সমস্ত বুদ্ধি আর মাথাটা ঠিক রেখে দিয়েছেন।

আমরা পরের দিনই খবর পেলাম পূর্ব বাংলায় গভর্নর শাসন দিবে, মন্ত্রিসভা ভেঙে দিবে, এই নিয়ে আলোচনা চলছে। কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব বাংলা সরকারের চিফ সেক্রেটারি জনাব ইসহাক সাহেবকে আদেশ দিয়েছে, যাতে আমরা পূর্ব বাংলায় আসতে না পারি— যাতে আমাদের প্লেনের টিকিট করতে না দেওয়া হয়। তিনি অস্বীকার করলেন এই কথা বলে যে, 'এখনও তাঁরা মন্ত্রী। আইনত তিনি আমাদের আদেশ মানতে বাধ্য।' তাঁকে আরও বলা হয়েছিল, তাঁর রিপোর্ট পরিবর্তন করতে। তিনি তাও করতে আপত্তি করলেন। এটা না করার ফল হিসাবে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং অনেক দিন পর্যন্ত ছুটি ভোগ করতে বাধ্য করেছিল। আমি ও আতাউর রহমান সাহেব এ খবর পেয়েছিলাম। তাই হক সাহেবকে যেয়ে বললাম, "আমরা আজই ঢাকা রওয়ানা করব। কারণ, আজ না যেতে পারলে আরও কয়েকদিন থাকতে হবে। প্লেনের টিকিট পাওয়া সম্ভব না।" হক সাহেবকে অবস্থা বুঝিয়ে বললে তিনিও নান্না মিয়াকে ডেকে বললেন, তিনিও যাবেন। নান্না মিয়াও রাজি হলেন। মোহন মিয়া ও আশরাফউদ্দিন চৌধুরী সাহেব করাচি থেকে তদ্বির করবেন, কোনো কিছু করা যায় কি না।

আমরা টিকিট করতে হুকুম দিয়ে শহীদ সাহেবের কাছে উপস্থিত হলাম। তাঁকে কিছু কিছু বললাম। তিনি অতি কষ্টে আমাকে বললেন, "দু'একদিনের মধ্যে চিকিৎসার জন্য আমাকে জুরিখ যেতে হবে, টাকার অভাব হয়ে পড়েছে।" আমি বললাম, "ঢাকা যেয়ে কিছু টাকা বেবীর কাছে পাঠিয়ে দিব।" মনে মনে দুঃখ করলাম, আর ভাবলাম, যে লোক হাজার হাজার টাকা উপার্জন করে গরিবকে বিলিয়ে দিয়েছেন আজ তাঁর চিকিৎসার টাকা নাই, একেই বলে কপাল।

বোধহয় ২৯শে মে হবে, আমরা রাতের প্লেনে রওয়ানা করলাম। দিল্লি কলকাতা হয়ে ঢাকা পৌঁছাবে বিওএসি প্লেন। আমাদের সাথে চিফ সেক্রেটারি হাফিজ ইসহাক ও আইজিপি শামসুদ্দোহা সাহেব ঢাকা রওয়ানা করলেন। দোহা সাহেব কেন এবং কার হুকুমে করাচি গিয়েছিলেন আমার জানা ছিল না। হক সাহেব পরে আমাকে বলেছেন, তিনিই হুকুম দিয়েছেন। কলকাতা পৌঁছাবার কিছু সময় পূর্বে জনাব দোহা হক সাহেবকে যেয়ে বললেন, "স্যার আমার মনে হয় আপনার আজ কলকাতা থাকা উচিত। কি হয় বলা যায় না, এদের ভাবসাব ভাল দেখলাম না। রাতেই ইস্কান্দার মির্জা এবং এন. এম. খান ঢাকায় মিলিটারি প্লেনে রওয়ানা হয়ে গেছেন। ঢাকা এয়ারপোর্টে কোনো ঘটনা হয়ে যেতে পারে। যদি কোনো কিছু না হয়, তবে আগামীকাল প্লেন পাঠিয়ে আপনাদের নেওয়ার বন্দোবস্ত করব।" হক সাহেব সবই বুঝতেন, তিনি নান্না মিয়াকে ও আমাকে দেখিয়ে দিয়া বললেন, "ওদের সাথে আলাপ করুন।" আমার কাছে দোহা সাহেব এসে ঐ একই কথা বললেন। আমি তাকে পরিষ্কার বলে দিলাম, "কেন কলকাতায় নামব? কলকাতা আজ আলাদা দেশ। যা হয় ঢাকায়ই হবে।" নান্না মিয়াও একই জবাব দিলেন। আমার

বুঝতে বাকি থাকল না, কেন তিনি গায়ে পড়ে এই পরামর্শ দিতে এসেছেন। তিনি যে এই পরামর্শ দিচ্ছিলেন তা করাচি থেকেই ঠিক করেই এসেছেন। পাকিস্তানী শাসকচক্র দুনিয়াকে দেখাতে চায়, 'হক সাহেব দুই বাংলাকে এক করতে চান, তিনি পাকিস্তানের দুশমন, তিনি রাষ্ট্রদ্রোহী। আর আমরা তাঁর এই রাষ্ট্রদ্রোহী কাজের সাথী।'

কলকাতা এয়ারপোর্টে নামবার সাথে সাথে খবরের কাগজের প্রতিনিধিরা হক সাহেবকে ঘিরে ফেলল এবং প্রশ্ন করতে শুরু করল। তিনি মুখে আঙ্গুল দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন, তাঁর মুখ বন্ধ, আর আমাকে দেখিয়ে দিলেন। প্রতিনিধিরা আমার কাছে এলে, আমি বললাম, "এখানে আমাদের কিছুই বলার নাই। যদি কিছু বলতে হয়, ঢাকায় বলা যাবে।" কলকাতা এয়ারপোর্টে আমাদের প্রায় এক ঘণ্টা দেরি করতে হল। আবার দোহা সাহেব এসে বললেন, "টেলিফোন করে খবর পেলাম, সমস্ত ঢাকা এয়ারপোর্ট মিলিটারি ঘিরে রেখেছে। চিন্তা করে দেখেন, কি করবেন?" আমি তাঁকে বললাম, "ঘিরে রেখেছে ভাল, আমাদের তাতে কি, আমরা ঢাকায়ই যাব। বিদেশে এক মুহূর্তও থাকব না।" প্লেনে উঠে ভাবলাম, দোহা সাহেব পুলিশে চাকরি করেন, তাই নিজেকে খুবই বুদ্ধিমান মনে করেন। আমরা রাজনীতি করি, তাই এই সামান্য চালাকিটাও বুঝতে পারি না!

ঢাকায় এসে দেখলাম, বিরাট জনতা আমাদের অভ্যর্থনা করার জন্য অপেক্ষা করছে। আমরা সকলের সাথে দেখা করে যার যার বাড়ির দিকে রওয়ানা করলাম। আমরা হক সাহেবের পিএ সাজেদ আলীকে করাচি রেখে এসেছিলাম। যদি কোনো খবর থাকে তাহলে টেলিফোন করে যেন জানিয়ে দেয়।

※

বাসায় এসে দেখলাম, রেণু এখনও ভাল করে সংসার পাততে পারে নাই। তাকে বললাম, "আর বোধহয় দরকার হবে না। কারণ মন্ত্রিত্ব ভেঙে দিবে, আর আমাকেও গ্রেফতার করবে। ঢাকায় কোথায় থাকবা, বোধহয় বাড়িই চলে যেতে হবে। আমার কাছে থাকবা বলে এসেছিলা, ঢাকায় ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার সুযোগ হবে, তা বোধহয় হল না। নিজের হাতের টাকা পয়সাগুলিও খরচ করে ফেলেছ।" রেণু ভাবতে লাগল, আমি গোসল করে ভাত খেয়ে একটু বিশ্রাম করছিলাম। বেলা তিনটায় টেলিফোন এল, কেন্দ্রীয় সরকার ৯২(ক) ধারা জারি করেছে।[২৮] মন্ত্রিসভা বরখাস্ত করা হয়েছে। মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জাকে পূর্ব বাংলার গভর্নর, আর এন. এম. খানকে চিফ সেক্রেটারি করা হয়েছে।

আমি তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে আতাউর রহমানের বাড়িতে এসে তাঁকে নিয়ে হক সাহেবের বাড়িতে গেলাম এবং তাঁকে অনুরোধ করলাম ক্যাবিনেট মিটিং ডাকতে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই অন্যায় আদেশ আমাদের মানা উচিত হবে না এবং এটাকে অগ্রাহ্য করা উচিত। তিনি বললেন, কি হবে বুঝতে পারছি না, অন্যদের সাথে পরামর্শ কর। নান্না মিয়াকে বললাম,

তিনি কিছুই বলতে পারছেন না, মনে হল সকলে ভয় পেয়ে গেছেন। আতাউর রহমান সাহেব রাজি ছিলেন, যদি সকলে একমত হতে পারতাম। মন্ত্রীদের পাওয়া গেল না, হক সাহেব দোতলায় বসে রইলেন। আতাউর রহমান সাহেবকে বললাম, "আপনি দেখেন, সকলকে ডেকে আনতে পারেন কি না? আমি আওয়ামী লীগ অফিস থেকে কাগজপত্রগুলি সরিয়ে দিয়ে আসি। অফিস তালা বন্ধ করে দিতে পারে।"

আমি আওয়ামী লীগ অফিসে যেয়ে দরকারি কাগজপত্র সরিয়ে বের হওয়ার সাথে সাথে অন্য পথ দিয়ে পুলিশ অফিসে এসে পাহারা দিতে আরম্ভ করল। আমি আবার নান্না মিয়ার বাড়িতে উপস্থিত হওয়ার সাথে সাথে আমাকে জানাল, বড় বড় পুলিশ কর্মচারীরা আমাকে খুঁজতে এসেছিল। বাড়িতে ফোন করে জানলাম সেখানেও গিয়েছিল। আমি রেণুকে বললাম, "আবার আসলে বলে দিও শীঘ্র আমি বাড়িতে পৌঁছাব।" বিদায় নেওয়ার সময় অনেককে বললাম, "আমি তো জেলে চললাম, তবে একটা কথা বলে যাই, আপনারা এই অন্যায় আদেশ নীরবে মাথা পেতে মেনে নেবেন না। প্রকাশ্যে এর বাধা দেওয়া উচিত। দেশবাসী প্রস্তুত আছে, শুধু নেতৃত্ব দিতে হবে আপনাদের। জেলে অনেকের যেতে হবে, তবে প্রতিবাদ করে জেল খাটাই উচিত।" সেখান থেকে এসে পথে কয়েকজন কর্মীর সাথে দেখা করতে চেষ্টা করলাম, কাউকেও পাওয়া গেল না। আমি সরকারি গাড়ি ছেড়ে দিয়ে রিকশা ভাড়া করে বাড়ির দিকে রওয়ানা করলাম। দেখলাম, কিছু কিছু পুলিশ কর্মচারী আমার বাড়ি পাহারা দিচ্ছে। আমি রিকশায় পৌঁছালাম, তারা বুঝতে পারে নাই। রেণু আমাকে খেতে বলল, খাবার খেয়ে কাপড় বিছানা প্রস্তুত করে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জনাব এহিয়া খান চৌধুরীকে ফোন করে বললাম, "আমার বাড়িতে পুলিশ এসেছিল, বোধহয় আমাকে গ্রেফতার করার জন্য। আমি এখন ঘরেই আছি গাড়ি পাঠিয়ে দেন।" তিনি বললেন, "আমরা তো হুকুমের চাকর। গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি, আপনি প্রস্তুত হয়ে থাকুন। আপনাকে গ্রেফতার করার জন্য বার বার টেলিফোন আসছে।" আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে ফোন ছেড়ে দিলাম। রেণু আমার সকল কিছু ঠিক করে দিল এবং কাঁদতে লাগল। ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে পড়েছে। ওদের ওঠাতে নিষেধ করলাম। রেণুকে বললাম, "তোমাকে কি বলে যাব, যা ভাল বোঝ কর, তবে ঢাকায় থাকলে কষ্ট হবে, তার চেয়ে বাড়ি চলে যাও।"

বন্ধু ইয়ার মোহাম্মদ খানকে বলে গিয়েছিলাম, যদি রেণু বাড়ি না যায় তা হলে একটা বাড়ি ভাড়া করে দিতে। ইয়ার মোহাম্মদ খান ও আল হেলাল হোটেলের মালিক হাজী হেলাল উদ্দিন রেণুকে বাড়ি ভাড়া করে দিয়েছিল এবং তখন দেখাশোনাও করেছিল। কিছুদিন পরই ইয়ার মোহাম্মদ খান রেণুকে নিয়ে জেলগেটে আমার সাথে দেখা করতে আসলে তাঁকেও জেলগেটে গ্রেফতার করে। ইয়ার মোহাম্মদ খান ঢাকা থেকে এমএলএ হয়েছিলেন।

আধা ঘণ্টা পরে গাড়ি এসে হাজির। অনেক লোকই বাড়িতে ছিল, গ্রেফতার হওয়ার ভয়ে অনেকেই অন্ধকারে পালিয়ে গেছে। আমি গাড়িতে উঠে রওয়ানা করলাম। গোপালগঞ্জের

অল্প বয়সের এক কর্মী শহিদুল ইসলাম গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে কাঁদছিল। আমি গাড়ি থেকে নেমে তাকে আদর করে বুঝিয়ে বললাম, "কেন কাঁদিস, এই তো আমার পথ। আমি একদিন তো বের হব, তোর ভাবীর দিকে খেয়াল রাখিস।"

জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অফিসে আমাকে নিয়ে আসা হল। তিনি বসেই ছিলেন, আমাকে বললেন, "কি করব বলুন! করাচি আপনাকে গ্রেফতার করার জন্য পাগল হয়ে গেছে। আমরা তো জানি আপনাকে খবর দিলে আপনি চলে আসবেন। জেলের ভয় তো আপনি করেন না।" তাঁর কাছে অনেক টেলিফোন আসছিল, আমার আর তাঁর কামরায় থাকা উচিত না। তাঁকে বললাম, "আমাকে জেলে পাঠিয়ে দেন। খুবই ক্লান্ত, গতরাতেও ঘুম হয় নাই প্লেনে।"

তিনি আমাকে পাশের রুমে নিয়ে বসতে দিলেন। ইদ্রিস সাহেব তখন ঢাকার ডিআইজি। তিনি আসলেন, আমার সাথে খুব ভাল ব্যবহার করলেন। সিগারেট বা অন্য কিছু লাগবে কি না জানতে চাইলেন। আমি তাঁকেও বললাম, তাড়াতাড়ি জেলে পাঠিয়ে দিলেই খুশি হব। তিনি চলে যাওয়ার কয়েক মিনিট পরে একজন ইন্সপেক্টর এসে একটা ওয়ারেন্ট তৈরি করতে লাগলেন। একটা মামলা আমার নামে করা হল, তাতে দেখলাম, ডাকাতি ও খুন করার চেষ্টা, লুটতরাজ ও সরকারি সম্পত্তি নষ্ট, আরও কতগুলি ধারা বসিয়ে দিলেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব 'ডিভিশন' লিখে দিলেন। আমি রাত সাড়ে বারোটা কি একটা হবে, জেলগেটে পৌঁছালাম। দেখি, আমিই একলা আর কাউকেও আনা হয় নাই। কয়েক মিনিট পরে দেখলাম, মির্জা গোলাম হাফিজ আর সৈয়দ আবদুর রহিম মোক্তারকে আনা হয়েছে। তিনজনকে দেওয়ানি ওয়ার্ডে রাখা হল।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অফিস থেকে আসবার সময় ইদ্রিস সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক প্রফেসর আবদুল হাই সাহেব কোথায় থাকেন?" আমি তাঁকে বললাম, "জানলেও বলব না। কি করে আশা করতে পারেন যে, আপনাকে বলব?" দশ-পনের দিনের মধ্যে আওয়ামী লীগের প্রায় তিন হাজার কর্মী ও সমর্থক গ্রেফতার করা হল। অন্যান্য দলের সামান্য কয়েকজন কর্মী, আর কয়েকশত ছাত্র, এবং পঞ্চাশজনের মত এমএলএকে গ্রেফতার করা হল। গণতান্ত্রিক দলের কয়েকজন এমএলএকেও গ্রেফতার করা হয়েছিল। ঢাকা জেলের দেওয়ানি ওয়ার্ডে ও সাত সেলে কোরবান আলী, দেওয়ান মাহবুব আলী, বিজয় চ্যাটার্জী, খন্দকার আবদুল হামিদ, মির্জা গোলাম হাফিজ, ইয়ার মোহাম্মদ খান, মোহাম্মদ তোয়াহাকে রাখা হয়েছিল। পরে প্রফেসর অজিত গুহ ও মুনীর চৌধুরীকেও গ্রেফতার করে আনা হয়েছিল। হক সাহেবকে নিজ বাড়িতে অন্তরীণ করেছে।

৬ই জুন তারিখে আবু হোসেন সরকার সাহেবের বাড়িতে যুক্তফ্রন্ট পার্লামেন্টারি পার্টির সভা আহ্বান করা হয়। সামান্য কয়েকজন এমএলএ উপস্থিত হয়েছিলেন। কয়েকজন ভূতপূর্ব মন্ত্রীও এসেছিলেন। পুলিশ এসে সভা করতে নিষেধ করলে সকলে সভা ত্যাগ করে যার যার বাড়িতে রওয়ানা করেন।

পূর্ব বাংলায় গভর্নর শাসন জারি করার দিন প্রধানমন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ আলী যে বক্তৃতা রেডিও মারফত করেন, তাতে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক সাহেবকে 'রাষ্ট্রদ্রোহী' এবং আমাকে 'দাঙ্গাকারী' বলে আক্রমণ করেন। আমাদের নেতারা যারা বাইরে রইলেন, তাঁরা এর প্রতিবাদ করারও দরকার মনে করলেন না। দেশবাসী ৬ই জুনের দিকে চেয়েছিল, যদি নেতারা সাহস করে প্রোগ্রাম দিত তবে দেশবাসী তা পালন করত। যেসব কর্মী গ্রেফতার হয়েছিল তারা ছাড়াও যারা বাইরে ছিল তারাও প্রস্তুত ছিল। আওয়ামী লীগের সংগ্রামী ও ত্যাগী কর্মীরা নিজেরাই প্রতিবাদে যোগ দিতে পারত। যুক্তফ্রন্টের তথাকথিত সুবিধাবাদী নেতাদের মুখের দিকে চেয়ে থেকে তাও তারা করতে পারল না। অনেক কর্মীই চেষ্টা করে গ্রেফতার হয়েছিল। যদি সেইদিন নেতারা জনগণকে আহ্বান করত তবে এতবড় আন্দোলন হত যে কোনোদিন আর ষড়যন্ত্রকারীরা সাহস করত না বাংলাদেশের উপর অত্যাচার করতে। শতকরা সাতানব্বই ভাগ জনসাধারণ যেখানে যুক্তফ্রন্টকে ভোট দিল ও সমর্থন করল, শত প্রলোভন ও অত্যাচারকে তারা ভ্রূক্ষেপ করল না—সেই জনগণ নীরব দর্শকের মত তাকিয়ে রইল! কি করা দরকার বা কি করতে হবে, এই অত্যাচার নীরবে সহ্য করা উচিত হবে কি না, এ সম্বন্ধে নেতৃবৃন্দ একদম চুপচাপ।

একমাত্র আতাউর রহমান খান কয়েকদিন পরে একটা বিবৃতি দিয়েছিলেন। ৯২(ক) ধারা জারি হওয়ার কয়েকদিন পূর্বে মওলানা ভাসানী বিলাত গিয়েছেন। শহীদ সাহেব অসুস্থ হয়ে জুরিখ হাসপাতালে, আর আমি তো কারাগারে বন্দি। নীতিবিহীন নেতা নিয়ে অগ্রসর হলে সাময়িকভাবে কিছু ফল পাওয়া যায়, কিন্তু সংগ্রামের সময় তাদের খুঁজে পাওয়া যায় না। দেড় ডজন মন্ত্রীর মধ্যে আমিই একমাত্র কারাগারে বন্দি। যদি ৬ই জুন সরকারের অন্যায় হুকুম অমান্য করে (হক সাহেব ছাড়া) অন্য মন্ত্রীরা গ্রেফতার হতেন তা হলেও স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলন শুরু হয়ে যেত। দুঃখের বিষয়, একটা লোকও প্রতিবাদ করল না। এর ফল হল ষড়যন্ত্রকারীরা বুঝতে পারল যে, যতই হৈচৈ বাঙালিরা করুক না কেন, আর যতই জনসমর্থন থাকুক না কেন, এদের দাবিয়ে রাখতে কষ্ট হবে না। পুলিশের বন্দুক ও লাঠি দেখলে এরা পালিয়ে গর্তে লুকাবে। এই সময় যদি বাধা পেত তবে হাজার বার চিন্তা করত বাঙালিদের উপর ভবিষ্যতে অত্যাচার করতে।



এই দিন থেকেই বাঙালিদের দুঃখের দিন শুরু হল। অযোগ্য নেতৃত্ব, নীতিহীন নেতা ও কাপুরুষ রাজনীতিবিদদের সাথে কোনোদিন একসাথে হয়ে দেশের কোনো কাজে নামতে নেই। তাতে দেশসেবার চেয়ে দেশের ও জনগণের সর্বনাশই বেশি হয়। ঠিক মনে নাই, তবে দুই-তিন দিন পরে আমাকে আবার নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করা হল। নিরাপত্তা আইনে বন্দিদের বিনা বিচারে কারাগারে আটক থাকতে হয়। সরকার ভাবল, যে মামলায়

77

[illegible]

পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠার চিত্রলিপি

আমাকে গ্রেফতার করেছে, তাতে জামিন হলেও হয়ে যেতে পারে; তাই নিরাপত্তা আইনে তাদের পক্ষে সুবিধা হবে আমাকে অনির্দিষ্টকালের জন্য আটক রাখা। কি মামলায় আসামি করেছে আমার তা মনে নাই। আমি নাকি কাউকে হত্যা করতে চেষ্টা করেছি বা লুটপাট করতে উসকানি দিয়েছি। খবর নিয়ে জানলাম, জেলগেটে একটা গোলমাল হয়েছিল—আমি মন্ত্রী হওয়ার সামান্য কিছুদিন পূর্বে, সেই ঘটনার সাথে আমাকে জড়িয়ে এই মামলা দিয়েছে।

একদিন আমি আওয়ামী লীগ অফিসে ইফতার করছিলাম। ঢাকায় রোজার সময় জেলের বাইরে থাকলে আমি আওয়ামী লীগ অফিসেই কর্মীদের নিয়ে ইফতার করে থাকতাম। হঠাৎ টেলিফোন পেলাম, চকবাজারে জেল সিপাহিদের সাথে জনসাধারণের সামান্য কথা কাটাকাটি হওয়ায় জেল সিপাহিরা গুলি করেছে। একজন লোক মারা গিয়েছে এবং অনেকে জখম হয়েছে। ঢাকা কারাগার চকবাজারের পাশেই। হক সাহেব মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন, আমি তখনও মন্ত্রী হই নাই। আমি আতাউর রহমান সাহেবকে টেলিফোন করলাম। তাঁর বাসা চকবাজারের কাছে। তিনিও খবর পেয়েছেন, আমাকে তাঁর বাসায় যেতে বললেন। দরকার হলে একসাথে চকবাজার ও জেলখানায় যাওয়া যাবে। আমি পৌঁছার সাথে সাথে দু'জনে দ্রুত চকবাজারে পৌঁছালাম। অনেক লোক জমা হয়ে আছে এবং তারা খুবই উত্তেজিত। আমরা উপস্থিত হলে তারা আমাদের ঘিরে ফেলল এবং সকলে একসাথে চিৎকার করতে শুরু করল। সকলেই একসঙ্গে কথা বলতে চায়, কি ঘটনা ঘটেছে জানাতে। আমরা যখন তাদের অনুরোধ করলাম, এক একজন করে বলতে, তখন তারা একটু শান্ত হল এবং ঘটনাটা বলল। একজন ওয়ার্ডারের সাথে এক পানের দোকানদারের কথা কাটাকাটি এবং পরে মারামারি হয়। এই অবস্থায় দু'চারজন ওয়ার্ডারও হাজির হয়ে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডারের পক্ষ নেয়, আর জনসাধারণ দোকানদারের পক্ষ নেয়। সিপাহিরা একটু বেশি মার খায়। তারা ব্যারাকে ফিরে গিয়ে রাইফেল এনে গুলি করতে শুরু করে। এতে অনেক লোক জখম হয় এবং তিনজন আহত লোককে ধরে জেল এরিয়ার ভিতরে নিয়ে যায়। অনেক লোক তখন জমা হয়েছে। আমরা দুইজনই তাদের শান্ত হতে বলে, জেলগেটের দিকে রওয়ানা করেই দেখতে পেলাম, সৈয়দ আজিজুল হক ওরফে নান্না মিয়া (তখন মন্ত্রী) খবর পেয়ে এসেছেন। তাঁর সাথে একজন বিশিষ্ট সরকারি কর্মচারী আছেন। আমরা একসাথে জেলগেটের ভিতরে পৌঁছালাম। সেখানে জেল সুপারিনটেনডেন্ট ও জেলারের সাথে আলাপ হল। এ সময় আরও দু'একজন মন্ত্রী, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ডিভিশনাল কমিশনার এসে হাজির হয়েছেন। জনসাধারণ মন্ত্রীদের ও আমাদের দেখে একদম জেলগেটের সামনে এসে জড়ো হয়েছে। হাজার হাজার লোক চিৎকার করতে আরম্ভ করেছে।

ঢাকা জেলে তখন একজন এ্যাংলো ইন্ডিয়ান সার্জেন্ট ছিল, তার নাম মিস্টার গজ। সত্যি কি না বলতে পারি না, তবে জনতা 'গজের বিচার চাই, গজ নিজে গুলি করেছে'—ইত্যাদি বলে চিৎকার করতে শুরু করেছে। গজের বাসা জেলগেটের সামনেই। কে যেন বলে দিয়েছে, এটা গজের বাড়ি। জনতা গজের বাড়ি আক্রমণ করে ফেলেছে। যাঁরা উপস্থিত

ছিলেন—মন্ত্রী, নেতা এবং সরকারি কর্মচারী তাঁরা আমাকে অনুরোধ করল বাইরে যেতে। এত বড় ঘটনা ঘটে গেছে, একজন আর্মড পুলিশও এক ঘণ্টা হয়ে গেছে, এসে পৌঁছায় নাই। আমি বাইরে যেয়ে জনতার মোকাবেলা করলাম। নিজের হাতে অনেককে ঠেলা ধাক্কা দিয়ে নিবৃত্ত করলাম। কর্মীদের নিয়ে মি. গজের বাড়ির বারান্দা থেকে উন্মত্ত জনতাকে ফেরত আনলাম। একটা গাড়ির উপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করলাম গোলমাল না করতে, শান্তি বজায় রাখতে। বললাম, সরকার বিচার করবে অন্যায়কারীর। মাইক্রোফোন নাই। গলায় কুলায় নাই। আবার গজের বাড়ির দিকে জনতা ছুটেছে। আবার আমি কর্মীদের নিয়ে জনতার সামনে দাঁড়িয়ে তার বাড়ি রক্ষা করলাম। আওয়ামী লীগের অনেক কর্মীও তখন পৌঁছে গেছে। আমি যখন লোকদের শান্ত করে জেলগেটের দিকে ফেরাই, ঠিক সেই সময় আইজিপি দোহা সাহেব কয়েকজন পুলিশ নিয়ে হাজির হলেন। তিনি আমার হাত ধরে ফেললেন এবং বললেন, "আপনি গ্রেফতার।" আমি বললাম, "খুব ভাল।" জনতা চিৎকার করে উঠে এবং আমাকে কেড়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগল। আমি তাদের বোঝাতে লাগলাম। আবার দুই-তিন মিনিট পরে দোহা সাহেব ফিরে এসে বললেন, "আপনাকে অন্ধকারে চিনতে পারি নাই। ভুল হয়ে গেছে। চলুন জেলগেটে যাই।" আমি তার সাথে জেলগেটের ভিতরে পৌঁছালাম এবং বললাম, "প্রায় দুই ঘণ্টা হয়ে গেছে গোলমাল শুরু হয়েছে, আপনি এখন পুলিশ নিয়ে হাজির হয়েছেন। এতক্ষণ পর্যন্ত শান্তি রক্ষা আমাদেরই করতে হয়েছে। যা ভাল বোঝেন করেন, আমার কি প্রয়োজন। লালবাগ পুলিশ লাইন থেকে জেলগেট এক মাইলও হবে না, অথচ আপনার পুলিশ ফোর্স পৌঁছাতে এত সময় লাগল।" আমি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। জনতা একেবারে জেলগেটের সামনে এসে পড়েছে। আমরা দেখলাম, এখন পুলিশ লাঠিচার্জ বা গুলি করতে আরম্ভ করবে। কেউই জনতাকে বোঝাতে চেষ্টা করছে না। সরকারি পাবলিসিটি ভ্যানও আসতে বলা হয় নাই যে মাইক্রোফোন দিয়ে বক্তৃতা করে লোকদের বোঝানো যায়। খালি গলায় চিৎকার করে কাউকেও শোনানো যাবে না। যাঁরা সুপারিনটেনডেন্ট সাহেবের রুমে বসেছিলেন তাঁদের বলে জনতাকে নিয়ে এক মিছিল করে রওয়ানা করলাম। আমাদের অনেক কর্মীও বাইরে ছিল। আমি বাইরে এসে জনতাকে বললাম, "চলুন এই অত্যাচারের প্রতিবাদ করার জন্য মিছিল করা যাক।" আমি হাঁটা দিলাম। প্রায় শতকরা সত্তরজন লোক আমার সাথে রওয়ানা করল। আমি সদরঘাট পর্যন্ত দেড় মাইল পথ এদের নিয়ে এলাম।

আওয়ামী লীগ অফিসে যেয়ে পরের দিন পল্টন ময়দানে এক সভা করব ঘোষণা করলাম। এটা খুবই অন্যায়, জেল ওয়ার্ডার কেন জেল এরিয়ার বাইরে যেয়ে গুলি করবে? আর কার অনুমতি নিয়েছে? কে ম্যাগজিন খুলে দিয়েছে? ওয়ার্ডারদের কাছে তো রাইফেল সব সময় থাকে না। আমি যখন আওয়ামী লীগ অফিসে বসে আলাপ করছিলাম তখন রাত প্রায় দশটা। আবার খবর এল, জেলগেটে গুলি হয়েছে। একজন লোক মারা গেছে। আমি আর জেলগেটে যাওয়া দরকার মনে করলাম না। আতাউর রহমান সাহেবকে টেলিফোনে বললাম, সভা ডেকে দিয়েছি, তিনি সম্মতি দিলেন।

পরের দিন পল্টন ময়দানে বিরাট সভা হল। আমি বক্তৃতা করলাম, যে দোষী তাকে শাস্তি দেওয়া উচিত, আর যারা গুলিতে মারা গিয়াছে তাদের জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। পুলিশ কেন সময় মত উপস্থিত হয় নাই, তারও একটা তদন্ত হওয়া উচিত। এর কয়েকদিন পরে যখন মন্ত্রী হলাম এবং এ ঘটনা সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, না হয়ে থাকলে কি করা উচিত এ বিষয়েও আমরা আলোচনা করেছিলাম। মন্ত্রিসভা বরখাস্ত ও গভর্নর শাসন কায়েম হওয়ার পরে আমাকে ঐ জেলগেট দাঙ্গার কেসে আসামি করা হল এবং মামলা দায়ের করা হল। ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত এই মামলা চলে। জনাব ফজলে রাব্বী, প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে বিচার হয়। অনেক মিথ্যা সাক্ষী জোগাড় করেছিল। এমন কি মিস্টার গজের মেয়েও আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়েছিল। পাবলিক সাক্ষী জোগাড় করতে পারে নাই। জেল ওয়ার্ডের মধ্যে থেকেও কয়েকজন সাক্ষী এনেছিল। তার মধ্যে দুইজন ওয়ার্ডার সত্য কথা বলে ফেলল যে, তারা আমাকে দেখেছে গাড়ির উপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করতে এবং লোকদের চলে যেতেও আমি বলেছিলাম, তাও বলল। জেল সুপারিনটেনডেন্ট মিস্টার নাজিরউদ্দিন সরকার কিন্তু সত্য কথা বললেন না, পুলিশ যা শিখিয়ে দিয়েছিল তাই বললেন। এক একজন সাক্ষী এক এক কথা বলল এবং কিছু কিছু সরকারি সাক্ষী একথাও স্বীকার করল যে, আমি জনতাকে শান্তি রক্ষা করতে অনুরোধ করেছিলাম। তাতে ম্যাজিস্ট্রেট আমার বিরুদ্ধে কোনো কিছু না থাকায় আমাকে বেকসুর খালাস দিলেন এবং রায়ে বলেছিলেন যে 'আমাকে শান্তিভঙ্গকারী না বলে শান্তিরক্ষকই বলা যেতে পারে।' তবে এইবারে বোধহয় আমাকে দশ মাস জেলে থাকতে হল নিরাপত্তা আইনে।



আমি জেলে থাকবার সময় কয়েকটি ঘটনা ঘটল—যাতে আমি ও অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দিরা খুবই মর্মাহত হয়ে পড়লাম। গৃহবন্দি হওয়ার কিছুদিন পরেই শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক সাহেবকে দিয়ে তাঁর সমর্থকরা এক বিবৃতি দিয়েছিলেন। তাতে তিনি অন্যায় স্বীকার করে দুঃখ প্রকাশ করলেন। তিনি যুক্তফ্রন্টের নেতা, তাঁর এই কথায় আমাদের সকলের মাথা নত হয়ে পড়ল। যারা আমরা জেলে ছিলাম তাদের মনের অবস্থা কি হয়েছিল তা লেখা কষ্টকর। খবরের কাগজ দেখে আমরা আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। তিনি বৃদ্ধ হয়ে গেছেন, তাঁর মনে দুর্বলতা আসতে পারে। যাঁরা বাইরে ছিলেন তাঁরা কি করলেন! সমস্ত জনসাধারণ আমাদের সমর্থন করেছিল। হাজার হাজার কর্মী কারাগারে বন্দি। আমি ও আমার সাথে যারা বন্দি ছিল তারা এক জায়গায় বসে আলোচনা করলাম এবং স্থির করলাম এই 'কৃষক শ্রমিক দলে'র সাথে আর রাজনীতি করা যায় না। এদিকে কারাগারে বসেও খবর পেতে লাগলাম যে, কৃষক শ্রমিক দলের কয়েকজন নামকরা নেতা—যাঁরা ১৯৫৩ সালে মুসলিম লীগ থেকে বিতাড়িত হয়েছেন তাঁরা গোপনে গোপনে মোহাম্মদ আলীর সাথে আলোচনা চালিয়েছেন কিভাবে আবার মন্ত্রিত্ব পেতে পারেন। দরকার হলে

আওয়ামী লীগের সাথে কোনো সম্পর্ক তাঁরা রাখবেন না। আদমজী মিলের এতবড় দাঙ্গার সাথে জড়িত সরকারি কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নিয়ে মিস্টার ইস্কান্দার মির্জা গভর্নর হয়ে রাজনৈতিক কর্মীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

অন্যদিকে মুসলিম লীগ নেতাদের মধ্যে গোলমাল শুরু হয়ে গেল। গোলাম মোহাম্মদ ও মোহাম্মদ আলীর সাথে মনকষাকষি শুরু হয়েছে। এখন আর মোহাম্মদ আলী 'সুবোধ বালক' নন। তিনি গোলাম মোহাম্মদের ক্ষমতা খর্ব করে গণপরিষদে এক আইন পাস করে নিলেন। গোলাম মোহাম্মদও ছাড়বার পাত্র নন। তিনিও আঘাত করার জন্য প্রস্তুত হলেন। যে অদৃশ্য শক্তি তাঁকে সাহায্য করেছিল নাজিমুদ্দীন সাহেবকে পদচ্যুত করতে, সেই অদৃশ্য শক্তি তাঁর পিছনে আছে, তিনি তা জানেন। সেই অদৃশ্য শক্তিই ধাপে ধাপে গোলমাল সৃষ্টি করার সুযোগ দিচ্ছে। ক্ষমতা দখল করার জন্য এখন খেলা শুরু করে দিয়েছে। সেপ্টেম্বর মাসে গণপরিষদে আইন পাস করে মোহাম্মদ আলী গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদের সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার এক মাস পরে, ২৪ অক্টোবর ১৯৫৪ সালে গোলাম মোহাম্মদ পাকিস্তানে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে গণপরিষদ ভেঙে দিলেন। গণপরিষদ ছিল সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই গণপরিষদের সদস্যরা ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত দেশে কোনো শাসনতন্ত্র ইচ্ছা করেই দেন নাই। গণপরিষদ একদিকে শাসনতন্ত্র তৈরি করার অধিকারী, অন্যদিকে জাতীয় পরিষদ হিসাবে দেশের আইন পাস করারও অধিকারী। ভারত ও পাকিস্তান একই সঙ্গে স্বাধীন হয়। একই সময় দুই দেশে গণপরিষদ গঠন হয়। ভারত ১৯৫২ সালে শাসনতন্ত্র তৈরি করে দেশজুড়ে প্রথম সাধারণ নির্বাচন দেয়। আবার জাতীয় নির্বাচনের তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছে।

আমাদের গণপরিষদের কতক সদস্য কিছু একটা কোটারির সৃষ্টি কবে রাজত্ব কায়েম করে নিয়েছে। পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক নির্বাচনে পরাজিত হয়েও এদের ঘুম ভাঙল না। এরা ষড়যন্ত্র করে পূর্ব বাংলার নির্বাচনকে বানচাল করে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করল। মোহাম্মদ আলী জানতেন তাঁর সাথে আর্মি নাই, আর থাকতেও পারে না। গোলাম মোহাম্মদকেই আর্মি সমর্থন করবে। তবুও এত বড় ঝুঁকি নিতে সাহস পেলেন কোথা থেকে? নিশ্চয়ই অদৃশ্য শক্তিই তাঁকে সাহস দিয়েছিল। পাঞ্জাবের যে কোটারি পাকিস্তান শাসন করছিল, তারা জানে, পূর্ব বাংলার এই ভদ্রলোকদের যতদিন ব্যবহার করা দরকার ছিল, করে ফেলেছে। এদের কাছ থেকে আর কিছু পাওয়ার নাই। আর এরাও পূর্ব বাংলার জনমতের চাপে মাঝে মাঝে বাধা সৃষ্টি করতে শুরু করেছিল। পশ্চিম পাকিস্তানীরা যুক্তফ্রন্টের জয়ের পরে এদের অবস্থাও বুঝতে পেরেছে। এরা যে পূর্ব বাংলার লোকের প্রতিনিধি নয় তাও জানা হয়ে গেছে।

মোহাম্মদ আলী তাঁহার সহকর্মীদের ত্যাগ করে আবার গোলাম মোহাম্মদের কাছে আত্মসমর্পণ করে কেয়ারটেকার সরকার গঠন করেন। এবারে তিনি পূর্বের চেয়ে বেশি গোলাম মোহাম্মদ ও চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর হাতের মুঠোয় চলে আসলেন। যদিও তিনি

প্রধানমন্ত্রী হলেন, কিন্তু সত্যিকারের ক্ষমতার মালিক ছিলেন চৌধুরী মোহাম্মদ আলী। আইয়ুব খানকে প্রধান সেনাপতি ও ইস্কান্দার মির্জাকে মন্ত্রী করে দেশটাকে আমলাদের হাতে তুলে দেওয়া হল। আইয়ুব সাহেবের মনে উচ্চাকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি পূর্বেই হয়েছিল। তার প্রমাণ আইয়ুব খানের আত্মজীবনী 'ফ্রেন্ডস নট মাস্টার্স'। তিনি এ বইতে স্বীকার করেছেন যে, ১৯৫৪ সালের ৪ঠা অক্টোবর লন্ডনের হোটেলে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে তাঁর মতামত লিখেছেন। কেন তিনি শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে লিখতে গেলেন? তিনি পাকিস্তান আর্মির প্রধান সেনাপতি, তিনি শত্রুর আক্রমণের হাত থেকে পাকিস্তানকে রক্ষা করবেন। সেইভাবে পাকিস্তানের আর্মড ফোর্সকে গড়ে তোলাই হল তাঁর কাজ।

গোলাম মোহাম্মদ আর চৌধুরী মোহাম্মদ আলী যে চক্রান্তের খেলা শুরু করেছিলেন, তাঁরা সাহস কোথা থেকে পেয়েছিলেন? নিশ্চয়ই জেনারেল আইয়ুব খান সকল কিছু বুঝেও চুপ করেছিলেন। রাজনীতিবিদরা নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ করে হেয়প্রতিপন্ন হয় এবং পাকিস্তানের জনগণ তাদের উপর থেকে আস্থা হারাতে বাধ্য হয়। এ অবস্থায় নেতাহীন ও নীতিহীন মুসলিম লীগ ক্ষমতায় থাকার জন্য সুযোগ করে নিতে চেষ্টা করতে লাগল। যখন গণপরিষদ ভেঙে দিয়ে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করা হল, তখনই দেখা গেল তথাকথিত লীগ নেতারা অনেকেই আবার মন্ত্রীর গদি অলঙ্কৃত করল। আর মুসলিম লীগের নেতা মোহাম্মদ আলী আবার মন্ত্রিত্ব পেয়ে দলের ও দেশের কথা ভুলে গেলেন।

মোহাম্মদ আলী (বগুড়া) প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে পাকিস্তানকে একটা ব্লকের দিকে নিয়ে গেলেন। দুনিয়া তখন দু'ইটা ব্লকে ভাগ হয়ে পড়েছে। একটা রাশিয়ান ব্লক বা সমাজতান্ত্রিক ব্লক, আর একটা হল আমেরিকান ব্লক যাকে ডেমোক্রেটিক ব্লক বা ধনতন্ত্রবাদী ব্লক বলা যেতে পারে—যদিও মরহুম লিয়াকত আলীর সময় থেকেই পাকিস্তান আমেরিকার দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। ১৯৫৪ সালের মে মাসে পাকিস্তান-আমেরিকা মিলিটারি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং পরে পাকিস্তান সিয়াটো[২৯] ও সেন্টো[৩০] বা বাগদাদ চুক্তিতে যোগদান করে পুরাপুরি আমেরিকার হাতের মুঠোর মধ্যে চলে যায়। এই দুইটা চুক্তিই রাশিয়া ও চীনের বিরোধী বলে তারা ধরে নিল। চুক্তির মধ্যে যা আছে তা পরিষ্কারভাবে কমিউনিস্টবিরোধী চুক্তি বলা যেতে পারে। নয়া রাষ্ট্র পাকিস্তানের উচিত ছিল নিরপেক্ষ ও স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করা। আমাদের পক্ষে কারও সাথে শত্রুতা করা উচিত না। সকল রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুভাবে বাস করা আমাদের কর্তব্য। কোনো যুদ্ধ জোটে যোগদান করার কথা আমাদের চিন্তা করাও পাপ। কারণ, আমাদের বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য সাহায্য করা দরকার, দেশের জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যও তা জরুরি।

আমাকে গ্রেফতারের পূর্বেই পাক-আমেরিকান মিলিটারি প্যাক্টের বিরুদ্ধে এক যুক্ত বিবৃতি দেই। আওয়ামী লীগের বৈদেশিক নীতি ছিল স্বাধীন, নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি। আমাদের বিবৃতি খবরের কাগজে বের হবার পরে আমেরিকানরা আমাদের উপরে চটে গেল। হক সাহেবের সাথে এক আমেরিকান সাংবাদিক দেখা করেন এবং তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে এক রিপোর্ট আমেরিকান কাগজে ছাপিয়ে দেন। সেই রিপোর্টটাও মোহাম্মদ আলী তাঁর বিবৃতির

মধ্যে উল্লেখ করেন। বিদেশী একজন সাংবাদিকের রিপোর্টের এত দাম মোহাম্মদ আলীর দেওয়ার কারণ, সেই সাংবাদিক ও তিনি দুজনেই আমেরিকান।



গোলাম মোহাম্মদ বেআইনিভাবে গণপরিষদ ভেঙে দিয়েছিলেন। তবু জনগণ এতে খুবই আনন্দিত হয়েছিল। কারণ, গণপরিষদের সদস্যদের হয়ত আট বৎসর পর্যন্ত থাকার আইনত অধিকার থাকলেও ন্যায়ত অধিকার ছিল না। আট বৎসর পর্যন্ত যে গণপরিষদ দেশকে একটা শাসনতন্ত্র দিতে পারে নাই, নির্বাচনে পরাজিত হয়েও যারা পদত্যাগ না করে ষড়যন্ত্র করে নির্বাচিত সদস্যদের বরখাস্ত করে, তাদের উপর জনগণের আস্থা থাকতে পারে না। যদিও গোলাম মোহাম্মদ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে এ কাজ করেন নাই, করেছিলেন নিজের এবং একটা অঞ্চলের একটা বিশেষ কোটারির স্বার্থ রক্ষা করার জন্য। অন্যায় জেনেও আমি খুশি হয়েছিলাম এই জন্য যে, এই গণপরিষদের সদস্যরা কোনোদিন শাসনতন্ত্র দিবে না। আর শাসনতন্ত্র ছাড়া একটা স্বাধীন দেশ কতদিন চলতে পারে? গণপরিষদের সদস্যদের লজ্জা না করলেও আমাদের লজ্জা করত। গণপরিষদের অধিকাংশ সদস্যই মুসলিম লীগার। মুসলিম লীগ নেতারা যখন লেজ গুটিয়ে আত্মসমর্পণ করল একমাত্র মরহুম তমিজুদ্দিন খান সাহেব গণপরিষদের প্রেসিডেন্ট হিসাবে গোলাম মোহাম্মদের এই আদেশের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। আমরা জেলে বসে খবরের কাগজের মারফতে যেটুকু খবর পাই, তাই সম্বল, তাই নিয়েই আলোচনা করি।

কয়েকজন বন্দি মুক্তি পেয়েছেন। এখন আমি, ইয়ার মোহাম্মদ খান, দেওয়ান মাহবুব আলী, বিজয় চ্যাটার্জী, অধ্যাপক অজিত গুহ, মোহাম্মদ তোয়াহা ও কোরবান আলী এক জায়গায় থাকি। দিন আমাদের কেটে যাচ্ছে কোনোমতে। অজিত বাবু আমাদের খাওয়া-দাওয়ার দেখাশোনা করিতেন। বাবুর্চি তিনি ভালই ছিলেন। অসুস্থ হয়েও নিজেই পাক করতেন। তিনি মুক্তি পাওয়ার পরে তোয়াহা ভার নিল। অজিত বাবুর মত ভাল পাকাতে না পারলেও কোনোমতে চালিয়ে নিত। আমি ও দু'একজন তার পিছু নিতাম। সে রাগ হয়ে মাঝে মাঝে বসে থাকত। আবার অনুরোধ করে তাকে পাঠাতাম। তার রাগ বেশি সময় থাকত না। কোরবান আলীর একটু কষ্ট হত। ভাগে যা পড়ত তাতে তার হত না। শরীরটা বেশ ভাল ছিল, খেতেও পারত।

কোরবানকে একদিন জেলগেটে নিয়ে গেল মুক্তির কথা বলে। আমাদের কাছ থেকে যথারীতি বিদায় নিয়ে মালপত্র সাথে নিয়ে জেলগেটে হাজির হওয়ার পরে একটায় মুক্তির আদেশ এবং সাথে সাথে আর একটা কাগজ বের করলেন একজন আইবি কর্মচারী, তাকে বলা হল, যদি বন্ড দেন, তবে এখনি বাইরে যেতে পারবেন। আর বন্ড না দিলে আবার জেলের মধ্যে ফিরে যেতে হবে। কোরবান ভীষণ একগুঁয়ে। সে ক্ষেপে গিয়ে অনেক কথা শুনিয়ে আবার জেলের মধ্যে ফিরে আসল এবং আমাদের সকল কথা বলল। অনেক দিন

কারাগারে বন্দি থাকার পরে মুক্তির আদেশ পেয়ে, জেলগেট থেকে আবার ফিরে আসা যে কত কষ্টকর এবং কত বড় ব্যথা, তা ভুক্তভোগী ছাড়া বোঝা কষ্টকর। পরের দিন জেল কর্তৃপক্ষকে ডেকে বলে দেওয়া হল আর কোনোদিন যেন এ কাজ না করা হয়। যদি কোনো বন্ড বা মামলা থাকে পূর্বেই জানিয়ে দিতে হবে। মালপত্র নিয়ে জেলগেটে গেলে এবং আবার ফিরে আসতে হলে ভীষণ গোলমাল হবে। রাজনৈতিক বন্দিরা দরখাস্ত করে নাই যে তারা বন্ড দিবে।

কয়েকদিন পরে এক আইবি কর্মচারী আমার সাথে দেখা করতে আসেন। তিনি নিজকে খুব বুদ্ধিমান মনে করেন বলে মনে হল। আমাকে বন্ড দেওয়ার কথা বলতে সাহস পাচ্ছেন না বা লজ্জা করছিলেন। আমি তাঁকে বলেছিলাম, "দয়া করে ঘোরাঘুরি করবেন না। আমার সাথে দেখা করার ইচ্ছা থাকলে আসতে পারেন, তবে লিখে নিয়ে যান— আপনার উপরওয়ালাদের জানিয়ে দিবেন, বন্ড আমার দেওয়ার কথাই ওঠে না। সরকারকেই বন্ড দিতে বলবেন, ভবিষ্যতে আর এই রকম অন্যায় কাজ যেন না করে। আর বিনা বিচারে কাউকেও বন্দি করে না রাখে।" ভদ্রলোক হাসতে লাগলেন এবং বললেন, "আপনাকে তো আমি বন্ড দিতে বলি নাই।" আমিও হেসে ফেললাম।

৮৮

কারাগারের দিনগুলি কোনোমতে কাটছিল। খবরের কাগজে দেখলাম, আতাউর রহমান খান সাহেব জুরিখ যাচ্ছেন, শহীদ সাহেবের সাথে দেখা করতে। সেখান থেকে বিলাত যাবেন, মওলানা ভাসানীর সাথে দেখা করতে। ভাসানী সাহেবের সাথে আরও তিনজন আওয়ামী লীগ কর্মী গিয়েছিলেন, তাঁরাও আর ফিরে আসতে পারেন নাই। প্রফেসর মোজাফফর আহমেদ, খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস আর এডভোকেট জমিরউদ্দিন দেশে ফিরে আসলেই তাঁদের গ্রেফতার করা হত। কিভাবে তারা সেখানে আছেন ভাববার কথা! খরচ কোথায় পাবেন? অনেক বাঙালি বিলাতে ছিল, তারাই নাকি থাকার জায়গা দিয়েছে আর সাহায্যও করেছে।

করাচিতে আতাউর রহমান সাহেব গোলাম মোহাম্মদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সম্পাদক ছিলেন তখন করাচির মাহমুদুল হক ওসমানী। তিনিও গোলাম মোহাম্মদের সাথে সাক্ষাৎ করে পূর্ব বাংলায় এসে আতাউর রহমান সাহেব, মানিক ভাই ও আরও অনেকের সাথে সাক্ষাৎ করেন। বুঝতে পারলাম, কিছু একটা চলছে। কিন্তু ষড়যন্ত্রের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগের জড়িয়ে পড়া উচিত হবে না। আমি তো বন্দি, কেইবা আমার কথা শুনবে?

আতাউর রহমান সাহেব, গোলাম মোহাম্মদের কাছ থেকে একটা বার্তা নিয়ে নাকি জুরিখে শহীদ সাহেবের সাথে দেখা করবেন। কি বার্তা হতে পারে অনেক গবেষণা হল। আতাউর রহমান সাহেবের উচিত ছিল প্রথমে রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি দাবি করা।

যদি গোলাম মোহাম্মদ বা মুসলিম লীগ নেতাদের সাথে কোনো আলোচনা করতে হয়, তবে প্রথমেই মওলানা ভাসানীকে দেশে ফিরিয়ে আনা এবং আমাদের মুক্তি দেওয়ার বন্দোবস্ত করা। আতাউর রহমান সাহেব জুরিখ থেকে ফিরে আসলেন। গোলাম মোহাম্মদ সাহেবও কিছুদিনের মধ্যে প্রোগ্রাম করলেন, ঢাকায় আসবেন। পাকিস্তানের বড়লাট ঢাকায় আসবেন ভাল কথা। পূর্ব বাংলায় তখন গভর্নর শাসন চলছে। পূর্বের সরকার ভেঙে দিয়েছিল। এখন পর্যন্ত সরকার গঠন করতে দেওয়া হয় নাই। এমএলএরা ও কর্মীরা জেলে। আওয়ামী লীগের সভাপতি বিলাতে, জেনারেল সেক্রেটারি কারাগারে বন্দি। অনেকের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা ঝুলছে। এই অবস্থায় কি করে গোলাম মোহাম্মদকে রাজকীয় সংবর্ধনা দেবার বন্দোবস্ত করার জন্য আওয়ামী লীগ নেতারা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন বুঝতে কষ্ট হতে লাগল। আরও দেখলাম, একটা ফুলের মালা নিয়ে আতাউর রহমান সাহেব, আর একটা মালা হক সাহেব নিয়ে তেজগাঁ এয়ারপোর্টে গোলাম মোহাম্মদ সাহেবকে অভ্যর্থনা করার জন্য দাঁড়িয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত গোলাম মোহাম্মদ সাহেবের গলায় দুইজনই মালা দিলেন। কিছুদিন পূর্বের থেকেই আওয়ামী লীগ ও কৃষক শ্রমিক দলের মধ্যে মনকষাকষি চলছিল এই অভ্যর্থনার ব্যাপার নিয়ে। এটা পরিষ্কার হয়ে পড়ল, কৃষক শ্রমিক দল আর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নয়, একমাত্র হক সাহেবের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তার উপর নির্ভর করে কিছু সংখ্যক সুবিধাবাদী লোক একজোট হয়েছে ক্ষমতার ভাগ বসানোর জন্য। এদের কোনো সংগঠন নাই, আদর্শ নাই, নীতি নাই। একমাত্র হক সাহেবই এদের সম্বল। তাঁরা গোলাম মোহাম্মদ সাহেবকে কেন মোহাম্মদ আলী (বগুড়া)কেও অভ্যর্থনা করতে পারেন; কিন্তু আওয়ামী লীগ একটা সংগ্রামী প্রতিষ্ঠান—সেই প্রতিষ্ঠানের নেতারা কি করে এই অগণতান্ত্রিক ভদ্রলোককে অভ্যর্থনা করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন আমার বুঝতে কষ্ট হল! আমি ও আমার সহবন্দিরা খুবই মর্মপীড়ায় ভুগছিলাম। আমাদের দুঃখ হল এজন্য যে, আমাদের নেতারাও ক্ষমতার লোভে পাগল হয়ে পড়েছেন। এতটুকু বুঝবার ক্ষমতা আমাদের নেতাদের হল না যে, যুক্তফ্রন্টের দুই গ্রুপকে নিয়ে খেলা শুরু হয়েছে। আওয়ামী লীগ ও কৃষক শ্রমিক দলকে আলাদা আলাদাভাবে তারা যোগাযোগ করছে, যাতে গোলাম মোহাম্মদ সাহেব পূর্ব বাংলায় এসে বিরাট অভ্যর্থনা পেতে পারেন। হলও তাই। কিন্তু তিনি যা করবেন, তা ঠিক করেই রেখেছেন। প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলীকে দিয়ে যে তিনি যুক্তফ্রন্টকে দ্বিধাবিভক্ত করাবেন সে ক্ষমতাও তাকে দেওয়া হয়েছিল। যদিও পরে শুনেছিলাম, গোলাম মোহাম্মদ ওয়াদা করেছিলেন শহীদ সাহেব জুরিখ থেকে ফিরে আসলেই তাঁকে প্রধানমন্ত্রী করা হবে। বড় বড় শিল্পপতিরা ও কিছু সংখ্যক আমলা কিছুতেই আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসে সেটা চাইছিলেন না।

মোহাম্মদ আলী ঢাকায় এসে গোপনে হক সাহেবের দলের সাথে বোঝাপড়া করে ফেলেছেন যে, আওয়ামী লীগকে না নিলে তাঁর দলকে পূর্ব বাংলায় সরকার গঠন করতে দিবে এবং শহীদ সাহেব যে কেউই নয় যুক্তফ্রন্টের, একথা ঘোষণা করতে হবে। তা হলেই শহীদ সাহেবকেও দূরে সরিয়ে রাখতে সক্ষম হবে। মোহাম্মদ আলী জানতেন শহীদ সাহেবই

একমাত্র লোক যে তাঁর প্রধানমন্ত্রীর পদের দাবিদার হতে পারেন। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে শহীদ সাহেব এত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন যে জনগণ তাঁকেই প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দেখতে চায়। চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা জানতেন, হক সাহেবের দলের সাথে আপোস করলে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বায়ত্তশাসন না দিয়েও পারা যাবে। তবে আওয়ামী লীগ স্বায়ত্তশাসন ছাড়া আপোস করবে না।



শহীদ সাহেব যখন ফিরে আসলেন রোগমুক্তির পরে, করাচিতে—তাঁকে বিরাট অভ্যর্থনা জনসাধারণ জানাল। একমাত্র জিন্নাহ ছাড়া এত বড় অভ্যর্থনা আর কেউ পায় নাই। পূর্ব বাংলা থেকে প্রায় বিশ-ত্রিশজন নেতাও তাঁকে অভ্যর্থনা দেয়ার জন্য করাচি উপস্থিত হয়েছিলেন। আতাউর রহমান সাহেব, আবুল মনসুর আহমদ সাহেব সকলেই প্রায় উপস্থিত ছিলেন। শহীদ সাহেব পৌঁছাবার সাথে সাথে কৃষক শ্রমিকের লোকেরা বলে বেড়াতে লাগলেন শহীদ সাহেব যুক্তফ্রন্টের কেউই নয়, হক সাহেবই নেতা। হক সাহেব তাঁকে সমর্থন করেন না, করেন মোহাম্মদ আলীকে। মন্ত্রিসভা গঠনে গোলাম মোহাম্মদ সাহেব শহীদ সাহেবকে বললেন, এ মন্ত্রিসভায় কেউই প্রধানমন্ত্রী নন, এটা কেয়ারটেকার সরকার। শীঘ্রই শহীদ সাহেবকে প্রধানমন্ত্রী করা হবে, তবে এখন আইনমন্ত্রী হয়ে তাঁকে একটা শাসনতন্ত্র দিতে হবে।

আমাদের নেতারা কি পরামর্শ শহীদ সাহেবকে দিয়েছিলেন জানি না, তবে শহীদ সাহেব ভুল করলেন, লাহোর ও ঢাকায় না যেয়ে, দেশের অবস্থা না বুঝে মন্ত্রিত্বে যোগদান করে। কৃষক শ্রমিক দলের নেতারা যাই বলুক না কেন, ঢাকায় এসে যদি যুক্তফ্রন্ট পার্টির সভা ডাকতে বলতেন এবং সদস্যদের সাথে পরামর্শ করে তারপর কোনো কিছু করতেন তা হলে কারও কিছু বলার থাকত না। জনগণের চাপে কৃষক শ্রমিক দলের নেতারা তাঁকে সমর্থন করতে বাধ্য হত। জনগণ চারদিকে অন্ধকার দেখছিল। তাদের একমাত্র ভরসা ছিল শহীদ সাহেব দেশে ফিরে আসবেন এবং পাকিস্তানের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব নিবেন। আমরা জেলের ভিতরে বসে খুবই কষ্ট পেলাম এবং আমাদের মধ্যে একটা হতাশার ভাব দেখা দিল। আমি নিজে কিছুতেই তাঁর আইনমন্ত্রী হওয়া সমর্থন করতে পারলাম না। এমনকি মনে মনে ক্ষেপে গিয়াছিলাম। অনেকে আমাকে অনুরোধ করেছিল শহীদ সাহেব রোগমুক্ত হয়ে ফিরে এসেছেন দেশে, তাঁকে টেলিগ্রাম করতে। আমি বলে দিলাম "না, কোন টেলিগ্রাম করব না, আমার প্রয়োজন নাই।"

রেণু টেলিগ্রাম পেয়েছে। আব্বার শরীর খুবই খারাপ, তাঁর বাঁচবার আশা কম। ছেলেমেয়ে নিয়ে গ্রামের বাড়িতে রওয়ানা করবে আব্বাকে দেখতে। একটা দরখাস্তও করেছে সরকারের কাছে, টেলিগ্রামটা সাথে দিয়ে। তখন জনাব এন. এম. খান চিফ সেক্রেটারি ছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে পাকিস্তান হওয়ার পূর্ব থেকেই তিনি আমাকে স্নেহ করতেন। রাত

115

[illegible]

পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠার চিত্রলিপি

আট ঘটিকার সময় আমার মুক্তির আদেশ দিলেন। নয়টার সময় আমাকে মুক্তি দেওয়া হল। সহকর্মীদের, বিশেষ করে ইয়ার মোহাম্মদ খানকে, ভিতরে রেখে বাইরে যেতে কষ্ট হল। কারণ, তিনি আমাকে জেলগেটে দেখতে এসে গ্রেফতার হয়েছিলেন। আমি বিদায় নিবার সময় বলে গেলাম, "হয় তোমরা মুক্তি পাবা, নতুবা আবার আমি জেলে আসব।" আমি জেলগেট পার হয়ে দেখলাম, রায় সাহেব বাজারের আমাদের কর্মী নূরুদ্দিন দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে বলল, "ভাবী এইমাত্র বাড়িতে রওয়ানা হয়ে গেছেন, আপনার আব্বার শরীর খুবই খারাপ। তিনি বাদামতলী ঘাট থেকে জাহাজে উঠেছেন। জাহাজ রাত এগারটায় নারায়ণগঞ্জ পৌঁছাবে। এখনও সময় আছে, তাড়াতাড়ি রওয়ানা করলে নারায়ণগঞ্জে যেয়ে জাহাজ ধরতে পারবেন।" তাকে নিয়ে ঢাকার বাড়িতে উপস্থিত হলাম। কারণ, পূর্বে এ বাড়ি আমি দেখি নাই। আমি জেলে আসার পরে রেণু এটা ভাড়া নিয়েছিল। মালপত্র কিছু রেখে আর সামান্য কিছু নিয়ে নারায়ণগঞ্জ ছুটলাম। তখনকার দিনে ট্যাক্সি পাওয়া কষ্টকর ছিল। জাহাজ ছাড়ার পনের মিনিট পূর্বে আমি নারায়ণগঞ্জ ঘাটে পৌঁছালাম। আমাকে দেখে রেণু আশ্চর্য হয়ে গেল। বাচ্চারা ঘুমিয়েছিল। রেণু তাদের ঘুম থেকে তুলল। হাচিনা ও কামাল আমার গলা ধরল, অনেক সময় পর্যন্ত ছাড়ল না, ঘুমালও না, মনে হচ্ছিল ওদের চোখে আজ আর ঘুম নাই।

মুক্তির আনন্দ আমার কোথায় মিলিয়ে গেছে। কারণ, আব্বার চেহারা চোখে ভেসে আসছিল। শুধু একই চিন্তা। দেখতে পারব কি পারব না? বেঁচে আছেন, কি নাই! কেবিন ছেড়ে অনেকক্ষণ বাইরে বসে রইলাম। আজ অনেক দিন পরে রাতের হাওয়া আমার গায়ে লাগছে। জেলে তো সন্ধ্যার সময়ই বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে দেয়। বাচ্চারা ঘুমিয়ে পড়লে রেণু আর আমি অনেকক্ষণ আলাপ করেছিলাম। ভোর রাতের দিকে ঘুমিয়ে পড়ি। সমস্ত দিন জাহাজে থাকতে হবে, রাতে বাড়ির ঘাটে পৌঁছাব। কোন খবর কেউ জানে না। নৌকায় দুই মাইল পথ যেতে হবে। বাড়ির থেকে নৌকাও আসবে না। সমস্ত দিন উৎকণ্ঠায় কাটালাম।

পরের রাতে বাড়িতে পৌঁছে শুনলাম, আব্বাকে গোপালগঞ্জ নিয়ে গিয়েছে। দেশে ডাক্তার নাই। নৌকায় আবার চৌদ্দ মাইল পথ, রাতেই রওয়ানা করলাম। পরের দিন বেলা দশটায় গোপালগঞ্জ যেয়ে আব্বার অবস্থা দেখে একটু শান্ত হলাম। আব্বা আরোগ্যের দিকে। ডাক্তার ফরিদ আহমদ সাহেব ও বিজিতেন বাবু বললেন, "ভয়ের কোন কারণ নাই।" দুইজনই ভাল ডাক্তার। আব্বা আমাকে পেয়ে আরও ভাল বোধ করতে লাগলেন। পরের দিনই টেলিগ্রাম পেলাম, শহীদ সাহেব আমাকে শীঘ্র করাচিতে ডেকে পাঠিয়েছেন। আতাউর রহমান সাহেব টেলিগ্রাম করেছেন। ঐদিন রওয়ানা করার কোন কথাই উঠতে পারে না।

পরের দিন রাতে আমি খুলনা, যশোর হয়ে প্লেনে ঢাকা পৌঁছালাম। ঢাকা থেকে করাচি রওয়ানা হয়ে গেলাম। আমি মনকে কিছুতেই সান্ত্বনা দিতে পারছি না। কারণ, শহীদ সাহেব আইনমন্ত্রী হয়েছেন কেন? রাতে পৌঁছে আমি আর তাঁর সাথে দেখা করতে যাই

নাই। দেখা হলে কি অবস্থা হয় বলা যায় না! আমি তাঁর সাথে বেয়াদবি করে বসতে পারি। পরের দিন সকাল নয়টায় আমি হোটেল মেট্রোপোলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই। তিনি বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। আমাকে দেখে বললেন, "গত রাতে এসেছ শুনলাম, রাতেই দেখা করা উচিত ছিল।" আমি বললাম, "ক্লান্ত ছিলাম, আর এসেই বা কি করব, আপনি তো এখন মোহম্মদ আলী সাহেবের আইনমন্ত্রী।" তিনি বললেন, "রাগ করছ, বোধহয়।" বললাম, "রাগ করব কেন স্যার, ভাবছি সারা জীবন আপনাকে নেতা মেনে ভুলই করেছি কি না?" তিনি আমার দিকে চেয়ে বললেন, "বুঝেছি, আর বলতে হবে না, বিকাল তিনটায় এস, অনেক কথা আছে।"

আমি বিকাল তিনটায় যেয়ে দেখি তিনি একলা শুয়ে বিশ্রাম করছেন। স্বাস্থ্য এখনও ঠিক হয় নাই, কিছুটা দুর্বল আছেন। আমি তাঁর কাছে বসলাম। তিনি আলাপ করতে আরম্ভ করলেন। অনেকক্ষণ আলাপ করলেন, তার সারাংশ হলো গোলাম মোহাম্মদ জানিয়ে দিয়েছেন যে, মন্ত্রিসভায় যোগাদান না করলে তিনি মিলিটারিকে শাসনভার দিয়ে দেবেন। আমি বললাম, "পূর্ব বাংলায় যেয়ে সকলের সাথে পরামর্শ করে অন্য কাউকেও তো মন্ত্রিত্ব দিতে পারতেন। আমার মনে হয় আপনাকে ট্র্যাপ করেছে। ফল খুব ভাল হবে না, কিছুই করতে পারবেন না। যে জনপ্রিয়তা আপনি অর্জন করেছিলেন, তা শেষ করতে চলেছেন।" তিনি আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন এবং বললেন, "কিছু না করতে পারলে ছেড়ে দেব, তাতে কি আসে যায়!" আমি বললাম, "এই ষড়যন্ত্রের রাজনীতিতে আপনার যোগদান করা উচিত হয় নাই, আপনি বুঝতে পারবেন।" তিনি আমাকে পূর্ব বাংলায় কখন যাবেন তার প্রোগ্রাম করতে বললেন। আমি বললাম, "ভাসানী সাহেব দেশে না এলে এবং রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি না দিয়ে আপনার ঢাকায় যাওয়া উচিত হবে না।" তিনি রাগ করে বললেন, "তার অর্থ তুমি আমাকে পূর্ব বাংলায় যেতে নিষেধ করছ।" আমি বললাম, "কিছুটা তাই।" তিনি অনেকক্ষণ চক্ষু বন্ধ করে চুপ করে রইলেন। পরে আমাকে বললেন, আগামীকাল আসতে, ঠিক বিকাল তিনটায়। আমি থাকতে থাকতে দেখলাম, আবু হোসেন সরকার সাহেবকে হক সাহেবের নমিনি হিসাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্বে গ্রহণ করা হয়েছে। শহীদ সাহেব কিছুই জানেন না। এবার তিনি কিছুটা বুঝতে পারলেন যে খেলা শুরু হয়েছে।

হক সাহেব লাহোরে এক খবরের কাগজের প্রতিনিধির কাছে বলেছেন, সোহরাওয়ার্দী যুক্তফ্রন্টের কেউই নন, আমিই নেতা। অথচ আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ যুক্তফ্রন্টে। হক সাহেব কেএসপি'র দলের নেতা। কেএসপি, নেজামে ইসলাম মিলেও আওয়ামী লীগের সমান হবে না। সোহরাওয়ার্দী সাহেব আওয়ামী লীগের নেতা—হক সাহেব একথা কি করে বলতে পারেন! হক সাহেবের দল গোলাম মোহাম্মদকে বলে দিয়েছে যে, তাঁরা সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে প্রধানমন্ত্রী চান না, মোহাম্মদ আলী বগুড়াকে চান, এই জন্যই শহীদ সাহেবকে প্রধানমন্ত্রী করা হয় নাই। আর মোহাম্মদ আলী সাহেব বলে দিয়েছেন, আওয়ামী লীগ দলকে বাদ দিয়েই পূর্ব বাংলায় সরকার গঠন করতে হবে। আমি বুঝতে পারলাম, মোহম্মদ আলী বগুড়া হক সাহেবের মাথায় তর করেছেন। আর চৌধুরী মোহাম্মদ

আলী শহীদ সাহেবের মাথায় ভর করেছেন। কেএসপি'র নেতারা তখন অনেকেই করাচিতে। কেউই শহীদ সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে আসেন না। আমার সাথে কেএসপি'র নেতাদের দু'একজনের দেখা হলে আমি তাঁদের জানালাম, আপনারা অনেক কিছুই করেছেন। কথা ছিল, শহীদ সাহেবকে আপনারা পাকিস্তানের নেতা মানবেন, আর আমরা হক সাহেবকে পূর্ব বাংলার নেতা মানব, এখন আপনারা করাচি এসে মুসলিম লীগ নেতা বগুড়ার মোহাম্মদ আলীকে নেতা মানছেন এবং তাঁকেই সমর্থন করছেন। শহীদ সাহেব যাতে প্রধানমন্ত্রী হতে না পারেন তার চেষ্টা করছেন। আমরাও বাধ্য হব হক সাহেবকে নেতা না মানতে, দরকার হলে যুক্তফ্রন্টের সভায় অনাস্থা প্রস্তাব দেব তাঁর নেতৃত্বের বিরুদ্ধে। আমরা হক সাহেবকে ক্ষমতা দেই নাই যে, তিনি যুক্তফ্রন্টের পক্ষ থেকে মোহাম্মদ আলী সাহেবকে সমর্থন দেবেন এবং মুসলিম লীগ নেতাকে নেতা মানবেন। কৃষক-শ্রমিক দলের নেতারা কথা পেয়েছেন পূর্ব বাংলায় সরকার তাঁদেরই দেওয়া হবে। আওয়ামী লীগ দল থেকে কিছু লোক তাঁরা পাবেন, এ আশ্বাসও তাঁরা পেয়েছেন। যদিও শহীদ সাহেবের সাথে তাঁর মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করার ব্যাপার নিয়ে একমত হতে পারি নাই, তবু অন্য কেউ তাঁকে অপমান করুক এটা সহ্য করা আমার পক্ষে কষ্টকর ছিল। আমি শহীদ সাহেবকে বললাম, "যখন হক সাহেব প্রকাশ্যে বলে দিয়েছেন আপনি যুক্তফ্রন্টের কেউই নন, তখন বাধ্য হয়ে প্রমাণ করতে হবে আপনিও যুক্তফ্রন্টের কেউ। কেএসপি ও নেজামে ইসলামী যুক্তফ্রন্টে থাকে থাকুক। আমরা অনাস্থা দিব হক সাহেবের বিরুদ্ধে। তাতে অন্ততপক্ষে আওয়ামী লীগের নেতা হিসাবে তো কথা বলতে পারবেন এবং আওয়ামী লীগ পার্টি পূর্ব বাংলার আইনসভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠ। আওয়ামী লীগ ছাড়া কারও পূর্ব বাংলায় সরকার চালাবার ক্ষমতা নাই।" শহীদ সাহেব বললেন, "যতদিন আওয়ামী লীগ যুক্তফ্রন্টে আছে ততদিন তো সত্যই আমি কেউই নই। হক সাহেব যুক্তফ্রন্টের নেতা, তিনি আওয়ামী লীগ, কেএসপি ও নেজামে ইসলাম পার্টির পক্ষ থেকে কথা বলতে পারেন।"



আমি ঢাকায় ফিরে এসে আতাউর রহমান সাহেব, আবুল মনসুর আহমদ ও মানিক ভাইকে নিয়ে বৈঠকে বসলাম এবং সকল কথা তাঁদের বললাম। শহীদ সাহেবের মতামতও জানালাম। ভাসানী সাহেব কলকাতা এসে পৌঁছেছেন খবর পেয়েছি, কিন্তু কোথায় আছেন জানি না। শহীদ সাহেব এন. এম. খান চিফ সেক্রেটারি সাহেবকে টেলিফোন করেছেন রাজবন্দিদের মুক্তি দিতে। অনেক কর্মীই আস্তে আস্তে মুক্তি পেতে লাগল। কেএসপি দলের নেতারা রাজবন্দিদের মুক্তির জন্য একটা কথাও বলেন নাই। কারণ, তাদের দলের কেউই জেলে নাই। আওয়ামী লীগ এমএলএ ও কর্মীরা তখনও অনেকে জেলে এবং অনেকের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা ঝুলছে। আতাউর রহমান সাহেব, আবুল মনসুর আহমদ, মানিক ভাই ও আমি অনেকক্ষণ আলাপ-আলোচনা করলাম। হক সাহেবের নেতৃত্বে অনাস্থা দেওয়া

হবে কি হবে না, এ বিষয়ে। হক সাহেবের চেয়েও তাঁর কয়েকজন সাঙ্গপাঙ্গই বেশি তৎপর মুসলিম লীগের সাথে কোনো নীতি, আদর্শ ছাড়াই মিটমাট করার। কোথায় গেল একুশ দফা, আর কোথায় গেল জনতার রায়। তিনজনই প্রথমে একটু একটু অনিচ্ছা প্রকাশ করছিলেন। অনাস্থা সম্বন্ধে কোনো আপত্তি নাই, তবে পারা যাবে কি যাবে না এ প্রশ্ন তুলেছিলেন। আমি বললাম, না পারার কোনো কারণ নাই। নীতি বলেও তো একটা কথা আছে। শেষ পর্যন্ত সকলেই রাজি হলে আমি ওয়ার্কিং কমিটির সভা আহ্বান করলাম। ওয়ার্কিং কমিটির প্রায় সকল সদস্যই একমত, কেবল সালাম সাহেব ও হাশিমউদ্দিন সাহেব একমত হতে পারলেন না। তবে একথা জানালেন যে, তাঁরা ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই মানতে বাধ্য।

আমি ও আতাউর রহমান সাহেব বের হয়ে পড়লাম এমএলএদের দস্তখত নিতে। সতের দফা চার্জ গঠন করলাম। হক সাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে কে অনাস্থা প্রস্তাব প্রথমে পেশ করবে, সে প্রশ্ন হল। অনেকেই আপত্তি করতে লাগলেন, আমার নিজেরও লজ্জা করতে লাগল। তাঁকে তো আমিও সম্মান ও ভক্তি করি। কিন্তু এখন কয়েকজন তথাকথিত নেতা তাঁকে ঘিরে রেখেছে। তাঁকে তাদের কাছ থেকে শত চেষ্টা করেও বের করতে পারলাম না। এদের অনেকেই নির্বাচনের মাত্র কয়েক মাস পূর্বে মুসলিম লীগ ত্যাগ করে এসেই ক্ষমতার লড়াইয়ে পরাজিত হয়। ঠিক হল, আমিই প্রস্তাব আনব আর জনাব আবদুল গণি বার এট ল' সমর্থন করবেন। আমরা তাঁর কাছে সভা ডেকে অনাস্থা প্রস্তাব মোকাবেলা করার জন্য অনুরোধ করলাম। তিনিও সভা ডাকতে রাজি হলেন। আমরা আওয়ামী লীগের প্রায় একশত তেরজন সদস্যের দস্তখত নিলাম। তাতেই আমাদের হয়ে গেল।[৩১]

টিকা

১. পাণ্ডুলিপির জন্য ব্যবহৃত খাতাগুলি ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অব প্রিজন্স, ঢাকা ডিভিশন, সেন্ট্রাল জেল, ঢাকা, ৯ই জুন ১৯৬৭ ও ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৬৭ তারিখে পরীক্ষা করেন। অপরদিকে লেখককে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় ১৭ জানুয়ারি ১৯৬৮ থেকে ঢাকা সেনানিবাসে আটক করা হয়। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, লেখক তাঁর এই আত্মজীবনীটি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ১৯৬৭ সালের দ্বিতীয়ার্ধে রচনা শুরু করেন।

২. গোপালগঞ্জ বর্তমানে জেলা। বাংলাদেশের সকল মহকুমাই জেলায় রূপান্তরিত হয়েছে।

৩. এক পয়সা এক টাকার চৌষট্টি ভাগের একভাগ।

৪. একাউন্ট্যান্ট জেনারেল অব বেঙ্গল।

৫. স্বদেশী আন্দোলন বঙ্গভঙ্গকে (Partition of Bengal) রোধ করার সংকল্প নিয়ে ১৯০৫ সালে শুরু হয়ে ১৯০৮ সালে এই আন্দোলন শেষ হয়। গান্ধী-পূর্বকালে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যতগুলি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন হয়েছে, এটি ছিল তাদের মধ্যে অন্যতম। বঙ্গবন্ধু এখানে স্বদেশী আন্দোলন বলতে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনকে এবং স্বদেশী বলতে সম্ভবত আন্দোলনের চরমপন্থীদের বুঝিয়েছেন।

৬. সিভিল সার্ভিস অব পাকিস্তান। পাকিস্তান কেন্দ্রীয় জনপ্রশাসনের সর্বোচ্চ ক্যাডার।

৭. মেম্বার অব লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্বলি।

৮. লেখক এখানে ভুলবশত কৃষক প্রজা পার্টির পরিবর্তে কৃষক শ্রমিক পার্টির কথা উল্লেখ করেছেন। অবিভক্ত বাংলায় ১৯৩৫ সালে এ. কে. ফজলুল হক কর্তৃক কৃষক প্রজা পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। অপরদিকে তিনি ১৯৫৩ সালে কৃষক শ্রমিক পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন।

৯. অল-ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ। এটি ১৯০৬ সালে ঢাকায় প্রধানত অবাঙালি মুসলিম অভিজাত নবাব নাইট ও জমিদারদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল। এই দলই মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করে।

১০. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। ভারতীয় প্রধান রাজনৈতিক দল। দলটি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দেয়।

১১. অবিভক্ত বাংলার মুসলমান ছাত্রদের সংগঠন। তৎকালীন ছাত্রনেতা আবদুল ওয়াসেক এই ছাত্র সংগঠনের নেতা ছিলেন। শাহ আজিজুর রহমান, শেখ মুজিবুর রহমানও এই সংগঠনের নেতৃত্ব দিয়েছেন।

১২. হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন।

১৩. বুলবুল একাডেমি অব ফাইন আর্টস। এই সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানটি ১৯৫৫ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৪. মেম্বার অব লেজিসলেটিভ কাউন্সিল।

১৫. লাহোর প্রস্তাবে (১৯৪০) মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশদের নিয়ে একাধিক পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু দিল্লি কনভেনশনে একটি মাত্র মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করা হয়। সমালোচকদের মতে এই ব্যবস্থায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতের পূর্বাঞ্চল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতের পশ্চিমাঞ্চল থেকে এক হাজার মাইল ভারতীয় ভূখণ্ড দ্বারা বিচ্ছিন্ন থাকবে। তাই এ ধরনের একটি রাষ্ট্র হবে অবাস্তব।

১৬. সুভাষ বসুর অনুসারী ভারতীয় রাজনৈতিক দল।

১৭. ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই (১ সেপ্টেম্বর) পাকিস্তানী সাংস্কৃতিক দর্শন প্রচার এবং ভিত্তি নির্মাণের লক্ষ্যে তমদ্দুন মজলিস প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৮ ও ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে তমদ্দুন মজলিস সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

১৮. ইসলামের তৃতীয় খলিফা ওমর (রা.) একবার মদিনা মনোয়ারার জনগণকে টুকরো কাপড় সমভাবে ভাগ করে দেন। ঐ কাপড়ের টুকরো এমন ছিল না যাতে কেউ বড় জামা বানাতে পারে। কিন্তু ওমর (রা.) ঐ কাপড় দিয়ে বড় জামা বানালে লোকের সন্দেহ জাগে ও তাঁকে প্রশ্ন করে যে কিভাবে তিনি ঐ কাপড় দিয়ে বড় জামা বানালেন। ওমর (রা.)-এর পুত্র এই সন্দেহ দূর করেন এই বলে যে, তিনি তার ভাগের কাপড়টি পিতাকে দান করেছেন যাতে তিনি বড় জামা বানাতে পারেন। যিনি যত বড়ই ক্ষমতাশালী হোন না কেন অন্যায় মনে হলে জনগণ যে বিনা দ্বিধায় তাঁকে প্রশ্ন করতে পারে, লেখক এখানে সেই প্রসঙ্গটি তুলে এনেছেন।

১৯. পশ্চিম পাঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নবাব ইফতিখার হোসেন মামদোতের বিরুদ্ধে পাবলিক এ্যান্ড রিপ্রেজেনটেটিভ অফিসেস ডিসকোয়ালিফিকেশন এ্যাক্ট ১৯৪৯ (প্রোডা) মামলা রুজু করা হয়। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী আসামি পক্ষের আইনজীবী ছিলেন। তিনি ঐ মামলায় মামদোতকে সকল অভিযোগ থেকে মুক্ত করতে পারেননি, তবে তাঁকে ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ প্রদানের দায় থেকে অব্যাহতি পাইয়ে দিতে সমর্থ হন।

২০. পাবলিক এ্যান্ড রিপ্রেজেনটেটিভ অফিসেস ডিসকোয়ালিফিকেশন এ্যাক্ট ১৯৪৯।

২১. রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ। ভারতের চরমপন্থী হিন্দুত্ববাদী একটি সংগঠন।

২২. Public Offices Disqualification Order। দেশের অনেক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে নির্বাচনে অংশগ্রহণে অযোগ্য ঘোষণার উদ্দেশ্যে আইয়ুব খানের সামরিক সরকার ১৯৫৯ সালের ৭ আগস্ট এই আদেশ জারি করেন। এখানে লেখক পরবর্তী সময়ের ঘটনা উল্লেখ করেছেন।

২৩. রাওয়ালপিন্ডি কনসপিরেসি কেস নামে পরিচিত। ১৯৫২ সালে পাকিস্তানের লিয়াকত আলী খান সরকারকে উৎখাতের জন্য এই সামরিক অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছিল। উদ্যোগটি ব্যর্থ হয়। পাকিস্তান আর্মির একজন ঊর্ধ্বতন কমান্ডার মেজর জেনারেল আকবর খান কতিপয় সামরিক কর্মকর্তা ও পাকিস্তানের বামপন্থী রাজনৈতিক নেতারা মিলে এই অভ্যুত্থানের চেষ্টা করেন। এতে ১১ জন সামরিক কর্মকর্তা ও ৪ জন বেসামরিক ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করা হয়। ১৮

মাস ধরে গোপনে পরিচালিত এই বিচারে মেজর জেনারেল খান ও কবি ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ দোষী সাব্যস্ত হন। তাঁদের দীর্ঘ মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পরবর্তী সময়ে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হলে দণ্ডপ্রাপ্ত প্রায় সকলের দণ্ড মওকুফ করাতে সমর্থ হন। [সূত্রঃ উইকিপিডিয়া]

২৪. পাণ্ডুলিপির সঙ্গে বক্তৃতার কপি পাওয়া যায় নাই।

২৫. পাণ্ডুলিপির সঙ্গে ম্যানিফেস্টো পাওয়া যায় নাই।

২৬. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের ফলাফল (১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত): মুসলিম আসন ২৩৭– যুক্তফ্রন্ট ২২৩ (আওয়ামী লীগ ১৪০; কৃষক শ্রমিক পার্টি ৩৪; নেজামে ইসলামী ১২; যুবলীগ ১৫; গণতান্ত্রিক দল ১০; কমিউনিস্ট পার্টি ৪; ও স্বতন্ত্র ৮); মুসলিম লীগ ৯ (১জন স্বতন্ত্র নির্বাচনের পরে মুসলিম লীগে যোগ দেন); খিলাফত-ই-রব্বানী ১; স্বতন্ত্র ৪।

সাধারণ আসন (অমুসলিম সদস্য) ৭২: কংগ্রেস ও অন্যান্য ৭২।

মোট আসন ৩০৯ (মুসলিম লীগ ৯; যুক্তফ্রন্ট ও সহযোগী ২৯১; অন্যান্য ৯)। (সূত্রঃ রঙ্গলাল সেন, *পলিটিক্যাল এলিটস ইন বাংলাদেশ*, ইউপিএল, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ১২৩-১২৫)।

২৭. ৪ মে ১৯৫৪ পশ্চিমবঙ্গ সফরকালে পূর্ব বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক বলেন: এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, দুই বাংলার জনগণকে একটি মৌলিক সত্য অনুধাবন করতে হবে, সুখে শান্তিতে বাস করতে চাইলে তাদের অতি অবশ্যই পরস্পরকে সাহায্য সহযোগিতা করতে হবে। রাজনীতিকরা ভূখণ্ডকে ভাগ করেছেন, কিন্তু সাধারণ মানুষকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যাতে প্রত্যেকে শান্তিতে বসবাস করতে পারে। ইতিহাসে ভাষা হচ্ছে ঐক্যসাধনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং দুই বাংলার জনগণ একই ভাষার বন্ধনে আবদ্ধ, তাদের রাজনৈতিক বিভেদ ভুলতে হবে এবং তারা যে এক তা অনুভব করতে হবে। (ইংরেজি থেকে অনুবাদ, সূত্রঃ মর্নিং নিউজ, ৫ মে ১৯৫৪, উদ্ধৃতি, রঙ্গলাল সেন, *পলিটিক্যাল এলিটস ইন বাংলাদেশ*, ইউপিএল, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ১২৯)।

২৮. পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া এ্যাক্ট ১৯৩৫ তে ৯২/ক ধারা যুক্ত করেন, যার বলে কতকগুলো বিশেষ ক্ষেত্রে গভর্নর জেনারেল কোন প্রদেশের গভর্নরকে ঐ প্রদেশের জন্য আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা দিয়ে ঘোষণা জারি করতে পারেন। (সূত্রঃ হামিদ খান, *কনস্টিটিউশনাল এ্যান্ড পলিটিক্যাল হিস্ট্রি অব পাকিস্তান*, অক্সফোর্ড, করাচি, ২০০৯, পৃ. ১১৩)।

২৯. South East Asia Treaty Organization।

৩০. Central Treaty Organization।

৩১. অনাস্থার পক্ষে একশত তেরজন সদস্যের দস্তখত থাকা সত্ত্বেও ফজলুল হকের বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত গৃহীত হয়নি। আওয়ামী লীগের পঁয়ত্রিশজন সদস্য সালাম খানের নেতৃত্বে অনাস্থা প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেন, অপর দিকে অনেকটাই অপ্রত্যাশিতভাবে কৃষক শ্রমিক পার্টি ও নেজামে ইসলামী দলের সদস্যরা জোটবদ্ধভাবে ফজলুল হককে সমর্থন করেন। অনাস্থা প্রস্তাব তাই পরাজিত হয়। (সূত্রঃ এস. এ. করিম, *শেখ মুজিব: ট্রায়াফ এ্যান্ড ট্রাজেডি*, ২য় সংস্করণ, ইউপিএল, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৬৩।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবন পরিচয় (১৯৫৫–১৯৭৫)

১৯৫৫

৫ জুন বঙ্গবন্ধু গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ১৭ জুন ঢাকার পল্টন ময়দানের জনসভা থেকে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন দাবি করে ২১ দফা ঘোষণা করা হয়। ২৩ জুন আওয়ামী লীগের কার্যকরী পরিষদে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা না হলে দলীয় সদস্যরা আইনসভা থেকে পদত্যাগ করবেন। ২৫ আগস্ট করাচিতে পাকিস্তান গণপরিষদে বঙ্গবন্ধু বলেনঃ

> Sir, you will see that they want to place the word 'East Pakistan' instead of 'East Bengal'. We have demanded so many times that you should use Bengal instead of Pakistan. The word 'Bengal' has a history, has a tradition of its own. You can change it only after the people have been consulted. If you want to change it then we have to go back to Bengal and ask them whether they accept it. So far as the question of One-Unit is concerned it can come in the constitution. Why do you want it to be taken up just now ? What about the state language, Bengali? What about joint electorate ? What about autonomy? The people of East Bengal will be prepared to consider One-Unit with all these things. So, I appeal to my friends on that side to allow the people to give their verdict in any way , in the form of referendum or in the form of plebicite.

> *[অনুবাদঃ স্যার আপনি দেখবেন ওরা 'পূর্ব বাংলা' নামের পরিবর্তে 'পূর্ব পাকিস্তান' নাম রাখতে চায়। আমরা বহুবার দাবি জানিয়েছি যে, আপনারা এটাকে বাংলা নামে ডাকেন। 'বাংলা' শব্দটার একটা নিজস্ব ইতিহাস আছে, আছে এর একটা ঐতিহ্য। আপনারা এই নাম আমাদের জনগণের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে পরিবর্তন করতে পারেন। আপনারা যদি ঐ নাম পরিবর্তন করতে চান তাহলে আমাদের বাংলায় আবার যেতে হবে এবং সেখানকার জনগণের কাছে জিজ্ঞেস করতে হবে তারা নাম পরিবর্তনকে মেনে নেবে কি না। এক ইউনিটের প্রশ্নটা শাসনতন্ত্রে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। আপনারা এই প্রশ্নটাকে এখনই কেন তুলতে চান? বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করার*

ব্যাপারে কি হবে? যুক্ত নির্বাচনী এলাকা গঠনের প্রশ্নটারই কি সমাধান? আমাদের স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধেই বা কি ভাবছেন? পূর্ব বাংলার জনগণ অন্যান্য প্রশ্নগুলোর সমাধানের সাথে এক ইউনিটের প্রশ্নটাকে বিবেচনা করতে প্রস্তুত। তাই আমি আমার ঐ অংশের বন্ধুদের কাছে আবেদন জানাব তারা যেন আমাদের জনগণের 'রেফারেন্ডাম' অথবা গণভোটের মাধ্যমে দেয়া রায়কে মেনে নেন।]

২১ অক্টোবর আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ প্রত্যাহার করা হয় এবং বঙ্গবন্ধু পুনরায় দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯৫৬

৩ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে খসড়া শাসনতন্ত্রে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্তির দাবি জানান। ১৪ জুলাই আওয়ামী লীগের সভায় প্রশাসনে সামরিক বাহিনীর প্রতিনিধিত্বের বিরোধিতা করে একটি সিদ্ধান্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্ত প্রস্তাব আনেন বঙ্গবন্ধু। ৪ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে খাদ্যের দাবিতে ভুখা মিছিল বের করা হয়। চকবাজার এলাকায় পুলিশ মিছিলে গুলি চালালে ৩ জন নিহত হয়। ১৬ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু কোয়ালিশন সরকারের শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন ও ভিলেজ-এইড দপ্তরের মন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ করেন।

১৯৫৭

সংগঠনকে সুসংগঠিত করার উদ্দেশ্যে ৩০ মে দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শেখ মুজিব মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। ২৪ জুন থেকে ১৩ জুলাই তিনি চীনে সরকারি সফর করেন।

১৯৫৮

৭ অক্টোবর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা ও সামরিক বাহিনী প্রধান জেনারেল আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করে রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ১১ অক্টোবর বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয় এবং একের পর এক মিথ্যা মামলা দায়ের করে হয়রানি কবা হয়। প্রায় চৌদ্দ মাস জেলখানায় থাকার পর তাঁকে মুক্তি দিয়ে পুনরায় জেলগেটেই গ্রেফতার করা হয়।

১৯৬০

৭ ডিসেম্বর হাইকোর্টে রিট আবেদন করে তিনি মুক্তি লাভ করেন। সামরিক শাসন ও আইয়ুববিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু গোপন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন। এ সময়ই বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষ্যে কাজ করার

জন্য বিশিষ্ট ছাত্র নেতৃবৃন্দ দ্বারা 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ' নামে একটি গোপন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতি মহকুমায় এবং থানায় নিউক্লিয়াস গঠন করেন।

১৯৬২

৬ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধুকে জননিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করা হয়। ২ জুন চার বছরের সামরিক শাসনের অবসান ঘটলে ১৮ জুন বঙ্গবন্ধু মুক্তিলাভ করেন। ২৫ জুন বঙ্গবন্ধুসহ জাতীয় নেতৃবৃন্দ আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যৌথ বিবৃতি দেন। ৫ জুলাই পল্টনের জনসভায় বঙ্গবন্ধু আইয়ুব সরকারের কঠোর সমালোচনা করেন। ২৪ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু লাহোর যান, এখানে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে বিরোধীদলীয় মোর্চা জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠিত হয়। অক্টোবর মাসে গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের পক্ষে জনমত সৃষ্টির জন্য তিনি শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে সারা বাংলা সফর করেন।

১৯৬৩

সোহরাওয়ার্দী অসুস্থ হয়ে চিকিৎসার জন্য লন্ডনে অবস্থানকালে বঙ্গবন্ধু তাঁর সঙ্গে পরামর্শের জন্য লন্ডন যান। ৫ ডিসেম্বর সোহরাওয়ার্দী বৈরুতে ইন্তেকাল করেন।

১৯৬৪

২৫ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে অনুষ্ঠিত এক সভায় আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়। এই সভায় দেশের প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটের মাধ্যমে সংসদীয় সরকারব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি সাধারণ মানুষের ন্যায্য অধিকার আদায় সম্বলিত প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভায় মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১১ মার্চ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি গঠিত হয়। দাঙ্গার পর আইয়ুববিরোধী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগ গ্রহণ। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ১৪ দিন পূর্বে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়।

১৯৬৫

শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও আপত্তিকর বক্তব্য প্রদানের অভিযোগে মামলা দায়ের। এক বছরের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে হাইকোর্টের নির্দেশে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে তিনি মুক্তিলাভ করেন।

১৯৬৬

৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলসমূহের জাতীয় সম্মেলনের বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবি পেশ করেন। প্রস্তাবিত ৬ দফা ছিল বাঙালি জাতির

মুক্তি সনদ। ১ মার্চ বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। বঙ্গবন্ধু ৬ দফার পক্ষে জনমত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সারা বাংলায় গণসংযোগ সফর শুরু করেন। এ সময় তাঁকে সিলেট, ময়মনসিংহ ও ঢাকায় বার বার গ্রেফতার করা হয়। বঙ্গবন্ধু এ বছরের প্রথম তিন মাসে আটবার গ্রেফতার হন। ৮ মে নারায়ণগঞ্জ পাটকল শ্রমিকদের জনসভায় বক্তৃতা শেষে তাঁকে পুনরায় গ্রেফতার করা হয়। ৭ জুন বঙ্গবন্ধু ও আটক নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবিতে সারা দেশে ধর্মঘট পালিত হয়। ধর্মঘটের সময় ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও টঙ্গীতে পুলিশের গুলিতে তেজগাঁও শিল্প এলাকায় মনু মিয়াসহ ১১ জন শ্রমিক নিহত হয়।

১৯৬৮

৩ জানুয়ারি পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুকে এক নম্বর আসামি করে মোট ৩৫ জন বাঙালি সেনা ও সিএসপি অফিসারের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগ এনে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসাবে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে। ১৭ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুকে জেল থেকে মুক্তি দিয়ে পুনরায় জেলগেট থেকে গ্রেফতার করে ঢাকা সেনানিবাসে আটক রাখা হয়। বঙ্গবন্ধুসহ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অভিযুক্ত আসামিদের মুক্তির দাবিতে সারা দেশে বিক্ষোভ শুরু হয়।

১৯ জুন ঢাকা সেনানিবাসে কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামিদের বিচারকার্য শুরু হয়।

১৯৬৯

৫ জানুয়ারি ৬ দফাসহ ১১ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবিতে দেশব্যাপী ছাত্র আন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলন গণআন্দোলনে পরিণত হয়। পরে ১৪৪ ধারা ও কারফিউ ভঙ্গ, পুলিশ-ইপিআর-এর গুলিবর্ষণ, বহু হতাহতের মধ্য দিয়ে গণঅভ্যুত্থানে রূপ নিলে আইয়ুব সরকার ১ ফেব্রুয়ারি গোলটেবিল বৈঠকের আহ্বান জানায় এবং বঙ্গবন্ধুকে প্যারোলে মুক্তি দান করা হবে বলে ঘোষণা দেয়া হয়। বঙ্গবন্ধু প্যারোলে মুক্তিদান প্রত্যাখ্যান করেন। ২২ ফেব্রুয়ারি জনগণের অব্যাহত চাপের মুখে কেন্দ্রীয় সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে বঙ্গবন্ধুসহ অন্যান্য আসামিকে মুক্তি দানে বাধ্য হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ময়দানে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধুকে সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। প্রায় ১০ লাখ ছাত্র জনতার এই সংবর্ধনা সমাবেশে শেখ মুজিবুর রহমানকে আনুষ্ঠানিকভাবে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। বঙ্গবন্ধু রেসকোর্সের ভাষণে ছাত্র সমাজের ১১ দফা দাবির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান।

১০ মার্চ বঙ্গবন্ধু রাওয়ালপিন্ডিতে আইয়ুব খানের গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। বঙ্গবন্ধু গোলটেবিল বৈঠকে আওয়ামী লীগের ৬ দফা ও ছাত্র সমাজের ১১ দফা

দাবি উপস্থাপন করে বলেন, 'গণঅসন্তোষ নিরসনে ৬ দফা ও ১১ দফা'র ভিত্তিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই'। পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী ও রাজনীতিবিদরা বঙ্গবন্ধুর দাবি অগ্রাহ্য করলে ১৩ মার্চ তিনি গোলটেবিল বৈঠক ত্যাগ করেন এবং ১৪ মার্চ ঢাকায় ফিরে আসেন। ২৫ মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া খান সামরিক শাসন জারির মাধ্যমে ক্ষমতাসীন হন। ২৫ অক্টোবর বঙ্গবন্ধু তিন সপ্তাহের সাংগঠনিক সফরে লন্ডন গমন করেন।

৫ ডিসেম্বর শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আওয়ামী লীগের আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধু পূর্ব বাংলার নামকরণ করেন 'বাংলাদেশ'। তিনি বলেন, *"একসময় এদেশের বুক হইতে, মানচিত্রের পৃষ্ঠা হইতে 'বাংলা' কথাটির সর্বশেষ চিহ্নটুকুও চিরতরে মুছিয়া ফেলার চেষ্টা করা হইয়াছে।...একমাত্র 'বঙ্গোপসাগর' ছাড়া আর কোন কিছুর নামের সঙ্গে 'বাংলা' কথাটির অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।...জনগণের পক্ষ হইতে আমি ঘোষণা করিতেছি—আজ হইতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম 'পূর্ব পাকিস্তান'-এর পরিবর্তে শুধুমাত্র 'বাংলাদেশ'।*

১৯৭০

৬ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু পুনরায় আওয়ামী লীগ সভাপতি নির্বাচিত হন। ১ এপ্রিল আওয়ামী লীগ কার্যকরী পরিষদের সভায় নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৭ জুন রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় বঙ্গবন্ধু ৬ দফার প্রশ্নে আওয়ামী লীগকে নির্বাচিত করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। ১৭ অক্টোবর বঙ্গবন্ধু তাঁর দলের নির্বাচনী প্রতীক হিসাবে 'নৌকা' প্রতীক পছন্দ করেন এবং ঢাকার ধোলাইখালে প্রথম নির্বাচনী জনসভার মধ্য দিয়ে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেন। ২৮ অক্টোবর তিনি জাতির উদ্দেশে বেতার-টিভি ভাষণে ৬ দফা বাস্তবায়নে আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের জয়যুক্ত করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। ১২ নভেম্বরের গোর্কিতে উপকূলীয় এলাকায় ১০ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি ঘটলে বঙ্গবন্ধু নির্বাচনী প্রচারণা বাতিল করে দুর্গত এলাকায় চলে যান এবং আর্তমানবতার প্রতি পাকিস্তানী শাসকদের ঔদাসীন্যের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। তিনি গোর্কি উপদ্রুত মানুষের ত্রাণের জন্য বিশ্ববাসীর প্রতি আহ্বান জানান। ৭ ডিসেম্বর সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। আওয়ামী লীগ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসন লাভ করে।

১৯৭১

৩ জানুয়ারি রেসকোর্সের জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জনপ্রতিনিধিদের শপথ গ্রহণ পরিচালনা করেন। আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যরা ৬ দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা এবং জনগণের প্রতি আনুগত্য থাকার শপথ গ্রহণ করেন। ৫ জানুয়ারি তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে সর্বাধিক আসন লাভকারী পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী

ভুট্টো কেন্দ্রে আওয়ামী লীগের সাথে কোয়ালিশন সরকার গঠনে তাঁর সম্মতির কথা ঘোষণা করেন। জাতীয় পরিষদ সদস্যদের এক বৈঠকে বঙ্গবন্ধু পার্লামেন্টারি দলের নেতা নির্বাচিত হন। ২৮ জানুয়ারি জুলফিকার আলী ভুট্টো বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনার জন্য ঢাকায় আসেন। তিন দিন বৈঠকের পর আলোচনা ব্যর্থ হয়ে যায়। ১৩ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের বৈঠক আহ্বান করেন। ১৫ ফেব্রুয়ারি ভুট্টো ঢাকায় জাতীয় পরিষদের বৈঠক বয়কটের ঘোষণা দিয়ে দুই প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দুই দলের প্রতি ক্ষমতা হস্তান্তর করার দাবি জানান।

১৬ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু এক বিবৃতিতে জনাব ভুট্টোর দাবির তীব্র সমালোচনা করে বলেন, 'ভুট্টো সাহেবের দাবি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। ক্ষমতা একমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগের কাছে হস্তান্তর করতে হবে। ক্ষমতার মালিক এখন পূর্ব বাংলার জনগণ।'

১ মার্চ ইয়াহিয়া খান অনির্দিষ্টকালের জন্য জাতীয় পরিষদের বৈঠক স্থগিতের ঘোষণা দিলে সারা বাংলায় প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। বঙ্গবন্ধুর সভাপতিত্বে আওয়ামী লীগ কার্যকরী পরিষদের জরুরি বৈঠকে ৩ মার্চ দেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করা হয়। ৩ মার্চ সারা বাংলায় হরতাল পালিত হবার পর বঙ্গবন্ধু অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তর করার জন্য প্রেসিডেন্টের প্রতি দাবি জানান।

৭ মার্চ রেসকোর্সের জনসমুদ্র থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, জয় বাংলা'। ঐতিহাসিক ভাষণে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতিকে শৃঙ্খল মুক্তির আহ্বান জানিয়ে ঘোষণা করেন, "প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।... রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেবো। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ।"

তিনি শত্রুর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য সবাইকে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান এবং ইয়াহিয়া খানের সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। একদিকে রাষ্ট্রপতি জেনারেল ইয়াহিয়ার নির্দেশ যেত, অপরদিকে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়ক থেকে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ যেত, বাংলার মানুষ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ মেনে চলতেন। অফিস, আদালত, ব্যাংক, বীমা, স্কুল-কলেজ, গাড়ি, শিল্প কারখানা সবই বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ মেনেছে। ইয়াহিয়ার সব নির্দেশ অমান্য করে অসহযোগ আন্দোলনে বাংলার মানুষের সেই অভূতপূর্ব সাড়া ইতিহাসে বিরল ঘটনা। মূলত ৭ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ হিসাবে বঙ্গবন্ধুই রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন। ১৬ মার্চ ঢাকায় ক্ষমতা হস্তান্তর প্রশ্নে মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক শুরু হয়। আলোচনার জন্য জনাব ভুট্টোও ঢাকায় আসেন। ২৪ মার্চ পর্যন্ত ইয়াহিয়া-মুজিব-ভুট্টো আলোচনা হয়। ২৫ মার্চ আলোচনা ব্যর্থ হবার পর সন্ধ্যায় ইয়াহিয়ার ঢাকা ত্যাগ। ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালির ওপর পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে। আক্রমণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পিলখানা রাইফেল সদর দফতর ও রাজারবাগ পুলিশ হেডকোয়ার্টার।

বঙ্গবন্ধু ২৫শে মার্চ রাত ১২টা ২০ মিনিটে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন:

This may be my last message, from to-day Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved.

[অনুবাদ: এটাই হয়ত আমার শেষ বার্তা, আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। বাংলাদেশের জনগণ, তোমরা যে যেখানেই আছ এবং যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শেষ পর্যন্ত দখলদার সৈন্য বাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্য আমি তোমাদের আহ্বান জানাচ্ছি। পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর শেষ সৈনিকটিকে বাংলাদেশের মাটি থেকে বিতাড়িত করে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে]

এই ঘোষণা বাংলাদেশের সর্বত্র ওয়্যারলেস, টেলিফোন ও টেলিগ্রামের মাধ্যমে প্রেরিত হয়। এর সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বাংলায় নিম্নলিখিত একটি বার্তা পাঠান:

পাকিস্তান সেনাবাহিনী অতর্কিতভাবে পিলখানা ইপিআর ঘাঁটি, রাজারবাগ পুলিশ লাইন আক্রমণ করেছে এবং শহরের রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ চলছে, আমি বিশ্বের জাতিসমূহের কাছে সাহায্যের আবেদন করেছি। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা বীরত্বের সঙ্গে মাতৃভূমি মুক্ত করার জন্য শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহর নামে আপনাদের কাছে আমার আবেদন ও আদেশ দেশকে স্বাধীন করার জন্য শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যান। আপনাদের পাশে এসে যুদ্ধ করার জন্য পুলিশ, ইপিআর, বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও আনসারদের সাহায্য চান। কোন আপোস নাই। জয় আমাদের হবেই। পবিত্র মাতৃভূমি থেকে শেষ শত্রুকে বিতাড়িত করুন। সকল আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিক প্রিয় লোকদের কাছে এ সংবাদ পৌঁছে দিন। আল্লাহ আপনাদের মঙ্গল করুন। জয় বাংলা।

বঙ্গবন্ধুর এই বার্তা তাৎক্ষণিকভাবে বিশেষ ব্যবস্থায় সারা দেশে পাঠানো হয়। সর্বস্তরের জনগণের পাশাপাশি চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও যশোর সেনানিবাসে বাঙালি জওয়ান ও অফিসাররা প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনী ১.৩০ মিনিটে বঙ্গবন্ধুকে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে ঢাকা সেনানিবাসে নিয়ে যায় এবং এর তিন দিন পর তাঁকে বন্দি অবস্থায় পাকিস্তান নিয়ে যাওয়া হয়।

২৬ মার্চ জে. ইয়াহিয়া এক ভাষণে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বঙ্গবন্ধুকে দেশদ্রোহী বলে আখ্যায়িত করে।

২৬ মার্চ চট্টগ্রাম স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা এম. এ. হান্নান বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণাপত্রটি পাঠ করেন। ১০ এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি করে বিপ্লবী সরকার গঠিত হয়। ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের

বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে (মুজিবনগর) বাংলাদেশ সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দীন আহমদ প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের পরিচালনায় মুক্তিযুদ্ধ শেষে ১৬ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানী বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জিত হয়। বাংলাদেশ লাভ করে স্বাধীনতা। তার আগে ৭ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের ফায়জালাবাদ (লায়ালপুর) জেলে বঙ্গবন্ধুর গোপন বিচার করে তাঁকে দেশদ্রোহী ঘোষণা করে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। বিভিন্ন দেশ ও বিশ্বের মুক্তিকামী জনগণ বঙ্গবন্ধুর জীবনের নিরাপত্তার দাবি জানায়। ২৭ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে জাতির জনক রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি প্রদানের দাবি জানান হয়। ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নসহ বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য পাকিস্তান সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলা হয়, শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি। তিনি বাংলাদেশের স্থপতি, কাজেই পাকিস্তানের কোন অধিকার নেই তাকে বন্দি করে রাখার। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে বহু রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভ করেছে।

১৯৭২

৮ জানুয়ারি পাকিস্তান সরকার আন্তর্জাতিক চাপে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেয়। জুলফিকার আলী ভুট্টো বঙ্গবন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করেন। সেদিনই বঙ্গবন্ধুকে ঢাকার উদ্দেশ্যে লন্ডন পাঠানো হয়। ৯ জানুয়ারি লন্ডনে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথের সাথে সাক্ষাৎ হয়। লন্ডন থেকে ঢাকা আসার পথে বঙ্গবন্ধু দিল্লিতে যাত্রাবিরতি করেন। বিমানবন্দরে ভারতের রাষ্ট্রপতি ভি. ভি. গিরি ও প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী বঙ্গবন্ধুকে স্বাগত জানান।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু ১০ জানুয়ারি ঢাকায় পৌঁছালে তাঁকে অবিস্মরণীয় সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। বঙ্গবন্ধু বিমানবন্দর থেকে সরাসরি রেসকোর্স ময়দানে গিয়ে লক্ষ জনতার সমাবেশ থেকে অশ্রুসিক্ত নয়নে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। ১২ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ৬ ফেব্রুয়ারি ভারত সরকারের আমন্ত্রণে তিনি ভারত যান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১৯৪৯ সালে বঙ্গবন্ধুকে দেয়া বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে। ২৮ ফেব্রুয়ারি তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন সফরে যান। ১২ মার্চ বঙ্গবন্ধুর অনুরোধে ভারতীয় মিত্রবাহিনী বাংলাদেশ ত্যাগ করে।

১ মে তিনি তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর সরকারি কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির ঘোষণা দেন। ৩০ জুলাই লন্ডনে বঙ্গবন্ধুর পিত্তকোষে অস্ত্রোপচার করা হয়। অস্ত্রোপচারের পর লন্ডন থেকে তিনি জেনেভা যান। ১০ অক্টোবর বিশ্বশান্তি পরিষদ বঙ্গবন্ধুকে 'জুলিও কুরী' পুরস্কারে ভূষিত করে। ৪ নভেম্বর বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের তারিখ (৭ মার্চ ১৯৭৩) ঘোষণা করেন। ১৫ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় খেতাব প্রদানের

কথা ঘোষণা করেন। ১৪ ডিসেম্বর বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে বঙ্গবন্ধু স্বাক্ষর করেন। ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয়। প্রশাসনিকব্যবস্থার পুনর্গঠন, সংবিধান প্রণয়ন, এক কোটি মানুষের পুনর্বাসন, যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন, শিক্ষাব্যবস্থার সম্প্রসারণ, শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাথমিক স্কুল পর্যন্ত বিনামূল্যে এবং মাধ্যমিক শ্রেণী পর্যন্ত নামমাত্র মূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ, মদ, জুয়া, ঘোড়দৌড়সহ সমস্ত ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ড কার্যকরভাবে নিষিদ্ধকরণ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড পুনর্গঠন, ১১,০০০ প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠাসহ ৪০,০০০ প্রাথমিক স্কুল সরকারিকরণ, মুক্তিযুদ্ধে পাকবাহিনীর হাতে ধর্ষিতা মেয়েদের পুনর্বাসনের জন্য নারী পুনর্বাসন সংস্থা, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন, ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মাফ, বিনামূল্যে/স্বল্পমূল্যে কৃষকদের মধ্যে কৃষি উপকরণ বিতরণ, পাকিস্তানীদের পরিত্যক্ত ব্যাংক, বীমা ও ৫৮০টি শিল্প ইউনিটের জাতীয়করণ ও চালু করার মাধ্যমে হাজার হাজার শ্রমিক-কর্মচারীর কর্মসংস্থান, ঘোড়াশাল সার কারখানা, আশুগঞ্জ কমপ্লেক্সের প্রাথমিক কাজ ও অন্যান্য নতুন শিল্প স্থাপন, বন্ধ শিল্প কারখানা চালুকরণসহ অন্যান্য সমস্যার মোকাবেলা করে একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক অবকাঠামো তৈরি করে দেশকে ধীরে ধীরে একটি সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রয়াস চালানো হয়। অতি অল্প সময়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভ ছিল বঙ্গবন্ধু সরকারের উল্লেখযোগ্য সাফল্য।

১৯৭৩

জাতীয় সংসদের প্রথম নির্বাচনে ৩০০ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগের ২৯৩ আসন লাভ। ৩ সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগ, সিপিবি ও ন্যাপের সমন্বয়ে ঐক্যফ্রন্ট গঠিত হয়। ৬ সেপ্টেম্বর জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের জন্য বঙ্গবন্ধু আলজেরিয়া যান। ১৭ অক্টোবর তিনি জাপান সফর করেন।

১৯৭৪

২২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশকে পাকিস্তান স্বীকৃতি দেয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান গমন করেন। ১৭ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে এবং বঙ্গবন্ধু ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে প্রথমবারের মত বাংলায় ভাষণ দেন।

১৯৭৫

২৫ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকারব্যবস্থা প্রবর্তন এবং বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ। ২৪ ফেব্রুয়ারি দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে জাতীয় দল বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ গঠন। বঙ্গবন্ধু জাতীয় দলে যোগদানের জন্য দেশের সকল

রাজনৈতিক দল ও নেতাদের প্রতি আহ্বান জানান। বিদেশী সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে বাঙালি জাতিকে আত্মনির্ভরশীল হিসাবে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তাই স্বাবলম্বিতা অর্জনের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক নীতিমালাকে নতুনভাবে ঢেলে সাজান। স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে মানুষের আহার, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ও কাজের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি ঘোষণা দেন যার লক্ষ্য ছিল—দুর্নীতি দমন; ক্ষেতে খামারে ও কলকারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি; জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা। এই লক্ষ্যে দ্রুত অগ্রগতি সাধিত করবার মানসে ৬ জুন বঙ্গবন্ধু সকল রাজনৈতিক দল, পেশাজীবী, বুদ্ধিজীবী মহলকে ঐক্যবদ্ধ করে এক মঞ্চ তৈরি করেন, যার নাম দেন বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ। বঙ্গবন্ধু এই দলের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রামে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়ে অভূতপূর্ব সাড়া পান। অতি অল্প সময়ের মধ্যে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হতে শুরু করে। উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। চোরাকারবারি বন্ধ হয়। দ্রব্যমূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার আওতায় চলে আসে।

নতুন আশার উদ্দীপনা নিয়ে স্বাধীনতার সুফল মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার জন্য দেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে অগ্রসর হতে শুরু করে। কিন্তু মানুষের সে সুখ বেশি দিন স্থায়ী হয় না।

১৫ আগস্টের ভোরে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বাংলাদেশের স্থপতি বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজ বাসভবনে সেনাবাহিনীর কতিপয় উচ্চাভিলাষী বিশ্বাসঘাতক অফিসারদের হাতে নিহত হন। সেদিন বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী মহীয়সী নারী বেগম ফজিলাতুনন্নেছা, বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠপুত্র মুক্তিযোদ্ধা লে. শেখ কামাল, পুত্র লে. শেখ জামাল, কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল, দুই পুত্রবধূ সুলতানা কামাল ও রোজী জামাল, বঙ্গবন্ধুর ভাই শেখ নাসের, ভগ্নিপতি ও কৃষিমন্ত্রী আবদুর রব সেরনিয়াবাত ও তাঁর কন্যা বেবী সেরনিয়াবাত, পুত্র আরিফ সেরনিয়াবাত, দৌহিত্র সুকান্ত আবদুল্লাহ বাবু, ভ্রাতুষ্পুত্র শহীদ সেরনিয়াবাত, বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নে যুবনেতা ও সাংবাদিক শেখ ফজলুল হক মণি ও তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজু মণি, বঙ্গবন্ধুর সামরিক সচিব কর্নেল জামিল আহমেদ এবং ১৪ বছরের কিশোর আবদুল নঈম খান রিন্টুসহ ১৬ জনকে ঘাতকরা হত্যা করে।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট মহামানব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শহীদ হবার পর দেশে সামরিক শাসন জারি হয়। গণতন্ত্রকে হত্যা করে মৌলিক অধিকার কেড়ে নেয়া হয়। শুরু হয় হত্যা, ক্যু ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি। কেড়ে নেয় জনগণের ভাত ও ভোটের অধিকার।

বিশ্বে মানবাধিকার রক্ষার জন্য হত্যাকারীদের বিচারের বিধান রয়েছে, কিন্তু বাংলাদেশে জাতির জনকের আত্মস্বীকৃত খুনিদের বিচারের হাত থেকে রেহাই দেবার জন্য ২৬শে সেপ্টেম্বর এক সামরিক অধ্যাদেশ (ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স) জারি করা হয়। জেনারেল

জিয়াউর রহমান সামরিক শাসনের মাধ্যমে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স নামে এক কুখ্যাত কালো আইন সংবিধানে সংযুক্ত করে সংবিধানের পবিত্রতা নষ্ট করে। খুনিদের বিদেশে অবস্থিত বিভিন্ন দূতাবাসে চাকরি দিয়ে পুরস্কৃত করে।

১৯৯৬ সালের ২৩ জুন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করার পর ২ অক্টোবর ধানমন্ডি থানায় তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ তাঁর পরিবারের সদস্যগণকে হত্যার বিরুদ্ধে এজাহার দায়ের করা হয়। ১২ নভেম্বর জাতীয় সংসদে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল কবা হয়। ১ মার্চ '৯৭ ঢাকার জেলা ও দায়রা জজ আদালতে বিচারকার্য শুরু হয়। ৮ নভেম্বর '৯৮ জেলা ও দায়রা জজ কাজী গোলাম রসুল ৭৬ পৃষ্ঠার রায় ঘোষণায় ১৫ জনকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। ১৪ নভেম্বর ২০০০ সালে হাইকোর্টে মামলার ডেথ রেফারেন্স ও আপিলে দুই বিচারক বিচারপতি মোঃ রুহুল আমিন এবং বিচারপতি এ.বি.এম. খায়রুল হক দ্বিমতে বিভক্ত রায় ঘোষণা করেন। এরপর তৃতীয় বিচারপতি মোঃ ফজলুল করিম ১২ জনের মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেন। এরপর পাঁচজন আসামি আপিল বিভাগে লিভ টু আপিল করে। ২০০২-২০০৬ পর্যন্ত বিএনপি-জামায়াত-জোট সরকারের সময় মামলাটি কার্যতালিকা থেকে বাদ দেয়া হয়। ২০০৭ সালে শুনানির জন্য বেঞ্চ গঠিত হয়। ২০০৯ সালে ২৯ দিন শুনানির পব ১৯ নভেম্বর প্রধান বিচারপতিসহ পাঁচজন বিচারপতি রায় ঘোষণায় আপিল খারিজ করে ১২ জনের মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখেন। ২০১০ সালের ২ জানুয়ারি আপিল বিভাগে আসামিদের রিভিউ পিটিশন দাখিল এবং তিন দিন শুনানি শেষে ২৭ জানুয়ারি চার বিচারপতি রিভিউ পিটিশনও খারিজ করেন। এদিনই মধ্যরাতের পর ২৮ জানুয়ারি পাঁচ ঘাতকের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। ঘাতকদের একজন বিদেশে পলাতক অবস্থায় মারা গেছে এবং ছয়জন বিদেশে পলাতক রয়েছে। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবি ৩৪ বছর পর বাস্তবায়িত হল।

১৫ আগস্ট জাতির জীবনে এক কলঙ্কময় দিন। এই দিবসটি জাতীয় শোক দিবস হিসাবে বাঙালি জাতি পালন করে।*

---

* জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত এলবাম *জাতির জনক*, ৩য় প্রকাশ, ১৭ মার্চ ২০১০ থেকে উদ্ধৃত।

জীবনবৃত্তান্তমূলক টিকা

(আদ্যাক্ষর অনুযায়ী)

অজিত কুমার গুহ, প্রফেসর (১৯১৪-১৯৬৯): বাংলা ভাষা-সাহিত্যের খ্যাতকীর্তি অধ্যাপক। ঢাকা জগন্নাথ কলেজের বাংলা বিভাগের দীর্ঘকালীন অধ্যক্ষ ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগেও খণ্ডকালীন অধ্যাপনা করেছেন। রাজনীতিসচেতন বুদ্ধিজীবী ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব হিসাবে ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে কারাবরণ করেন।

আইয়ুব খান, মোহাম্মদ (১৯০৭-১৯৭৪): ১৯৬০ থেকে ১৯৬৯ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট। জানুয়ারি ১৯৫১ তিনি পাকিস্তানের পাকিস্তান আর্মির কমান্ডার ইন চিফ ও ১৯৫৪-৫৫ প্রতিরক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৫৮ সালে তিনি চিফ মার্শাল ল এডমিনিস্ট্রেটর নিযুক্ত হন এবং সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে পাকিস্তানের ক্ষমতা দখল করেন। ১৯৬২ সাল পর্যন্ত তিনি সামরিক আইনে, এরপর ১৯৬৯ পর্যন্ত নিজ প্রবর্তিত শাসনতন্ত্র দ্বারা দেশ শাসন করেন এবং রেফারেন্ডামের মাধ্যমে ১৯৬০ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হন।

আকরম খাঁ, মোহাম্মদ, মওলানা (১৮৬৮-১৯৬৮): সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ। দৈনিক *আজাদের* প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি, নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের সহসভাপতি এবং পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৫৪ রাজনীতি থেকে অবসর, অবিভক্ত বঙ্গে মুসলিম জাগরণের আন্দোলনে অবদান উল্লেখযোগ্য। বঙ্গীয় মুসলিম সমাজের সাংবাদিকতার পথিকৃৎ।

আজমল খাঁ, হাকিম (১৮৬৩-১৯২৭): পুরো নাম হাফিজ মোহাম্মদ আজমল খাঁ। খ্যাতনামা ইউনানি চিকিৎসক, গ্রন্থকার ও রাজনীতিবিদ। সর্বভারতীয় স্তরের মুসলিম নেতা। জালিওনাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সরকার প্রদত্ত উপাধি ও স্বর্ণপদক বর্জন করেন।

আজিজ আহমদ (১৯০৬-১৯৮২): তিনি পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের উর্দ্ধতন অবাঙালি সদস্য। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের চিফ সেক্রেটারি রূপে দায়িত্ব পালনকালে পূর্ব পাকিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ প্রায় সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতেন। তিনি আইয়ুব খান, ইয়াহিয়া খান সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন ছিলেন এবং পরবর্তীকালে ভুট্টো সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী রূপে কাজ করেন।

আজিজুর রহমান: ময়মনসিংহ আওয়ামী লীগের অন্যতম সংগঠক। স্থানীয় রুমি প্রেসের স্বত্বাধিকারী। ময়মনসিংহ শহরের সাহিত্য সংস্কৃতি অঙ্গনের বিশিষ্টজন ছিলেন।

আতাউর রহমান খান (১৯০৭-১৯৯১): রাজনীতিবিদ ও আইনজীবী। আওয়ামী লীগ দলের প্রতিষ্ঠাতা সহসভাপতি। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ-এর অন্যতম সদস্য। যুক্তফ্রন্টের যুগ্ম আহ্বায়ক। এ. কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে গঠিত পূর্ববঙ্গ সরকারের বেসামরিক সরবরাহ দপ্তরের মন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৫৬-৫৮ পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী। বঙ্গবন্ধু প্রবর্তিত নতুন দল 'বাকশাল'-এ

যোগদান করেন। লে. জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সরকারের মন্ত্রিসভায় যোগদান এবং ৯ মাসকাল প্রধানমন্ত্রিত্ব করেন।

আনোয়ারা খাতুন, বেগম (১৯১৯-১৯৮৮): আওয়ামী মুসলিম লীগের একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, আইনজীবী আলী আমজাদ খানের স্ত্রী। তিনি সোহরাওয়ার্দী, মওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে রাজনীতিতে বিশেষ অবদান রাখেন। তিনি প্রথম মুসলিম মহিলা হিসাবে দেশ ভাগের পূর্বে বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য ছিলেন এবং ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তান আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন।

আবদুর রব নিশতার, সরদার (১৮৯৯-১৯৫৮): পশ্চিম পাকিস্তানে মুসলিম লীগের অন্যতম নেতা, পাকিস্তান আন্দোলনের একজন প্রথম সারির কর্মী ও রাজনীতিক। পাকিস্তানের যোগাযোগমন্ত্রী ও পাঞ্জাবের গভর্নর নিযুক্ত হন।

আবদুর রব সেরনিয়াবাত (১৯২১-১৯৭৫): প্রথম জীবনে বামপন্থী রাজনৈতিক সংগঠন গণতন্ত্রী দল (১৯৫২) এবং মওলানা ভাসানীর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৬৯-এ আওয়ামী লীগে যোগ দেন। আদর্শবাদী ও সৎ রাজনৈতিক হিসাবে পরিচিত ছিলেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ছিলেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শেখ সাহেবের ঘাতকেরা তাঁকে তাঁর মন্ত্রীপাড়ার বাড়িতে গিয়ে হত্যা করে। তিনি শেখ সাহেবের ভগ্নিপতি ছিলেন।

আবদুর রশিদ (১৯১২-২০০৩): ১৯৪০-এর দশকে আলীপুর মহকুমার এসডিও ছিলেন। পরবর্তীকালে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের একজন সচিব হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন।

আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ, মওলানা (১৯০০-১৯৮৬): ভাষা-আন্দোলন ও গণআজাদী লীগ নেতা। পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন।

আবদুল ওয়াসেক (১৯০৯-১৯৬৭): ১৯৪০-এর দশকের প্রখ্যাত ছাত্রনেতা। হলওয়েল মনুমেন্ট আন্দোলনের নেতা ছিলেন। ১৯৬২ সালে মৌলিক গণতন্ত্রের সদস্যদের ভোটে ঢাকা-১ আসন থেকে পাকিস্তান জাতীয় সংসদের সদস্য (এমএনএ) নির্বাচিত হন।

আবদুল জব্বার খদ্দর (১৮৯৭-১৯৭৭): আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠায় বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের মনোনয়ন না পেয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে পূর্ববঙ্গ পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। পরবর্তীকালে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতা করেন। সমবায়, ব্যাংক ও ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি প্রতিষ্ঠায় একজন বিশিষ্ট সংগঠক ছিলেন।

আবদুস সালাম খান (১৯০৬-১৯৭২): আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ। প্রথমে মুসলিম লীগ ও পাকিস্তান আন্দোলনের উদ্যমী কর্মী ছিলেন কিন্তু পাকিস্তান সরকারের অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী নীতির প্রতিবাদে মুসলিম লীগ ত্যাগ করে নবগঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগদান (১৯৪৯)। যুক্তফ্রন্টের মনোনয়নে পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত (১৯৫৪) এবং মন্ত্রী। ১৯৫৭ সালে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দেয়ার প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ ত্যাগ। পরে আওয়ামী লীগে প্রত্যাবর্তন এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত। পরে আবার আওয়ামী লীগ ত্যাগ করে। পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টির পূর্ব পাকিস্তান শাখার সভাপতির পদ গ্রহণ। শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে করা পাকিস্তান সরকারের আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় শেখ সাহেবের প্রধান কৌসুলি (১৯৬৯) ছিলেন।

আবু সাঈদ চৌধুরী (১৯২১-১৯৮৭): বিচারপতি ও বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি (১৯৭২-১৯৭৩)।

আবু হোসেন সরকার (১৮৯৪-১৯৬৯): বঙ্গীয় কৃষক প্রজা পার্টির মনোনীত প্রার্থী হিসাবে বঙ্গীয় বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত। ১৯৫৪-এর সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব বাংলা আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং ১৯৫৫ সালে পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন।

আবুল কালাম আজাদ, মওলানা (১৮৮৮-১৯৫৮): ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উল্লেখযোগ্য নেতা, ভারত স্বাধীন হলে শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। আধুনিক ভারত নির্মাণে তাঁর অবদান স্মরণীয়।

আবুল কাশেম, অধ্যাপক (১৯২০-১৯৯১): ভাষা সৈনিক, শিক্ষাবিদ ও লেখক। তমদ্দুন মজলিসের প্রতিষ্ঠাতা। বাংলা ভাষায় শিক্ষা দানের জন্য প্রচেষ্টা ও ঢাকার মিরপুরে বাংলা কলেজ প্রতিষ্ঠা করে তার প্রিন্সিপালের দায়িত্ব গ্রহণ। বাহান্নর ভাষা আন্দোলনে তাঁর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯): সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ। আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা নেতা, যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী কর্মসূচি ২১ দফার অন্যতম প্রণেতা। প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।

আবুল হাশিম (১৯০৫-১৯৭৪): ১৯৩৬-এ বর্ধমান থেকে বঙ্গীয় বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত। ১৯৩৭-এ মুসলিম লীগে যোগদান। ১৯৪৩-এ বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত। মুসলিম লীগকে একটি আধুনিক, গণতান্ত্রিক এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক চিন্তাচেতনালব্ধ রাজনৈতিক দলে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে নতুন কর্মসূচি ও কর্মী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ। সোহরাওয়ার্দী-শরৎ বসুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে স্বাধীন অখণ্ড বাংলার আন্দোলন। তখন শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সান্নিধ্যে আসেন। ১৯৫০-এ পূর্ব পাকিস্তানে আগমন। ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে কারাবরণ। ১৯৬২-এর দশকে রাজনৈতিক আদর্শবিচ্যুতি। সামরিক একনায়ক আইয়ুব খানের কনভেনশন মুসলিম লীগে যোগদান। পরে শেখ সাহেবের ৬ দফা আন্দোলনে সক্রিয় সমর্থন দান এবং পাকিস্তান সরকারের রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচার বন্ধের তীব্র বিরোধিতা। সুবক্তা, সুপণ্ডিত এবং ইসলামী চিন্তাবিদ।

আব্বাসউদ্দিন আহম্মদ (১৯০৯-১৯৫৯): কিংবদন্তীতুল্য একজন সঙ্গীত শিল্পী ছিলেন। পূর্ববঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগে এডিশনাল সঙ অর্গানাইজার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর কণ্ঠে পল্লীগীতি বিশেষ মাত্রা অর্জন করে।

আমিরুজ্জামান খান (১৯২৩-১৯৯২): আকরামুজ্জামান খানের পুত্র। বাংলাদেশ টেলিভিশনের সাবেক মহাপরিচালক।

আর. পি. সাহা (১৮৯৬-১৯৭১): পুরো নাম রনদাপ্রসাদ সাহা। সমাজসেবক ও দানবীর। মির্জাপুরে অবস্থিত ভারতেশ্বরী হোম্‌স, কুমুদিনী হাসপাতাল ও কুমুদিনী কলেজ তাঁর প্রধান কীর্তি। পাকিস্তান হানাদারবাহিনী তাঁকে ১৯৭১ সালে হত্যা করে।

আলতাফ গওহর (১৯২০-২০০০): পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের সদস্য। সামরিক একনায়ক আইয়ুব সরকারের তথ্য সচিব ছিলেন।

আলী আমজাদ খান: তিনি ঢাকা ও কোলকাতায় আইনজীবী হিসাবে কাজ করেন। আওয়ামী মুসলিম লীগ (পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগ) প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখেন ও তার প্রতিষ্ঠাতা সহসভাপতি

ছিলেন। রাজনৈতিক মতবিরোধের জন্য পরে তিনি আওয়ামী লীগ ত্যাগ করেন ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে যোগদান করেন। শেষে তিনি আইয়ুব খান প্রবর্তিত রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন।

ইব্রাহিম খাঁ, প্রিন্সিপাল (১৮৯৪-১৯৭৮): খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ। টাঙ্গাইলের করটিয়া সাদত কলেজের অধ্যক্ষ, বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য (১৯৪৬), পাকিস্তান জাতীয় সংসদের সদস্য (১৯৬২)।

ইস্কান্দার মির্জা (১৮৯৯-১৯৬৯): ১৯৫৪ সালে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত হন। ১৯৫৫-১৯৫৮ পর্যন্ত পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল ও প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

এ. জেড. খান ওরফে আকরামুজ্জামান খান (১৮৮৮-১৯৩৩): গোপালগঞ্জের তৎকালীন জনপ্রিয় মহকুমা অফিসার (SDO)। মানিকগঞ্জের হরিরামপুর উপজেলার দাদরোখী গ্রামের বিখ্যাত খান পরিবারের সদস্য।

ওয়াহিদুজ্জামান (১৯১২-১৯৭৬): সাবেক মুসলিম লীগ নেতা ও পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।

ওসমান আলী খান সাহেব: নারায়ণগঞ্জের বিখ্যাত আওয়ামী লীগ নেতা ও সাবেক এমএলএ ছিলেন।

ওসমান গনি, এম. ও. : ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন।

কফিলুদ্দিন চৌধুরী (১৮৯৯-১৯৭২): আইনজীবী, রাজনীতিবিদ এবং সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের যুক্তফ্রন্ট ও আওয়ামী লীগ সরকারের মন্ত্রী। যুক্তফ্রন্ট গঠনে (১৯৫৩) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। প্রথমে মুসলিম লীগ, পরে কৃষক শ্রমিক পার্টি এবং সবশেষে আওয়ামী লীগ রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে যোগদানকারী জাতীয় সংসদ সদস্য। বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরীর পিতা।

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬): বাংলা সাহিত্যের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। জনপ্রিয়তায় তাঁর স্থান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরেই। ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে কলম ধরেন ও রাজদ্রোহের অভিযোগে শাস্তিস্বরূপ কারাদণ্ড ভোগ করেন। তাঁকে বিদ্রোহী কবি বলেও ডাকা হয়ে থাকে। তিনি বাংলাদেশের জাতীয় কবি। তিনি গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও নাটকে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। গীতিকার, সুরকার ও গায়ক হিসাবেও তিনি অসাধারণ সুনাম অর্জন করেন।

কাজী বাহাউদ্দিন আহমদ (১৯২৬-১৯৯৮): ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত বরিশালে ভাষা আন্দোলনের একজন অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব। ১৯৫৪ সালে তিনি পাসপোর্ট ও বহিরাগমন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক নিযুক্ত হন। পরে ঐ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। সংস্কৃতিমনা ব্যক্তিত্ব, রাগ প্রধান সংগীতের অনুরাগী হিসাবে তিনি বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন।

কাদের সর্দার: পুরো নাম মির্জা আবদুল কাদের। ঢাকার মহল্লা সরদার ও রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। লায়ন সিনেমা হলের প্রতিষ্ঠাতা।

কামরুদ্দিন আহমদ (১৯১২-১৯৮২): লেখক, রাজনীতিবিদ ও কূটনীতিক। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের (১৯৪৮, ১৯৫২) অন্যতম সদস্য। ১৯৫৪-তে আওয়ামী লীগে যোগদান ও পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত। ১৯৫৭-তে রাজনীতি ত্যাগ করে কূটনীতিকের দায়িত্ব গ্রহণ। ষাটের দশকে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলায় যে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সৃষ্টি হয় তিনি তার একজন তাত্ত্বিক।

কিরণশংকর রায় (১৮৯১-১৯৪৯): শিক্ষাবিদ ও রাজনীতিক . নেতাজী সুভাষ বসুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু । বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বাধীন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রিসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন।

কোরবান আলী (১৯২৪-১৯৯০): রাজনীতিবিদ । যুক্তফ্রন্টের মনোনয়নে পূর্ববঙ্গ পরিষদের সদস্য ও ১৯৭৩ সালে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত। শেখ মুজিবুর রহমানের মন্ত্রিসভায় (১৯৭৫) তথ্য ও বেতার মন্ত্রী। ১৯৪৮-র ১৩ জুন লে. জেনারেল হুসেন মুহম্মদ এরশাদের নেতৃত্বাধীন সামরিক সরকারের মন্ত্রিসভায় যোগদান করে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে দায়িত্ব পালন করেন।

খন্দকার মাহবুব উদ্দিন আহমদ (১৯২৫-): বর্তমানে বাংলাদেশ হাইকোর্টের সিনিয়র এডভোকেট ও বিএনপির স্থায়ী কমিটির প্রাক্তন সদস্য ও সাবেক এমপি।

খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস (১৯২৩-১৯৯৫): লেখক, সংস্কৃতিসাধক ও রাজনীতিক, 'ভাসানী যখন ইউরোপে', 'কত ছবি কত গান', 'মুজিববাদ' ইত্যাদি গ্রন্থের লেখক। ভাষা আন্দোলনের অন্যতম নেতা।

খন্দকার শামসুদ্দীন আহমেদ: গোপালগঞ্জ থেকে নির্বাচিত অবিভক্ত বাংলার বিধানসভার সদস্য ও বিখ্যাত আইনজীবী।

খয়রাত হোসেন (১৯১১-১৯৭২): রাজনীতিবিদ। ১৯৩৮-১৯৪৭ পর্যন্ত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কাউন্সিলর। ১৯৪৬-এ রংপুর জেলা থেকে মুসলিম লীগের মনোনয়নে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর নাজিমুদ্দীন সরকারের গণবিরোধী নীতির প্রতিবাদে ১৯৪৮-এ মুসলিম লীগের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ। আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ভাষা আন্দোলনে সমর্থন দান। ১৯৫৪-র মার্চ মাসে যুক্তফ্রন্টের মনোনয়নে পূর্ববঙ্গ আইনসভার নির্বাচিত সদস্য।

খাজা নাজিমুদ্দীন (১৮৯৪-১৯৬৪): জন্ম ঢাকার নবাব পরিবারে। লন্ডনের মিডল টেম্পলের ব্যারিস্টার। দেশে ফিরে মুসলিম লীগে যোগদান। ১৯২৯-এ বাংলার শিক্ষামন্ত্রী। ১৯৩৭-এ নিজ জমিদারি এলাকা পটুয়াখালী থেকে বঙ্গীয় বিধানসভার নির্বাচনে দাঁড়িয়ে জননেতা এ. কে. ফজলুল হকের কাছে পরাজিত। পরে সোহরাওয়ার্দীর সহায়তায় কলকাতার কেন্দ্র থেকে উপনির্বাচনে জিতে হক সাহেবের নেতৃত্বে গঠিত কৃষক-প্রজা পার্টি ও মুসলিম লীগের সমন্বয়ে গঠিত বঙ্গীয় কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। অবিভক্ত বঙ্গে ১৯৪৩-এ মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা গঠিত হলে তিনি তার প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব বাংলার প্রথম প্রধানমন্ত্রী। বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার বিরোধিতা করেন। পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল ও প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

খাজা শাহাবুদ্দীন (১৮৯৯-১৯৭৭): রাজনীতিবিদ। খাজা নাজিমুদ্দীনের ছোট ভাই। বিভাগ পূর্বকালে বাংলা ও পরে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য। আইয়ুব খানের তথ্যমন্ত্রী হিসাবে রবীন্দ্রসঙ্গীত নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।

খান আবদুল কাইয়ুম খান (১৯০১-১৯৮১): পাকিস্তানের বিশেষ করে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের একজন উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব।

খান আবদুল গাফফার খান (১৮৯০-১৯৮২): উপমহাদেশের প্রবাদপ্রতিম স্বাধীনতা সংগ্রামী। বর্তমান উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের এই মহান নেতা 'সীমান্ত গান্ধী' হিসাবে পরিচিত ছিলেন।

খুরশিদ, কে. এইচ. (১৯২৪-১৯৮৮): ১৯৪২ সাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি জিন্নাহর সচিব ছিলেন। তিনি জিন্নাহ সম্পর্কে একটি স্মৃতিকথা রচনা করেন (অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচি ১৯৯০)। ১৯৪৯-১৯৭৫ পর্যন্ত তিনি আজাদ কাশ্মীরের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ভুট্টো সরকার তাঁকে ঐ পদ থেকে অব্যাহতি দেয়।

খোন্দকার মোশতাক আহমদ (১৯১৮-১৯৯৬): বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দক্ষিণপন্থী অংশের নেতা ছিলেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকারের বিতর্কিত পররাষ্ট্রমন্ত্রী। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সরকারের (১৯৭১-৭৫) বিভিন্ন দফতরের মন্ত্রী ছিলেন। ১৯৭৫-এ বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের মর্মান্তিক ও ষড়যন্ত্রমূলক হত্যায় তাঁর গোপন সমর্থন ও সহায়তা ছিল বলে ধারণা করা হয়। ১৯৭৫-এ বঙ্গবন্ধু হত্যার পর হত্যাকারীরা তাঁকে রাষ্ট্রপতির আসনে বসায়। বাংলাদেশের এক নিন্দিত রাজনীতিক।

গান্ধী, মহাত্মা (১৮৬৯-১৯৪৮): পুরো নাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। ভারতের জাতির পিতা এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা। নাথুরাম গডসে নামক এক আততায়ীর গুলিতে নিহত হন।

গোলাম মোহাম্মদ (১৮৯৫-১৯৫৬): ১৯৫১-১৯৫৪ পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল ছিলেন।

চিত্তরঞ্জন দাশ, দেশবন্ধু (১৮৭০-১৯২৫): প্রখ্যাত আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ। কলকাতা কর্পোরেশনের প্রথম মেয়র। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য সম্পাদিত বেঙ্গল প্যাক্ট (১৯২৩) চুক্তির জন্য বিখ্যাত।

চুন্দ্রিগড়, আই আই (১৮৯৯-১৯৬০): দেশ বিভাগের পর ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের প্রথম মন্ত্রিসভার সদস্য। তিনি ২ মাসের জন্য পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী (অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৫৭) দায়িত্ব পালন করেন।

চৌধুরী খালিকুজ্জামান (১৮৮৯-১৯৭৩): জিন্নাহ পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেলের পদ গ্রহণ করলে তিনি মুসলিম লীগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ৩১ মার্চ ১৯৫০ থেকে ৩১ মার্চ ১৯৫৩ পর্যন্ত তিনি পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর রূপে দায়িত্ব পালন করেন।

চৌধুরী মোহাম্মদ আলী (১৯০৫-১৯৮০): দেশ বিভাগের পর ১৯৪৭ সালে তিনি পাকিস্তান সরকারের সেক্রেটারি জেনারেল নিযুক্ত হন এবং ১৯৫১ সাল পর্যন্ত ঐ পদে আসীন থাকেন। ১৯৫৫-১৯৫৬ পর্যন্ত তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন।

জওহরলাল নেহেরু, পণ্ডিত (১৮৮৯-১৯৬৪): জাতীয় কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতা, স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। আধুনিক ভারতের রূপকার।

জহুর আহমদ চৌধুরী (১৯১৬-১৯৭৪): রাজনীতিবিদ ও শ্রমিক নেতা, স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভায় যোগদান করেন। এ দেশের স্বাধিকার আন্দোলনে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য।

জিল্লুর রহমান, মোহাম্মদ, এডভোকেট (১৯২৩-): শেখ সাহেবের ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সহচর। বর্তমানে বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি।

জুবেরী, আই. এইচ.: প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য।

টি. আহমদ, ডা.: বিগত শতকের ত্রিশ ও চল্লিশের দশকের কলকাতার বিখ্যাত চক্ষু চিকিৎসক।

তমিজুদ্দিন খান, মৌলভী (১৮৮৯-১৯৬৩): রাজনীতিক ও আইনজীবী। ইংরেজ আমলে অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নেয়ায় ১৯২১-২৩ সাল পর্যন্ত কারাভোগ করেন। কংগ্রেসের মনোনয়নে ১৯২৬ ও ১৯২৯-এ বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য। ১৯৩০-এ মুসলিম লীগে যোগদান। ১৯৩৭-৪১ বাংলায় ফজলুল হক মন্ত্রিসভার মন্ত্রী। পাকিস্তান গণপরিষদের সভাপতি ও জাতীয় পরিষদের স্পিকার।

তাজউদ্দীন আহমদ (১৯২৫-১৯৭৫): বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক। শেখ মুজিবের সুদক্ষ ডেপুটি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী। স্বাধীন রাজনৈতিক নেতা। ১৯৭৫-এর ৩ নভেম্বর বাংলাদেশের প্রতিবিপ্লবীরা তাঁকে আরও তিনজন সিনিয়র নেতার সঙ্গে জেলখানায় ব্রাশফায়ারে হত্যা করে।

তিতুমীর (১৭৮২-১৮৩১): আসল নাম মীর নিসার আলী। মক্কায় হজ করতে গিয়ে ওহাবি মতবাদে দীক্ষা গ্রহণ। দেশে ফিরে (১৮২৭) ধর্ম সংস্কার আন্দোলন শুরু। নদীয়া ও চব্বিশ পরগনায় তাঁতি ও কৃষকদের সংগঠিত করে নীলকর ও জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু। নিপীড়ক জমিদারদের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ায় তা শেষ পর্যন্ত ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে রূপান্তরিত হয়। ১৮৩১-এ তিনি নারিকেলবাড়িয়ায় বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু। ইংরেজের কামানের গোলায় কেল্লা ধ্বংস হলে তিনি ১৮৩১ সালের ১৯শে নভেম্বর শহীদ হন।

তোফাজ্জল আলী (১৯০৫-১৯৮৮): পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও রাষ্ট্রদূত।

দানেশ, মোহাম্মদ, হাজী (১৯০০-১৯৮৬): দিনাজপুরের বিখ্যাত কৃষক নেতা ছিলেন।

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮৬-১৯৭১): আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ। ১৯৪৬ সালে কংগ্রেসের সদস্য হিসাবে বঙ্গীয় বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত। ১৯৪৭-এ দেশ বিভাগের পর পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি পাকিস্তান গণপরিষদে ইংরেজি ও উর্দু ভাষার পাশাপাশি বাংলা ভাষাকেও সমান মর্যাদা দানের দাবি জানান। এই দাবি প্রত্যাখ্যাত হয়। এই সূত্রে পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। তিনি আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে গঠিত পূর্ববঙ্গ সরকারের মন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৭১ সালে ২৭ মার্চ পাকিস্তান হানাদার বাহিনী তাঁকে তাঁর বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে। এরপর থেকে তিনি নিখোঁজ।

নওশের আলী, সৈয়দ (১৮৯০-১৯৭২): আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ। ১৯২৯-এ বঙ্গীয় বিধান পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৩৭-এ ফজলুল হক মন্ত্রিসভার সদস্য ও মতান্তরের জন্য পদত্যাগ। জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান। বঙ্গীয় বিধানসভায় স্পিকার। ভারতীয় পার্লামেন্টে রাজ্যসভার সদস্য।

নবাব গুরমানি (১৯০৫-?): পুরো নাম মিয়া মুশতাক আহমদ খান গুরমানি। পাঞ্জাব লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের (১৯৩০ এবং ১৯৩২-১৯৩৬) এবং পাঞ্জাব লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্বলির (১৯৩৭-১৯৪৬) সদস্য। পাঞ্জাবের ও ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৭ পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্নর।

নন্দী ডা.: পুরো নাম ডা. মন্মথ নাথ নন্দী। ঢাকায় প্রগতিশীল আন্দোলনে যুক্ত থাকার ও নিঃস্বার্থ জনসেবার জন্য অত্যন্ত পরিচিত চিকিৎসক ছিলেন। ষাটের দশকের মাঝামাঝি পূর্ব পাকিস্তান সরকার তাকে পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগে বাধ্য করলে তিনি পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলায় বসবাস শুরু করেন ও সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

নাদেরা বেগম: ১৯৪০-৫০ দশকের প্রখ্যাত নারী নেত্রী। প্রগতিশীল ও সাম্যবাদী চিন্তার জন্য খ্যাতি অর্জন করেন। অধ্যাপক কবীর চৌধুরী ও শহীদ মুনীর চৌধুরীর বোন।

নূরজাহান বেগম (১৯২৫-): 'সওগাত' সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিনের কন্যা, নারীনেত্রী, মাসিক 'বেগম' পত্রিকার সম্পাদক।

নূরুদ্দিন আহমেদ: ১৯৪০-এর দশকের কলকাতায় মুসলিম ছাত্রনেতা ও মুসলিম লীগ কর্মী। বৃহত্তর বরিশালের পিরোজপুরের বাসিন্দা। পরবর্তী সময়ে পূর্ব বাংলা আইনসভার সদস্য।

নূরুল আমিন (১৮৯৩-১৯৭৪): সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে তাঁর নির্দেশেই ছাত্রজনতার ওপর পুলিশ গুলি বর্ষণ করে এবং তাতেই ভাষা শহীদদের মৃত্যু হয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার বিরোধিতা করেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পাকিস্তানের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে সেদেশের ভাইস প্রেসিডেন্ট পদ পান।

পীর মানকী শরীফ (১৯২৩-১৯৬০): পুরো নাম পীর আমিনুল হাসনাত। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের একজন প্রগতিশীল ধর্মীয় নেতা। ১৯৪৫ সালে মুসলিম লীগে যোগ দেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে ব্যাপক অবদান রাখেন।

পূর্ণ দাস: মাদারীপুরের বিপ্লবী অধ্যক্ষ পূর্ণদাস। এঁর জেলমুক্তি উপলক্ষে নজরুল 'পূর্ণ অভিনন্দন' নামে যে কবিতা রচনা করেন তা তাঁর 'ভাঙ্গার গান' কাব্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই কবিতায় নজরুল তাঁকে মাদারীপুরের 'মর্দবীর' বলে উল্লেখ করেন।

প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ (১৮৯১-১৯৮৩): পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী। এর পরেও তিনি দুইবার মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন।

ফজলুর রহমান (১৯০৫-১৯৬৬): মুসলিম লীগ নেতা ও পাকিস্তনের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছিলেন। উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করা ও আরবি হরফে বাংলা লেখায় পক্ষপাতী ছিলেন।

ফজলুল কাদের চৌধুরী (১৯১৯-১৯৭৩): অবিভক্ত ভারতে মুসলিম ছাত্রনেতা। পরবর্তীকালে মুসলিম লীগ নেতা। পূর্ব পাকিস্তান আইনসভা এবং পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের স্পিকার। শেখ মুজিবুর রহমানের ৬ দফা আন্দোলনের বিরোধিতা। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা। চট্টগ্রামে রাজাকার বাহিনী গঠন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর দালাল আইনে গ্রেফতার। ১৯৭৩-এ মৃত্যুবরণ।

ফজলুল হক, এ. কে. (১৮৭৩-১৯৬২): বইতে তাঁকে হক সাহেব ও শেরে বাংলা নামেও উল্লেখ করা হয়েছে। অবিভক্ত বাংলার দুইবারের প্রধানমন্ত্রী (১৯৩৭ ও ১৯৪১)। কিংবদন্তি প্রতিম বাঙালি জননেতা। কৃষক শ্রমিক পার্টির প্রতিষ্ঠাতা। বাংলার প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ঋণসালিসি বোর্ডের মাধ্যমে কৃষকদের মহাজনদের ঋণ থেকে মুক্ত করায় কৃষকদের মধ্যে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেন। অন্যদিকে একই সময়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বও নিজ হাতে রাখায় বাংলার কৃষক সমাজের মধ্য থেকে নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এবং পাকিস্তান সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেন। ইংরেজি আরবি উর্দুসহ বহু ভাষায় দক্ষ এক সম্মোহন সৃষ্টিকারী বাগ্মী ছিলেন। শেরে বাংলা নামে খ্যাত হয়েছিলেন।

ফণি ভূষণ মজুমদার (১৯০১-১৯৮১): ব্রিটিশ ভারতে সুভাষ চন্দ্র বসুর ঘনিষ্ঠ অনুসারী। পূর্ব পাকিস্তান আমলে আওয়ামী লীগের জন্মলগ্ন থেকেই প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগ সরকারের মন্ত্রী।

ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ (১৯১১-১৯৮৪): পাকিস্তানের নামকরা বুদ্ধিজীবী ও কবি এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ উর্দু কবি। তিনি অল ইন্ডিয়া প্রগ্রেসিভ রাইটারস্ মুভমেন্টের সদস্য ছিলেন। মার্কসবাদে ছিল তাঁর অবিচল আস্থা। তিনি ১৯৬২ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে লেলিন শান্তি পুরস্কার লাভ করেন।

বল্লভ ভাই প্যাটেল, সরদার (১৮৭৫-১৯৫০): জাতীয় স্তরের কংগ্রেস নেতা। স্বাধীন ভারতে জওহরলাল নেহেরুর ক্যাবিনেটে উপপ্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন।

বেগম রশিদ (১৯২২-২০০২): পুরো নাম বেগম জেরিনা রশিদ। পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের সচিব আবদুর রশিদের পত্নী। সিলেট রেফারেন্ডামে মুসলিম লীগের মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকাদের নেতৃত্ব দেন।

ভাসানী, আবদুল হামিদ খান, মওলানা (১৮৮০-১৯৭৬): রাজনীতিবিদ। বাংলাদেশে জন্মলাভ করলেও রাজনীতির সূত্রপাত করেন আসামে। ১৯১৯ সালে কংগ্রেস দলে যোগদান করে খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ ও দশ মাসের কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯২৬ সালে আসামে কৃষক-প্রজা আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। ১৯৩৭ সালে কংগ্রেস ত্যাগ করে মুসলিম লীগে যোগদান। ঐ বছর আসামে বাঙালি নিপীড়নের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। ১৯৪৪ সালে আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। পাকিস্তান আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯৪৭ সালে আসামে পুনরায় গ্রেফতার হন। ১৯৪৮ সালে মুক্তিলাভ করে পূর্ব বাংলায় আগমন। ১৯৪৯ সালে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। ১৯৫৭ সালে আওয়ামী লীগ ত্যাগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) প্রতিষ্ঠা করেন ও তার সভাপতি নির্বাচিত হন। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন পর্যন্ত সকল আন্দোলনে মুখ্য ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেন। শ্রমজীবী ও মেহনতী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আজীবন সংগ্রামের জন্য তিনি বিশেষভাবে স্মরণীয়।

মনসুর আলী, ক্যাপ্টেন এম. (১৯১৯-১৯৭৫): রাজনীতিবিদ, বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহযোগী। সেপ্টেম্বর ১৯৫৬ থেকে অক্টোবর ১৯৫৮ আতাউর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত পূর্ববঙ্গ কোয়ালিশন সরকারের মন্ত্রী। মুজিবনগরে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের অর্থমন্ত্রী, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রী ও ১৯৭৫-এর জানুয়ারিতে একদলীয় রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকার গঠিত হলে তার প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় অসামান্য অবদান রাখেন। কেন্দ্রীয় কারাগারে সেনাবাহিনীর একটি দল তাঁকে হত্যা করে।

মনোজ বসু (১৯০১-১৯৮৭): বাংলা সাহিত্যের খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক ও পুস্তক প্রকাশক।

মশিয়ুর রহমান (১৯২০-১৯৭১): আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ। যশোরের বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা। আতাউর রহমানের নেতৃত্বে পূর্ববঙ্গ কোয়ালিশন সরকারের মন্ত্রী (১৯৫৬-১৯৫৮)। ১৯৭১ সালে সামরিক বাহিনী তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করে।

মহিউদ্দিন আহমদ (১৯২৫-১৯৯৭): রাজনীতিবিদ। পূর্ব বাংলায় ও বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত প্রায় সকল রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। রাজনৈতিক কারণে ব্রিটিশ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলে সুদীর্ঘকাল কারাভোগ করেন। ১৯৭৯-১৯৮১ তিনি পার্লামেন্টে বিরোধীদলীয় ডেপুটি লিডার ছিলেন।

মানিক মিয়া (১৯১১-১৯৬৯): পুরো নাম তফাজ্জল হোসেন। বিখ্যাত সাংবাদিক এবং রাজনৈতিক ভাষ্যকার। গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রচিন্তার প্রবক্তা। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর রাজনৈতিক শিষ্য। বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তাঁর এবং তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা সাপ্তাহিক ও দৈনিক *ইত্তেফাকের* ভূমিকা ছিল তুলনারহিত। তিনি শেখ সাহেবের ৬ দফাকে তাঁর পত্রিকার মাধ্যমে দৃঢ় সমর্থন দেন। পাকিস্তানী সেনা শাসকদের পূর্ব বাংলাকে শোষণ ও নিপীড়ন এবং সাম্প্রদায়িকতার পৃষ্ঠপোষকতা দানের বিরুদ্ধে তাঁর কলম ছিল ক্ষুরধার ও আপোসহীন। এ জন্য অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী পাকিস্তানী সরকারসমূহ তাঁকে বার বার কারাগারে নিক্ষেপ করে এবং তাঁর পত্রিকা বন্ধ করে দেয়। ১৯৬৪ সালে পাকিস্তান সরকারের পরোক্ষ সহায়তায় ঢাকায় হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা লাগান হলে প্রধানত তাঁরই উদ্যোগে ঢাকার প্রধান পত্রিকাসমূহে "পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও" শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়।

মালেক, ডা. (১৯০৫-১৯৭৭): পুরো নাম ডা. আবদুল মোত্তালেব মালিক। রাজনীতিবিদ, শ্রমিক নেতা ও চক্ষু চিকিৎসক। মুসলিম লীগ নেতা এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভা এবং পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য। প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রদূত। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানী সামরিক জান্তার অধীনে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার বিরোধিতা এবং পাকিস্তানী হানাদারদের গণহত্যায় সহায়তা দেয়ার অপরাধে স্বাধীন বাংলাদেশে বিশেষ আদালতে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। পরে সাধারণ ক্ষমায় মুক্তি লাভ।

মাহমুদ নুরুল হুদা (১৯১৬-১৯৯৬): ছাত্রনেতা ও সাংস্কৃতিক কর্মী। নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের (১৯৩৩) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর রাজনৈতিক সচিব (১৯৪৩-১৯৫০)। 'বুলবুল ললিতকলা' একাডেমির (১৯৫৫) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

মিয়া মুহাম্মদ ইফতিখারউদ্দিন (১৯০৮-১৯৬২): ১৯৩৭ সালে তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মনোনয়নে পাবোর লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্বলির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪৫ সালে মুসলিম লীগে যোগ দেন। ১৯৪৭-৫৪ সাল অবধি তিনি পাকিস্তান কনস্টিটিউয়েন্ট এ্যাসেম্বলির সদস্য ছিলেন। তিনি আজাদ পাকিস্তান পার্টির (১৯৫০-৫৬) প্রতিষ্ঠাতা নেতা ছিলেন এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি অব পাকিস্তানের একজন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।

মিয়া মাহমুদ আলী কাসুরী (১৯১০-?): পাকিস্তানের একজন প্রখ্যাত বিরোধীদলীয় রাজনীতিবিদ, মানবাধিকার কর্মী এবং বামপন্থী আইনজীবী। তিনি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। তিনি জুলফিকার আলী ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টিতে ১৯৭০ সালে যোগ দেন এবং ১৯৭৩ সালে ১ম পাকিস্তানের সর্বসম্মত সংবিধান তৈরিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। পাকিস্তান পিপলস পার্টির গণতন্ত্রবিরোধী কার্যকলাপে অসন্তুষ্ট হয়ে ১৯৭৩ সালে অন্যতম বিরোধী দল আসগর খানের তাহরিক ই ইস্তেকলাল পার্টিতে যোগ দেন ও মৃত্যু অবধি ঐ দলের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। তিনি স্ট্যালিন শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হন।

মির্জা গোলাম হাফিজ (১৯২০-২০০০): আইনজীবী ও চীনাপন্থী ভাসানী ন্যাপের রাজনীতিক। বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিপক্ষে ছিলেন। সামরিক স্বৈরশাসক জিয়াউর রহমানের রাজনৈতিক দল বিএনপিতে যোগ দিয়ে সংসদ নির্বাচনে জয়লাভ করেন। জাতীয় সংসদের স্পিকার নির্বাচিত হন।

মুকুন্দবিহারী মল্লিক: হিন্দু দলিত সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট নেতা ছিলেন।

মুজিবুর রহমান খাঁ (১৯১০-১৯৮৪): খ্যাতনামা সাংবাদিক। পরে দৈনিক *আজাদের* সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি। 'পাকিস্তান' তাঁর বিখ্যাত বই।

মুনীর চৌধুরী, প্রফেসর (১৯২৫-১৯৭১): বাংলাদেশের কিংবদন্তি প্রতিম অধ্যাপক, বাগ্মী, সাহিত্যরসবেত্তা, ভাষাতাত্ত্বিক ও নাট্যকার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের জনপ্রিয় অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৫২ ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করায় তিনি কারাবন্দি হন এবং জেলের সহবন্দিদের অনুরোধে রচনা করেন অমর নাটক 'কবর'। প্রগতিশীল কারাবন্দিরা জেলেই নাটকটির অভিনয় করেন। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে আলবদর বাহিনীর হাতে শহীদ হন।

মোনেম খান (১৮৯৯-১৯৭১): পুরো নাম আবদুল মোনায়েম খান। কৃষক ও সাম্প্রদায়িক মুসলিম লীগ নেতা। পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলনে বিরোধিতা। বাঙালির সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরোধিতা। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। ১৯৬২ সালে সামরিক একনায়ক আইয়ুব একান্ত বিশ্বাসভাজন হিসাবে তাঁকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিয়োগ করেন। পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন ও শেখ সাহেবের ৬ দফার তীব্র বিরোধিতা এবং শেখকে বার বার গ্রেফতার ও নির্যাতন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা আক্রমণে ঢাকার নিজ বাড়িতে নিহত।

মোয়াজ্জেম আহমদ চৌধুরী (১৯২২-২০০২): রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ী। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের নির্বাচিত সদস্য ১৯৬৫।

মোল্লা জালালউদ্দিন আহমদ (১৯২৬-১৯৭৯): রাজনীতিবিদ। শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহযোগী। 'ছাত্রলীগ' ও 'আওয়ামী লীগ'-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। বঙ্গবন্ধু সরকারের মন্ত্রী। ১৯৭৪ সালে স্বাস্থ্যগত কারণে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় শেখ মুজিবুর রহমানের অন্যতম কৌঁসুলি।

মোহন মিয়া (১৯০৫-১৯৭১): পুরো নাম ইউসুফ আলী চৌধুরী। মুসলিম সদস্য হিসাবে অবিভক্ত বাংলার বিধানসভায় নির্বাচিত হন। ১৯৫৩ সালে মুসলিম লীগ থেকে বহিষ্কার করা হলে এ. কে. ফজলুল হকের কৃষক শ্রমিক (কেএসপি) দলে যোগ দেন। ১৯৫৪-এ যুক্তফ্রন্টের টিকিটে পূর্ব বাংলার সাধারণ নির্বাচনে জয়ী হয়ে ফজলুল হক মন্ত্রিসভায় সদস্যপদ লাভ করেন। আইয়ুববিরোধী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অংশগ্রহণ। কিন্তু ১৯৭১-এ বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা করেন।

মোহাম্মদ আলী (১৯০০-১৯৬৩): পুরো নাম মোহাম্মদ আলী চৌধুরী, তিনি বগুড়ার মোহাম্মদ আলী বলে বেশি পরিচিত ছিলেন। ১৯৪৬-৪৭ পরবর্তী বঙ্গীয় সরকারের অর্থ ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী। কলকাতা ও যুক্তরাষ্ট্রে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত। ১৯৫৩-১৯৫৫ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। তিনি আইয়ুব খানের মন্ত্রিসভায় (১৯৬২-৬৩) পাকিস্তান সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ (১৮৭৬-১৯৪৮): পাকিস্তান আন্দোলনের প্রধান পুরুষ, পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা, জাতির পিতা ও প্রথম গভর্নর জেনারেল।

মোহাম্মদউল্লাহ, মোহাম্মদ (১৯২১-১৯৯৯): বঙ্গবন্ধুর আমলে বাংলাদেশের ৪র্থ রাষ্ট্রপতি ছিলেন। পরবর্তীকালে বিএনপিতে যোগ দিয়ে এমপি নির্বাচিত হন।

মোহাম্মদ তোয়াহা (১৯২২-১৯৮৭): বিশিষ্ট বামপন্থী নেতা। যুবলীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের অন্যতম প্রভাবশালী নেতা, ভাষা আন্দোলনে তাঁর অবদান স্মরণীয়।

মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন (১৮৮৮-১৯৯৪): সাময়িক পত্রের সম্পাদক। কলকাতা থেকে সচিত্র মাসিক সাহিত্যপত্র 'সওগাত' প্রকাশনা ও সম্পাদনা তাঁর জীবনের প্রধান কীর্তি। বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের জাগরণের অন্যতম অগ্রনায়ক।

মোহাম্মদ মোদাব্বের (১৯০৮-১৯৮৪): সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। দীর্ঘকাল দৈনিক *আজাদের* বার্তা সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল (১৯০৬-১৯৫৬): দলিত নেতা, পাকিস্তান কনস্টিটিউয়েন্ট এ্যাসেম্বলির সদস্য ও পাকিস্তানের প্রথম আইনমন্ত্রী। পাকিস্তান ক্যাবিনেটে তিনি ছিলেন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন একমাত্র হিন্দু।

রফি আহমেদ কিদোয়াই (১৮৯৪-১৯৫৪): ভারতের অন্যতম স্বাধীনতা সংগ্রামী ও একজন সমাজতন্ত্রী নেতা। তিনি উত্তর প্রদেশে জাতীয় কংগ্রেসে অন্যতম মুসলিম নেতা ছিলেন। স্বাধীন ভারতে নেহেরু মন্ত্রিসভায় যোগাযোগমন্ত্রী হিসাবে ও পরে খাদ্যমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১): বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা। তিনি একাধারে কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার, প্রাবন্ধিক, দার্শনিক, সঙ্গীত রচয়িতা, সুরস্রষ্টা, গায়ক, চিত্রশিল্পী, অভিনেতা, সমাজসেবী ও শিক্ষাবিদ। ১৯১৩ সালে তাঁর গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের জন্য তাঁকে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

রাণী রাসমণি (১৭৯৩-১৮৬১): ব্রিটিশ বাংলার এক বিখ্যাত জমিদার।

লাল মিয়া (১৯০৫-১৯৬৭): পুরো নাম মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী। মুসলিম লীগ নেতা ও পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং সরকারদলীয় পার্লামেন্টারি পার্টির চিফ হুইপ ছিলেন।

লিয়াকত আলী খান (১৮৯৬-১৯৫১): পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। ১৬ অক্টোবর ১৯৫১ আততায়ী এক যুবকের গুলিতে নিহত হন।

লুলু বিলকিস বানু: ঢাকা শহরের ইতিহাস লেখক সৈয়দ মোহাম্মদ তৈফুরের কন্যা। অভিজাত ও আলোকিত পরিবারের এই মহিলা ১৯৪০ ও ১৯৫০-এর দশকে একজন প্রগতিশীল সংস্কৃতি কর্মী হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন।

শওকত আলী, ব্যারিস্টার: টাঙ্গাইলের অধিবাসী। খ্যাতনামা আইনজীবী ও আওয়ামী লীগ নেতা।

শরৎচন্দ্র বসু (১৮৮৯-১৯৫০): আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর অগ্রজ। ভারত বিভক্তির পটভূমিতে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেন এবং হোসেন সহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে যুক্ত বঙ্গকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে গঠনের চেষ্টা করেন।

শরীয়তুল্লাহ, হাজী (১৭৮১-১৮৪০): জন্ম বর্তমান মাদারীপুর জেলায়। আরবি ও ফারসি ভাষায় শিক্ষা লাভ কলকাতা, হুগলি ও মুর্শিদাবাদে। ১৮ বছর বয়সে মক্কা গমন সেখানে ১৬ বছর আরবি, ফারসি ও ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করেন মওলানা মুরাদ ও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত তাহিরের কাছে। পরে দু'বছর কায়রোয় আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে ওহাবি মতবাদে দীক্ষিত হয়ে দেশে ফেরেন ১৮১৮ সালে। দেশে এসে ইসলামী সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন। তিনি ইসলামের ফরজ সম্পার্কে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে আন্দোলন শুরু করেন। তাঁর এই আন্দোলনের নাম ফরায়জী আন্দোলন। এই আন্দোলন হিন্দু জমিদার, নীলকরদের বিরুদ্ধে হলেও পরে তা ইংরেজবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপ নেয়।

শামসুজ্জোহা: খান সাহেব ওসমান আলীর পুত্র। আওয়ামী লীগ নেতা ও নারায়ণগঞ্জ আসন থেকে পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

শামসুদ্দোহা (১৯০১-১৯৮৪): পুরো নাম আবু হামিদ মোহাম্মদ শামসুদ্দোহা। ভারতীয় পুলিশ সার্ভিসের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে চাকরি। ১৯৫২ সালে পূর্ববঙ্গ পুলিশের আইজি পদে নিযুক্ত। অবসর গ্রহণের পর ১৯৬৫ সালে আইয়ুব খানের নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য, কৃষি ও পূর্ত মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী নিযুক্ত হন।

শামসুল হক (১৯১৮-১৯৬৫): পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রথম সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে অংশ নেয়ায় তাঁকে গ্রেফতার করে কারান্তরালে পাঠানো হয়। সেখানে তাঁর মানসিক বৈকল্য দেখা দেয়। টাঙ্গাইলের এই নেতা মুসলিম লীগের শক্তিশালী প্রার্থীকে উপনির্বাচনে পরাজিত করে ইতিহাস সৃষ্টি করেন।

শাহ আজিজুর রহমান (১৯২৫-১৯৮৭): বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধী ছিলেন। জেনারেল জিয়া কর্তৃক বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন (১৯৭৯-১৯৮২)।

শেখ ফজলুল হক মণি (১৯৩৯-১৯৭৫): রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক ও লেখক, আওয়ামী লীগ রাজনীতিতে সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি সংযোজনে অবদান রাখেন। স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৫৩): অবিভক্ত বাংলার বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা ও শিক্ষানুরাগী ও সমাজসেবক স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র। ১৯৪১-এ বাংলার প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার অর্থমন্ত্রী। এ. কে. ফজলুল হক ছিলেন এই মন্ত্রিসভার প্রধানমন্ত্রী। ভারতের কেন্দ্রীয় জাতীয় মন্ত্রিসভার সদস্য। ১৯৫০-এ হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক দল 'জনসংঘ' গঠন করেন।

সবুর খান (১৯০৮-১৯৮২): পুরো নাম আবদুস সবুর খান। রাজনীতিবিদ। আইয়ুব খানের মন্ত্রিসভায় প্রায় ৮ বছর যোগাযোগমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতাকারীদের অন্যতম। সুবক্তা, দক্ষ পার্লামেন্টারিয়ান ও কৃতী ফুটবলার।

সাইদুর রহমান, প্রফেসর (১৯০৯-১৯৮৭): শিক্ষাবিদ, দার্শনিক ও মুক্তচিন্তার বুদ্ধিজীবী। ঢাকা জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁর স্মৃতিকথা: 'শতাব্দীর স্মৃতি'।

সাইফুদ্দিন কিচলু, ড. (১৮৮৮-১৯৬৩): ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী, ব্যারিস্টার এবং ভারতের একজন জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতা। ১৯২৪ সালে তিনি অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির জেনারেল সেক্রেটারি হন। ১৯৫২ সালে তাঁকে লেনিন শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

সিদ্দিকী, বিচারপতি: বি. এ. সিদ্দিকী; পাকিস্তানী শাসনের শেষ দিকে পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন।

সিরাজুদ্দিন হোসেন (১৯২৯-১৯৭১): প্রথমে দৈনিক *আজাদ* ও পরে দৈনিক *ইত্তেফাকে* সাংবাদিকতা করেন। ১৯৭১-এর শহীদ বুদ্ধিজীবী সাংবাদিক।

সুভাষ বসু (১৮৯৭-১৯৪৫): 'নেতাজী' নামে খ্যাত ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের এক কিংবদন্তি প্রতিম নেতা। আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করতে মুক্তি সংগ্রাম শুরু করেন। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের এই বীর নায়ক এক বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হন বলে ধারণা করা হয়।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম (১৯২৫-১৯৭৫): বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহচর ও সহকর্মী। একজন আইনজীবী ও রাজনীতিক। ১৯৭১ সালে মুজিবনগরে গঠিত প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির

দায়িত্ব পালন করে। দেশ স্বাধীন হলে তিনি শিল্পমন্ত্রী ও পরে উপরাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হন। সেনাবাহিনীর কিছু বিপথগামী সদস্য তাঁকে জেলে বন্দি অবস্থায় হত্যা করে।

সোহরাওয়ার্দী, শাহেদ (১৮৯০-১৯৬৮): হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর অগ্রজ, প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও শিল্পকলা বিশারদ। স্পেন, তিউনিসিয়া ও মস্কোতে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

সোহরাওয়ার্দী, হোসেন শহীদ (১৮৯২-১৯৬৩): বইতে পরবর্তী সময়ে তাঁকে শহীদ সাহেব বলে উল্লেখ করা হয়েছে। শেখ মুজিবুর রহমানের প্রথম জীবনের রাজনৈতিক গুরু। পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের একনিষ্ঠ প্রবক্তা। ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় জননন্দিত বক্তা। যুক্ত বাংলার শেষ প্রধানমন্ত্রী (১৯৪৬)। পাকিস্তানের আইন ও প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছিলেন।

হবীবুল্লাহ বাহার চৌধুরী (১৯০৬-১৯৬৬): লেখক, সাংবাদিক, বাগ্মী, ক্রীড়াবিদ ও পূর্ব পাকিস্তানের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন।

হামিদ নিজামী (১৯১৫-১৯৬২): পাকিস্তানের বিশিষ্ট সাংবাদিক। উর্দু সংবাদপত্র *নওয়াই ওয়াক্তের* প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক।

হামিদুল হক চৌধুরী (১৯০১-১৯৯২): রাজনীতিবিদ, আইনজীবী, সংবাদপত্রের মালিক। ভারত-পাকিস্তান সীমানা নির্ধারণের র‌্যাডক্লিফ কমিশনের সদস্য। পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রী। পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী। বাংলাদেশের স্বাধীনতার অন্যতম বিরোধিতাকারী।

হামুদুর রহমান (১৯১০-১৯৭৫): ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি (১৯৫৪-১৯৬০)। পরে পাকিস্তান সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি। হামুদুর রহমান বাংলাদেশ আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন। পাকিস্তানের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন এবং সেদেশের প্রধান বিচারপতির পদে অধিষ্ঠিত হন।

হুমায়ুন কবির (১৯০৬-১৯৬৯): বিখ্যাত লেখক, চিন্তাবিদ ও রাজনৈতিক নেতা। ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সংস্কৃতি দফতরের ক্যাবিনেট মন্ত্রী ছিলেন।

নির্ঘণ্ট